বসুমতী-গ্রন্থাবলী-সিরিজ



শতগল্প গ্রন্থাবলী

(চতুর্থ ভাগ)

[পঞ্চবিংশতি গল্পের রত্ন-মঞ্জুষা]

শ্রীসরোজনাথ ঘোষ প্রণীত

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত



কলিকাতা, ১৬৬নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, "বসুমতী-বৈদ্যুতিক-রোটারী-মেসিন-যন্ত্রে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত।

মূল্য ১।০ টাকা মাত্র] [উপহারে ১৲

সূচীপত্র

নববর্ষে

১

"মা!"

"আস্‌ছি, বাবা," বলিয়া মাতা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার পরিধানে একখানি চওড়া লাল পাড় শাড়ী। সিন্দুরচর্চ্চিত ললাটতলে, স্নিগ্ধ আননে একটা করুণ অথচ শান্তশ্রীর বিমলদীপ্তি। মাতৃত্বের পবিত্র মাধুর্য্যমণ্ডিত হইলেও নয়নপথে যেন কত দিনের অলিখিত ইতিহাসের উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ব্যর্থজীবনের সঞ্চিত অশ্রুরাশি কি সেখানে জমা হইয়া নয়নের মণিযুগলকে আরও কালো করিয়া দিয়াছে?

আরাধ্যদেবতার উদ্দেশে নিবেদিত পুষ্প ও বিল্বপত্রের দুই একটি যেন বিক্ষিপ্ত হইয়া দেবতার আশীর্ব্বাদস্বরূপ জননীর মস্তকের একান্তে শোভা পাইতেছিল। পূজাগৃহের পবিত্র ধূপগন্ধ তাঁহার অঙ্গে ও বাসে তখনও যেন আলিঙ্গনের স্পর্শ রাখিয়া বাতাসে মৃদুশ্বাস ফেলিতেছিল।

কালিদাস মায়ের এই করুণ, মধুর রূপ প্রতিদিনই দেখিয়া থাকে। জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই সে পূজারিণী, সংযতবাক্, চিরসহিষ্ণু, সেবাপরায়ণা মাতৃমূর্ত্তি দেখিয়া আসিতেছে। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং আত্মীয়স্বজনের বিবিধ মন্তব্য তাহার অন্তরতম প্রদেশে যে ব্যথার সঞ্চার করিত, তাহার তীব্রতার পরিমাপ কে করিবে? মায়ের এই অবস্থার যিনি মূল কারণ, জন্মদাতা হইলেও সে কখনও তাঁহাকে মনে মনে ক্ষমা করিতে পারে নাই। তাঁহাকে সে কখনও দেখিয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না। পাঁচ বৎসর বয়সে সে যে ছবি দেখিয়াছিল, কালের দীর্ঘপ্রলেপে তাহা অস্পষ্টতর হইয়া এখন যেন একবারেই মুছিয়া গিয়াছে।

অতি ধীরে একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস তাহার বক্ষঃপঞ্জরগুলিকে স্পন্দিত করিয়া বাহির হইয়া গেল। জননীর প্রতি সশ্রদ্ধনয়নে চাহিয়া সে বলিল, "কাকাবাবু যে প্রস্তাব করেছেন, তাতে কি মত দেওয়া সঙ্গত?"

মাতা বলিলেন, "আমি ত কোন দোষ দেখ্‌ছি না, বাবা। তাঁর মত হিতকামী আমাদের আর কে আছে? তাঁর জন্যই ত আজ তুই এত লেখাপড়া শিখ্‌তে পেরেছিস্। তোর মামাবাবু ত ম্যাট্রিক পাশের পর তোকে চাকরী করবার জন্যই পীড়াপীড়ি করেছিলেন। তোর ঐ কাকাবাবুই ত রাজী হন নি। দাদাকে কত রকমে বুঝিয়ে, পড়ার অন্যান্য খরচ তিনিই ত এত দিন যুগিয়ে এসেছেন।"

কালিদাস কি তাহা জানে না? পিতৃবন্ধু সত্যেন্দ্রকুমার তাহার কে? রক্তের সম্বন্ধ না থাকিলেও, এই বন্ধুবৎসল মহাপ্রাণ মানুষটি তাহার জন্য যাহা করিয়াছেন, সে ঋণ সে জীবনে শোধ করিতে পারিবে না। মাতুলালয়ে অন্নের অভাব না থাকিলেও, মাতাপুত্রকে যে ভাবে ধনীর গৃহে বাস করিতে হইতেছে, তাহার দুঃখ ভুক্তভোগী ব্যতীত কে বুঝিবে?

পিতৃবন্ধু সত্যেন্দ্র বাবু তাহাকে পড়ার কোনও অভাব জানিতে দেন নাই। এমন কি, তাঁহার জন্যই মাতুলও তাহাদের সহিত তেমন অশিষ্ট আচরণ করিতে সাহস করেন নাই। হাইকোর্টের বিশিষ্ট ব্যবহারাজীব বলিয়া, বিষয়ী মাতুলকে প্রায়ই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইতে হইত। কাজেই ভগিনী ও ভাগিনেয় গলগ্রহস্বরূপ হইলেও সত্যেন্দ্রকুমারের প্রিয় এবং অনুগ্রহভাজন বলিয়া প্রকাশ্যে তাহাদিগের প্রতি তাঁহার কোনও অন্যায় ব্যবহার করা সম্ভবপর ছিল না।

কালিদাস বলিল, "সেই জন্যই ত, মা, তাঁর ঋণের মাত্রা আর বাড়াবার ইচ্ছে হয় না। আমরা যে তাঁর কাছে আকণ্ঠ ঋণী।"

মাতার করুণ আননে ঈষৎ হাসির রেখা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "তিনি আমার কাছে তাঁর মনের কথা খুলে বলেছেন। তাঁর একটিমাত্র সন্তানকে—আদরিণী বেলা-মাকে তোর হাতে সঁপে দিতে চান। তাই আগে থেকেই একটা ব্যবসা বেঁধে যাতে তুই

মানুষের মত রোজগার করতে পারিস, তার ব্যবস্থা করেছেন।"

লজ্জার অরুণরাগে কালিদাসের আনন আরক্ত হইয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া সে সহসা বলিয়া উঠিল, "আমার জীবনটাও কি চিরদিন পরের অনুগ্রহেই কাটবে, মা? বাবা—"

তাহার মুখমণ্ডল সহসা একটু বিকৃত হইল; একটু থামিয়া সে কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "আমার যিনি জন্মদাতা, তিনি পরের অনুগ্রহে ছিলেন ব'লে আজ আমাদের এই দশা। আবার আমাকেও কি সেই পথ অবলম্বন করতে বল?"

ব্যথায় তাহার কণ্ঠস্বর ভারী হইয়া উঠিল। আজ সর্ব্বপ্রথম—আপনার অবস্থা বুঝিবার বয়স হইবার পর—সে মাতার কাছে তাহার অনুদ্দিষ্ট পিতার কথা আলোচনা করিল। সর্ব্বপ্রযত্নে সকলের নিকট হইতে সে এই প্রসঙ্গের আলোচনা এড়াইয়া চলিত। তাহার আরাধ্যা জননী এবং পিতৃব্যসম অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ পিতৃবন্ধু সত্যেন্দ্র বাবু কোনও দিন আভাসেও তাহার কাছে তাহার পিতার সম্বন্ধে কোনও কথার আলোচনা করেন নাই, অথচ আত্মীয়-স্বজনের নিকট হইতে সে স্পষ্ট ভাষায় যে সকল মন্তব্য উচ্চারিত হইতে শুনিত, তাহাতে তাহার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত এবং তাহার হৃদয়ে পিতার সম্বন্ধে এমন একটা বিরুদ্ধ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, শ্রদ্ধার সহিত কোনও দিন সে তাঁহাকে মনে করিতে পারে নাই। সত্যেন্দ্র বাবু এবং তাহার মাতার এ বিষয়ে নীরবতা তাহার এই ধারণাকে আরও দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল।

জননী একবার সন্তানের ব্যথা-কাতর মুখের দিকে চাহিলেন। কি একটা কথা বলিতে গিয়া তখনই আত্মসংবরণ করিয়া লইলেন। তার পর মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুই এতে অমত করিস্ না, কালি। পরের দাসত্ব করার চেয়ে এ ঢের ভাল। তোর কাকাবাবু বলেছেন, বেলা-মার সম্পর্কে এক জ্যেঠামশাই বেলার ভাবী স্বামীর জন্ত তাঁর জীবনের সঞ্চিত সব টাকা উইল ক'রে দিয়েছেন। সংসারে তাঁর আর কেউ নেই। ঐ মেয়েই তাঁর সব। তবে এতে তোর আপত্তি কেন হবে?"

কালিদাস নীরবে ভাবিতে লাগিল।

২

আষাঢ়ের মসীলিপ্ত আকাশের মতই কি তাঁহার সমগ্র জীবন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া থাকিবে? এ অন্ধকারের কি শেষ নাই—বিরাম নাই? আর কত কাল তিনি সন্তানের নিকট এমনভাবে আত্মগোপন করিয়া থাকিবেন? আজ তাঁহার জীবনাকাশের ধ্রুবতারা কালিদাস, তাহার জন্মদাতা পিতার সম্বন্ধে ইঙ্গিতে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, তাঁহার সযত্নলালিত, শিক্ষিত সন্তানের সম্বন্ধে তাহা কখনই শোভন নহে। কিন্তু তাহাকে এ সম্বন্ধে কোন কথা বলিবার তাঁহার উপায় নাই; তাঁহার মুখ বন্ধ—কঠোর অঙ্গীকারে তিনি আবদ্ধ।

জ্যেষ্ঠাগ্রজতুল্য শ্রদ্ধাভাজন, স্বামীর বাল্যসুহৃদ্ এবং পুত্রের অশেষ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সত্যেন্দ্র বাবু স্বামীর নিরুদ্দেশ হইবার পরই তাঁহাকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন, কালিদাস তাহার পিতার গৃহত্যাগ সম্বন্ধে কোনও কথা—ভাল অথবা মন্দ—কোন প্রকার মন্তব্য যেন তাহার মার নিকট হইতে জানিতে না পারে। বড় হইয়া যখন সে উপার্জ্জনক্ষম হইবে, তখন সকল কথা জানিয়া সে যেন নিরপেক্ষভাবে তাহার ভাগ্যবিড়ম্বিত পিতার সম্বন্ধে ধারণা করিয়া লইতে পারে। বন্ধুর নিকট হইতে তিনি যে বিদায়লিপি পাইয়াছিলেন, তাহাতে এই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল। সে যেমনই চরিত্রের হউক, তাহার এই অনুরোধ তাঁহার নিকট আদেশ, তাই বন্ধুপত্নীকে সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাক্ থাকিবার অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিয়া লইয়া তিনি নিরস্ত হইয়াছিলেন।

আজ নূতন করিয়া উমাশশীর মনে কৈশোর ও প্রথম যৌবনের স্মৃতি পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। পিতার আদরিণী কন্যা বলিয়া ধনী জমীদার, আত্মীয়-স্বজনহীন, দরিদ্র, সুন্দর, কিশোরকে জামাতৃপদে বরণ করিয়া আপনার গৃহে আনিয়া সমাদরে প্রতিপালন করিতেছিলেন। প্রতিভাশালী ছাত্র হরিদাস পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করিয়া কলেজে অধ্যয়ন করিত। কিশোরী উমাশশী কিশোর স্বামীর সাফল্যগর্ব্বে আনন্দিত ও সুখী। সুন্দর দেহের অন্তরালে যে প্রণয়স্নিগ্ধ হৃদয় ও পবিত্র চরিত্র-মাধুর্য্য বিদ্যমান ছিল, তাহাতে উমাশশী মনে তৃপ্তি ও গর্ব্ব অনুভব করিতেন। তিনি কল্পনানেত্রে কত সুখের জীবন-যাত্রার স্বপ্ন দেখিতেন।

পিতা তাঁহাকে ও তাঁহার সহায়সম্পদ্‌হীন স্বামীকে জীবনযুদ্ধে জয়ী হইবার উপযুক্ত পাথেয় ও রসদের বন্দোবস্ত করিয়া যাইবেন, এ কথা তিনি জানিতেন। কিন্তু অপস্মার রোগে অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া রুদ্ধবাক্‌ পিতা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যখন পরপারে পাড়ি জমাইয়াছিলেন, তখন উমাশশী শুধু ডাক ছাড়িয়াই কাঁদিয়াছিলেন—কিশোরীর মনে তখন সংসারের চিরন্তন ব্যবস্থা ও অবস্থার কোনও তত্ত্বই রেখাপাত করিতে পারে নাই।

তাহার পর ভ্রাতার সংসারে তাঁহাকে অনুগ্রহপ্রার্থিনী হিসাবে থাকিতে হইতেছে, এমন আভাস, তাঁহার পুত্রের আবির্ভাবের পর হইতে যখন তাঁহার কোমল চিত্তে প্রথম রেখাপাত করিল, তখন তাঁহার নারীহৃদয় অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়াছিল। স্বামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ করিয়া শুধু কল্পনার রাজ্যে কাব্য-কুসুমের সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। মাসিকপত্রে কবিতা বা গল্প ছাপা হইলে আত্মপ্রসাদ জন্মিতে পারে, কিন্তু তাহাতে অন্নবস্ত্রের দুঃখ দূর হয় কি?

উমাশশী স্বামীকে মাঝে মাঝে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আকারে ইঙ্গিতে আভাস দিতেন। হরিদাস তাহা কাণে লইলেও প্রাণে প্রাণে অর্থোপার্জ্জনের গুরু প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। স্বল্পে সন্তুষ্ট কল্পনাশ্রয়ী ভাবরাজ্যেই বিচরণ করিতে লাগিলেন।

জমীদার শ্যালক, ইন্দিরার নির্ম্মাল্য লাভ করিয়া তরুণ বয়সেই ভারতীর বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিল। এ জন্য সে ভগিনীপতি হরিদাসকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে দেখিত। অনায়াসলভ্য অন্নবস্ত্রের প্রসাদে অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া যাহারা সাহিত্যের সেবায় রত, অথচ সংসার প্রতিপালনের কোন চেষ্টা করে না, নবীন জমীদার তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া মনে করিতে পারিত না। কিন্তু তথাপি সহোদরার স্বামী, তাহাকে ত কিছু বলা যায় না।

কিন্তু এক দল চাটুকার-বেষ্টিত বৈঠকখানা-ঘরে কোন প্রসঙ্গের আলোচনায় হরিদাস যে দিন শ্যালককে যুক্তিতর্কে পরাভূত করিলেন, সে দিন ইন্দিরার বরপুত্র ভারতীর সেবককে ক্ষমা করিতে পারিল না। সে এমন কয়টি কথা শুনাইয়া দিল যে, হরিদাসের মত স্বপ্ন-বিলাসীরও চৈতন্য হইল। আত্মসম্মানে আঘাত লাগিলে তাহার বেদনা নিতান্ত মূঢ়কেও উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে। চাটুকারদিগের সম্মুখে পরানুগ্রহী, পরান্নভোজী ও পরগৃহবাসী বলিয়া যে বিদ্রূপের বাণগুলি—সরাসরি না হইলেও—তাঁহারই অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এমন সহজ সত্যটি বুঝিতে তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না। তার পর অন্তঃপুরমধ্যেও অনুরূপ আলোচনার স্রোত প্রবাহিত হওয়ায়, উমাশশীর সহিষ্ণুতাও ভাসিয়া গেল। অতি নির্ম্মমভাবে সেই রাত্রিতে তিনি হরিদাসকে ধিক্কার দিলেন। যে স্ত্রীপুত্রকে প্রতিপালন করিতে অসমর্থ, তাহার বিদ্যা ও সামর্থ্যের মূল্য কতটুকু? গলায় রজ্জু বাঁধিয়া ভাগীরথীগর্ভে আত্মবিসর্জ্জন করাও তাহার পক্ষে প্রশংসনীয়।

পরদিবস হইতে হরিদাসকে আর কেহ কলিকাতাতেও দেখিতে পাইল না। অজ্ঞাত অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন নিমেষে মিলাইয়া গেলেন।

তার পর?—তার পর দীর্ঘ দিন, দীর্ঘ মাস, দীর্ঘ বৎসর যুগ হইতে যুগে চলিয়া গিয়াছে, উমাশশী স্বামীর কোনও সন্ধান পান নাই। একখানি পত্রও স্বামীর নিকট হইতে তাঁহার কাছে আসে নাই। কত দুঃখে, কি বেদনা অন্তরে লইয়া তাঁহার জীবনের আরাধ্য দেবতা তাঁহাদের সংস্রব ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, তাহা কি অন্তর দিয়া উমাশশী পরে অনুভব করিতে পারেন নাই? সব কথাই ক্রমে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু নীরবে সবই সহ্য করা ছাড়া আর উপায় ছিল না। সন্তানকে মানুষ করিতে হইবে—তাহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। সাহিত্য-রচনায় মগ্ন থাকিয়াও কত দিন স্বামী তাঁহার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা, কেমন করিয়া তাহাকে স্বাধীন জীবনযাপনের যোগ্য করিয়া তুলিবেন, তাহার আলোচনা করিতেন। পরের বেতনভুক্‌ হইয়া অভিশপ্ত জীবনযাপনের মত দুঃখ আর নাই, সে কথা শতবার কত ভাবেই তিনি না উমাশশীকে শুনাইয়াছিলেন!

আত্মীয়-পরিজন, গৃহত্যাগী স্বামীর কাপুরুষতা, হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে কত ভাবে কত প্রকারে আলোচনা করিত—উমাশশীর কর্ণে প্রত্যেক কথাই পৌঁছিত। তাঁহাকে শুনাইয়া শুনাইয়া অনেকে আনন্দ অনুভব করিত। মাঝে মাঝে এমন সংবাদও পাওয়া যাইত যে, হরিদাস দূরদেশে ম্লেচ্ছভাবে জীবনযাপন করিতেছে। কেহ বলিত, সে আবার বিবাহ করিয়াছে; কেহ রটাইত, ভিন্ন দেশীয়া নারী

লইয়া ব্যভিচারে সে এখন জীবন কাটাইতেছে। সহোদরের কোনও পরিচিত ব্যক্তি সে দিনও তাহাকে বোম্বাই অঞ্চলে দেখিয়া আসিয়াছেন। এমনই নানাভাবে, নানাকথা তাঁহার সম্বন্ধে মাঝে মাঝে উমাশশী শুনিয়া আসিতেছেন। কোনও বর্ণনা কাহারও সহিত না মিলিলেও মোটের উপর তাঁহার স্বামী যে এই বিশ বৎসর জীবিত আছেন, এ সংবাদ সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহমাত্র ছিল না। কাজেই উমাশশী ভোগ-বিলাসের সহিত কোনও সম্বন্ধ না রাখিলেও সধবার বেশ পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁহারই কঠোর মন্তব্যে, নিদারুণ ব্যবহারে স্বামী নিরুদ্দিষ্ট। যদি তাঁহার অধঃপতন হইয়া থাকে, সে জন্য দায়ী উমাশশী। ভ্রাতার দ্বারা অপমানিত, মর্ম্মপীড়িত স্বামীকে সান্ত্বনা দিবার পরিবর্ত্তে কেন তিনি কঠোর, নির্ম্মম বাণী শুনাইয়াছিলেন?

উমাশশীর মনে পড়িল—সাহিত্য-সাধনায় স্বামীর কি ঐকান্তিক চেষ্টা! বিনিদ্র রজনীতে, কল্পনার ধ্যানে সাধক তন্ময়। সুন্দরের উপাসনায়, শিবের অর্চ্চনায়, সত্যের প্রতিষ্ঠায় অনন্যাসক্ত ভক্ত কাব্য-জগতে বিচরণ করিতেছেন। সাধারণ স্তরের মানুষ তাঁহার 'নাগাল' পাইবে কিরূপে?

আজ সেই সাধক কোথায়? কোন্ দূরদেশে, কোন্ দুর্ব্বিপাকে তাঁহার জীবনের দিনগুলি চলিয়া গিয়াছে—এখনও কি ভাবে তিনি আছেন, কে জানে?

এত অভিমান! এত দিনেও কি ক্ষমা করিবার অবকাশ তাঁহার হয় নাই? না—উমাশশীর অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নাই। কেন তিনি অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রীকে ক্ষমা করিবেন? তিনিই ত স্বহস্তে সে পথ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। দুইটি মিষ্ট কথা, গোটাকয়েক সহানুভূতিস্নিগ্ধ সান্ত্বনাবাক্য যে অবস্থায় পত্নীর নিকট অসহায় স্বামীর প্রাপ্য, তাহার বিনিময়ে তিনি কি দিয়াছিলেন?

আজ বিশ বৎসর ধরিয়া উমাশশীর হৃদয় অনুতাপের অনলে দগ্ধ হইয়া ছাই হইতে বসিয়াছে; কিন্তু এক অন্তর্য্যামী ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি ত তাহা জানে না। কিন্তু আর কত দিন?—আর কত সহ্য করা যায়?

তিনি বাঁচিয়া আছেন; কিন্তু লোক বলিতেছে, সে মানুষ আর নাই। ব্যভিচারী, মদ্যপ, কুক্রিয়াসক্ত হইয়া বিদেশে পাশবিক জীবনে নাকি অভ্যস্ত হইয়াছেন। সেই পূতচরিত্র যুবকের এমন অধঃপতন? তাঁহার সন্তানের যিনি জনক, এই তাঁহার বর্ত্তমান পরিচয়? এ দুঃখ, এ বেদনা যে রাখিবারও স্থান নাই, বিশ্বনাথ!

তাঁহার চরিত্রবান্, গুণবান্ পুত্র পিতৃনিন্দা, পিতৃ-পরিচয় শুনিয়া অধোবদনে থাকে, মুখ তুলিয়া কাহারও সহিত কথা কহিতে পারে না। কিন্তু উপায় কি? এ সকলের মূলই তিনি—তাঁহার বিবেচনার অভাবেই এই অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। জীবন ভরিয়া প্রায়শ্চিত্ত তাঁহাকেই করিতে হইবে।

কিন্তু তথাপি এ কথা তাঁহার অন্তর মানিয়া লইতে পারিতেছে না। হিমালয় চূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু সত্যাশ্রয়ীর পতন কি সম্ভব? ১২ বৎসর হইতে ২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনি স্বামীর প্রতিদিনের জীবনযাত্রার পরিচয়—মনের প্রত্যেক খুঁটিনাটি অবস্থার কথা—

"মা, অমন ক'রে অন্ধকারে ব'সে আছ কেন?"

ঘরের মধ্যে আলো জ্বলিয়া উঠিল।

উমাশশী তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া বসনাঞ্চলে নয়নাশ্রু মার্জ্জনা করিলেন। কালিদাসের তীক্ষ্নদৃষ্টি তাহা অতিক্রম করিল না। এমন অবস্থায় মাকে যে সে এই প্রথম দেখিল, তাহা নহে। জননীর সবিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তানের সম্মুখে তাঁহাকে অনেকবার ধরা পড়িতে হইয়াছে।

মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া কালিদাস বলিল, "মা, তোমার ও কাকাবাবুর আদেশমত ব্যবসা করাই স্থির হয়েছে। দাঁড়াও, তোমার পায়ের ধুলো নেই।"

নতশীর্ষ পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া জননী অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"তোমার ইচ্ছা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পেরে যেন ধন্য হই।"

কালিদাস কি সে কথা শুনিতে পাইয়াছিল?

৩

"কাকাবাবু বলেছেন, আপনি খুব কাজের লোক, খনির কাজও ভাল জানেন। বেশ, সেখানকার ম্যানেজার ছুটীতে যাবেন—বোধ হয় আর কাজ করবেন না। তাঁর শেষ পত্র না পাওয়া পর্য্যন্ত আপনি এখানকার কাজ—ক্যাশিয়ারের কাজের ভার নিতে পারবেন? এখানে ঐটাই বড় কাজ, এখন খালি আছে, পরে সেখানে যাবেন।"

ইংরাজীতে কথা হইতেছিল। ভাটিয়া ভদ্রলোকটি যেন অত্যন্ত অনুগৃহীত হইলেন। তাঁহার গুম্ফশ্মশ্রুশোভিত

প্রশান্ত আনন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চশমার মধ্য হইতে দীর্ঘায়ত লোচনপথে আনন্দ-বিস্ময়-জড়িত একটা দীপ্তি প্রকাশ পাইল। বিশুদ্ধ ও দ্রুত ইংরাজীতে তিনি বলিলেন, "মিঃ রায়, আমার মত অপরিচিতের উপর এরূপ অনুগ্রহ ও বিশ্বাস—"

কথা শেষ করিতে না দিয়া কালিদাস বলিল, "কাকাবাবু যখন আপনাকে নির্ব্বাচিত করেছেন, তখন আমার আর বলবার কিছু নেই। আপনি এখন থেকে আমার ক্যাশ বুঝে নিন। ৬ মাস পরে আপনাকে ঝরিয়া পাঠাবার বন্দোবস্ত করব।"

প্রৌঢ় ভাটিয়া ভদ্রলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সুগঠিত, সুন্দর ও বলিষ্ঠ দেহ হইতে যৌবনের দীপ্তি ও মাধুর্য্য তখনও বিদায় লয় নাই। সম্মুখে টেবলের উপর একখানি বাঁধান নূতন বই দেখিয়া কৌতূহলবশে তিনি উহা একবার তুলিয়া লইলেন।

কালিদাস বলিল, "ওখানা বাঙ্গালা বই—নূতন বেরিয়েছে। আপনি কি বাঙ্গালা জানেন?"

মাথা নাড়িয়া ভদ্রলোক বলিলেন, "সে সৌভাগ্য আমার হয় নি। তবে শুনেছি, বাঙ্গালা ভাষায় না কি অনেক ভাল ভাল বই আছে। আমাদের গুজরাটী ভাষায় কয়েকখানা অনুবাদও হয়েছে। আপনি বই পড়তে খুব ভালবাসেন বুঝি, মিঃ রায়? মাফ করবেন, আমাদের সম্বন্ধ বিচার ক'রে এটা বল্‌ছি না। আমি নিজে বড় কেতাবকীট কি না।"

কালিদাস বলিল, "সে কি কথা, আপনি শিক্ষিত ভদ্রলোক; তাতে বয়সে আমার পিতৃতুল্য, বিশেষতঃ আপনি কাকাবাবুর বন্ধু। আমাদের মধ্যে ও সম্বন্ধটার উল্লেখ ক'রে আমাকে লজ্জা দেবেন না।"

কর্ম্মপ্রার্থী বৈদেশিক এইরূপ শিষ্ট উত্তরে প্রীত হইলেন।

কালিদাস বইখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "দেখুন, আপনি যদি আমাদের ভাষা জানতেন, এই বই-খানা আপনাকে পড়বার জন্ত অনুরোধ করতাম। এমন চমৎকার বই অনেক দিন পড়িনি। লেখক অজ্ঞাত-নামা। কিন্তু এমন ভাষার মাধুর্য্য আর বিন্যাস-ভঙ্গী আমি কমই দেখেছি। কাল রাত্রিতে বইখানা প'ড়ে খালি কেঁদেছি। লেখক যেন বুকের রক্ত দিয়ে বইখানা লিখেছেন।"

কালিদাস অন্যমনস্কভাবে সম্মুখস্থ প্রাচীরের দিকে কয়েক মুহূর্ত্ত চাহিয়া রহিল।

প্রৌঢ় মাথায় পাগ্‌ড়ীটা সুবিন্যস্ত করিতে করিতে নির্দ্দিষ্ট আসনের দিকে অগ্রসর হইলেন। অদূরে কয়েক জন কেরাণী বসিয়া কাজ করিতেছিল। কালিদাস তাহা-দিগকে নব-নিযুক্ত ক্যাশিয়ার ধরমচাঁদ বিঠলদাসের অধীনে কাজ করিবার কথা বুঝাইয়া দিল। কেরাণীদের চিত্ত যে তাহাতে আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল, এমন লক্ষণ অবশ্যই প্রকাশ পাইল না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঐ পদের জন্য আবেদন-নিবেদনও করিয়াছিল। তন্মধ্যে কালিদাসের মাতুলের শ্বশুরালয়-সম্পর্কিত এক জন যুবকও প্রার্থী ছিল। বাহির হইতে অজ্ঞাতনামা বিদেশী ভাটিয়া আসিয়া তাহাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লওয়ায় মনে মনে কেহই সন্তুষ্ট হইতে পারিল না; কিন্তু প্রকাশ্যে অভিযোগও নিষ্ফল। কারণ, তাহারা জানিত, স্বল্পভাষী মনিবের হুকুম নড়িবার নহে।

৪

কয়দিন হইতে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল। বঙ্গোপসাগরে ঝটিকার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া কলিকাতা আবহবিভাগ হইতে প্রকাশিত দৈনিক পত্রে সংবাদ বাহির হইয়াছিল। কালিদাস কয়েক মুহূর্ত্ত মেঘমূর্চ্ছিত আকাশের দিকে চাহিয়া কাজে মন দিবার চেষ্টা করিল। অকারণে আজ তাহার মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গিয়াছিল।

কল-বাবু কলে চিঠি ছাপিতেছে, তাহার খট্‌খট্ শব্দ, কেরাণীদিগের অস্ফুট কলগুঞ্জন তাহার কাণে আসিয়া পৌঁছিতেছিল। সে প্রকৃতই আজ কাজে মনোনিবেশ করিতে পারিতেছিল না। আজ সে জননীকে অত্যন্ত বিচলিত দেখিয়া আসিয়াছিল, উহাই কি তাহার কারণ? তিনি যেন কি পড়িতে পড়িতে অঝোরে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিলেন। সে জননীর এই বিক্ষোভের কারণ জানিতে চাহিয়াছিল; কিন্তু মাতা তাহাকে কিছুই প্রকাশ করিয়া বলেন নাই। শুধু বলিয়াছিলেন, "আজ নয়, বাবা। এক দিন বল্‌ব বৈ কি!" সেও আর পীড়াপীড়ি করে নাই।

জীবনে কি সে মায়ের বুকের বেদনা শান্ত করিতে পারিবে না? কি অক্ষম সন্তান সে!

"কি হচ্ছে, কালিদাস?"

যুবক মাথা তুলিয়া দেখিল, তাহার মাতুল অবিনাশ বাবু দাঁড়াইয়া। সসম্ভ্রমে সে তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া বসাইল।

কয় বৎসর ব্যবসায় করিয়া, কালিদাস প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করায় মাতুলালয়ে তাহার আদর ও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছিল। ইদানীং ভবানীপুরে সে এক সুদৃশ্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া জননীসহ তথায় বাস করিতেছিল। প্রচুর টাকা, ব্যবসায়িমহলে সুনাম, মোটর—কিছুরই অভাব তাহার ছিল না। শ্যালক-অন্নভোজী, ভাগ্যবিড়ম্বিত হরিদাসের পুত্র বলিয়া যাহারা পূর্ব্বে কালিদাসকে অনুকম্পাভাজন মনে করিত, এখন সকলেই তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ—অনেকেই তাহার অনুগ্রহপ্রার্থী। এমন কি, প্রয়োজন হইলে, বিস্তীর্ণ জমীদারীর মালিক অবিনাশ বাবুও ভাগিনেয়ের নিকট টাকা ধার লইতেন। কয়লার ব্যবসায়ে সে বৎসর অতিরিক্ত অর্থলাভ হওয়ায় কালিদাস আরও কয়েকটি নূতন ব্যবসায়ের পত্তন করিয়াছিল। ভাগ্যলক্ষ্মী মুক্তহস্তে তাহার মস্তকে আশীর্ব্বাদ-ধারা বর্ষণ করিতেছিলেন।

অবিনাশ বাবু পূর্ব্বে কখনও কালিদাসের আপিসে আসেন নাই। সম্ভ্রান্ত মাতুলের পদধূলিলাভে কালিদাস ধন্য হইল।

আকাশে মেঘের গর্জ্জন আসন্ন বৃষ্টির সম্ভাবনা জানাইয়া দিল। ঘরের মধ্যে বিদ্যুতালোক, বাহিরে ঘনায়িত অন্ধকার। দুই একটা ঝড়ের ঝাপটা রুদ্ধ-কাচ বাতায়নে ঠেলা দিয়া গেল।

কালিদাস বলিল, "এই দুর্য্যোগে, মামাবাবু, কোথায় গিয়েছিলেন?"

অবিনাশ বাবু বলিলেন, "এই তোমার আপিসেই এলাম। অনুরূপকে ক্যাশিয়ারী কাজটা কবে থেকে দেবে, তাই জান্‌তে এলাম।"

কালিদাস অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে বলিল, "পদটা বড় দায়িত্বপূর্ণ, অনুরূপ একলা পেরে উঠবে না। তাই কাকাবাবু এক জন অভিজ্ঞ লোক দিয়েছেন। তাঁকেই আপাততঃ ও কাজটার ভার দিয়েছি। অনুরূপ তাঁর সহকারী হয়ে কাজটা ভাল ক'রে শিখে ফেলুক। মাস কয়েক পরে অন্য ব্যবস্থা করব।"

জমীদার বাবুর মুখ গম্ভীর হইল। তাঁহার শ্যালকপুত্রকে তিনি কথা দিয়াছিলেন যে! স্ত্রীর তরফ হইতেও যথেষ্ট অনুরোধ ছিল। মনে মনে নিদারুণ বিরক্ত হইয়া তিনি বলিলেন, "কাকে কাজটা দিলে?"

"কাকাবাবুর বিশেষ পরিচিত বন্ধু ধরমচাঁদ বিঠলদাস এক জন ভাটিয়া ভদ্রলোক। উনি সকল কাজেই বিশেষ দক্ষ।"

"তোমার বুদ্ধি এখনও পাকে নি, কালিদাস। টাকাকড়ির কাজ একটা বিদেশী মেড়োকে দিলে?"

অবিনাশ বাবুর কণ্ঠস্বরে কেরাণীরা সকলেই চমকিয়া উঠিল। ধরমচাঁদ বিঠলদাসও মুখ তুলিয়া বিস্মিত নেত্রে সেই দিকে চাহিলেন।

কালিদাস কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "কাকাবাবু ওঁকে খুবই ভাল জানেন।"

বিকৃতকণ্ঠে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "সত্যেন বাবু ভাল উকীল হ'তে পারেন,—এ সব বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা কি? তোমরা জান না, ও সব উড়ে, মেড়ো, গুজরাটী চোর, বদমাস ও ধড়িবাজ হয়। ওদের বিশ্বাস নেই। কোন্ দিন তোমার গলায় ছুরী দেবে। ও ব্যাটাকে রেখেছ—মুস্কিলে পড়বে।"

কেরাণীরা উৎফুল্লভাবে কাণ খাড়া করিয়া সব শুনিতেছিল,—মৃদু হাসির রেখা তাহাদের আননে উদ্ভাসিত হইল।

ধরমচাঁদ বাবু তাহাদের ভাবভঙ্গী দেখিয়া বোধ হয় বুঝিলেন, তাঁহারই সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে। তিনি উন্নত-মস্তকে সেই দিকে চাহিয়া অবিনাশ বাবুকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

কালিদাস বড় বিপন্ন হইল। মামাবাবুর কথাগুলি তাহার ভাল লাগে নাই। আগন্তুক ভদ্রলোক যদি বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন—ছিঃ ছি! কি লজ্জা!

অকস্মাৎ কক্ষটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। সম্ভবতঃ তার জ্বলিয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা নূতন নহে। বেহারা তাড়াতাড়ি কতকগুলি বাতি জ্বালিয়া দিল।

অবিনাশ বাবু কালিদাসের ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। চিরজীবন আদেশ দিয়া এবং সেলাম পাইয়া যাহারা

জীবনপথে অগ্রসর হয়, তাহারা অপরাধীকে মার্জ্জনা করিতে জানে না। এই বিঠলদাসকেও তিনি ক্ষমা করিতে পারেন না। অবিনাশ বাবু বলিলেন, "দেখি, তোমার নূতন লোকটি কেমন।"

ধরমচাঁদ স্বল্লালোকেও হিসাবের বহিগুলি পরীক্ষা করিতেছিলেন। মনিব ও তাঁহার মাতুলকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া কেরাণীরা শশব্যস্তে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু ধরমচাঁদ যেমন বসিয়া ছিলেন, তেমনই ভাবে আপনার কাজে মগ্ন।

শ্লেষভরে অবিনাশ বাবু বলিলেন, "দেখ্‌লে, লোকটা কেমন অসভ্য! মনিব দেখে উঠে দাঁড়াল না।"

কালিদাস ইংরাজীতে বলিল, "মিঃ বিঠলদাস, ইনি আমার মামা।"

ভদ্রলোক তাঁহার কর প্রসারিত করিয়া দিলেন।

"তুমি কি রকম ভদ্রলোক, আদব-কায়দা জান না?" বলিয়া অবিনাশ বাবু মুখ ফিরাইয়া লইলেন।

কালিদাস অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। সে বলিল, "উনি বাঙ্গালা বোঝেন না, মামাবাবু।"

অবিনাশ বাবুর আভিজাত্য, মর্য্যাদাজ্ঞান তখন দুর্নিবারভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি ইংরাজীতে বলিলেন, "মনিবের সঙ্গে ব্যবহারের রীতি তোমার জানা নেই? কালিদাস, তুমি একটা অসভ্য চাষাকে কাজ দিয়েছ?"

ধরমচাঁদ বিঠলদাস সবেগে আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর উন্নতশিরে দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "বাঙ্গালাদেশের অভিজাত বংশের ভদ্রলোকরা কি বিদেশী ভদ্রলোকদের সঙ্গে এই রকম ইতর ব্যবহারের পরিচয় দিয়ে থাকেন? দেখুন মশায়, আমি এখানে কাজ করতে এসেছি, সেলামের কসরত দেখাতে আসিনি। আর আপনিও আমার মনিব নন।"

"দেখ্‌লে কালিদাস! তোমার চাকর ব'লে কিছুই বল্লুম না, নইলে চাব্‌কে আজ—"

অবিনাশ বাবুর কণ্ঠস্বর ক্রোধে রুদ্ধ হইয়া গেল। কালিদাস এমন অদ্ভুত ব্যাপার কখনও দেখে নাই। সে মনে মনে বুঝিল, দোষ সম্পূর্ণ তাহার মাতুলের। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে কি করিবে?

অবিনাশ বাবু দ্রুতবেগে বাহিরে গিয়া মোটরে চড়িলেন। আকাশে তখনও ঘন ঘন বজ্রনাদ হইতেছিল।

নতশীর্ষে দাঁড়াইয়া কালিদাস ভাবিতেছিল, এ কি হইল! মাতুলের এই অভদ্র আচরণের প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাহার হইল না!

স্নিগ্ধ কণ্ঠে বিঠলদাস বলিলেন, "মিঃ রায়, দুঃখের কোন প্রয়োজন নাই। এর পর এখানে আর আমার কাজ করা সঙ্গত নয়। আমার জন্য—ভবঘুরের জন্য আত্মীয়-বিচ্ছেদ করা সঙ্গত নয়। আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি, এ দুঃখ আমার কাছে বড় নয়।"

কালিদাস দৃঢ়স্বরে বলিল, "তা হবে না, মিঃ বিঠলদাস। আপনি কর্ম্মচারী হলেও, মাতুলের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। আপনি যাবেন না।"

প্রৌঢ় স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে যুবকের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ভগবান্ আপনার মঙ্গল করুন; কিন্তু বিদায়। বিঠলদাস অপমানিত হয়ে সেখানে কাজ করে না।"

৫

আজ নববর্ষের সুপ্রভাত!

আর দশ দিন পরে তাহার বিবাহ, কিন্তু তথাপি কালিদাস সুখী হইতে পারিতেছিল না। গত কল্য বিঠলদাসকে লইয়া যে লজ্জাজনক ব্যাপার ঘটিয়া গিয়াছে, তাহার অনুশোচনার তীব্রদাহ তাহার মনুষ্যত্বকে যেন সন্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। কয়েক দিনের কার্য্যে সে বুঝিয়াছিল, এই কর্ম্মঠ লোকটিকে পাইয়া তাহার ব্যবসায়ের কার্য্য উত্তমরূপে চলিবে। সত্যেন্দ্র বাবু সত্যই বলিয়াছিলেন, 'হাজারে এক জনও এমন লোক মিলে না, কালিদাস।' তাঁহাকেই বা সে কি কৈফিয়ৎ দিবে? তাহার যাবতীয় ঐশ্বর্য্য ও সুখের একমাত্র কারণ যিনি, যাঁহার একমাত্র সন্তান—কন্যা আর কয়দিন পরেই তাহার গৃহলক্ষ্মী হইয়া আসিবে, সেই পিতৃতুল্য—তাহারও অধিক শ্রদ্ধাভাজন ভাবী শ্বশুরকে বিঠলদাসের কর্ম্মত্যাগ সম্বন্ধে সে কি কৈফিয়ৎ দিবে?

রবিবারে আফিস বন্ধ। সে প্রভাতে উঠিয়াই অনুতপ্তচিত্তে গঙ্গার ধারে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিল।

সারারাত্রি সে ভাল করিয়া নিদ্রা যাইতে পারে নাই, প্রভাতের স্নিগ্ধ বায়ুহিল্লোলে যদি মস্তিষ্ক একটু শান্ত হয়।

কয়দিন হইতে সে জননীর মুখেও একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন দেখিয়া আসিতেছে। সেই চিরবিষণ্ণ, করুণ মুখমণ্ডলে যেন একটা অপূর্ব্ব আভা বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে! ভাগ্যবিড়ম্বিতা নারী পুত্রের বিবাহ দিয়া একটা আনন্দ-নীড় রচনার আশায় কি সত্য সত্যই উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন? ভগবানের আশীর্ব্বাদে সত্য সত্যই কি জননীকে—দেবীকে সে সুখী করিতে পারিবে? ঈশ্বর কিরূপ, তাহা সে জানে না, তাহার মাতাই তাহার কাছে প্রত্যক্ষ দেবতা; যদি তাহা হয়, তবে সে আর কিছুই চাহে না। তাহার জননীর ভগ্ন, ম্রিয়মাণ হৃদয় আনন্দের সহস্র দলে বিকশিত হইয়া উঠুক। চিরদুঃখিনী নারী সুখের আস্বাদ পাইয়া এতটুকু তৃপ্তিলাভ করিলেই তাহার সকল শ্রম, সকল সাধনা সার্থক হইবে।

বেলা আটটার সময় বেড়াইয়া সে বাড়ী ফিরিয়া আসিল। কিন্তু তাহার অন্তঃপুর হইতে নারীর কল-হাস্যের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে না? তবে কি মাতুলালয় হইতে মেয়েরা এত সকালেই আসিয়া তাহা-দের নীরব পুরীকে কলহাস্যে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে? এত পূর্ব্ব হইতেই কি শুভ বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজনের সূত্রপাত হইল?

ভিতরে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, সম্মুখের বারান্দায় তাহার মাতা দাঁড়াইয়া। তাঁহার আজ এ কি বেশ! সেই সাধারণ বস্ত্রপরিহিতা, স্বল্পভূষণা জননী যেন আজ রাজরাজেশ্বরী-মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন! তাঁহার ললাটে চিরদিনই সিন্দুরের লোহিত শিখা প্রদীপ্ত থাকিত, কিন্তু আজ চরণযুগলও অলক্তক-চিত্রিত! আর জননীর পার্শ্বে তাহার ভাবী শাশুড়ী ও তাঁহারই ননন্দা মাতাকে বেষ্টন করিয়া অলঙ্কার-ভূষণে তাঁহাকে সজ্জিত করিতেছেন! জননীর আননে তৃপ্তি ও লজ্জার যে মাধুর্য্য আজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, তেমন ভাব সে পূর্ব্বে কখনও মাতৃ-আননে দেখে নাই। অদূরে পরিচারিকা দুই জন দাঁড়াইয়া—তাহাদের আননও হর্ষোৎফুল্ল।

দ্বারপথে দাঁড়াইয়া সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধ বিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিল। জননীর দৃষ্টি তাহার উপর নিক্ষিপ্ত হইবার পূর্ব্বেই তাহার চিরদিনের কাকীমা—সত্যেন্দ্র বাবুর স্ত্রী—বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি উপরের ঘরে যাও। উনি তোমার প্রতীক্ষা কচ্ছেন।"

তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। বিস্ময়ব্যাকুলচিত্তে সে দ্বিতলে উঠিয়া গেল। তাহার প্রশস্ত শয়নকক্ষের অভ্যন্তর হইতে কাকাবাবুর গলা শুনা গেল। তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন।

কালিদাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইল। কাকাবাবুর পার্শ্বে ও কে বসিয়া? প্রথমতঃ সে আপনার দৃষ্টিকে বিশ্বাস করিতে পারিল না। বিনিদ্র রজনীর খেয়াল এখনও কি তাহার মস্তিষ্কে জটলা করিতেছে? চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া সে আবার ভাল করিয়া চাহিল। না, তাহার দৃষ্টিবিভ্রম নহে। ঐ লোকটিকে সে সহস্র ব্যক্তির মধ্য হইতে অনায়াসে বাহির করিয়া লইতে সমর্থ। কিন্তু, কিন্তু—

সত্যেন বাবু বলিলেন, "এস কালিদাস। বিঠলদাস আমাকে সব কথাই বলেছেন। তাঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এলাম।"

সকৌতুক-দৃষ্টিতে তিনি কালিদাসের প্রতি চাহিলেন।

কিন্তু কালিদাস বুঝিতে পারিল না, তাহার অন্তঃপুরে সম্পূর্ণ অপরিচিত, এক বিদেশীকে কি করিয়া কাকাবাবু প্রবেশাধিকার দিলেন। মনে মনে শুধু বিস্ময় নহে, একটু বিরক্তিও অনুভব করিল। যে ব্যক্তি এক দিন তাহার অধীনে কর্ম্মচারী ছিল, অন্তরঙ্গ বন্ধু হইলেও তাহাকে তাহাদের অন্তঃপুরে—একবারে শয়ন-কক্ষে লইয়া আসা সঙ্গত কার্য্য কি?

সম্ভবতঃ তাহার মুখে চোখে তাহার মনের ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সত্যেন বাবু বলিলেন, "এঁর পদধূলি আগে নাও, কালিদাস। আজ তুমি সত্যই ভাগ্যবান্।"

কাকাবাবুর মস্তিষ্ক-বিভ্রম ঘটিয়াছে নাকি? বয়োজ্যেষ্ঠ হিসাবে পদধূলি কাহারও কাহারও গ্রহণ করা যাইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া অধীন কর্ম্মচারীর পদধূলি লইতে হইবে? এ কি অন্যায়, অসম্ভব আদেশ?

বিঠলদাস পলকহীন নেত্রে কালিদাসের সুন্দর আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিলেন। সত্যেন্দ্রকুমার কালিদাসের হাত ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

"কালিদাস, তোমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া এবং অর্থ-সম্পদের অধিকারী হওয়ার যিনি একমাত্র হেতু—তোমার ইহলোকের সেই দেবতাকে প্রণাম ক'রে ধন্য হও। ইনি তোমার নিরুদ্দিষ্ট পিতা।"

কালিদাস বিহ্বলভাবে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। পৃথিবী কি তাহার পদতল হইতে সরিয়া যাইতেছে? তাহার দেহ টলিয়া উঠিল।

অকস্মাৎ দুইখানি বলিষ্ঠ বাহু সস্নেহে তাহাকে বক্ষোদেশে চাপিয়া ধরিল।

"আমার বংশের তিলক—আমার জীবনের সাধনা, আনন্দ!"

কালিদাস পিতৃপদধূলি গ্রহণ করিয়া অশ্রুপ্লাবিত নেত্রে সেই সৌম্য প্রশান্ত পিতৃমুখপানে চাহিল।

"১৮ বৎসরের সাধনালব্ধ ২ লক্ষ টাকা, ঝরিয়ার কয়লার খনি, এ সবই তোমার বাবার দান। ছেলেবেলা হ'তে পড়ার খরচ?—সবই তোমার বাবার টাকায় হয়েছে। বন্ধুর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আমি, সব কথা জেনেও প্রকাশ করতে পারি নি। ২৫ বৎসর বয়সে ব্রহ্মচারীর মত সংযম নিয়ে সে শুধু অর্থের সাধনা করেছিল! সিদ্ধিলাভ হয়েছে। তোমার আগে তোমার মাকে কিছু কিছু বলেছিলাম, কিন্তু প্রকাশ করতে নিষেধ ক'রে দিয়েছিলাম।"

সত্যেন বাবুর কণ্ঠও অশ্রুভারে রুদ্ধ হইয়া আসিল।

"বাবা, বাবা, অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করুন।"

হরিদাস পুত্রকে আবার বক্ষোদেশে জড়াইয়া ধরিলেন। আজ ২০ বৎসর!—বুভুক্ষু পিতৃহৃদয় সন্তানের স্পর্শরস আস্বাদনে বঞ্চিত!—

সত্যেন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "খেয়ালী কবির কর্ম্মচারী সেজে পুত্রের কর্ম্মশক্তিকে পরীক্ষা করবার ব্যাপারেও মৌলিকতা আছে। কালিদাস, সে পরীক্ষাতে তুমি পাশ হয়েছ। আর একটা কথা। ১৮ বৎসর ধ'রে লক্ষ্মীদেবীর পরিচর্য্যার পর, ভারতীর চিরন্তন সেবক তাঁর বহুদিন বিস্মৃত বীণায় ঝঙ্কার তুলেছেন। সে দিনের সেই বেনামা উপন্যাসের লেখকই তোমার বাবা।"

কালিদাসের হৃদয় গর্ব্বে, হর্ষে, উল্লাসে অধীর হইয়া উঠিল। এমন পিতার সে সন্তান! এত দিন মনে মনে পিতার সম্বন্ধে যে বিরুদ্ধ ধারণা তাহার হৃদয়কে কলুষিত করিয়াছিল, সারাজীবন ধরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিলেও তাহার ক্ষয় নাই।

এমন সময় নীচে আর একবার জোরে শঙ্খ বাজিয়া উঠিল।

"কি হে, হরিদাস নাকি ফিরে এসেছে? ব্যাপার কি?"

দ্বারপ্রান্তে অবিনাশ বাবু থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কালিদাসের আফিসের ক্যাশিয়ারটা ঘরের মধ্যে দাঁড়াইয়া কালিদাসকে জড়াইয়া ধরিয়াছে কেন? তবে কি? তবে কি—

"আসুন দাদা, বিশ বছর পরে দেখা।"

অবিনাশ বাবুর নেত্রযুগল বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইল। নববর্ষের প্রভাতে কি তিনি দিবাস্বপ্ন দেখিতেছেন?

গল্পলহরী, বৈশাখ, ১৩৩৪

চাবিকাঠি

১

"দাদা!"

বিভারাণী গলবস্ত্র হইয়া অগ্রজ সত্যভূষণের চরণে প্রণত হইল।

জ্যেষ্ঠ সহোদর ভগিনীর শিরে হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কত কাল পরে উভয়ের দেখা! দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর সত্যভূষণ জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়া সামান্ত বেতনে পশ্চিমাঞ্চলে শিক্ষকতার কার্য্য লইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। তদবধি মাঝে মাঝে ভ্রাতা ও ভগিনীর মধ্যে পত্র-বিনিময় হইত। দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াও পিতৃমাতৃহীন সত্যভূষণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এস্ সি পরীক্ষায় বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ভগিনীকে সুশিক্ষিতা করিয়া ধনবান্ পিতার একমাত্র পুত্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন। সে আজ ১২ বৎসরের কথা। বিভারাণীর অতুলনীয় রূপ এবং গুণগ্রামের প্রশংসা শুনিয়া রাধামাধব বাবু সুশিক্ষিত পুত্র বিজয়-মাধবের সহিত দরিদ্র-কন্থার বিবাহ দিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

বিজয়মাধব বিলাত হইতে ঘুরিয়া আসিয়া পিতৃপরিত্যক্ত বিরাট কণ্ট্রাক্টরী কার্য্য গ্রহণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়াছিল। দূরে থাকিয়া সত্যভূষণ সে সকল সংবাদ পাইতেন। পরমস্নেহাস্পদা ভগিনীর সুখৈশ্বর্য্যের সংবাদে তিনি বিমল আনন্দই লাভ করিতেন। কিন্তু নানা-কারণে বিগত দশ বৎসরের মধ্যে তিনি দেশে আসিতে পারেন নাই। ভগিনী বা ভগিনীপতির সহিত শুধু পত্র-বিনিময় ব্যতীত প্রত্যক্ষ দর্শন ঘটিবার সুযোগ কোন পক্ষ হইতেই হয় নাই।

বিভা সহাস্তমুখে বলিল, "বৌদিকে সঙ্গে ক'রে আননি কেন, দাদা? কত দিন তাঁকে দেখিনি।"

সত্যভূষণ বিজলীপাখার তলে বসিয়া প্রসন্নমুখে বলিলেন, "তাঁর কি সময় আছে, বোন্। সংসারের খুঁটিনাটি কাজে অবসরই নেই। আমি একটা বিশেষ কাজে কলকাতা আসবার অবকাশ পেলাম, তাই তোদের দেখা পেলাম। কতবার ত লিখেছিলাম, তা গরীবের বাড়ীতে বিজয়মাধব বাবুর যাবার লক্ষণ ত দেখ্‌লাম না।"

সত্যভূষণ সরলভাবে হাসিতে লাগিলেন।

বিভার মুখমণ্ডল ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। দাদার কথার অন্তরালে শ্লেষের স্পর্শ পর্য্যন্ত নাই; কিন্তু দুঃখের রেশ যে তাহাতে আছে, বিভা কি তাহা অনুভব করিতে পারে নাই?

সে কথার মোড় ঘুরাইয়া দিবার জন্ত বলিল, "তোমার ত মোটে একটি ছেলে; সংসারে ত মোটে তোমরা ৩টি প্রাণী, তা কি এত কাজ বল ত?"

সত্যভূষণ বলিলেন, "সে কি না দেখ্‌লে বোঝা যায়, বিভু? যাক্, তোর ছেলেমেয়েকে ডাক এ দিকে।"

বিভা গৃহান্তর হইতে সাত বৎসরের কন্থা ও ৪ বৎসরের পুত্রকে ডাকিয়া আনিল।

সত্যভূষণ তাহাদিগকে আদর করিয়া কাছে ডাকিলেন। "যাও প্রণাম কর। তোমাদের মামাবাবু।"

বালক-বালিকা সেই প্রিয় ও প্রসন্নদর্শন মামাবাবুর দিকে চাহিতে চাহিতে অগ্রসর হইল। পার্শ্বের হাতব্যাগ খুলিয়া সত্যভূষণ বালিকার গলদেশে একগাছি সোনার হার এবং বালকের হস্তে একটি সুদৃশ্য সোনার রিষ্ট ওয়াচ্ পরাইয়া দিলেন।

বিভা বলিয়া উঠিল, "দাদা!"

সত্যভূষণ প্রসন্নদৃষ্টিতে সহোদরার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার বৌদি পছন্দ ক'রে এ জিনিস নিজে আনিয়েছিলেন, আমি তাঁরই আদেশ পালন করলাম মাত্র। তোরা বড়লোক, এ জিনিস হয় ত তোদের কাছে তুচ্ছ হ'তে পারে; কিন্তু গরীব হলেও আমাদের ত একটা সাধ, কর্ত্তব্য আছে।"

বিভার নয়নযুগল সহসা আর্দ্র হইয়া উঠিল। সে শশব্যস্তে বলিল, "না দাদা, আমি কখনই তা ভাবিনি। আমি ত তোমারই বোন্—আমিও গরীবের মেয়ে। তবে তোমার অবস্থা ত তেমন নয়। এতগুলো টাকা—"

বাধা দিয়া সত্যভূষণ বলিলেন, "কিন্তু তাই ব'লে এমন অভাবও আমাদের নেই, বোন্।"

দ্বারপথে পদশব্দ হইল। একটু আগেই মোটরের শৃঙ্গধ্বনি বাহিরের ফটকে শ্রুত হইয়াছিল।

য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে বিজয়মাধব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

বিভা মাথার অঞ্চলটা ঈষৎ টানিয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "দাদা!"

বিজয়মাধবের আননে পরিচয়ের স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। যুক্তকর ললাটে স্পর্শ করিয়া সে খদ্দরধারী শ্যালক—পত্নীর অগ্রজকে নমস্কার জানাইল।

"কখন্ এলেন, আপনি?"

"সকালের গাড়ীতেই এসেছি।"

"আপনি ত ধানবাদের স্কুলেই এখন আছেন?"

সত্যভূষণ বাহিরের বাতায়নপথে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেই ভাবেই তিনি বলিলেন, "ধানবাদ? হাঁ, সেইখানেই আছি।"

পত্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বিজয়মাধব বলিল, "দাদাকে চা দিয়েছ?"

ভগিনীর কুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া সত্যভূষণ বলিলেন, "প্রয়োজন নেই। ও অভ্যাসটা হয় নি।"

"তা হ'লে সকাল সকাল স্নানটা সেরে ফেলুন, সত্য বাবু। তোমার দাদার শোবার ঘরটা ঠিক ক'রে রাখা দরকার। হরে—"

ভৃত্য শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিল। বিজয়মাধব তাহাকে যথাযথ আদেশ প্রদান করিল।

সত্যভূষণের মুখভঙ্গী দেখিয়া তাঁহার অন্তরের কথা কেহ বুঝিতে পারিল না। কিন্তু সত্যভূষণ দশ বৎসর পরে ভগিনীর গৃহিণীপণার লক্ষণগুলির অভাব দেখিয়া কি ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন? তাহার সংসারে সেই ত সর্ব্বময়ী কর্ত্রী। মাথার উপরে আর ত কেহ নাই। পঞ্চদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহে যেমন স্বচ্ছন্দভাবে বিভা সকল বিষয়ে তত্ত্বাবধারণ করিত, তাহাতে তিনি বুঝিয়াছিলেন, পরলোকগতা জননীর অনবদ্য গৃহিণীপণার সকল লক্ষণ উত্তরকালে তাহাতে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিবে। কিন্তু এমন কুণ্ঠা, এমন সশঙ্ক সঙ্কোচ সাতাইশ বৎসরের যুবতী গৃহিণীর পক্ষে ত সঙ্গত নহে!

বিজয়মাধব শিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি স্বামী। তাহার অর্থের প্রাচুর্য্য বিস্ময়জনক। নানা দেশহিতকর প্রতিষ্ঠানের সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ সংস্রব। জাতীয় জাগরণের অনুকূল মতবাদীদিগের মধ্যে সে অন্যতম বলিয়া সংবাদপত্রে তাহার নাম বাহির হয়। স্ত্রীস্বাধীনতা, নারীজাগরণ সম্বন্ধে নানাস্থানে সে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করে। তবে তাহার বিদুষী পত্নীর সাংসারিক জ্ঞান এই কয় বৎসরে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হয় নাই কেন? দীর্ঘকাল পরে অগ্রজের দেখা পাইয়া আনন্দ-বিস্ময়ে ভগিনী কি বিমূঢ়া হইয়া পড়িয়াছে যে, গৃহিণীর প্রথম কর্ত্তব্য তাহার তরফ হইতে পালিত হইবার প্রেরণা না আসিয়া তাহার স্বামীর নিকট হইতে আসিল?

কিন্তু সত্যভূষণের আননে এ সকল চিন্তার কোন লক্ষণ প্রকাশ পাইল না। তিনি সহোদরার নত মুখের দিকে একবার চাহিয়া ভগিনীপতির সহিত বাহিরে চলিয়া গেলেন।

২

কার্য্যোপলক্ষে সত্যভূষণকে প্রায় সপ্তাহকাল কলিকাতায় থাকিতে হইল। তিনি প্রসন্নচেতা, মধুরভাষী হইলেও স্বভাবতঃ বাচালতার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি গভীরভাবে প্রত্যেক বিষয়টি লক্ষ্য করিত, কিন্তু মুখ হইতে কদাচিৎ কোন মন্তব্য প্রকাশিত হইত।

কার্য্যের অবকাশে ভগিনীপতির সহিত তিনি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের সভাক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। বিজয়মাধব কোনও স্থানেই পত্নীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে কুণ্ঠিত হইত না। সে যখন সমাজসংস্কার, নারীশিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে উঠিত, তখন উচ্চ করতালি-ধ্বনিতে সভা-প্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিত। সে যেন বর্ত্তমান যুগকেও অতিক্রম করিয়া আরও শত বৎসর পরের যুগের মানুষ। তাহার আলোচনায় এমনই উদারতা ও সমদর্শিতার বাণী মুখরিত হইয়া উঠিত।

সত্যভূষণ বিস্ফারিত-নেত্রে তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন।

কিন্তু কয়দিনেই তাঁহার অভ্যস্ত দৃষ্টি অনেক কিছু আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। তিনি দেখিলেন, ভগিনীর সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি বিজয়মাধব অতিরিক্ত মাত্রায় আগ্রহশীল।

বসন ভূষণ, আহার প্রভৃতি বিষয়ে বিভারাণীর অভিযোগ করিবার কিছুমাত্র কারণ ছিল না। কিন্তু ভিতরে বা বাহিরে বিভার যেন কোন সত্তাই ছিল না। সে যেন কলের পুত্তলিকা, স্বামীর ইঙ্গিত অনুসারেই সে চলে ফিরে, কথা কহে, কার্য্য করে। অথচ বিজয়মাধবকে এই কয়দিনের মধ্যে সে একবারও তাহার পত্নীর প্রতি রূঢ় আচরণ বা বাক্য প্রয়োগ করিতে দেখে নাই।

এই অসামঞ্জস্য সত্যভূষণের চিত্তক্ষেত্রে কি দুশ্চিন্তার সঞ্চার করিয়াছিল?

বিভাকে তিনি বুদ্ধিমতী, তেজস্বিনী বলিয়াই জানিতেন। আত্মমর্য্যাদা সম্বন্ধে বাল্যকাল হইতেই সে বিশেষ সজাগ ছিল। দরিদ্রের সংসারে আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞানই সম্ভ্রমরক্ষার প্রধান উপায়। সে শিক্ষা সত্যভূষণ যেমন স্বয়ং আয়ত্ত করিয়াছিলেন, ভগিনীর মধ্যেও তাহার বিকাশ ঘটাইয়াছিলেন।

সত্যভূষণ মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুকাল ধরিয়া গবেষণা করিতেছিলেন। মনোবৃত্তির সূক্ষ্মতম তত্ত্বগুলির বিশ্লেষণে অনেক জটিল সমস্যার সমাধান করা যায়।

সত্যভূষণ সত্যই যেন আপনাকে একটু বিব্রত বলিয়া মনে করিলেন।

সে দিন বিশেষ কাজ ছিল না। সত্যভূষণ লেক রোড দেখিয়া বাসার দিকে ফিরিলেন। আর বিলম্ব করিবার সুযোগ নাই। দুই তিন দিনের মধ্যেই তাঁহাকে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

তখনও বেলা বেশী হয় নাই। বাসায় ফিরিয়া দেখিলেন, এক জন ভদ্রলোক ড্রয়িংরুমের সম্মুখের বারান্দায় বসিয়া। তাঁহার সম্মুখে একটি বড় ঝুড়ির মধ্যে নানাবিধ দ্রব্য। অদূরে এক জন মুটিয়া অপেক্ষা করিতেছে। ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, ভাগিনেয়ী একটা জিনিস হাতে লইয়া জননীর কাছে দাঁড়াইয়া মৃদুস্বরে কি বলিতেছে।

বিভারাণী কন্যার হাত হইতে জিনিসটি লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। সত্যভূষণকে দেখিবামাত্র সে কন্যাকে বলিল, "জিনিসটা রেখে যেতে বল, উনি এলে ওবেলা যা হয় হবে।"

সত্যভূষণের কাণে কথাটা প্রবেশ করিল। তিনি কোন কথা বলিবার পূর্ব্বেই বালিকা বারান্দার দিকে চলিয়া গেল।

সত্যভূষণ শুনিতে পাইলেন, লোকটি বলিতেছেন, "তা ত হয় না। ওবেলা আসবার আমার সুবিধা হবে না। আজই দুপুরের গাড়ীতে চন্দননগর যেতে হবে। সেখান থেকে দশবারো দিনের মধ্যে ফিরতে পারব না। দামটা এখনই চাই।"

সত্যভূষণ ভগিনীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ব্যাপার কি?"

বালিকা তখন একটি কারুকার্য্যখচিত হাতীর দাঁতের বাক্স লইয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সত্যভূষণ প্রশ্ন করিয়া জানিলেন, লোকটি শ্যামদেশ হইতে অনেকগুলি রকমারী জিনিস আনিয়াছেন, ভাগিনেয়ী এই বাক্সটি কিনিতে চাহে—দাম দশ টাকা।

সত্যভূষণ বলিলেন, "তা এর জন্য বিজয়মাধবের পরামর্শের কি প্রয়োজন? তুমিই দশটা টাকা ত দিতে পার।"

ভগিনীর মুখের প্রতি তিনি স্থিরভাবে দৃষ্টিপাত করিলেন।

বিভা নতনেত্রে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ চরণের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা কক্ষতলের কার্পেটকে সঙ্কুচিত করিবার বৃথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

সত্যভূষণ ভাগিনেয়ীকে কাছে ডাকিয়া বাক্সটি একবার পরীক্ষা করিলেন। তার পর নিঃশব্দে বাহিরে উঠিয়া গেলেন। পরমুহূর্ত্তে বারান্দার লোক দুইটি চলিয়া গেল।

মামা ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিয়া ভাগিনেয়ীকে উপরে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন। প্রাপ্তির আনন্দে বালিকার মন আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। সে হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে কক্ষত্যাগ করিল।

মুহূর্ত্ত সত্যভূষণ স্তম্ভিত হইয়া ছিলেন। যাহার কনট্রাক্টারী হইতে বার্ষিক উপার্জ্জন প্রায় দুই লক্ষ টাকার উপর, ব্যাঙ্কে যাহার নামে অন্ততঃ পঁচিশ লক্ষ টাকা মজুত, বাড়ীভাড়ার আয়ই মাসিক দুই হাজার টাকা, তাহার স্ত্রীর একটা দশ টাকার জিনিস কিনিবার মত ব্যক্তিগত অর্থ নাই?

সত্যভূষণ স্নিগ্ধকণ্ঠে ডাকিলেন, "বিভু!"

দাদার এই আদরের আহ্বান বিভারাণীর সংযমের বাঁধ ভাঙিয়া দিল। দরদরধারে তাহার নেত্রপথে অশ্রু নামিয়া আসিল।

সত্যভূষণ বিচলিত হইলেন। তার পর অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলেন, "আমার কাছে তোর লুকোবার কি আছে, বোন্?"

না, কিছু নাই। পিতার স্থায় স্নেহে এই অগ্রজই তাহাকে লালনপালন করিয়াছেন। সংসারে জুড়াইবার যদি সত্যই কোন স্থান থাকে, তবে তাহা এই স্নেহচ্ছায়া-শীতল দাদার কাছেই আছে। সে অতুল ঐশ্বর্য্যশালী স্বামীর পত্নী; কিন্তু এত কাল ধরিয়া ঘর করিয়া সে বুঝিয়াছে যে, সে সহধর্ম্মিণীর অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। কেন?

বিভা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিল, "আমরা গরীব। তুমি কেন বড়লোকের ঘরে আমার বিয়ে দিয়েছিলে, দাদা? গরীবের মেয়ে, গরীবের বোন্ কখনো ঐশ্বর্য্য ব্যবহারের যোগ্য হয়?"

সত্যভূষণ ভাবিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ অসম্ভবরূপ গম্ভীর হইয়া উঠিল।

৩

বিজয়মাধব অবশেষে রাজি হইল। ধানবাদে শ্যালক পাহাড়ের ধারে বাড়ী তৈয়ার করিয়াছেন, মোটরও সেখানে দুর্ল ভ হইবে না, অনেক বড় বড় সদাগর সত্যভূষণের পরিচিত। বেড়াইবার স্থানও মনোরম, ইত্যাদি বিষয় অবগত হইয়া সে সস্ত্রীক পনের দিনের জন্য যাইতে রাজি আছে। তাহার কাজের বিশেষ ক্ষতি হইবে না। ম্যানেজার উপযুক্ত ব্যক্তি, কয়দিন অনায়াসে কাজ চালাইয়া লইতে পারিবেন।

সম্ভবতঃ সে অঞ্চলে আপনাকে প্রচার করিবার একটা গোপন অভিপ্রায়ও বিজয়মাধবকে প্রলুব্ধ করিয়াছিল। ধানবাদে আধুনিক সংস্কারপন্থীদিগের ছোটখাট শাখা প্রতিষ্ঠানও আছে শুনিয়া তাহার উৎসাহবহ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা সত্যভূষণ সম্ভবতঃ অনুমান করিয়া থাকিবেন।

প্রথম শ্রেণীর একটা কামরা রিজার্ভ করিয়া বিজয়মাধব যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইল। সত্যভূষণ এক দিন পূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিলেন। ভগিনী ও ভগিনীপতিকে সমাদরে অভ্যর্থনা করা প্রয়োজন। কতকাল পরে তাহারা যাইতেছে। সুতরাং বিজয়মাধব তাঁহাকে পূর্ব্বেই ছাড়িয়া দিয়াছিল।

বিজয়মাধবের ঐশ্বর্য্যের অহঙ্কার কিছু ছিল। এমন অনেক ধনীরই থাকে। দরিদ্র শ্যালককে ধনবান্ ভগিনীপতির পরিচর্য্যায় কৃতার্থ করার একটা প্রলোভনও তাহার অন্তরে হয় ত সমুদিত হইয়া থাকিবে; মানুষের মনের সম্পূর্ণ ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত কোনও মানুষ কি আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে? দুই জন মানুষের আকারগত সম্পূর্ণ সাদৃশ্য যখন পৃথিবীতে সম্ভবপর নহে, তখন মনোবৃত্তির বৈশিষ্ট্য ত অবশ্যম্ভাবী!

ষ্টেশনে সত্যভূষণ উপস্থিত ছিলেন। ট্যাক্সির অভাব ছিল না; কিন্তু একখানি সুদৃশ্য মোটরেই সত্যভূষণ অতিথিগণকে লইয়া যাত্রা করিলেন। পরিচারকরা মালপত্র লইয়া আর একখানি গাড়ীতে উঠিল। প্রথম অভ্যর্থনায় বিজয়মাধব সন্তুষ্টই হইয়াছিল।

সহরের এক প্রান্তে একটি নাতি-উচ্চ পাহাড়ের উপর সুদৃশ্য অট্টালিকার তোরণপথে মোটর প্রবেশ করিল। পথটি ঢালু হইয়া উপর হইতে নীচে নামিয়াছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিজয়মাধব মুগ্ধ হইল। সত্যভূষণ কিছু অর্থের মালিক হইয়া থাকিবেন।

পরিচ্ছন্ন অট্টালিকায় শৃঙ্খলা ও নিপুণ হস্তের প্রসাধন সর্ব্বত্র বিরাজিত। বিভারাণী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল।

বাড়ীর গৃহিণী সমাদরে তাহাদিগকে অভিনন্দিত করিলেন। কুশলপ্রশ্নাদির পর বিভা দেখিল, তাহার বৌদিদির ইঙ্গিতে ভৃত্যবর্গ নিঃশব্দে দ্রব্যাদি লইয়া চলিয়াছে।

"ঠাকুরঝি, চল, তোমাদের ঘর ওদিকে।"

বিভা বধূঠাকুরাণীর পশ্চাতে অগ্রসর হইল। বিজয়মাধবও আহূত হইল।

স্বচ্ছন্দ আলোক ও বাতাস দ্বিতলের প্রশস্ত ঘর দুইখানিকে প্লাবিত ও স্নিগ্ধ করিতেছিল।

"আমাদের গরীবের বাড়ী, আপনাদের কষ্ট হয় ত হবে, বিজয় বাবু!"

বিজয়মাধব তখন আভিজাত্যের বর্ম্ম খুলিয়া ফেলিয়া মুক্তকণ্ঠে ঘরগুলির, বিশেষতঃ সাজসজ্জার প্রশংসা করিল। না, ইহাদের পছন্দ আছে।

"পাশেই স্নানের ঘর; বিজয় বাবু, কাপড়চোপড় ছেড়ে স্নান ক'রে ফেলুন। আমি চা আন্‌তে ব'লে দিয়েছি। ঠাকুর্‌ঝি, তুমি এ দিকে এস।"

বৌদিদির অনাড়ম্বর কিন্তু গৃহিণীপণার প্রচুর নিদর্শন ইতিমধ্যেই বিভাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাহার সহিত বৌদিদির কি বিরাট ব্যবধান!

মন্থরগতিতে গৃহের কর্ত্রী বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বিজয়মাধব মুখ ফিরাইয়া বাহিরে কি দেখিতেছিল। পত্নীর দিকে সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বিজয় বলিল, "তোমার বৌদি ত চমৎকার লোক

বিভা কোন উত্তর না দিয়া ট্রাঙ্ক খুলিয়া প্রয়োজনীয় বস্ত্রাদি বাহির করিতে লাগিল। স্বামী, পুত্রকন্যা এবং নিজের প্রয়োজনীয় জামা-কাপড় বাহির করিয়া লইয়া সে বলিল, "তুমি স্নানের ঘরে যাও, আমি আস্‌ছি।"

৪

ইষ্টারের ছুটী, স্কুল বন্ধ, কিন্তু সত্যভূষণ প্রত্যহ সকালে কোথায় বাহির হইয়া যান? বাড়ীর কোন ব্যাপারেই তাঁহার যে কোন যোগ আছে, বিজয়মাধব তাহা আবিষ্কার করিতে পারিল না। কিন্তু তাহাদের কোন প্রকার অসুবিধা নাই। নিপুণা গৃহিণীর ইঙ্গিতে প্রয়োজন বোধ হওয়ার পূর্ব্বেই সমস্তই তাহারা পাইয়া থাকে। অপরাহ্নে দূরে বেড়াইতে যাইবার প্রয়োজন, দ্বারদেশে মোটর হাজির। চা না চাহিতেই টেবলের উপর সরঞ্জাম উপস্থিত হয়। দাসদাসী সর্ব্বক্ষণই আদেশ-পালনে তৎপর। এমন কি, বাড়ীর যিনি মালিক, তিনিও যেন বাড়ীর গৃহিণীর নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিবার জন্য প্রস্তুত।

হাস্যময়ী গৃহিণী যেন এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাণী, তাঁহাকে খুসী করিবার জন্য সকলেই প্রাণপণ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছে। সহর কলিকাতার বুকের উপর বসিয়া, প্রচুর ধন-সম্পদের অধিকারী হইয়াও বিজয়মাধব ত সত্যভূষণের মত এমন নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা এক দিনও অতিবাহিত করিতে পারে নাই। অথচ এই লোকটি স্কুল-মাষ্টার ছাড়া আর কিছুই নহেন।

বাড়ীর দাসদাসী কর্ত্তা ও গৃহিণীর মত স্বল্পভাষী। প্রয়োজনের অতিরিক্ত কোন কথাই তাহারা বলে না। শুধু কাজই করিয়া যায়। এমন ভাবে কি তাহার সংসারকে পরিচালিত করা যায় না?

প্রভাত-আলোকে চা পান করিতে করিতে বিজয়মাধব কথাটা মনে মনে আলোচনা করিতেছিল। আজ দুই দিন সে এখানে আসিয়াছে; কিন্তু তাহার মনে হইতেছিল, এই দুই দিনেই সে যেন নূতন জগতের বার্ত্তার আভাস পাইয়াছে; তাহার পত্নীরও নয়নে এই দুই দিনে যেন একটা রহস্যের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া তাহার অনুমান হইতেছিল

প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে এত দিন যে তৃপ্তি পায় নাই, এখানে যেন সে তাহা অনুভব করিবার অবকাশ পাইয়াছে। তাহার স্ত্রীও ত বিদুষী, গুণবতী, কিন্তু—

বিজয়মাধব কি ভাবিতে লাগিল।

"বোস মশাই, কি ভাবছেন? চলুন, একটু বেড়িয়ে আসা যাক্।"

বিজয় চমকিতভাবে চাহিয়া দেখিল, খদ্দরে বিভূষিতা শ্যালকপত্নী দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইয়া, তাঁহার পার্শ্বে বিভারাণীও বাহিরে যাইবার বেশে সজ্জিতা।

"বেলা ৭টা বেজে গেছে, এই সময় কোথায় যাবেন?"

"বেশী দূরে নয়। আজ সকালে শিশুমঙ্গল সমিতির অধিবেশন। গরমের সময় ৯টার মধ্যে সমিতির কাজ শেষ হবে। চলুন, আপনাকে একটা বক্তৃতা দিতে হবে।"

সুরবালা—সত্যভূষণের স্ত্রী মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

বিজয়মাধব সহসা উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল, "বেশ, চলুন, কিন্তু সত্য বাবু বাড়ী নেই, তাঁকে সঙ্গে নিলেও হ'ত

সুরবালা বলিলেন, "তিনি বেরিয়েছেন, হয় ত পরেও যেতে পারেন।"

বিজয় বলিল, "তাঁর এত কি কাজ, বৌদি? আমি এসে অবধি দেখ্‌ছি, প্রায় সারাদিনই বাইরে থাকেন। এখন ত স্কুল বন্ধ।"

সুরবালা বিভার দিকে এক কটাক্ষপাত করিয়া বলিল, "আমাদের মত লোকের বিনা পরিশ্রমে কি সংসার চলে, বোস মশাই! তিনি নানা কাজে ঘোরেন।"

বিজয় কয়েক মিনিটের মধ্যে বাহিরে যাইবার খদ্দরের বেশ ধারণ করিয়া ফিরিয়া আসিল। মোটর দাঁড়াইয়া ছিল। ৩ জনে যাত্রা করিল।

শিশুমঙ্গল সমিতির গৃহদ্বারে পৌঁছিয়া বিজয়মাধব দেখিতে পাইল, বহু নর-নারীর সমাবেশ হইয়াছে। এক দিকে পুরুষ, অপর পার্শ্বে নারীদিগের বসিবার আসন নির্দ্দিষ্ট। বিজয়মাধব সেখানে নবাগত; কিন্তু সে সবিস্ময়ে দেখিল, সত্যভূষণ হাস্যমুখে সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন।

সভার উদ্দেশ্য ছিল, কি ভাবে জনক-জননীর শিশু পালন করিতে হয়, সে সম্বন্ধে আলোচনা এবং অনাথ, দরিদ্র শিশুদিগের কল্যাণকল্পে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করা। সেই আশ্রমে আশ্রয়হীনা নারীদিগকে শিক্ষা প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে কি করিয়া শিশুকে ভবিষ্য-যুগের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে, তাহার শিক্ষা-ব্যবস্থা।

উদ্দেশ্য মহৎ, কিন্তু সে জন্য অর্থের প্রয়োজন। অর্থ-সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই আজিকার সভার আহ্বান হইয়াছিল। সভাপতি বিশদভাবে বক্তব্যটি বুঝাইয়া দিলেন। বিজয়মাধব অনুরুদ্ধ হইয়া জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা করিল। সকলেই তাহার বক্তৃতায় মুগ্ধ হইল!

বিভারাণী সভার এক প্রান্তে বসিয়া সভার কার্য্য লক্ষ্য করিতেছিল। তাহার ভ্রাতৃবধূও তাহার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন।

চাঁদার খাতায় দানের স্বাক্ষর আরম্ভ হইল। বিজয়মাধবের কাছে খাতা আসিলে সে সত্যভূষণকে বলিল, "বাড়ীতে ফিরে গিয়ে একটু বিবেচনা ক'রে কাজ করা ভাল নয়?"

সত্যভূষণ বলিলেন, "সেই ভাল। কা'ল সকালে খাতা পাঠিয়ে দেবেন।"

যে ব্যক্তি খাতা লইয়া ঘুরিতেছিলেন, তিনি চলিয়া গেলেন।

আকাশটা ঈষৎ মেঘাচ্ছন্ন বলিয়া রৌদ্রের তেজ প্রখর হইয়া উঠে নাই। মোটরে চড়িয়া চারি জন বাড়ীর দিকে ফিরিল। সত্যভূষণ সোফারকে অন্যের অজ্ঞাতসারে কি বলিয়া দিলেন। যে পথে আসিয়াছিল, মোটর সে পথ ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিল।

বিজয়মাধব সুরবালার সঙ্গে সভার কথার আলোচনা করিতে করিতে চলিতেছিল। গাড়ী কোন্ পথে চলিতেছিল, তাহার কোন খেয়ালও ছিল না। থাকিলেও নূতন সহরের সব স্থান সে চিনিতও না। সহসা সে দেখিল, তাহারা যে পথে চলিয়াছে, তাহার দুই পার্শ্বে বড় বড় কারখানাসমূহ বিরাজিত। সে বলিল, "আমরা ত এ পথে আসিনি, সত্য বাবু? এ সব কিসের কারখানা?"

সত্যভূষণ হাসিয়া বলিলেন, "এখানে অভ্রের কাজ হয়, তা শোনেন নি?"

বিজয়মাধব অভ্রের কারখানা কখনও দেখে নাই। সে বলিল, "কি রকম কাজ হয়, একবার দেখা যায় না? এখনও সাড়ে ৯টা বাজে নি।"

"আচ্ছা" বলিয়া সত্যভূষণ নীরব হইলেন। কিয়ৎকাল পরে একটা বড় কারখানা-বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামিল। সত্যভূষণ বলিলেন, "কারখানার কাজ দেখবেন ত আসুন? তোমরাও এস।"

বিজয়মাধবের সঙ্গে সুরবালা ও বিভাও গাড়ী হইতে অবতরণ করিল।

ফটকের সম্মুখে এক জন দ্বারবান্ বসিয়া ছিল। সে সসম্ভ্রমে আগন্তুকগুলিকে অভিবাদন করিল।

এ দেশের লোকগুলি বেশ সভ্য ত! বিজয়মাধব প্রীত হইয়া সত্যভূষণের পশ্চাতে চলিল।

একটা প্রকাণ্ড হলঘরে অনেকগুলি লোক কাজ করিতেছিল। কেহ বাছাই করিতেছে, অধিকাংশই ছুরীর সাহায্যে অভ্রগুলিকে কাটিয়া ছাঁটিয়া নির্দ্দিষ্ট আধারে রক্ষা করিতেছে। দুই জন মহিলার সহিত ভদ্র-পরিচ্ছদধারী পুরুষযুগলকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল।

সত্যভূষণ ইঙ্গিতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইতে লাগিলেন। বিজয়মাধব দেখিল, প্রচুর অভ্র প্রত্যেক কক্ষে ঝুড়ির মধ্যে সযত্নে রক্ষিত। তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কারখানার মালিক নিশ্চয়ই ধনী।

বিভারাণী আগ্রহভরে সমস্তই দেখিতেছিল; কিন্তু তাহার মুখে ভাষা ছিল না। বিজয়মাধব অনর্গল প্রশংসা-সূচক বাক্য প্রয়োগ করিতেছিল।

সুরবালার নয়নে একটা কৌতুকহাস্য সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল।

পরিদর্শন সমাপ্ত হইলে বিজয়মাধব বলিল, "এ কারখানার মালিক কে, সত্য বাবু?"

সত্যভূষণ মোটরে চড়িতে চড়িতে বলিলেন, "এ কারখানাটি একটি বাঙ্গালী মহিলার।"

বিজয়মাধব মুখভঙ্গী করিয়া বলিল, "স্ত্রীলোকের নামে কারবার?"

সুরবালা হাসিয়া বলিল, "মেয়েমানুষ কি মানুষ নয়, বোস মশাই?"

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে বিজয় বলিল, "না, তা বল্‌ছি না। তবে কি না—"

কিন্তু বক্তব্য সে বিশেষ কিছু খুঁজিয়া পাইল না।

বিভারাণীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সুরবালা ও সত্যভূষণ হাসিতে হাসিতে মোটরে আরোহণ করিলেন।

৫

প্রভাত-রৌদ্র আকাশে সমুজ্জল হইয়া উঠিয়াছিল। বিজয়মাধব বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া দেখিল, অন্য দিনের মত চায়ের সভায় সত্যভূষণ অনুপস্থিত নহেন। তিনি একখানি চেয়ারে বসিয়া নিবিষ্টমনে কি একখানা বই পড়িতেছিলেন।

সুরবালার সঙ্গে বিভাও সেই কক্ষে প্রবেশ করিল।

"আজ মঙ্গলবার, আপনার স্কুল আজ খুলবে বোধ হয়?"

সত্যভূষণ প্রশান্তভাবে ভগিনীপতির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "গুডফ্রাইডের ছুটী ফুরিয়েছে। আজ স্কুল কাছারী সবই খুল্‌বে বটে।"

চায়ের পেয়ালা হইতে ধূম উত্থিত হইতেছিল। গরম সিঙ্গাড়া ও কচুরী স্তূপীকৃতভাবে বিজয়মাধবের সম্মুখে সজ্জিত।

বিজয় হাসিয়া বলিল, "এত সকালে এ সব কখন্ তৈরী কর্‌লেন, বৌদি?"

সুরবালা হাসিতে লাগিলেন।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, এক জন বাবু খাতা লইয়া হাজির।

চাঁদার খাতা!—বিজয়মাধবের মুখে ঈষৎ বিরক্তির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। কিন্তু উপায় ত নাই।

সত্যভূষণের আদেশে বেহারা খাতা লইয়া আসিল।

বিরক্তি দমন করিয়া খাতাখানা চাহিয়া লইয়া বিজয়মাধব বলিল, "কত দেওয়া যায় বলুন ত? ৫০৲?"

"যা আপনার ইচ্ছে। তবে বিভাকেও ত কিছু দিতে হবে!"

বিজয়মাধব খাতার পাতা খুলিতে খুলিতে বলিল, "এক জন দিলেই হ'ল। আমার দানই কি যথেষ্ট নয়?"

সুরবালা বিভা ও স্বামীর দিকে উজ্জল কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বোসজা মশাই শাস্ত্র মেনে চলেন। 'পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য'!—"

চায়ের পেয়ালা মুখ হইতে নামাইয়া স্তব্ধদৃষ্টিতে খোলা খাতার দিকে চাহিয়া বিজয়মাধব মুহূর্ত্ত নীরব হইয়া রহিল। সে দেখিল, শ্রীমতী সুরবালা দেবীর নামের পার্শ্বে দুই শত টাকার অঙ্কপাত রহিয়াছে। আর এক স্থলে শ্রীসত্যভূষণ রায়ের নামের পার্শ্বে অনুরূপ সংখ্যার অঙ্কপাত দেখা গেল।

বিজয়মাধব সবিস্ময়ে বলিল, "আপনারা দু'জনেই টাকা দিয়েছেন?"

সত্যভূষণ পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই নাকি? উনিও সই দিয়েছেন, তা বেশ ত।"

বিজয়মাধব ঈষৎ বিরক্তিভরে বলিল, "বৌদি কি আপনাকে জিজ্ঞাসা না করেই যা ইচ্ছে তাই করেন?"

সত্যভূষণ হাসিয়া বলিলেন, "তা ওঁর যদি ইচ্ছা হয়, কর্‌তে পারেন বৈ কি। সেই রকম শিক্ষাই ত জীবনে পেয়েছি, বিজয় বাবু। কারও স্বাধীন সত্তাকে অস্বীকার করলে কি আমরা স্বাধীনতার যোগ্য হ'তে কখনও পারব?"

বিজয়মাধব ভাবিতে লাগিল। এক জন স্কুলমাষ্টার ও তাঁহার স্ত্রীর দুঃসাহস ত কম নহে।

"বিভা, তুইও কিছু চাঁদা দে না, বোন্!"

বিভারাণী আরক্তবদনে দাদার দিকে চাহিল। সত্যভূষণ পকেট হইতে একখানা বাঁধান খাতা ও সেই সঙ্গে একখানা চেক-বহি বিভার হাতে দিয়া বলিলেন, "বিয়ের সময় তোকে ত যৌতুক কিছুই দিতে পারি নি। বাবা বেঁচে থাক্‌লে হয় ত তিনি ব্যবস্থা কর্‌তেও পার্‌তেন। তোর গরীব দাদারও ত একটা কর্ত্তব্য আছে।"

বিজয়মাধব বিমূঢ়ভাবে শ্যালক ও পত্নীর দিকে চাহিয়া রহিল।

কম্পিতহস্তে বিভারাণী খাতা খুলিয়া দেখিল, তাহার নামে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা জমা রহিয়াছে। ধীরে ধীরে সে খাতাখানা স্বামীর দিকে আগাইয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তোমার স্নেহের দান আমি মাথা পেতে নিলাম, দাদা।"

বিজয়মাধব সহসা উঠিয়া দাঁড়াইল। আবেগে তাহার সমস্ত দেহ আন্দোলিত হইতেছিল। "আমায় ক্ষমা করুন, সত্যদা। আপনি আজ আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। চাবিকাঠি হাতে রেখে নারীর স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণ করাও অপরাধ। কিন্তু এত টাকা আপনি কোথায় পেলেন, দাদা?"

বিভা মৃদু হাসিয়া বলিল, "দাদা স্কুলমাষ্টারী ত করেন না। কা'ল যে কারখানা দেখে এসেছ, সে দাদারই চেষ্টার ফল। বৌদির নামে কারখানা ক'রে দেছেন। দাদা একটা জমী ইজারা নিয়েছিলেন, তাতে অভ্রের ভাল খনি আজ বছর ৬।৭ বেরিয়েছে।"

দানের খাতায় বিজয়মাধব এক হাজার টাকা সহি করিল।

বিভা চেক-বহিতে দুই শত টাকার অঙ্কপাত করিয়া সেখানা ছিঁড়িয়া লইয়া স্বামীর হস্তে প্রদান করিল।

বঙ্গলক্ষ্মী, শ্রাবণ, ১৩৩৬

মা

১

"জ্যেঠাইমা !"

অলস মধ্যাহ্নের উজ্জ্বলালোকে জ্যেঠাইমা একাগ্রমনে কি পড়িতেছিলেন। তাঁহার সৌম্য, প্রসন্ন মুখশ্রীতে আনন্দের স্নিগ্ধ হাস্যরেখা সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি মুখ তুলিয়া আমার দিকে চাহিলেন। স্বভাবসিদ্ধ স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "আয়, বাবা !"

দিনের মধ্যে অসংখ্যবার জ্যেঠাইমার কাছে ছুটিয়া ছুটিয়া আসা বাল্যকালে আমার নিত্যকর্ম্মের অন্যতম ছিল, এ কথা কেহ বলিলে সত্যের অপলাপ নিশ্চয়ই হইবে না। পড়া জানিয়া লইবার জন্য বড়দা নিশীথচন্দ্রের সহায়তা আমার কাছে অপরিহার্য্য ছিল। রাঙ্গা দাদা আমার এক ক্লাশ উপরে পড়িত, কিন্তু সে আমার খেলার সাথী। মফঃস্বলের পল্লী অঞ্চলে আমাদের পৈতৃক ভদ্রাসন। মা বাল্যকালেই আমাকে জ্যেঠাইমার ক্রোড়ে ফেলিয়া দিয়া অনিশ্চিত লোকে যাত্রা করিয়াছিলেন। কাজেই রাঙ্গাদা বিকাশচন্দ্রের সঙ্গে জ্যেঠাইমার স্নেহ-ক্রোড় অধিকারের দাবী লইয়া পরস্পরের মধ্যে যে বিরোধ বাধিয়া উঠিত, জ্যেঠাইমার স্নেহ ও আদরে তাহা দীর্ঘকালস্থায়ী হইতে পারিত না। শৈশব ও কৈশোর এমনই ভাবে জ্যেঠাইমার স্নেহচ্ছায়া-শীতল আশ্রয়ে যাপন করিয়া আমরা যৌবনের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়াছিলাম।

মফঃস্বলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে উচ্চতম বিদ্যার্জ্জনের সুবিধা না থাকায় জ্যেঠাইমা দুই পুত্রকে লইয়া কলিকাতা শ্যামবাজারে বাসা ভাড়া লইয়াছিলেন। বাবাও বাধ্য হইয়া কর্ম্মোপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শ্যামপুকুরে আমাদের বাসা ছিল। কিন্তু প্রত্যহ জ্যেঠাইমাকে, বড়দা ও রাঙ্গাদাকে না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। বড়দা বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছিলেন। রাঙ্গাদা তখন আইন-কলেজে যাতায়াত আরম্ভ করিয়াছিল। আমি বি, এ পরীক্ষা দিয়াছি, তখন দীর্ঘ অবকাশ।

জ্যেঠাইমা নিবিষ্টচিত্তে কি পড়িতেছিলেন, দেখিবার আগ্রহ হইল। আমি জানিতাম, পড়াশুনার দিকে জ্যেঠাইমার প্রচণ্ড অনুরাগ। তিনি কোন দেশ-প্রসিদ্ধ সাহিত্যিকের কন্যা; তাঁহার নাম বাঙ্গালা দেশের কোনও শিক্ষিত ব্যক্তির অগোচর নাই; সুতরাং জ্যেঠাইমার পিতার নাম প্রকাশ না করাই সঙ্গত। পুরাণাদি জ্যেঠাইমার নখদর্পণে ছিল, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ত কথাই নাই। বাড়ী বসিয়া জ্যেঠাইমা কিছু কিছু ইংরাজীও শিখিয়াছিলেন। বাঙ্গালা কাব্য সাহিত্য পড়িতে তাঁহাকে কোনও দিন ক্লান্ত হইতে দেখি নাই। বড়দা জননীর জন্য নানা রকম গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতেন। রাঙ্গাদাও এ বিষয়ে কম উৎসাহী ছিল না। বিশেষতঃ সে প্রায়ই কবিতা লিখিত, এ জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাহার অকৃত্রিম অনুরাগ ছিল। "নব্যভারতে"—যখনকার কথা বলিতেছি, সে সময় বাঙ্গালা দেশে এত মাসিক পত্রের বাহুল্য ঘটে নাই—মাঝে মাঝে বিকাশদার লেখা বাহির হইত।

জ্যেঠাইমা আদর করিয়া পার্শ্বে বসাইতেই দেখিলাম, "নব্যভারত"খানি খোলা রহিয়াছে। "মা" শীর্ষক কবিতাটি পড়িয়াই জ্যেঠাইমার আননে আনন্দজ্যোতিঃ উছলিয়া উঠিয়াছিল, তাহা বুঝিলাম। কবিতার রচয়িতা যে বিকাশদা, তাহা কবিতার নিম্নের মুদ্রিত নাম হইতেই সুস্পষ্ট হইয়াছিল।

অবশ্য জ্যেঠাইমার হৃদয়ে আনন্দ-রসের তরঙ্গ উঠিবার যথেষ্ট কারণ ছিল। বিকাশ-দা মাতৃ-বন্দনায় যে ভাবটি ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা শুধু পবিত্র নহে, অনবদ্য, চমৎকার। পড়িতে পড়িতে মুগ্ধ হইলাম। বিকাশ-দা জননীকে কতখানি ভালবাসে, মাতার মুখে তৃপ্তির হাসি দেখিবার জন্য সন্তানের হৃদয়ে অনুক্ষণ কি প্রেরণা জাগে, বিকাশ-দা তাহা ভাষার লালিত্যে, শব্দের বিন্যাসে, ছন্দের ঝঙ্কারে নিপুণভাবেই প্রকাশ করিয়াছিল। সে যে প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তান, তাহা তাহার এই কবিতা পাঠ করিয়া সকলকেই অকুণ্ঠিত-চিত্তে স্বীকার করিতেই হইবে। সন্তানের রচনায় এমন অপূর্ব্ব মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাস দেখিয়া কোন্ জননীর হৃদয় গর্ব্বে, আনন্দে ও তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া না উঠে?

"মা" !—

আমাদের আলোচনার মাঝখানে বড়দা এক মোট জিনিস লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই মানুষটিকে আমি সত্যই ভক্তি করিতাম। এমন স্বল্পভাষী ও সদা-প্রফুল্ল মানুষ আমি কমই দেখিয়াছি। কোন বিষয়েই তাঁহাকে অধিক উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখিতাম না। অথচ মনে হইত, এমন গভীর-হৃদয়, স্নেহময় মানুষের সংস্রবে আসিয়া যেন ধন্য হইয়াছি। বড়দা নিশীথচন্দ্র যেন অতলস্পর্শ সমুদ্র, অল্প বাতাসে তাহাতে তরঙ্গ উঠে না। সকল সময়েই প্রশান্ত; নিষ্কম্প, স্থির!

জ্যেঠাইমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বড়দার হাত হইতে বোঝাটা নামাইলেন।

উহার মধ্যে কি আছে, তাহা জানিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ হইল না; কারণ; জানিতাম—বড়দা প্রত্যহই জ্যেঠাইমার মুখরোচক নানা প্রকার ফলমূল, তরিতরকারী নিজে কিনিয়া আনিয়া থাকেন। এ বিষয়ে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে দেখি নাই।

বড়দা সেই শ্রেণীর মানুষ, যাহারা কথা কহে কম, কিন্তু কাজ করে বেশী। এটর্ণীর আপিসে কাজ করিয়া বড়দা যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহাতে সংসার-প্রতিপালন হইলেও, তিনি অবকাশকালে প্রত্যহ কোনও সংবাদপত্রের সহিত সংযুক্ত ছিলেন জানিতাম। তাহাতেও কিছু অর্থ ঘরে আসিত। সাহিত্যের ভক্ত হইলেও কোনও দিন তাঁহাকে এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন আলোচনা করিতে দেখি নাই।

বিকাশ-দা জ্যেঠাইমাকে বেশী ভালবাসে কি বড়দা জ্যেঠাইমার অধিক ভক্ত, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন ছিল; কারণ, বিকাশ-দা এই বয়সেও মা'র ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, নানা প্রকার গল্পগুজব করিয়া যে ভাবে সকল অবস্থায় জ্যেঠাইমাকে প্রসন্ন রাখিতে চেষ্টা করিত, নিশীথ-দাকে কখনও তাহা করিতে দেখি নাই। তবে মাতাকে আহার না করাইয়া বড়দা কোন দিনই আপিসে যাইতেন না। রাত্রিকালেও মাতার সম্মুখে বসিয়া তাঁহার জলযোগ দেখিতেন। পীড়ার সময় নিশীথ-দার সেবানিপুণ হস্তকে জননীর পরিচর্য্যায় কখনও ক্লান্ত হইতে দেখি নাই।

জ্যেঠাইমা "নব্যভারত"খানা বড়দার হাতে দিয়া বলিলেন, "বিকাশ লিখেছে।"

বড়দা নীরবে উহা পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। বলিলেন, "বিকাশের মনের ছবি কাব্যে ফুটে উঠেছে।"

সে কথা ধ্রুব সত্য।

২

আইন-পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল, বিকাশ-দা উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের অনেক উপরে স্থান পাইয়াছে। তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। জব্বলপুরে হরবিলাস বাবু সদর-আলার কাজ করিতেন। তাঁহার একমাত্র সুন্দরী ও শিক্ষিতা কন্যার সহিত বিকাশ-দার বিবাহ কলিকাতা সহরেই নিষ্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহ উপলক্ষে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত ত হইলামই—জ্যেঠাইমার আনন্দোৎফুল্ল মুখ দেখিয়া ততোহধিক সন্তোষ জন্মিল।

কনিষ্ঠ সন্তানের প্রতি জননীর একটা গোপন আকর্ষণ থাকে বলিয়া বিজ্ঞগণ মত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কথাটা কতদূর সত্য, জানি না, তবে মাতৃভক্ত রাঙ্গাদার বধূকে পাইয়া জ্যেঠাইমা যে খুবই খুসী হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ব্যবহারে প্রচুর পরিমাণে প্রকাশ পাইল।

বড়দার যত্ন ও চেষ্টার ফলেই বিকাশ-দার এক জন উচ্চ শ্রেণীর অভিভাবক হইলেন। রাজদ্বারে হরবিলাস বাবুর অবাধ গতি এবং রাজপুরুষগণের সহিত তাঁহার যথেষ্ট খাতির ছিল। জীবন-সংগ্রামে বিকাশ-দাকে সম্ভবতঃ বিশেষ কষ্ট পাইতে হইবে না।

বিকাশ-দার কবিতাচর্চ্চা তখনও প্রবল-বেগে চলিতেছিল। সুন্দরী তরুণী পত্নীর স্বামী হইয়াও তাহার রচনার বিষয়নির্ব্বাচনের পরিবর্ত্তন তখনও দেখা যায় নাই। মানুষের কর্ত্তব্য, সন্তানের দায়িত্ব কত গুরু, মানুষের আদর্শ ও লক্ষ্য কত ঊর্দ্ধে অবস্থিত, বিকাশ-দার রচনায় তাহার অনবদ্য ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যাইত। জন্মভূমিকে ভক্তি করিবার একমাত্র সোপান জননী, তাঁহার তৃপ্তিসাধনে ভগবানের প্রীতি জন্মে, এইরূপ নানাপ্রকার ভাবব্যঞ্জনায় বিকাশ-দার কবিতা সর্ব্বদা পাঠকসমাজে প্রশংসা অর্জ্জন করিত।

প্রায় সমবয়স্ক হইলেও বিকাশ-দার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল। আমাদের বংশের এক জন যে এমন

অনবদ্য কাব্য রচনা করিয়া পাঠকসমাজে সমাদৃত হইতেছে, এ জন্য আমি একটা বিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতাম। বিশেষতঃ আমার জননীরূপিণী, স্নেহময়ী জ্যেঠাইমার হাস্যপ্রফুল্ল মুখমণ্ডল, পুত্রকীর্ত্তি ও ভক্তির আতিশয্যবশতঃ সদাপ্রসন্ন, প্রভাত-পদ্মের বিকশিত সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হইতে দেখিয়া অপূর্ব্ব তৃপ্তিলাভ করিতাম।

সে দিন সন্ধ্যার পর আমাদের মজলিস জমিয়া উঠিয়াছিল। রবিবারে নিশীথ-দা কোথাও যাইতেন না। ছুটীর দিন বলিয়া মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতিকে লইয়া বিশ্রম্ভালাপে আনন্দ পাইতেন। আমি বুঝিতাম, এই দিনটি তাঁহার কাছে অত্যন্ত লোভনীয়। বিকাশ-দাও রবিবারটি অবসর-যাপনের জন্য রাখিয়া দিত। সে এখন আলিপুর জজ আদালতে নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া বাহির হইতেছিল বটে; কিন্তু অর্থ-লাভের বিশেষ সম্ভাবনা তখনও দেখা যায় নাই। বিকাশ-দার স্ত্রী তখন জব্বলপুরে।

জ্যেঠাইমা সে দিন আমাদের জন্য নানাপ্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এমন প্রায়ই হইত। সেগুলির যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করিয়া আমরা আসর জাঁকাইয়া বসিয়াছি, এমন সময় জ্যেঠাইমা কাছে আসিয়া বসিলেন।

"আজ বেহাইয়ের যে চিঠি পেয়েছি, তার কি ব্যবস্থা করা যায়, নিশি?"

বড়দা প্রশান্তভাবে বলিলেন, "তুমি যা বল্‌বে, তাই হবে।"

বিকাশ-দা দেখিলাম, পাণের কৌটা হইতে একসঙ্গে গোটা দুই পাণ লইয়া মুখে ভরিয়া দিল।

ব্যাপার কিছুই আমার জানা ছিল না। বলিলাম, "কার চিঠি, বড়দা?"

বড়দা লণ্ঠনের পলিতাটি আর একটু বাড়াইয়া দিয়া বলিলেন, "বিকাশের শ্বশুর মশাই চিঠি লিখেছেন, বিকাশ যদি জব্বলপুরে যায়, অল্পদিনের মধ্যে একটা মুন্সেফী তার হ'তে পারে।"

পরানুগ্রহে জীবন-যাপন, অথবা দাসত্ব, বাল্যকাল হইতেই আমার আদর্শের বিরোধী ছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মতপ্রকাশ হঠকারিতা বলিয়া আমি কোন মন্তব্যই প্রকাশ করিলাম না।

জ্যেঠাইমা বলিলেন, "তা বিকাশের যদি ভাল হয়, সেটা করা উচিত নয় কি?"

বড়দা নির্ব্বিকার-চিত্তে বলিলেন, "নিশ্চয়ই। বড় মানুষ শ্বশুর, তার উপর লোকবল আছে। তিনি বেঁচে থাক্‌তে থাক্‌তেই হয় ত বিকাশ জজ হয়েও যেতে পারে। আমার খুব মত আছে।"

জ্যেঠাইমা কনিষ্ঠ সন্তানের মাথায় হাত রাখিয়া বলিলেন, "কি রে বিকাশ, তোর মত আছে ত?"

বিকাশ-দার সুগৌর আননে রক্তিমচ্ছটার বিকাশ লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হইল না। সে নত-নেত্রে বলিল, "তোমাদের যদি মত থাকে, তবে তাই হবে।"

জ্যেঠাইমা কয়েক মুহূর্ত্ত নীরবে বসিয়া রহিলেন। মাতৃ-হৃদয়ের রহস্য বুঝিবার সামর্থ্য আমার ছিল না। কাহারও যে আছে, তাহা আমি বিশ্বাস করি না।

আলোকরশ্মি জ্যেঠাইমার নির্ব্বাক্ আননে খেলা করিতেছিল। নীরবে বসিয়া তাহাই দেখিতেছিলাম।

জানি না, চাপা দীর্ঘশ্বাস কি না। জানি না, উহা মাতৃ-হৃদয়ের গভীর বেদনা অথবা আনন্দের প্রেরণায় বক্ষঃ-পঞ্জরকে কম্পিত করিয়া বহির্গত হইল কি না! কিন্তু জ্যেঠাইমার নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত যে হইয়াছিল, তাহা নিশ্চয়ই আমার দৃষ্টিভ্রম নহে।

"তুমি জব্বলপুরেই যাও। তাঁর বড় সাধ ছিল, তাঁর কোন সন্তান দেশের হাকিম হয়। সে সুযোগ যখন এসেছে, ছাড়া উচিত নয়, কি বল্ নিশি?"

নিশীথ-দা অবিচলিত-কণ্ঠে বলিলেন, "সে কথা ত আমি আগেই বলেছি, মা।"

দেখিলাম, সকলেই প্রসন্ন-মনে সমস্যার মীমাংসা করিয়া লইলেন। কিন্তু আমার হৃদয় ইহাতে সাড়া দিল না, তাহা গোপন করিব না। আমি জানিতাম, বিকাশ-দা বড়দার হৃদয়ের কতখানি অংশ জুড়িয়া আছে; আমি জানিতাম, বিকাশ-দাকে ছাড়িয়া থাকিতে জ্যেঠাইমার হৃদয়-তন্ত্রী ছিন্ন-প্রায় হইবে। আর বিকাশ-দা? কি জানি! সেও কি স্নেহময় ভ্রাতা ও পরম স্নেহময়ী জননীকে দীর্ঘকাল না দেখিয়া থাকিতে পারিবে?

মনের সংশয় প্রকাশ করা সঙ্গত নহে বলিয়া আমিও এ মীমাংসায় সম্মতিসূচক শিরঃসঞ্চালন করিলাম।

৩

পিতাকে সংসারে আর ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি উত্তীর্ণ হইবার সহায়তা করিবার পর তিনি বৈতরিণীর পরপারে স্বয়ং উত্তীর্ণ হইলেন। জ্যেঠাইমার স্নেহশীতল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়া এই দুঃসহ শোকে আংশিক সান্ত্বনা মিলিল, অবশ্য-প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্যপালনেও তিনি সহায় হইলেন।

পিতা কিছু অর্থ ব্যাঙ্কে জমা করিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃবিয়োগের ৬ মাস পরে ভাগ্য-পরীক্ষার জন্য ব্রহ্মদেশে অভিযান করিলাম। দাসত্ব করিব না সঙ্কল্পই ছিল। শুনিয়াছিলাম, নানাপ্রকার ব্যবসায়ের সুবিধা ও-দেশে আছে। বিশেষতঃ কাঠের কারবারে সুবিধা হইবার সম্ভাবনা।

জ্যেঠাইমার চরণ-ধূলির সহিত জয়শ্রী-লাভের আশীর্ব্বাদ, বড়দার স্নেহালিঙ্গনের স্মৃতি লইয়া বঙ্গোপসাগরে পাড়ি দিলাম। বিকাশ-দা তখন জব্বলপুরে শ্বশুরভবনে।

দীর্ঘ পনেরো বৎসরকাল বঙ্গদেশের শ্যামল প্রাঙ্গণে আশ্রয় লইবার অবসর ঘটিল না।

জ্যেঠাইমা ও বড়দার পত্র নিয়মিত সময়ে পাইতাম। কুশলপ্রশ্ন ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত অতিরিক্ত কোন সংবাদ দেওয়া বোধ হয় উভয়েরই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু সংক্ষিপ্ত পত্রে আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব কখনও অনুভব করিতে পারি নাই।

বিকাশ-দা প্রথম প্রথম নিয়মিত উচ্ছ্বাসপূর্ণ পত্র লিখিত; কিন্তু ক্রমেই তাহা দুর্ল্লভ হইয়া আসিতে লাগিল। এই পনেরো বৎসরের মধ্যে তাহার কয়েকটি সন্তান জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। মুন্সেফী হইতে প্রথম শ্রেণীর সবজজের পদেও তাহার ক্রমোন্নতি ঘটিয়াছিল, সে সংবাদও জানিতাম। দীর্ঘকাল পরে কখনও সম্বলপুর, কখনও রায়পুর, কখনও বা অন্য কোন সহর হইতে মাঝে মাঝে দুই একখানা সংক্ষিপ্ত পত্রও পাইতাম। কার্য্যের পেষণে তাহার নিশ্বাস ফেলিবার সময় নাই, এই সংবাদেই পত্রের অধিকাংশ কলেবর পূর্ণ থাকিত।

কাঠের ব্যবসায়ে জননী ইন্দিরার আশীর্ব্বাদে বঞ্চিত হই নাই। কিন্তু জন্মভূমিতে ফিরিবার সুযোগ ঘটিল না। রেঙ্গুন-প্রবাসী, স্বজাতি ও স্বশ্রেণী কোন ভদ্র পরিবারের কন্যাকে গৃহলক্ষ্মীর পদে বরণ করিয়া লইয়াছিলাম। জীবনসংগ্রামের বিভিন্ন স্তরে জয়লাভ করিয়া যখন একটু নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ পাইলাম, তখন দেখিলাম, যৌবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি, প্রৌঢ়ত্ব তাহার দাবী লইয়া দেখা দিতে আসিয়াছে।

শ্যামাঙ্গিনী জন্মভূমির ক্রোড় হইতে স্বেচ্ছায় নির্ব্বাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলাম সত্য; কিন্তু জননীর মূর্ত্তিকে কখনও ভুলিতে পারি নাই। কেহ ভুলিতে পারে কি না, জানি না। এমন দুর্ভাগা যদি কেহ থাকে, তাহার জন্য দুঃখ হয়।

মাতৃভাষার সহিত যোগসূত্র অচ্ছেদ্য রাখিবার জন্য বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত যাবতীয় প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রের গ্রাহক ছিলাম। অপ্রচুর অবসরের মধ্যেও তাহাদিগের প্রত্যেক পৃষ্ঠার মধ্যে আমার দেশ-জননীর সন্ধান লইবার চেষ্টা করিতাম। বিকাশ-দার লেখা কিন্তু আর দেখিতে পাই নাই। মুন্সেফী পদ গ্রহণের পর সে যে কাব্যচর্চ্চা করিয়াছে, তাহার কোনও নিদর্শন সাময়িক পত্রাদিতে খুঁজিয়া পাই নাই। এ জন্য তাহাকে প্রথম প্রথম অনেকবার পত্র লিখিয়াছিলাম। সে সকল পত্রের উত্তর কোনও বার অত্যন্ত বিলম্বে পাইয়াছি, কখনও পাই নাই। কৈফিয়ৎস্বরূপ সে আমাকে জানাইত যে, দাসত্বের পেষণে কাব্যচর্চার অবসর তাহার নাই। সে জন্য তাহার হৃদয়ে কোনও ব্যথা জন্মিয়াছিল কি না, পত্রে তাহার কোনও আভাস পাই নাই। তাহার জীবনযাত্রার পথে কোথাও কোন বিঘ্ন নাই, এই তত্ত্বটুকু সে পরিষ্কার করিয়া না লিখিলেও, তাহার পত্রের লেখা হইতে উহা ব্যক্ত হইয়াছিল।

ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, বিকাশ-দা সুখে থাকুক; জ্যেঠাইমা, বড়দাদা তৃপ্তিতে কালযাপন করুন। তাঁহাদিগকে কখনও বিস্মৃত হইতে পারিব না। এত দূর হইতে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে জ্যেঠাইমার চরণে আমার হৃদয়ের সশ্রদ্ধ নতি নীরবে প্রেরণ করিয়া থাকি।

জ্যেঠাইমা ইদানীং স্বয়ং আর আমাকে পত্র লিখিতেন না। বার্দ্ধক্যের প্রভাবে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস হওয়ায় পত্র লেখা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বলিয়া বড়দা আমায় জানাইয়াছিলেন। শুধু প্রতি সপ্তাহে তাঁহারই সংক্ষিপ্ত পত্র আসিত। তাহাতেই আমার তৃপ্তি।

কিন্তু মাঝে মাঝে মনটা ব্যাকুল হইয়া উঠিত। কত দিনে দেশে ফিরিতে পারিব—জানি না। ব্যবসায় যে ভাবে

চলিয়াছে, তাহাতে এক দিনের জন্যও স্থানত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইবার উপায় নাই। নহিলে একবার সকলকে দেখিয়া আসিতাম।

বড়দাকে কতবার লিখিয়াছি, জ্যেঠাইমাকে লইয়া যদি ব্রহ্মদেশে আসেন, তাহা হইলে আমি চরিতার্থ হইব। কিন্তু আমার সে সাধ মিটে নাই। বড়দা লিখিয়াছিলেন, জ্যেঠাই-মা গঙ্গাতীর ছাড়িয়া কোথাও এক দিনের জন্যও যাইতে রাজি নহেন। বড়দা আসিতে পারিতেন; কিন্তু জ্যেঠাই-মাকে ছাড়িয়া আসিবার সুবিধা তাঁহার হইবে না। বড়দার চরণ-ধূলার যোগ্য হইবার জন্য আমার পুত্র ও কন্যাকে উপদেশ দিতাম।

বিকাশ-দা উপযুক্ত পুত্র। যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সে জ্যেঠাইমাকে সুখী করিতে পারিতেছে ভাবিয়া মনে মনে তৃপ্তি অনুভব করিতাম। কন্যার বিবাহ উপলক্ষে বিকাশ-দা আমায় নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। কলিকাতায় আসিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিল। দুঃখ হইল, অর্থোপার্জ্জনের নেশায় অনেক কর্ত্তব্য পালন করিতে পারিতেছি না।

যৌতুক পাঠাইয়া দিয়া কাকার কর্ত্তব্য পালন করিলাম বটে; কিন্তু তাহাতে তৃপ্তি পাইলাম না।

৪

জননী জন্মভূমির ক্রোড়ে সত্যই এবার চলিয়াছি। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করিয়া ২৫ বৎসর পরে আমার চিরারাধ্যা জন্মভূমির স্নেহ-শীতল বক্ষে ফিরিয়া চলিয়াছি। লেক্ রোডের ধারে এটর্ণীর সাহায্যে জমী ক্রয় করিয়া একটা নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম। এই লেক্ রোডের সম্বন্ধে—কলিকাতা সহরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিশাল ভূখণ্ডে ইম্প্রুভমেন্ট ট্রাষ্টের বিচিত্র কীর্ত্তি এই 'লেক্' বা হ্রদের বিবরণ সংবাদপত্রের মারফতে পড়িয়াছিলাম।

দীর্ঘকাল ধরিয়া ব্রহ্মদেশবাসীর মধ্যে যাপন করিয়া ক্লান্তি আসিয়াছিল। আমার বাঙ্গালী—আমার বাঙ্গালাদেশ সহস্র দোষের আকর হইলেও, আমি সমগ্র প্রাণ দিয়া আমার জন্মভূমিকে, আমার স্বদেশবাসীকে ভালবাসি। কবি সমগ্র প্রাণ দিয়াই গাহিয়াছেন, "এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাক তুমি!" সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়-শতদলে জন্মভূমির বিচিত্র মূর্ত্তি অপূর্ব্ব রূপ গ্রহণ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল।

সাগর-তরঙ্গে ষ্টীমার যখন দোল খাইতেছিল, তখনও আমি সুদূর বারি-বিস্তারের দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার জন্মভূমির তটরেখা দেখিবার আশায় ডেকে বসিয়াছিলাম। গৃহিণী ও পুত্র-কন্যাদিগকে সঙ্গে আনিয়াছিলাম। তাহারা কখনও পিতৃ-পিতামহের জন্মভূমিকে দেখে নাই। তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দুঃখ রাখিব না।

ইন্দিরার অর্চ্চনায়, অর্থের উপাসনায়, তাহাদিগের হৃদয়ে দেশাত্মবোধ জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টাকে কখনও শিথিল হইতে দিই নাই। বাঙ্গালী হইয়া যে বাঙ্গালা-মাকে ভুলিয়া থাকে, তাহার অপরাধের মার্জ্জনা আছে বলিয়া আমার বিশ্বাস নাই।

না, এখন হইতে স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে দেশছাড়া করিব না। রেঙ্গুনের ব্যবসায়কে কলিকাতায় লইয়া আসা একান্ত দুর্ঘট নহে।

তৃতীয় দিবসে কলিকাতায় ষ্টীমার-ঘাটে জাহাজ নোঙ্গর করিল। বড়দা বা জ্যেঠাইমাকে বিস্মিত করিয়া দিব বলিয়াই তাঁহাদিগকে আমার আগমন-সংবাদ জানাই নাই। ঘাটে আমার এটর্ণীর নিযুক্ত লোক আমাদের প্রতীক্ষা করিতেছিল। নবনির্ম্মিত বাড়ীতে উঠিব না, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। গৃহপ্রবেশের সময় জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে প্রয়োজন।

এটর্ণীর লোক আমাদিগকে অন্য একটি বাসায় লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছিল। দ্রব্যাদি ও পরিচারকদিগকে সেই বাসায় লইয়া যাইতে বলিয়া, আমি স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া একখানি ট্যাক্সিতে উঠিলাম। বড়দার ওখানে গিয়া অগ্রে জ্যেঠাইমার পদধূলি লইব।

নির্দ্দিষ্ট স্থান অভিমুখে ট্যাক্সি ছুটিয়া চলিল।

শতাব্দীর একপাদ কলিকাতায় অনুপস্থিত। ইতিমধ্যে সহরে বিপুল পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব-পরিচিত স্থান-গুলি চিনিবার উপায় নাই। বড়দা কলিকাতার দক্ষিণাংশে কালীঘাট অঞ্চলে কয়েক মাস পূর্ব্বে উঠিয়া আসিয়াছিলেন। স্থান চিনিয়া লইয়া বাড়ী নির্দ্দেশ করিতে কিছু সময় লাগিল।

একটি জীর্ণপ্রায় একতল অট্টালিকার সম্মুখে ট্যাক্সি থামিল। নূতন কিছু করার যুগে, চারিদিকে নূতন রাজপথ,

নূতন ইমারত রচনার যুগে, মান্ধাতার আমলের ক্ষুদ্র একতল গৃহটি এখনও আত্মরক্ষা করিয়া দণ্ডায়মান আছে দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু সে বিস্ময় উপভোগ করিবার সময় তখন ছিল না।

তাড়াতাড়ি গাড়ী হইতে নামিয়া সম্মুখের মুদীর দোকানে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, বড়দা এই বাড়ীতেই আছেন বটে। ইতস্ততঃ না করিয়াই স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাকে লইয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম।

ছোট বাড়ী, দুইখানি কক্ষ। সম্মুখের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিবার দরজার সম্মুখে দাঁড়াইয়া ডাকিলাম, "বড়দা!" সম্মুখে যিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, তাঁহাকে প্রথম দৃষ্টিপাতে দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলাম।

হাঁ, আমার চিরপরিচিত বড়দাই তিনি। কিন্তু এ কি পরিবর্ত্তন!

চশমার মধ্য হইতে আমার দিকে মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "কে, বিলাস?—তুই যে হঠাৎ?"

আমার পশ্চাতে একটু দূরে গৃহিণী পুত্র-কন্যাকে লইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন।

সে দিকে একবার চকিতে দৃষ্টিপাত করিয়াই বড়দা বলিয়া উঠিলেন, "সঙ্গে বৌমা?" বড়দা যেন অত্যন্ত চঞ্চল—অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পথ দেখাইয়া বলিলেন, "এস মা-লক্ষ্মি, ভিতরে এস।"

অকস্মাৎ মনে হইল, অতীত যুগের কি একটা সম্পদ্ যেন আলাদীনের প্রদীপস্পর্শে দৈত্য হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে! কি সে সম্পদ্!

ভিতরে প্রবেশ করিলাম। বড়দা ডাকিলেন, "মা, বিলাস এসেছে।"

শয্যার উপর জ্যেঠাইমার উপবিষ্ট মূর্ত্তি দেখিলাম। তাঁহার সম্মুখভাগে দুই তিনটি বালিস পরস্পরের উপর রক্ষিত। জীর্ণা শীর্ণা বৃদ্ধা তাহার উপর ভর দিয়া আছেন।

সমস্ত অন্তর অজ্ঞাত বেদনায় যেন টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। ঐ কি আমার সেই স্নেহময়ী, সহিষ্ণুতা ও মমতার আদর্শ-রূপিণী জ্যেঠাইমা? সেই তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ কোথায় গেল? বার্দ্ধক্যের প্রলেপে কি লুপ্ত হইয়া গিয়াছে? তাঁহার স্নেহ-সুধা-স্নিগ্ধ আয়ত নেত্রযুগল হইতে অনুক্ষণ করুণার নির্ঝর গলিয়া পড়িতে দেখিতাম। আজ সে নেত্রযুগলের দীপ্ত তারকা এমন নিষ্প্রভ কেন? শুধু জরা সকল সুষমা হরণ করিয়া লইয়াছে?

আন্দোলিত হৃদয়কে যথাসাধ্য সংযত করিয়া জ্যেঠাইমার পদধূলি লইলাম। গৃহিণী পুত্র-কন্যাকে লইয়া জ্যেঠাইমার অপর পার্শ্বে উপবিষ্টা হইলেন। তাঁহার নত মস্তকে হাত রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত জ্যেঠাইমা নীরব হইয়া রহিলেন। বুঝিলাম, মাতৃ-হৃদয়ের আশীর্ব্বাণী ধীরে ধীরে গৃহিণীর মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। বার্দ্ধক্যশীর্ণ আননে এখনও অতীত যুগের প্রসন্নতা অন্তর্হিত হয় নাই। আশীর্ব্বাদলাভের সময় তাহা বুঝিলাম।

বাহিরে জ্যেঠাইমা ও বড়দার শরীরে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন আমাকে বিচলিত করিল। বড়বৌদির আকৃতিতেও সে আভাস পরিস্ফুট। কিন্তু তাঁহাদের কণ্ঠস্বরে, ব্যবহারে দীর্ঘকালের, ২৫ বৎসরের ব্যবধানজনিত কোন পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইলাম না।

প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, বড়দা ও জ্যেঠাইমা উভয়েরই চোখে ছানি পড়িয়াছিল। বড়দার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়াছে; কিন্তু জ্যেঠাইমা উহা ফিরাইয়া পান নাই। বড়দা প্রায় তিন বৎসর বেকার বলিলেই হয়। দৃষ্টিশক্তির দোষে কাজ করিবার সুবিধা তাঁহার নাই। জ্যেঠাইমা ও বড়দার নিকট আর কোন কথা আদায় করা গেল না।

কিন্তু বড়বৌদিকে আমি অল্পে ছাড়িয়া দিলাম না। বাহিরের বারান্দায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া আমার প্রশ্নবাণে তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিলাম। স্পষ্টভাবে কোন কথা না বলিলেও ব্যাপারটা প্রকাশ পাইল।

বিকাশ-দা এই ২৫ বৎসরের মধ্যে মাতার জন্য এক কপর্দ্দকও পাঠায় নাই। কন্যার বিবাহের সময় একবার-মাত্র কলিকাতায় আসিয়াছিল। তাহা ছাড়া জননীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য কখনও বিকাশ-দার তরফ হইতে আগ্রহ বা উদ্যোগ-আয়োজন কেহ দেখে নাই। শুধু তাহাই নহে—পঁচিশ বৎসরের মধ্যে জননী বা জ্যেষ্ঠাগ্রজ পাঁচখানি পত্র পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

কবি কাব্য লেখেন—অনেক কথা ভাষায় ব্যক্ত হয় না, প্রকাশ করা যায় না; কিন্তু দুই একটা শব্দে, দুই চারিটি বাক্যের অন্তরাল হইতে অনেক তত্ত্ব, বহু অলিখিত

ইতিহাস মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া রসজ্ঞ পাঠকের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া থাকে।

বৌদিদির স্বল্প কথার অন্তরাল হইতে পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস বিরাট গ্রন্থের আকারে যেন লিপিবদ্ধ হইয়া উঠিল।

ক্ষুধার নিবৃত্তির প্রয়োজন। বড়দাকে বলিলাম, এই বেলা এখানেই আমরা আহার করিব। বাহিরে ট্যাক্সি দাঁড়াইয়াছিল। জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়াই ট্যাক্সিতে একা চড়িয়া বসিলাম। বাজারের দিকে গাড়ী ছুটিল।

কেহ বলিয়া দেয় নাই; কিন্তু বিগত কয়েক বৎসরের কঠোর জীবন-সংগ্রামের অভ্রান্ত চিহ্ন আমার আরাধ্য জ্যেঠাইমাতা, বড়দাদা প্রভৃতির দেহ ও মনে কি পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছে, তাহা অনুমান করা কি কঠিন? হায়! বিকাশ-দা! এমন করিয়া সে যে আমার সমস্ত আদর্শকে চূর্ণ করিয়া দিবে, তাহা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারি নাই!

কিন্তু আমার অপরাধেরই বা প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? কর্ত্তব্য কি আমারও ছিল না? লক্ষ টাকা যে কোনও দিন ব্যাঙ্ক হইতে যে ব্যক্তি বাহির করিতে পারে, তাহার জননীরূপিণী জ্যেঠাইমাতা ও অগ্রজকে নিদারুণ অভাবের পীড়ন হইতে মুক্ত করিবার জন্য সে তাহার ধনভাণ্ডারের দ্বার মুক্ত করিতে পারিত না? প্রতি মাসে দুই এক শত টাকা ব্যয় করা তাহার কাছে কত তুচ্ছ? না, না—এ বিস্মৃতির, এ উপেক্ষার মার্জ্জনা নাই।

দেড় সহস্র টাকা মাসিক উপার্জ্জনকারী বিচারকের জননী ও সহোদরকে অর্থসাহায্য করিবার প্রয়োজনীয়তা নাই বলিয়া স্তোকবাক্যে আত্মপ্রতারণার কোন মূল্য নাই। কেহ আবেদন করিলে তবে কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে? ইহা ত ভারতবর্ষের চিন্তাধারার অনুকূল নহে।

অনুশোচনায় সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। প্রায়শ্চিত্ত চাই—চাই!

৮

সপ্তমী-পূজার দিন নূতন বাড়ীতে জ্যেঠাইমাকে লইয়া প্রবেশ করিব, পূর্ব্ব হইতেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলাম। আমার জননীর স্থান তিনিই অধিকার করিয়া রহিয়াছেন। রেঙ্গুন হইতে আসিবার সময় একবারও কল্পনা করিতে পারি নাই, জ্যেঠাইমাকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিব। শুধু বয়সের ধর্ম্মে তিনি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, ইহা ছাড়া তিনি যে শারীরিক ও মানসিক বেদনার যন্ত্রণা মুখ বুজিয়া সহ্য করিতেছেন, ইহার আভাস পাইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না।

গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে আমার বাসাবাড়ীতে আমি জ্যেঠাইমা ও বড়দা প্রভৃতিকে লইয়া গেলাম। তাঁহাদের কোন প্রকার আপত্তি শুনিলাম না। জ্যেঠাইমার শরীরে পদার্থ ছিল না। ডাক্তার রায় আমাকে গোপনে বলিয়াছিলেন, আর দীর্ঘকাল তাঁহাকে পৃথিবীতে ধরিয়া রাখা যাইবে না। বড় জোর মাসখানেক এই জরাজীর্ণ দেহকে কোনমতে চির-অবসানের প্রভাব হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে।

আপনাকে সংযত করিতে পারি নাই। সম্বলপুরে বিকাশ-দাকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়া দিয়াছিলাম। বুঝিয়াছিলাম, তাহার উত্তর পাইব না। যে জননীর সংবাদ লইবার অবকাশ পায় না, তাহার কাছে জ্ঞাতি-ভ্রাতার আশা কতটুকু?

মনে হয়, কেন এমন হইল? মাতৃবন্দনায় যাহার লেখনী অনুক্ষণ পবিত্র হইত, মাতার কথা বলিবার সময় যাহার কণ্ঠস্বর উচ্ছ্বসিত হইত, সে দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর সেই জননীকে কেমন করিয়া ভুলিয়া রহিল? অর্থ-বৈভব ও পদমর্য্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া আপনার জননী ও সহোদরকে অনশন, পীড়া ও দুর্দ্দশার ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষার জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা করে নাই কেন?

গৃহপ্রবেশের উৎসবে জ্যেঠাইমা ও বড়দাকে পুরোবর্ত্তী করিয়া একটা কর্ত্তব্য পালন করিলাম।

বিস্ময়স্তম্ভিত-হৃদয়ে বড়দার মাতৃসেবা দেখিতাম—দেখিয়া সহস্রবার তাঁহার চরণধূলি লইয়া পবিত্র, ধন্য হইবার বাসনা জন্মিত। মুখে শব্দ নাই, জীর্ণ দেহে ক্লান্তি নাই, নিশীথচন্দ্র সারারাত্রি মাতৃরোগ-শয্যার পার্শ্বে উপবিষ্ট। সাবধানে ঔষধ-পথ্য সেবন করান, নির্ব্বিকার-চিত্তে মল-মূত্র পরিষ্কারে অবহিত হওয়া, সহস্র উপায়ে পীড়িতার স্বস্তি-বিধানের জন্য চেষ্টা—ধন্য জননি! এমন সন্তান গর্ভে ধারণ করিয়াছিলে!

কিন্তু বিকাশ-দা—সেও ত এই জননীরই মেদো-মজ্জা-রক্তধারার অধিকারী!

আশ্চর্য্য! জননী একবারও এই পুত্রের সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও অপ্রিয় মন্তব্য প্রকাশ করেন না! নির্ব্বিকারচিত্ত বড়দার মুখে কনিষ্ঠ সম্বন্ধে কোন অভিযোগ নাই!

ক্ষোভে অধীর হইয়া পড়িলে আমার মুখ হইতে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ হইয়া পড়িত। জ্যেঠাইমা ক্ষীণকণ্ঠে বলিতেন, "শক্তি থাকলে সে কি না ক'রে পারত, বাবা! অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে—আহা, বাছা আমার কুলিয়ে উঠতে পারে না!"

হায়! স্নেহমুগ্ধা, মমতাময়ী, ক্ষমার আদর্শস্বরূপা মাতৃহৃদয়!

বড়দা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাতায়নের ধারে দাঁড়াইতেন। চশমার মধ্য হইতে তাঁহার দীর্ঘায়ত নয়ন ছল-ছল করিয়া উঠিত, দেখিতাম। লজ্জায় নিজেই কুণ্ঠিত হইয়া পড়িতাম।

সে দিন ভোরবেলা বাহির হইয়াই দেখিলাম, বড়দা পথের ধারে এক ব্যক্তির সহিত মৃদুস্বরে কি বলিতেছেন। আমাকে দেখিয়া লোকটি তাড়াতাড়ি বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। বড়দা একটু কুণ্ঠিতভাবে ভিতরে চলিয়া গেলেন।

মনটা যে কৌতূহলাক্রান্ত হয় নাই, তাহা অস্বীকার করিব না।

সন্ধ্যার পর বড়দা আমার কাছে আসিয়া বলিলেন, "বিলাস, আমার এই বই তিনখানার গতি ক'রে দিতে পারিস?" তাঁহার হাতে কয়েকখানি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি।

"তোমার নিজের লেখা, বড়দা?"

মৃদু হাস্যরেখা তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

দেখিলাম, তিনখানিই উপন্যাস। বড়দা সারা জীবন ধরিয়া উপন্যাস লিখিয়াছেন?

"গ্রন্থস্বত্ব যদি বেচতে হয়, সেও ভাল। তোর ত— বাবুর সঙ্গে খুব আলাপ আছে; তাঁকে—"

বাধা দিয়া বলিলাম, "কিন্তু কি তোমার এমন প্রয়োজন, যাতে এখন গ্রন্থস্বত্ব বেচে ফেলবে?"

বড়দা মাথা নত করিলেন। মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমি ঋণী—শোধ দেবার অন্য উপায় নেই।"

প্রশ্নজালে বড়দাকে বিব্রত করিয়া তুলিলাম। বধূ ঠাকুরাণী এমন সময় সেখানে আসিয়া পড়িলেন। সরলা নারীর নিকট হইতে বাকী কথাটা জানিয়া লইতে বিলম্ব হইল না। জননীর চিকিৎসার জন্য, বন্ধু-বান্ধবদের নিকট হইতে বহু অর্থ ঋণ করিতে হইয়াছে।

"দাদা, আমি তোমার ভাই নই? আমার দায় আমাকে উদ্ধার করবার অনুমতি দাও।"

বড়দার চোখে কখনও অশ্রু দেখি নাই। আজ বন্যার ধারা প্রথম দেখিলাম।

* * * * *

জ্যেঠাইমাকে রক্ষা করা বুঝি গেল না। উত্তর পাইবার মাশুলসহ জরুরী তার করিয়াছিলাম। বিকাশ-দা আসিল না, জবাব পাইলাম, "অসম্ভব। ষ্টেশন ছাড়িয়া যাইবার উপায় নাই। দুঃখিত।" ম্যাজিষ্ট্রেট নহে, জেলার জজ, পূজার সময় দুই তিন দিনের জন্য পরলোকপথযাত্রিণী জননীকে শেষ দেখা করিবারও সময় পায় না!

ক্ষোভে ধিক্কারে মনে হইল, ধরণী, তুমি দ্বিধা হও, তন্মধ্যে এই মহালজ্জাকে সমাধিস্থ করি।

বড়দার শান্তশ্রীমণ্ডিত মুখে পরিবর্ত্তনের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। জ্যেঠাইমাকে এই নৃশংস সংবাদ কোনমতে জানাইতে পারা গেল না। প্রতি মুহূর্ত্তে মৃত্যু অগ্রসর হইতেছিল; দৃঢ়, অমোঘ গতির বেগ কে রুদ্ধ করিবে?

"বিকাশ!"

জ্যেঠাইমার উচ্চারিত তিনটি অক্ষর তিনটি অগ্নিগোলকের ন্যায় আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিল। বড়দা জননীর শিরোদেশে বসিয়া সন্তর্পণে শুষ্ক কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতেছিলেন। বিজয়া-দশমীর সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। আসুক—শিক্ষা-দীক্ষায় যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের ভাবধারা হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহার জীবনে বিজয়া-দশমীর প্রয়োজন আছে। জগজ্জননীর মৃন্ময়ী মূর্ত্তিকে নদীগর্ভে বিসর্জ্জন দিয়া চিন্ময়ী মূর্ত্তির প্রভাবে ঘরে ঘরে যে মিলনের দৃশ্য অভিনীত হয়, তাহার যথার্থ মর্ম্ম-কথা জানিবার প্রয়োজন বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর পক্ষে অপরিহার্য্য।

কিন্তু যাহার কথা মনে করিয়া এই কথা ভাবিতেছিলাম, সে ত মধ্যপ্রদেশের বিচারাসনে বসিয়া ইহজগতের বস্তুতান্ত্রিক সুখ-স্বপ্নে অচেতন হইয়া রহিয়াছে! মাতৃবন্দনার গান যে অঙ্গুলির চালনায় উত্থিত হইয়াছিল, সেই করাঙ্গুলি অনায়াসে শুধু দুঃখপ্রকাশ করিয়াই নিস্তব্ধ হইয়াছে! মাতার অন্তিম আশীর্ব্বাদ তাহার সম্বিৎকে ফিরাইয়া আনিবে না কি?

বহুদূর হইতে উৎসববাদ্যের ধ্বনি ভাসিয়া আসিতেছে।

মাসিক বসুমতী, আশ্বিন—১৩৩৬

ক্রমভঙ্গ

১

বাল্যকাল হইতেই বাড়ীর সকলেরই মুখে শুনিয়া আসিয়াছিলাম,আমার বুদ্ধিটা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ এবং ঘোরালো। প্রত্যেক ব্যাপারেরই দুইটা দিক্ আছে। একটি বাহ্য, তাহার স্বরূপ উপলব্ধি-গোচর; অপরটি গুহ্য—অন্তঃসলিলা ফল্গুর প্রবাহ-ধারার মত, তাহার প্রকাশ দৃষ্টির অগোচর। আত্মীয়-স্বজন আমার বুদ্ধিকে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ধারার সহিত তুলনা করিতেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে, যুক্তিতর্কের সহিত পরিচয় ঘটায়, আমি বুদ্ধির প্রাধান্যকেই বরণ ও স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম। যাহারা ভাবপ্রবণ, আমি তাহাদিগকে কৃপার পাত্র মনে করিতাম—ভাবপ্রবণতার কোন মূল্য আছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে রাজি কখনও ছিলাম না, এখনও নহি।

কিন্তু বিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে দেবী ভারতীর বীণাধ্বনির প্রতি চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তখন মাইকেল, হেম, নবীন, বঙ্কিমের যশোভাতি বাঙ্গালার সাহিত্য-গগনকে আলোক-প্লাবনে সমুজ্জ্বল করিয়া বাঙ্গালীকে মাতৃভাষার বন্দনা-গানে আকৃষ্ট করিতেছিল। সাহিত্যরসিক সুধীগণের উক্তিতে দেখিতে পাইতাম, বন্ধুরাও বলিত,—কাব্যকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া যে সকল পূজারী দেবীর চরণে পরম নিষ্ঠাভরে সচন্দন পুষ্পাঞ্জলির অর্ঘ্য নিবেদন করে, ভাবপ্রবণতার বিশেষ প্রকাশ তাহাদের মধ্যে থাকা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন। আমার মন তাহা মানিতে চাহিত না, তর্ক উপস্থিত হইলে আমার কণ্ঠস্বরও তাহা প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। আমি বলিতাম, ও সব বাজে কথা। বুদ্ধি যাহাদের তীক্ষ্ণ ও প্রবল, তাহারা অনায়াসে কাব্য, সাহিত্য—গল্প ও উপন্যাসে জয়মাল্য লাভ করিতে পারে। শুধু বাগ্দেবীর পূজা-প্রাঙ্গণে নহে, ইন্দিরার স্বর্ণ-দেউলেও বটে। জ্ঞান ও কর্ম্ম—ধর্ম্মকে কোনও দিনই স্বীকার করি নাই, সুতরাং সে আজগুবী পদার্থের কথা বাদই দেওয়া গেল—এই উভয় ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশক্তির প্রয়োগে শ্রী ও হ্রী, নাম ও যশঃ অর্জ্জন করা যায়, অন্য কোন শক্তির দ্বারা অর্চ্চনায় তাহা সম্ভবপর নহে।

তরুণ বয়সেই আমার বুদ্ধিশক্তির অব্যর্থ, অমোঘ প্রয়োগে শুধু বন্ধুবর্গ চমৎকৃত হন নাই, অনেক প্রবীণ সাহিত্যিকও তাহাতে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই সুপ্রসিদ্ধ সাময়িক পত্র "কল্পনার" সুযোগ্য সম্পাদকপ্রবরের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। এই বিরাট্-দেহ সুপণ্ডিত মানুষটি আমার অপেক্ষা প্রায় দশ বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে বিশেষ প্রয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। অসাধারণ প্রতিভা ও অনুভূতিশক্তির প্রভাবে সম্পাদক মহাশয় লেখক তৈয়ার করিয়া লইতে পারিতেন জানিতাম। দেখিয়াছি, সাহিত্য-যশঃপ্রার্থী বহু ব্যক্তির অচল রচনাকে তিনি সচল করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার লিপিচাতুর্য্যবিদ্যা এবং সূক্ষ্ম বিচারশক্তির ফলে, খোল এবং নলিচার পরিবর্ত্তনসাধন হইলেও বহু কবি ও সাহিত্যিক বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে কাব্য, গল্প ও প্রবন্ধ প্রচার দ্বারা যশোলাভ করিতেছিলেন। আমিও সেই দলের এক জন হইলাম, ইহাতে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ থাকিতে পারে কি?

কিন্তু সাহিত্যচর্চ্চার অজুহতেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে দুই বৎসর এবং চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে চারিবার আবদ্ধ থাকিতে হইল। পরীক্ষার সাগর উত্তীর্ণ হইতে বার কয়েক নৌকাডুবি হইলেও, কবিতা ও কথাসাহিত্যের স্তূপ পুঞ্জীভূত হইতেছিল। বন্ধুবর "কল্পনা"-সম্পাদক সহায় ছিলেন, মাজিয়া ঘষিয়া প্রসাধনাগার হইতে তিনি যখন সেগুলিকে 'কল্পনার' বক্ষোদেশে সাজাইয়া দিতেন, তখন পরীক্ষার অসাফল্য আমাকে দুঃখ দিতে পারিত না।

বন্ধুবর বলিতেন, আভিজাত্যসম্বন্ধে আমার একটা সতর্ক ধারণা আছে। কথাটা মিথ্যা নহে। পিতামহের আমল হইতে—মহারাজ-পরিবারের সহিত আমাদের বংশানুক্রমিক একটা আত্মীয়তার সম্বন্ধ ছিল। দুষ্ট লোক তাহা লইয়া যে রহস্য করিত, তাহা অবশ্য উপেক্ষণীয়; তবে পিতামহ এই আত্মীয়তা-সূত্রে কিছু তালুক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এজন্য গ্রামের অধিবাসীদিগের নিকট হইতে আমরা জমীদারের সম্মান আদায় করিয়া লইতাম। এই কথাটা খুবই সত্য যে,

আভিজাত্যসম্বন্ধে দৃঢ় ও সবল ধারণা প্রকাশ করিতে না পারিলে, বাহিরে ইজ্জত ও প্রতিপত্তি বজায় রাখা দুর্ঘট। আমার মুখের হাসি যে স্বচ্ছন্দ-সরলতার অভিব্যক্তি, এ অপবাদ কেহই দিতে পারে নাই। কল্পনা-সম্পাদকের সহিত এ বিষয়ে আমার প্রচণ্ড মতভেদ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার সহিত বন্ধুত্বের বন্ধন শিথিল হয় নাই; বরং তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে আমি অন্যতম ছিলাম।

আভিজাত্যের আর একটা বিশিষ্ট গুণ আমি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। কলম্বসের নূতন পৃথিবী আবিষ্কারের ন্যায় সে গৌরব আমারই প্রাপ্য। অভিজাতসম্প্রদায়ের কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী বংশধর কখনই অপরের প্রশংসা করিবে না—যদি প্রশংসা একান্তই করিতে হয়, তবে তাহা শুধু নিজের। এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে হইবে, সহজ সরলভাবে আত্মপ্রশংসা না করিয়া, বক্রপথে সে কার্য্য সমাধা করিবে। অর্থাৎ যে কোন উপায়ে হউক, এক দল লোককে পক্ষভুক্ত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে দামামা-ধ্বনি সহকারে প্রচারকার্য্য চালাইতে হয়। যাহারা সরলভাবে 'অস্মদ' শব্দের ব্যবহার করে, তাহাদিগকে কখনই বুদ্ধিজীবী বলা চলে না।

কিন্তু ইহার ফলে "কল্পনা"-সম্পাদক আমার নামের পূর্ব্বে একটি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেন। যেখানে সেখানে, এমন কি, আমার সমক্ষেও তাঁহাকে ইতস্ততঃ করিতে দেখি নাই। কথাটা আমি ভুলি নাই। আমি মনে করিতাম, এই "বিশ্বনিন্দুক" উপাধির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিলে লোকসানের তুলনায় লাভ বেশী। তবে এজন্য বন্ধুবর সম্পাদককে শিক্ষা দিতে আমি ভুলি নাই। সেরূপ দুর্ব্বলতার অপবাদ আমাকে কেহ দিতে পারিবে না।

২

আষাঢ়ের মেঘমেদুর আকাশ; অপরাহ্নকালে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। শূন্য চায়ের পেয়ালা এক পার্শ্বে সরাইয়া রাখিয়া ভবিষ্যতের কর্ম্মপদ্ধতির একটা খসড়া মনে মনে গড়িয়া তুলিয়াছি, এমন সময় চন্দ্রশেখর বাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। সংবাদপত্র-সেবকরূপে এই ব্রাহ্মণসন্তান বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একখানি ছোট ইংরাজী দৈনিকের তিনি কর্ণধার। 'কল্পনা-সম্পাদক'ও তাঁহার পাণ্ডিত্য-গুণ-মুগ্ধ ছিলেন। আমি চন্দ্রশেখর বাবুর সাহায্যে তাঁহার সম্পাদিত ইংরাজী দৈনিকেও হাত মক্স করিতাম। ভদ্রলোক অতি সরলপ্রকৃতি ও বন্ধুবৎসল।

চন্দ্রশেখর বাবুর সাহায্যে আমার কর্ম্ম-পদ্ধতির কল্পনাকে রূপ দেওয়া যাইতে পারে। সমাদরে তাঁহাকে ডাকিয়া বসাইলাম। গত মাসে 'কল্পনা'-সম্পাদক আমার গল্পের প্রতি মর্য্যাদা প্রকাশ করেন নাই। যত্ন করিয়া গল্পটি লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি অনায়াসে তাহা না মুদ্রিত করিয়া আমারই সমসাময়িক আর এক জনের গল্প ছাপিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, উক্ত গল্পটির পাণ্ডুলিপি পড়িবার সময় আমি মুগ্ধভাবে তাহার প্রশংসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। এ অপমান নিতান্ত নিরীহ ব্যক্তিরও রক্তধারাকে চঞ্চল ও উষ্ণ করিয়া তুলে। বিশেষতঃ গত দুই বৎসর এই "কল্পনা" পত্রিকাখানির জন্য নিজের তহবিল হইতে অনেকগুলি মুদ্রা ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাও ত কর্ত্তব্য।

সঙ্কল্প করিয়াছিলাম, নূতন একখানি মাসিক বাহির করিয়া দেখাইয়া দিব, আমাকে উপেক্ষা করিয়া সম্পাদক মহাশয় কিরূপ গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। তাঁহার বিরুদ্ধে আমার তরফ হইতে অনেকগুলি অভিযোগ জমিয়া উঠিয়াছিল। চন্দ্রশেখর বাবুকে মনের এ অভিযোগগুলি জানাইবার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু তাঁহার সহায়তা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন।

আমার প্রস্তাবে চন্দ্রশেখর বাবু প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না। অকারণে বন্ধুবিচ্ছেদ হয়, ইহা তিনি সঙ্গত বলিয়া মনে করেন না। কিন্তু আমার সঙ্কল্প অটল। বন্ধুত্ব, প্রেম, ভালবাসা,—ও সকল দুর্ব্বলতা কাপুরুষের, ক্লীবের অস্ত্র হইতে পারে, বলবানের নহে।

চন্দ্রশেখর বাবু স্পষ্টভাষী; তিনি বলিলেন, "হীরালাল বাবু, কাযটা কিন্তু ভাল হবে না। অকৃতজ্ঞতার পঙ্কতিলক আপনার ললাটে লিপ্ত হবে—সেটা বিবেচনা ক'রে দেখবেন।"

আমি হাসিলাম। বলিলাম, "সে জন্য দুর্ভাবনা করি না; কিন্তু আপনার সাহায্য—প্রবন্ধ পাব ত?"

চন্দ্রশেখর বাবু আমাকে স্নেহ করিতেন জানিতাম। তিনি স্বীকার করিবেন, তাহাও আমার দৃঢ়বিশ্বাস ছিল।

কিন্তু কথাটা ভুলিলাম না। এই সকল নীতিবিদের ন্যাকামি আমার অসহ্য। আচ্ছা, উহা আপাততঃ তোলা রহিল। হীরালাল মিত্র প্রতিজ্ঞা কখনও বিস্মৃত হয় না। কৃতজ্ঞতা!—এ সকল অসার ভাবপ্রবণতা 'স্কুল-মাষ্টারে'র দাসমনোবৃত্তির হেতু হইতে পারে। শক্তিশালী বুদ্ধিমান্ কখনই এমন দুর্ব্বলতা প্রকাশ করিয়া অপরের বিদ্রূপভাজন হইবে না।

এখন চন্দ্রশেখর বাবুকে হাতে রাখা দরকার। সুতরাং মুখে বিশেষ কোন প্রকার আভাস দিলাম না। তিনি প্রবন্ধ লিখিতে সম্মত আছেন।

গৃহের দ্বারে একখানি গাড়ী আসিয়া থামিল। অন্তঃপুরের দিকে কাহারা চলিয়া গেল। আমাদের উভয়ের আলোচনা তখন গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে।

এক পশলা বৃষ্টির পর একটা শীতল বাতাসের দমকা আসিল। চন্দ্রশেখর বাবু বিদায় লইলেন। কল্পনা-সম্পাদককে একটু আঘাত করিবার আনন্দে আমি প্রফুল্ল হইয়া উঠিলাম।

এমন সময় ভিতর হইতে আহ্বান আসিল।

সিঁড়ির মাথায় সুলোচনার সহিত দেখা হইল। সর্ব্বকনিষ্ঠা শ্যালিকা বৎসর দুই হইল স্বামিহারা। এখনও তাহার যৌবননিকুঞ্জ শ্যামায়মান শোভায় মনোরম। কয়েক মুহূর্ত্ত নিষ্পলক দৃষ্টিপাতের পর বলিলাম, "তুমি এসেছ দেখে সুখী হলাম।"

গৃহিণী শয়নকক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া বলিলেন, "সারাদিনই তোমার কাজ ত আছে দেখছি। সন্ধ্যার সময়ও এত ব্যস্ত যে, বাড়ীতে কুটুম এলে দেখবার ফুরসত পর্য্যন্ত হয় না।"

দুইটি সন্তানের জননী হইয়াও পত্নীর প্রসাধনের পারিপাট্য পূর্ব্ববৎই আছে, বরং ইদানীং আরও কিছু মাত্রাধিক্য হইয়াছে বুঝিতেছি। তা হইতে পারে, এখনও ত্রিশের কোটা তিনি ত অতিক্রম করেন নাই।

গৃহিণীর মৃদু ভৎর্সনার অন্তরালে প্রচণ্ড অভিমানের ধূমায়মান অগ্নি দেখিয়া সতর্ক হইতে হইল। তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিলাম, "তুমি যখন আছ, আমি ত সম্পূর্ণ নিরাপদ, কারণ, 'গৃহিণী সচিবঃ সখী—"

সুলোচনা তাহার কুন্দ দন্তে অধর চাপিয়া একটি অপূর্ব্ব ভঙ্গী করিল। তার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "দিদি, জামাই বাবু সাহিত্যিক মানুষ, তুমি ওঁর সঙ্গে পারবে না। চল, আমরা ও ঘরে বসি গে।"

ললিত ভঙ্গী সহকারে তরুণী বিধবা, দিদির হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের মত চলিয়া গেল।

মেঘময় আকাশে দীর্ঘ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতই কি সুলোচনা মনোহারিণী নহে?

৩

কয়মাস ধরিয়া "কল্পলতা" বাহির হইতেছে। সম্পাদক হইবার জন্য যে উদগ্র কামনা এত দিন অবরুদ্ধ অবস্থায় মনোমন্দিরে বাষ্পের মত সঞ্চিত হইতেছিল, অধুনা প্রকাশের পথ পাইয়া তাহা বিপুল উদ্যমে কল্পলতার আশ্রয়ে রুদ্ধনিশ্বাসে সাহিত্যের যাত্রী সহ অনির্দ্দেশ পথে যাত্রা করিয়াছে।

"কল্পনার" অনেকগুলি লেখককে নানা উপায়ে আমার কাগজেই টানিয়া আনিয়াছি। সম্পাদকের সহিত সম্প্রতি সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে, তাহাতে ক্ষতি নাই। প্রসিদ্ধ কথা-সাহিত্যিক, কবি, ঐতিহাসিক এবং সমালোচক হীরালাল এখন স্বয়ং একখানি মাসিকের সম্পাদক। এখন অবশ্যই উচ্চকণ্ঠে বলিতে পারা যায়—"আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে?"

কিন্তু নানা খেয়ালে অর্থের বিশেষ অনটন আরম্ভ হইয়াছে। তালুকের উপার্জ্জনে সকল প্রকার ব্যয় নির্ব্বাহ করা চলে না, দেনা বাড়িয়া চলিয়াছে। চন্দ্রশেখর বাবু একখানি প্রথম শ্রেণীর বাঙ্গালা সাপ্তাহিকের সম্পাদক হইয়া মোটা টাকা পাইতেছিলেন। প্রবন্ধ লিখিয়া দিলে তথা হইতে কিছু পাওয়া যাইতে পারে। আজ প্রায় এক যুগ ধরিয়া সাহিত্য-সেবা করিতেছি, সকলেই ত আমাকে চিনে। না হইবার কোন সঙ্গত কারণ ত দেখা যায় না।

চন্দ্রশেখর বাবুকে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি। আজ মনটাও নানা কারণে বিক্ষিপ্ত আছে।

আলমারী খুলিয়া গোপন স্থান হইতে "রাজা"কে বাহির করিলাম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল এই স্বর্ণ-কান্তি, বোতলমধ্যগত তরল পদার্থটিকে রাজা উপাধি দিয়াছিলেন। ঔষধ সেবনের মত প্রতিদিন এক পেগ হইলেই আর প্রয়োজন

হইত না। দোষ বলিয়া আমি কোন দিনই উহার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলাম না। তবে দেখিতাম, মানুষ প্রকাশ্যে ব্যবহার করিলে একটা অপ্রিয় সমালোচনা হয়; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সে সমালোচনাকে পরিহার করিয়াই চলিবে। বাহিরে সুনাম বজায় থাকিলে ব্যবসা চলে ভাল,এই কারণেই আমি সুনামের পক্ষপাতী ছিলাম। নচেৎ পাপপুণ্য, সুনাম-দুর্নাম ও সকল ব্যাপারের কৌলিক মূল্য আমি স্বীকার করি না।

'রাজা' মনের অপ্রসন্ন ভাবটিকে একটু সরাইয়া দিল। কিন্তু তথাপি গৃহিণীর ক্রোধকম্পিত স্ফুরিতাধর—বহ্নিজ্বালা-পূর্ণ নয়নের ভীষণ দৃষ্টি তখনও যেন আমাকে অনুসরণ করিয়া ফিরিতেছিল। সুলোচনার তদানীন্তন অসহায় চিত্রটিও ভুলিতে পারিতেছিলাম না। মানুষ কেন যে মানুষকে বিচার করিবার স্পর্দ্ধা করে? প্রকৃতির প্রভাব নরনারীকে ত অবশ্যই অভিভূত করিবে, ইহাতে বিস্ময় অথবা ক্রোধের উত্তেজনা অন্যের মনে সঞ্চারিত হওয়ার সঙ্গত কারণ ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তবে একটা কথা, সভ্যতার আবরণে ব্যাপারটা লোকলোচনের বাহিরে রাখিতে পারিলে অনর্থক সমালোচনার অগ্নিবর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়।

রন্ধনাগারের মধ্য হইতে 'মটন-কারির' লোভনীয় ঘ্রাণ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিতেছিল। এই উপাদেয় পদার্থটি আমার নিত্য প্রয়োজন। "রাজার" অনুগ্রহলাভের পর মনটা যখন কল্পলোকের কোনও উপবনে বিচরণ করিতে থাকে, তখন বস্তুতান্ত্রিক হইতে পারিলে ভৌতিক দেহও চরিতার্থ হয় এবং সেই আধারের অন্তর্নিহিত সত্তাও পুলকিত হইয়া উঠে।

আলোক ও ছায়া যখন পর্য্যায়ক্রমে দেহ ও মনকে লইয়া খেলা করিতেছিল, দেওয়ালের ঘড়ীতে টং টং করিয়া ৮টা বাজিয়া গেল। অন্তঃপুরের দিক্ হইতে পদশব্দ শ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একখানি ট্যাক্সির ভেঁপুর শব্দ ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

আমারই গৃহদ্বার হইতে মোটর-গাড়ী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল, বুঝিলাম। কিন্তু উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিবার মত মানসিক অবস্থা তখন ছিল না। শুধু একবার বুকের মধ্যটা অকস্মাৎ দুলিয়া উঠিল। দুর্ব্বলতাকে কোন দিন স্বীকার করি নাই, অতীতকে কোন দিন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া জমাখরচের কৈফিয়ৎ কাটিবার প্রয়োজন আছে, ইহা স্বীকার করিবার মত মনোবৃত্তির সহিত আমার পরিচয় নাই।

"এই যে চন্দ্রশেখর বাবু, আমি আপনাকেই খুঁজতে-ছিলাম।"

দ্বারপথে বন্ধুবরের বিশাল বপু কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে দাঁড়াইল।

অর্থের প্রবল প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করিয়া কাহারও কাছে দীনতা স্বীকার করা মূর্খতা। শুধু অর্থ বলিয়া নহে, সংসারের যাবতীয় বিষয়ের অভাব সম্বন্ধেই আত্মগোপন করাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। সুতরাং বাক্যজাল বিস্তার করিয়া কাজের কথাটাই পাড়িলাম। সরলহৃদয়, বন্ধুবৎসল ব্রাহ্মণ শুভ-সংবাদই জ্ঞাপন করিলেন। স্বত্বাধিকারী আমার রচিত প্রবন্ধ প্রত্যহই প্রকাশ করিতে সম্মত—যদি সম্পাদকের অনভিপ্রেত না হয়।

মনটা প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। একবার স্থান করিয়া লইতে পারিলে হয়। তার পর বুদ্ধির লীলাখেলা দেখাইবার প্রচুর অবকাশ পাওয়া যাইবে। একখানা সংবাদপত্র হাতে আসিলে কেমন করিয়া অর্থ ও যশঃ অর্জ্জন করিতে হয়, হীরালাল নিশ্চয়ই তাহার পরিচয় দিতে পারিবে।

চন্দ্রশেখর বাবু বিদায় লইবার উপক্রম করিতেছেন, সহসা অন্তঃপুর হইতে একটা চীৎকার উঠিল। তাঁহাকে বসিতে বলিয়া তাড়াতাড়ি ভিতরে গেলাম।

দ্বিতলে আমার শয়নকক্ষের সম্মুখে কন্যা রেণু—৭ বৎসরের বালিকা কাঁদিতেছে, মা স্তম্ভিতভাবে দাঁড়াইয়া আছেন। ব্যাপার কি?

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, পত্নী সুহাসিনী শয্যার উপর শায়িতা। তাঁহার চাঁপা-ফুলের মত মুখের কান্তি যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে। একটা তীব্র যন্ত্রণার আতিশয্যে সর্ব্বদেহ আকুঞ্চিত, প্রসারিত হইতেছে। চাহিয়া দেখিলাম, টেবলের উপর মরফিয়ার লেবেল আঁটা শিশিটা অনেকটা খালি। কিছু দিন পূর্ব্বে কোন প্রয়োজনে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্রানুযায়ী উহা আমিই কিনিয়া আনিয়াছিলাম।

সর্ব্বনাশ!—দ্রুতপদে বাহিরে ছুটিয়া গিয়া চন্দ্রশেখর বাবুকে কম্পিত কণ্ঠে বলিলাম, "একটা উপকার করুন। স্ত্রী হঠাৎ মরফিয়া সেবন করেছেন। বিমল ডাক্তার আপনারও

বন্ধু, আমারও সতীর্থ। গোপনে তাঁকে যন্ত্র-পাতি ও ঔষধ সহ ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে আসুন। আমি উপরে চললুম।"

চন্দ্রশেখর বাবু দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

ভৃত্য, পাচক প্রভৃতি ব্যাপারটা তখনও ভাল করিয়া বুঝিতে পারে নাই। মাকে বলিলাম, রেণুকে লইয়া তিনি অন্ত ঘরে গিয়া সান্ত্বনা দিন। কোন ভয় নাই। চাকর-চাকরাণীকে ঘটনা প্রকাশ করিয়া কাজ নাই। মা বলিলেন, সুলোচনা খানিক আগে অকস্মাৎ পিত্রালয়ে, শ্যামবাজারে চলিয়া যাইবার পরেই সুহাসিনীর এই অবস্থা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন।

সমস্ত দৃশ্যটা বায়স্কোপের ছবির মত নেত্রপথে ভাসিয়া উঠিল।

কিন্তু চিন্তা করিবার সময় নাই। শয়নকক্ষের দ্বার রুদ্ধ করিয়া একবার পত্নীর সমস্ত দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, চৈতন্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আমার করস্পর্শে অত্যন্ত শিহরিয়া উঠিয়া, তিনি অতি কষ্টে আমার দিকে চাহিলেন। উঃ, দৃষ্টিতে কি গভীর ঘৃণা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেই অবস্থায় তিনি আমার হাত ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিলেন।

পর-মুহূর্ত্তে বাহিরে করাঘাত হইল। বিমল তাহার ডাক্তারি ব্যাগ হস্তে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান। চন্দ্রশেখর বাবু সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিতে নামিতে বলিলেন, "বাহিরের ঘরে তিনি প্রতীক্ষা করিবেন। এ অবস্থায় চলিয়া যাওয়া তিনি সঙ্গত মনে করেন না।"

বিমল কোন কথা না বলিয়াই রোগিণীর পার্শ্বে বসিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। তাহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। সুহাসিনীকে সে দিদি বলিয়া ডাকিত। আমাদের গৃহচিকিৎসার ভার তাহারই উপর ছিল।

দুই ঘণ্টা পরে বিমল স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "এ যাত্রা দিদি বাঁচিয়া গেলেন।"

সুহাসিনীকে তখন চেয়ারের উপর বসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার নয়নে স্বাভাবিক দৃষ্টি ফিরিয়া আসিতেছিল।

আমার দিকে প্রথম দৃষ্টিপাত হইবামাত্র তাঁহার নয়ন-যুগল আরও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। বিবর্ণ-মুখে ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ভণ্ড! শয়তান!"

বিমল চমকিয়া উঠিল।

আমি বলিলাম, "মরফিয়ার ক্রিয়া কি এখনও আছে, ডাক্তার? ওতে একটু নেশা হয় না?"

সুহাসিনীর অধর কম্পিত হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "পশু!—ধর্ম্মাধর্ম্ম-জ্ঞান নেই! বিধবা—"

"ডাক্তার, মরফিয়ার প্রভাবে মাথা খারাপ হয়ে গেল না কি? দেখ ভাল ক'রে। না হয় একটু ঘুমের ঔষধ দাও।"

বিমল আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "হীরালাল, তোমারই মাথা দেখছি খারাপ হয়ে গেছে। এ রোগীকে সারারাত্রি জাগাইয়া রাখাই দরকার। দিদি, আপনি স্থির হোন্।"

সুহাসিনী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বলিলেন, "তবে ওকে এখান থেকে স'রে যেতে বলুন। ওর মুখ দেখতেও ঘৃণা হয়।"

বিমল বলিল, "হীরালাল, এক কাজ কর। মাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বাইরে যাও। বিষক্রিয়ার পর অনেক সময় রোগী নানা বেফাঁস কথা বলে। ও সব ধরতে নেই।"

বিমলের সম্মুখে অপ্রকাশ্য ব্যাপারের আভাস ব্যক্ত হইতে আর বাকী কি থাকিল? তবু—আচ্ছা, ব্যাখ্যা অন্যরূপে করা যায় না?

মৃদু হাসিয়া সহজভাবে বলিলাম, "মাকে পাঠিয়ে দিয়ে আমি একবার চন্দ্রশেখর বাবুর কাছে যাচ্ছি। দরকার হ'লে ডেকে পাঠিও।"

৪

স্বত্বাধিকারীকে পরামর্শ দিয়া সাপ্তাহিকখানাকে দৈনিকে রূপান্তরিত করার পথটা অনেক সহজ হইয়া আসিয়াছিল। কিন্তু বিমল ডাক্তার নেহাৎ নাবালক। এই জয়যাত্রার মুখে সে হঠাৎ নালিশ ও ডিক্রী করিয়া বসিল কেন? মাত্র দশ হাজার টাকার জন্য বন্ধুত্ব-বিচ্ছেদ কোন বুদ্ধিমান্ লোক করে না। আবার সে টাকাও তাহার নিজের নহে, বিধবা শাশুড়ীর। টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া সময়মত সুদটা ত ঠিকই দিয়া আসিতেছিলাম। বড় প্রয়োজনে সে টাকাটা খরচ করিয়া ফেলিয়াছি, তাই মাত্র এক বৎসর আর সুদটা দেওয়া হয় নাই। এই সামান্য অর্থের জন্য বাজালার

এক জন বুদ্ধিজীবী শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সাংবাদিকের নামে—নাঃ, কাজটা তাহার ভাল হয় নাই।

সে আমার পত্নীর জীবন রক্ষা করিয়াছিল; গোপন কথাটা অবশ্য প্রকাশও করে নাই। কিন্তু সে চিকিৎসার অজুহতে, আমার পত্নীর রোগের দুর্ব্বলতার সুযোগে সে কথাটা না শুনিলেই ত পারিত! তাহার শাশুড়ীর শেষ সম্বল দশ হাজার টাকাটা অবশ্য বিশ্বাস করিয়া সে জমা দিবার জন্য আমার কাছেই দিয়াছিল। জমা নিজের নামে দিয়া টাকাটাকে আরও নিরাপদে রক্ষা করিয়াছিলাম। কিন্তু "কল্পনা"-সম্পাদকের বন্ধু হঠাৎ যদি ব্যাঙ্কের জাল চেকের ব্যাপারে আমাকে না জড়াইয়া ফেলিত, তাহা হইলেও টাকাটা ত থাকিয়া যাইত। সেই সাংঘাতিক জালিয়াতের চক্রান্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্যই বিমলের শাশুড়ীর টাকাটা নষ্ট করিতে হইয়াছে।

কিন্তু এই উপস্থিত অশোভন ব্যাপারটা কিরূপে এড়ান যায়? বিমল ডাক্তার ডিক্রী করিয়া বেলিফের সাহায্যে আমাকে সন্ধ্যার পূর্ব্বেই ধরিয়া আনিয়াছে। অন্ধকার গৃহ-কোণে বসিয়া মশকের দংশনজ্বালায় বুদ্ধিশক্তিকে ঠিক আয়ত্তে আনিতে পারিতেছি না। স্ত্রীর টাকাও আছে, গহনাও আছে। কিন্তু সেই ঘটনার পর হইতে তিনি আমার মুখদর্শনও করেন না। এ বিপদের কথা তাঁহাকে জানাইয়া কোন লাভ নাই।

ও কে? চন্দ্রশেখর বাবু এবং দৈনিকের স্বত্বাধিকারী প্রভাতকিরণ না?

চন্দ্রশেখর বলিলেন, "বিমল ডাক্তারকে অনেক ব'লে করে রাজি করা গেছে, হীরালাল বাবু। তিনি ডিক্রীজারী উপস্থিত বন্ধ করেছেন। তবে প্রভাতকিরণ বাবুকে উপস্থিত ২ হাজার টাকা গণে দিতে হয়েছে। সব ব্যবস্থা করেছি। কাগজওয়ালারা সংবাদটা ছাপবে না। এখন আসুন আমাদের সঙ্গে।"

কৃতজ্ঞতায় হৃদয় ঈষৎ উদ্বেল হইয়া উঠিল, সে কথা অস্বীকার করিব না। বলিলাম, "আপনাদের দু'জনার কাছে—"

কথাটা তাঁহারা শেষ করিতে দিলেন না। ভালই।

মোটরে করিয়া তাঁহারা বাসায় পৌঁছিয়া দিয়া গেলেন। বড় ক্লান্ত। নির্জ্জন হইলেই, আলমারী খুলিয়া "রাজার" প্রসাদ লইয়া একটু তাজা হইলাম। মাংসের পরিচিত সুবাস রন্ধনাগার হইতে বাতাসে ভর করিয়া বাহিরে ভাসিয়া আসিল।

* * * *

তিন মাস পরে আমার বিজয়রথ গভীর চক্র-নির্ঘোষে বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নির্ভয়ে চলিতে লাগিল। স্বত্বাধিকারী প্রভাতকিরণকে জয় করিয়াছি। চন্দ্রশেখর পরাজিত, বিধ্বস্ত। সম্পাদকের আসন শূন্য রহিল না। বিশ্বাস করিয়া তাঁহার সযত্ন-রচিত সুন্দর তথ্যপূর্ণ নির্ভীক রচনাগুলি তিনি আমার কাছে দিয়া কার্য্যান্তরে গেলে আমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে ইতস্ততঃ করিতাম না। কোন কোন দিন তাঁহার রচনার কিয়দংশ এমন ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া ছাপিতে দিতাম যে, পরদিবস তাহা পড়িয়া স্বত্বাধিকারীও বিস্মিত হইয়া বলিতেন, বয়োবৃদ্ধির ফলে চন্দ্রশেখর বাবুর ভীমরতি হইয়াছে।

প্রচার-কার্য্যের ফল ফলিতে লাগিল। খান দুই ক্ষুদ্রকায় সাময়িক পত্রে চন্দ্রশেখর বাবুর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশিত হইত। আমি যে তাহার লেখক, ইহা জানিবার কোন উপায় ছিল না। ব্যাঘ্র-ভল্লুক-সেবিত অরণ্যে চন্দ্রশেখর বাবুর জীবন সংশয়াপন্ন হইয়া উঠিল। সুতরাং বেচারা নির্ভরশীল ব্রাহ্মণ তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার পুরস্কার লাভ করিলেন। এত দিনে সিংহাসন হইতে তাঁহাকে বিচ্যুত হইতে হইল। তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিলেন না, কোন্ অদৃশ্য হস্ত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিল।

আমি আসনে জাঁকিয়া বসিলাম। চন্দ্রশেখর বাবুর জন্য দুঃখ হয়। তিনি কেন বুঝেন নাই, বিংশ শতাব্দীতে বুদ্ধি-কুশলতাই জীবন-সংগ্রামের একমাত্র অমোঘ অস্ত্র।

বিদায়কালে চন্দ্রশেখর বাবু বলিলেন, "হীরালাল বাবু, গেটের কষ্ট পড়েছেন ত? আপনার মঙ্গল কামনা করি, তাই স্মরণ করিয়ে দিলাম।"

ভদ্রলোক কি কিছু বুঝিতে পারিয়াছেন?

৫

প্রভাতকিরণকে মুগ্ধ করিতে বিশেষ আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। অল্পবয়স্ক, কল্পনাপ্রবণ এবং গভীর বিশ্বাসী যুবকের দৃষ্টিকে উদ্‌ভ্রান্ত করিতে বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধির

প্রয়োজন হয় না। চন্দ্রশেখর বাবু আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁহার রচিত বহু প্রবন্ধ আমার কাছে ছিল। প্রকাশিত, অপ্রকাশিত উভয় প্রকার প্রবন্ধের সমবায়ে দৈনিকের প্রবন্ধ-রচনা বিশেষ কষ্টকর নহে।

দিকে দিকে আমার জয় বিঘোষিত হইতে লাগিল। অর্থ উপার্জ্জনের ইহাই ত পরম সুযোগ! গাছের ও তলদেশের ফল পাড়িবার ও কুড়াইবার কৌশল জানা থাকিলে একটিও অপরে দখল করিতে পারে না।

দৈনিকের জয়যাত্রা অমোঘ। পদমর্য্যাদায় প্রায় সমতুল্য কয়েক জন সহকর্ম্মী জুটিয়াছিলেন। তাঁহারা কেহই সাহিত্য-সমাজে অপরিচিত নহেন। পাঠক-সমাজ তাঁহাদের গুণ-মুগ্ধ ছিল। সহকর্ম্মীরা অনবদ্য ভাষা, ভাব ও যুক্তির সহায়তায় যে সকল প্রবন্ধ রচনা করিতেন, পাঠক-সমাজ তাহা পড়িয়া আমাকেই অভিনন্দিত করিত। আমি জানিতাম, সে রচনাগুলি আমার নহে; কিন্তু সম্পাদকের দায়িত্ব অত্যন্ত গুরু। সুতরাং বন্ধুজনকেও বুঝিতে দিতাম, প্রত্যেক শ্রেষ্ঠ রচনাই আমার।

স্বত্বাধিকারী আদর করিতেন, যত্ন করিতেন—প্রত্যহ সন্দেশের পাত্র পরিপূর্ণভাবেই আমার কাছে আত্মনিবেদন করিত। বিবেকানন্দ বলিয়া গিয়াছেন, চালাকীর দ্বারা কোন ভাল কাজ হয় না। তিনি সন্ন্যাসী মানুষ, তাই সংসারের অভিজ্ঞতার বাহিরে ছিলেন। আজ তিনি বাঁচিয়া থাকিলে তাঁহাকে প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে নিঃসংশয়ে বুঝাইয়া দিতাম, চালাকীর দ্বারা অসাধ্যও সাধন করা যায়।

কয় বৎসর ধরিয়া চালাকীর দ্বারা শত্রু ও মিত্র উভয় পক্ষকেই চালাইতে লাগিলাম। ফলে ইন্দিরার স্বর্ণঝাঁপি হইতে আশীর্ব্বাদ ধারায় ধারায় বর্ষিত হইতে লাগিল।

পরলোক কি, তাহা জানি না, জানিতে চাহি না—বিশ্বাসও নাই; কিন্তু ইহলোকের ভোগকে আয়ত্ত করা যায়, অনুভব করিতে হয় না। নাম ও যশঃ চন্দ্রের ষোল কলায় বিকসিত হইয়া উঠিল।

দেশাত্মবোধের ভেরী-নিনাদ আকাশ ও বাতাসকে অনুরণিত করিয়া তুলিয়াছিল। আমি কল্পনাশ্রয়ীকে সহ করিতে পারিতাম না; কিন্তু আমার সহকর্ম্মীরা দেশাত্মবোধে উজ্জীবিতপ্রাণ হওয়ায় একটা সুবিধা ছিল, কাগজখানা জাতীয়তার ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া দশের শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই সূত্রে দল ও বেদলের মূর্খগুলিকে আয়ত্ত করার চমৎকার সুযোগ মিলিয়াছিল।

কাগজখানার আয়তনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লেখকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন দেখিয়া স্বত্বাধিকারী মহাশয় চন্দ্রশেখর বাবুকে পুনরায় আনিবার প্রস্তাব করিলেন। তখন এক জন প্রবল সহকর্ম্মীর সহিত কাগজের নীতি লইয়া আমার মতভেদ চলিতেছিল। ভদ্রলোককে একহাত চালাকীর খেলা দেখাইবার সুযোগ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। সুতরাং মত দিলাম। আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল, যাঁহার অধীনে কিছু কাল সাক্‌রেদী করিয়াছি, তাঁহাকে সাক্‌রেদী করিবার বাহ্য অবস্থায় আনিতে পারিলে মন্দ হয় না।

এক দিন যে সিংহাসন তাঁহারই অধিকৃত ছিল, তাহারই পার্শ্বে আসিয়া স্বতন্ত্র আসনে তাঁহাকে বসিতে হইল। প্রকৃতির প্রতিশোধ ইহাকেই বলে।

কিন্তু আমার দক্ষিণ হস্তটি বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহার রচনায় স্বত্বাধিকারী মুগ্ধ, সহকর্ম্মীর দল প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কিন্তু সম্পাদকের লেখনী অব্যর্থ, অমোঘ। কি করিয়া মানুষের অহংজ্ঞানকে আঘাত করিতে হয়, সে বিদ্যায় আমাকে কেহই শিক্ষানবীশ বলিবে না। ভদ্রলোক অবশেষে আত্ম-মর্য্যাদা রক্ষার উপায় গ্রহণ করিলেন। ফল এইরূপই হইবে অনুমান করিয়াছিলাম। বুদ্ধির জয়যাত্রাকে কেহ এ পর্য্যন্ত বাধা দিতে পারে নাই।

কিন্তু স্বত্বাধিকারী পদে পদে বাধা জন্মাইতে লাগিলেন। তাঁহার উদ্ধত স্পর্দ্ধা সহ্য করিয়া যাইতে হইবে? অস্ত্র-প্রয়োগবিদ্যা মেঘনাদের বর্ণনা হইতে পাওয়া যায়। মহাভারতে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্মকে শরাহত করিবার উপায়ও বর্ণিত আছে। শিখণ্ডীর অভাব ছিল না। অন্তরালে থাকিয়া বাণবর্ষণ-ক্রিয়া আরব্ধ হইল। কৌশল ও প্রয়োগ-নৈপুণ্য জানা থাকিলে কোন শরাঘাতই ব্যর্থ হয় না। উভয়ের প্রতি, তাঁহাদের অতি প্রিয়জন উপলক্ষে যে সকল ভাষা প্রযুক্ত হইতে লাগিল, তাহা নাম স্বাক্ষর করিয়া হীরালাল মিত্র সাধারণের কাছে প্রকাশ করিতে পারে না।

নানা কৌশলে কয়েকবার স্বত্বাধিকারীকে বাধ্য করিয়া উপার্জ্জনের মাত্রা বাড়াইয়া লইয়াছিলাম। কেন করিব না? সঙ্গত দাবী কি নাই? এবারও মনে করিয়াছিলাম, ভিন্ন কৌশলে আয় বৃদ্ধি করিয়া লইতে হইবে। আমার

নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া যে সংবাদপত্রের এমন প্রচার, তাহার নামের মর্য্যাদার উপযুক্ত মূল্য না দিলে চলিবে কেন? প্রভাতকিরণ বিমল ডাক্তারকে যে দুই হাজার টাকা দিয়াছিলেন, তাহার জন্য অনেকগুলি গ্রন্থ দিতে হইয়াছে। সে টাকার দশ গুণ উপার্জ্জন অবশ্য করিয়াছি; কিন্তু তাহাতে অন্তর পরিতৃপ্ত হইতে চাহে না। কৃতজ্ঞতার বিনিময়-মূল্য-স্বরূপ উহা খরচ লিখিয়া লইলেই শোভন হইত।

৬

অর্থ উপার্জ্জনের নেশা বড় চমৎকার। এই নেশা যখন পরিপক্ব হয়, তখন সুযোগগুলিও এমন অনায়াসগতিতে উপস্থিত হয়! কায়দা করিয়া কয়েক হাজার ৫ দিনের মধ্যেই তহবিলজাত করিলাম। অর্থ আসিতেছিল, কিন্তু গৃহে তৃপ্তির অবকাশ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুলোচনাকে লইয়া গৃহিণী যে কাণ্ডটি বাধাইয়াছিলেন, তাহার পর হইতে তিনি পূজাগৃহেই সময় যাপন করিতেন, মুখদর্শনের অবকাশ কোন পক্ষেরই ছিল না। কিন্তু মানুষের মন দেহের ক্ষুধার আধার অন্বেষণে বিরত ছিল না।

বাহিরে সুনাম বজায় রাখিয়া অনেক কিছু করা শুধু বুদ্ধিশক্তির তীক্ষ্ণতার উপর নির্ভর করে। দেশের তপোবন বিরূপ, বিদেশের প্রমোদোদ্যান তোরণ মুক্ত করিয়া সাদরে আহ্বান করিল। অর্থের মোহিনী শক্তিকে তারিফ করিতে হয়।

সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনায় সমগ্র শক্তিকে নিযুক্ত করিতে হইল। দেশবিশ্রুত সম্পাদককে ক্ষুণ্ণ করিতে কেহ চাহে না, বিজ্ঞাপনদাতাও নহে। বিশ্বাসের সীমা নির্দ্দেশ করাও কঠিন। বিবেক বলিয়া একটা শব্দ কেন যে দার্শনিক কবি, সাহিত্যিক প্রভৃতি ব্যবহার করে! যাহার অস্তিত্ব শুধু মানুষের কল্পনায়, তাহাকে লইয়া আকাশে দুর্গ নির্ম্মাণ করার মত মূর্খতা আছে কি?

মনটা সে দিন অত্যন্ত প্রফুল্ল ছিল। আর একটা মোটা টাকা এক দল যাচিয়া দিয়া গিয়াছে। কায়দা করিয়া প্রবন্ধ লিখিতেছিলাম। দুই নৌকায় পা রাখিয়া চলিতেছি, সেটা বুঝিতে দিবার যেন কোন ছিদ্রপথ না থাকে।

বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল, স্বত্বাধিকারীর খাস-কমরায় ডাক পড়িয়াছে। জরুরী প্রয়োজন। এমন ত বড় হয় না। যে ব্যক্তি প্রতিদিন আমার ঘরে আসিয়া দেখা করেন,—আজ সে নিয়ম পরিবর্ত্তিত হইল কেন?

তাঁহার তরুণ মুখে একটু যেন অন্ধকারের ছায়া।

"বসুন হীরালাল বাবু।"

ঘরের মধ্যে তখন কেহ ছিল না। সম্মুখে প্রাচীর-বিলম্বিত পরমহংসদেবের আলেখ্য দুলিতেছিল। স্বত্বাধিকারী চিত্রের উপর কয়েক মুহূর্ত্ত নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া রহিলেন।

বিরক্তিবোধ হইল। কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী বলিয়া মানুষ যাঁহাকে পূজা করে, শ্রদ্ধা করে, ভগবানের আসনে বসায়, সে সকল ব্যক্তি যে কৃপার পাত্র, এ বিশ্বাস আমার অন্তরের। তবে বাহিরের মুখোসে তাহা আবৃত করিয়া রাখিতাম—বুদ্ধিমানের নিয়মই এইরূপ।

"দেখুন হীরালাল বাবু, আর চলে না!"

"কি চলে না?"

"বুঝতে পাচ্ছেন না? আপনি যে আমায় কণ্ঠরোধ ক'রে মেরে ফেলতে যাচ্ছেন!"

হাসিয়া বলিলাম, "শরীরটা ভাল আছে ত?"

প্রভাতকিরণ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি বিশ্রাম নিন, আমিও একটু নিশ্বাস ফেলে নিশ্চিন্ত হই।"

ব্যাপারটা হঠাৎ এমন ভাবে মোড় ফিরিল, ইহার অর্থ কি?

"দেখুন, কাগজখানা দেশের মর্ম্মকথা ব্যক্ত করেই আসছে, কিন্তু কিছু দিন হ'তে দেশের মর্ম্মদেশেই অস্ত্রোপচার চলতে আরম্ভ হয়েছে।"

"মিথ্যা কথা, প্রভাত বাবু—"

বাধা দিয়া স্বত্বাধিকারী বলিলেন, "শুধু শুধু অভিনয় ক'রে লাভ কি? একবার ৪ হাজার, আর একবার ২ হাজার টাকার চেকমুড়ি আমি নিজের চোখেই দেখেছি। ২।৫ শ টাকার ছোট ছোট চেকগুলির কথা বাদই দিলুম।"

না, লোকটা এবার নির্ব্বাক্ করিয়া দিল দেখিতেছি।

একটু চিন্তা করিয়া বলিলাম, "ও সব জাল। কিন্তু লেখার কথা—তা আপনি আমাকে বলেই দিন না, কি ভাবে লিখলে—"

"থামুন, হীরালাল বাবু, যাঁর প্রাণে দেশপ্রেম নেই, ইন্‌জেক্‌সন ক'রে তাঁর প্রাণে কি ওটা দেওয়া চলে? আপনিই বলুন না!"

এত টাকা উপার্জ্জনের পথ, এমন মোটা মাহিনা, এমন যশঃ, পদগৌরব!—উঃ, পাগল হইয়া যাইব না কি?

"আচ্ছা, আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখুন। তখন যদি—"

অসহিষ্ণুভাবে প্রভাতকিরণ বলিলেন, "না, আপনাকে আর সহ্য করা সম্ভবপর নয়। শিখণ্ডীর অন্তরাল হ'তে আপনি ভদ্রলোকদের স্ত্রী-কন্যা নিয়ে যে ইতরের মত মিথ্যা কথা রটাচ্ছেন,—আমাকেও বাদ দেন নি, তা থেকে—সুতরাং আপনি কাল থেকে আর আসবেন না।"

ঘণ্টার শব্দে ভৃত্য আসিল। একখানা লিখিত কাগজ লইয়া সে বাহিরে চলিয়া গেল।

"আপনি ভুল শুনেছেন।"

"কিছুই ভুল নয়। ভুল শুধু, আপনাকে এত দিন বিশ্বাস করেছি ব'লে।"

বটে! এতদূর স্পর্দ্ধা! কেন করিব না? স্বার্থের জন্য আমি সত্য-মিথ্যার পার্থক্য কোন দিন মানি নাই।

রুদ্ধদ্বার খুলিয়া চন্দ্রশেখর প্রবেশ করিলেন। প্রভাতকিরণ বলিলেন, "আপনি কাল থেকে আবার সম্পাদক হলেন। হীরালাল বাবুকে আমি কর্ম্মচ্যুত করেছি।"

আক্ষেপ হইতে লাগিল, কেন মিথ্যাকে পূর্ণরূপে গ্রহণ করি নাই।

ক্রোধে সমগ্র অন্তর পূর্ণ হইয়া উঠিল। তীব্র কণ্ঠে বলিলাম, "কিন্তু এর প্রতিফল পেতে হবে।"

প্রভাতকিরণ হাসিয়া বলিলেন, "কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধের চেষ্টার ত ত্রুটি করেন নি, মায় বিজ্ঞাপনের টাকাও সই দিয়ে আত্মসাৎ করেছেন। গালাগালি?—তা ত দিচ্ছেন, না হয় আরও দিবেন।"

"চন্দ্রশেখর বাবু, সাবধান—আমার মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছেন, আমিও আপনাকে ক্ষমা করব না।"

হাসিয়া ব্রাহ্মণ বলিলেন, "এটা প্রকৃতির প্রতিশোধ। আপনিই এক দিন আমাকে বিতাড়িত করেছিলেন। ভগবান্ আছেন, যদিও আপনার দুর্ভাগ্য, আপনি তা বিশ্বাস করেন না।"

ক্রুদ্ধ পদক্ষেপে কক্ষ ত্যাগ করিলাম। বনের শার্দ্দূল ভল্লুক আমার সহায় হও। আমি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিব! আত্মরক্ষার জন্য, শত্রুদমনের জন্য বুদ্ধিমান্ অমেধ্য বস্তু মাথায় তুলিয়া লয়। আমি স্কুল-মাষ্টার নহি, তাহা ইহাদিগকে অবশ্যই বুঝাইয়া দিব।

মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৩৬।

স্রোতের মালা

১

সন্তান যখন মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া বিচিত্রা ধরণীর প্রথম আলোকরশ্মির নৃত্যলীলা দেখে, তখন তাহার চিত্তে কোন রেখাপাত হয় কি না, কে বলিবে? বিজ্ঞান বা দর্শন সে সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে কি না, জানি না, অন্ততঃ আমার এই পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের স্বল্প জ্ঞান ও সামান্য বিদ্যাবুদ্ধির পরিধির মধ্যে সে সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত মীমাংসার পরিচয় পাই নাই। তবে এইটুকু বলিতে পারি, জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে, পৃথিবীর সঙ্গে পরিচয় আরম্ভের সূচনা হইতে মাতৃমূর্ত্তির দেখা পাই নাই; শুধু দেখিয়াছি, আমার পিতৃদেব একাধারে মাতা ও পিতার স্নেহ ও পালন-নৈপুণ্যে আমাকে কোলে পিঠে করিয়া রাখিতেছেন। তাহাতে তৃপ্তি জন্মিত, স্নেহের ক্ষুধা মিটিত; কিন্তু পূর্ণ মাত্রায় কি? মাতার আদর কিরূপ, পল্লীর অন্যান্য আমার বয়সী বালক-বালিকার গৃহচিত্র হইতে তাহার মধুর ও রৌদ্র রস মাঝে মাঝে আমার কাছে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতে দেখিতাম। বুকের মধ্যে যখন একটা অব্যক্ত যন্ত্রণা পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিত, পিতার স্নেহশীতল বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহার ব্যথা জুড়াইতে চাহিতাম। বাবা বোধ হয় আমার ক্ষোভ বুঝিতেন। দেখিতাম, তাঁহার সদাপ্রসন্ন আননে রেখাপাত হইয়াছে। এমনই ভাবে শৈশব ও বাল্যের রঙ্গমঞ্চে পট-পরিবর্ত্তন চলিতে চলিতে কৈশোরের যবনিকা দুলিয়া দুলিয়া নূতন দৃশ্যের অভিনয় দেখাইবার জন্য উত্তোলিত হইল।

বাবা পণ্ডিত মানুষ ছিলেন কি না, জানি না; কিন্তু তাঁহার বসিবার ঘরে রাশি রাশি পুস্তক সজ্জিত ছিল এবং তিনি অবসরসময়ে পুস্তকরাশির মধ্যে সমাহিতচিত্তে বসিয়া থাকিতেন দেখিতাম। আমাকে কোনও দিন তিনি বিদ্যালয়ে যাইতে দেন নাই। প্রভাতে ও সন্ধ্যায় তিনি আমাকে স্বয়ং লেখাপড়া শিখাইতেন। তাঁহার কাছে পাঠ লইতে আমার এমন আনন্দ হইত, এত কিছু শিখিয়া ফেলিতাম যে, আমার বয়সী কোন মেয়েকে তেমনভাবে শিখিতে দেখি নাই।

বাবা কোনও চাকরী করিতেন না। জ্ঞান-বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বুঝিয়াছিলাম, আমাকে একা বাড়ীতে রাখিয়া তাঁহার পরের কাছে চাকরী করিতে যাওয়ার সুবিধা নাই দেখিয়া তিনি নিয়মিতভাবে কোথাও চাকরী করিতে পারেন নাই। সাহিত্য রচনা করিয়া তিনি সংসার চালাইতেন। বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য-সেবার বিনিময়ে অর্থাগমের সম্ভাবনা কত অল্প, তাহা বাবার সামান্য উপার্জ্জনের পরিমাণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। দেখিয়াছি, বাবা সমস্ত দিন ও গভীর রজনীর অধিকাংশকাল কালি ও কলমের সাহায্যে যাহা রচনা করিতেন, তাহার বিনিময়ে যাহা ঘরে আসিত, কোনও রকমে কয়টি প্রাণীর তাহাতে চলিয়া যাইত মাত্র। কিন্তু সে জন্য সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্ত্তি পিতৃদেবকে কোনও দিন ধৈর্য্যচ্যুত হইতে দেখি নাই।

পিতার শিক্ষার গুণে বয়সের অনুপাতে আমার জ্ঞান-ভাণ্ডারে সঞ্চয়ের পরিমাণ অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-বিদেশের অনেক কথা আমি শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম। য়ুরোপ ও আমেরিকায় যাঁহারা সাহিত্যসেবা লইয়া থাকেন, তাঁহারা অপর্য্যাপ্ত অর্থ উপার্জ্জন করেন। যশঃ, প্রতিপত্তি, সম্মান যে কোনও সম্রাটের অপেক্ষা তাঁহাদের অল্প নহে। অতি সাধারণ শ্রেণীর সাহিত্যসেবক, তাঁহাদের লিপি-নৈপুণ্যের ফলে যে অর্থ-সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন, বাঙ্গালা-দেশে প্রতিভাশালী লেখক তাহার সহস্রাংশ পাইলেও ধন্য হইতেন।

বাবা কথা-সাহিত্যের প্রমোদোদ্যানে বিচরণ করিতেন। তাঁহার রচনা নানা মাসিকপত্রের পৃষ্ঠদেশ সুশোভিত করিত, বহু গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার সমাদর যে পরিমাণে ছিল, অর্থ সে পরিমাণে আসিলে আমাদের অবস্থারও পরিবর্ত্তন হইত। কিন্তু বাঙ্গালার কবি ক্ষুব্ধহৃদয়ে গাহিয়া গিয়াছেন,—

"যে জন সেবিবে তোমার চরণ
সেই সে দরিদ্র হবে।—"

বাবাকে অনেক সময় সে কথা বলিতাম। তিনি বীণা-পাণির সেবায় তনু-মন ঢালিয়া না দিয়া যদি অন্যভাবে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে এমন কঠোর

পরিশ্রম, ভীষণ তপস্যা করিয়া শরীরকে ক্লান্ত, মনকে শ্রান্ত করিতে হইত না। অভাবের সঙ্গে এমনভাবে প্রতিদিন সংগ্রাম করিতেও হইত না।

বাবা হাসিতেন। তাহাতে দৃঢ়চেতা মানুষের অবিচলিত সঙ্কল্পই শুধু প্রকাশ পাইত। অনেক দিন হইতে তাঁহার মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছিল। আমাদের দারিদ্র্যপীড়িত সংসারে আমরা অন্যের অপেক্ষা সন্তুষ্টচিত্তেই থাকিতাম; কিন্তু সে সন্তোষেরও অধিকারী হইবার সৌভাগ্য আমাদের সহে নাই। আমার দাদা—বাবার একমাত্র আশা ও ভরসাস্থল, আমার খেলার সাথী, আনন্দনির্ঝর জ্যেষ্ঠাগ্রজ রাজ-অতিথিরূপে পাষাণপ্রাচীর-বেষ্টিত, প্রহরিরক্ষিত দুর্গম প্রাসাদে নির্জ্জন বাস করিতেছিলেন। দাদা আমার অপেক্ষা পাঁচ বছরের বড়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া পিকেটিং করার সময় প্রথমে দাদা জেলে গিয়াছিলেন। কয়েক মাস পরে মুক্তিলাভ করিয়া দাদা আবার পড়াশুনায় মন দিয়াছিলেন। চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িবার সময় আবার তাঁহার ভাগ্যাকাশে শনি-গ্রহের আবির্ভাব হইয়াছিল। একবার খাতায় নাম লেখা হইয়া গেলে আর বুঝি উদ্ধারের আশা থাকে না। দেশ-জননীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিলে মাঝে মাঝে পাষাণ-প্রাসাদে অতিথি হইবার অবকাশ কোন্ দিক্ দিয়া কি ভাবে সমুদিত হয়, তাহা কি কেহ হিসাব করিয়া বলিতে পারে?

আজ এক বৎসর দাদা আমাদের গৃহকোণ, বাবার স্নেহ-ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন। পিতা মুখে কিছু বলিতেন না, কিন্তু বুঝিতাম, কি গভীর বেদনার প্রবাহধারা তাঁহার বুকের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। আমার স্নেহময় সহোদর, আমার গর্ব্ব ও আনন্দের আধার, আমার বুকে বিচ্ছেদের যে তীব্র ব্যথা রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হইতেই বাবার মর্ম্ম-বেদনার কতকটা পরিমাণ করিতে পারিতাম।

কিন্তু উপায় নাই, উপায় নাই! যাহারা যত সহ্য করে, যন্ত্রণার, বেদনার অন্তহীন প্রবাহধারা তাহাদের বুকের উপর দিয়াই বহিয়া যায়, দুঃখের অগ্নি নিয়তই তাহাদিগকে দহন করে। ইহাই কি বিধিলিপি? কে জানে!

২

বসন্ত-প্রভাতের তরুণ-তপনরাগরঞ্জিত কুসুমকাননের বিচিত্র বর্ণবিলাস ইন্দ্রজাল রচনা করে। যৌবন-বসন্তের স্নিগ্ধপ্রভাত আমার মনকেও অভিভূত করিয়াছিল—যৌবনের ইন্দ্রজাল শুধু মোহই বিস্তার করে। অবস্থা, পারিপার্শ্বিক আবেষ্টন—কিছুই বিচার করে না। ইন্দ্রজালের মায়া মনকে আচ্ছন্ন করিয়াই চলে।

দাদা আরও ৩ বৎসর ধরিয়া পাষাণ-প্রাচীরমধ্যে তাঁহার নিঃসঙ্গ যৌবনের কর্ম্মোত্তম, উৎসাহ, উদ্দীপনার সমাধির গতি লক্ষ্য করিতেছেন। মুক্ত আলোক ও বাতাসে আমার বিকশিত-যৌবনের রঙ্গীন নেশা নয়নে-মনে প্রত্যহই শক্তিসঞ্চয় করিয়া উঠিতেছে। অদৃষ্টের বিচিত্র প্রকাশ নহে কি?

বাবার দুশ্চিন্তার কারণ বুঝিতে পারিতেছি। সুন্দরী বলিয়া আমার কোন খ্যাতি না থাকিলেও দর্পণে প্রতি-বিম্বিত উদ্দাম যৌবনচ্ছাস-বিলসিত দেহ দেখিয়া বুঝিতাম, কেন পিতৃদেব দিন দিন অন্যমনস্ক হইয়া পড়িতেছেন। বহুদিন ধরিয়া তিনি আমাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন; কিন্তু অর্থহীন, সহায়সম্পদহীন দরিদ্র, কথা-সাহিত্যিকের 'চলনসই' কন্যাকে কোন্ সুপাত্র বরণ করিয়া লইবেন? দেশ শুনিতেছি, আত্মবিস্মৃতি হইতে জাগিয়া উঠিয়াছে। দেশের তরুণগণ দেশজননীর সকল প্রকার দুর্দ্দশা মোচন করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। নেতৃগণ জ্বালাময়ী ভাষায় জনসাধারণকে ডাক দিয়া দেশের যাহা কিছু আছে, ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিতেছেন। দেশের নারীজাতি সহস্রপ্রকারে লাঞ্ছিতা বলিয়া প্রতীকার-কামনায় স্বাধীনতাকামী বহু বীরহৃদয় ফুলিয়া দুলিয়া উঠিয়াছে—সংবাদপত্রে প্রতিদিনই তাহার বিবরণ পড়িতাম। কিন্তু তথাপি দেখিতেছি, নারীধর্ষণ, নারীহরণ অবাধে এই হতভাগ্য বাঙ্গালাদেশে নিত্য-ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। আর কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার জন্য ভাগ্যহীন জনক দ্বারে দ্বারে ব্যর্থমনোরথে ফিরিতেছে! দেশের বৃদ্ধ, প্রৌঢ়, যুবক—সকলেই এ বিষয়ে নির্ব্বিকার। উপযুক্ত দর্শনী দাও, সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যার গতি হইতে পারে। যাহাদের তাহা নাই—বিংশশতাব্দীর সভ্যযুগে তাহারা অপাংক্তেয়। জীবন-যুদ্ধে তাহারা অবশ্যই মরিবে, কে তাহাদের রক্ষা করিতে পারে?

সুদূর কারাগার হইতে দাদার পত্র মাঝে মাঝে আসিত। পড়িয়া বুঝিতে পারিতাম, বাবা মানসিক উদ্বেগের আভাস

দাদাকেও জানাইতেছেন। দাদা উৎসাহ দিয়া পত্র লিখিতেন, কিন্তু তবু ছত্রের ফাঁকে ফাঁকে নৈরাশ্যের ম্লান রেখার দাগ পড়িয়াছে, বুঝিতাম।

নারীর যৌবনে ধিক্, অষ্টাদশ বর্ষ বয়সকেও সহস্র ধিক্! পাড়ার গ্লানিভরা যে জনশ্রুতি দিন দিন এই দরিদ্র পরিবারের উদ্দেশে প্রবল হইয়া বাতাসকেও ভারী করিয়া তুলিতেছিল, তাহার পূতিগন্ধে দেহ ও মনকে অশুচি করিয়া দিল।

ছাদে উঠিয়া বস্ত্রাদি রৌদ্রে দিতে গিয়াও নিস্তার নাই। লুব্ধদৃষ্টি—যুবক ও প্রৌঢ়, কাহাকেই বা বাদ দিব!—সকল সময়েই বিষাক্ত শরের ন্যায় আমাকে আহত করিত। যে বাঙ্গালী এক দিন শুধু মৃন্ময়ীকে মা বলিয়া নিরস্ত হয় নাই, বিশ্বের নারী-জাতিকে মা বলিয়া কায়মনোবাক্যে পূজা করিবার আয়োজন করিয়াছিল—প্রকৃতপ্রস্তাবে, সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতিকেই নানা ভাবের মাতৃরূপ দিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল, আজ তাহাদেরই বংশধরগণ নারীকে শুধু ভোগের বস্তু ব্যতীত অন্য কোনও ভাবে কল্পনা করিতে অসমর্থ! এই শ্রেণীর তরুণই কি দেশজননীকে মুক্তির স্বর্গরাজ্যে লইয়া যাইবে?

বাবার কাছে পল্লীর উৎপাতের সকল কথাই বলিতাম। বলিবার প্রয়োজন ছিল না। তাঁহাব সমগ্র দৃষ্টি তাঁহার মাতৃহারা কন্যার চারিপার্শ্বে অনুক্ষণই সতর্কভাবে সুদর্শন চক্রের ন্যায় আবর্ত্তিত হইত। সকল সংবাদই তিনি রাখিতেন।

অনূঢ়া যুবতী কন্যা একাকিনী পিতার সহিত বাস করে—বিবাহ দিবার কোন চেষ্টা নাই, ইত্যাকার নিন্দাবাদে কর্ম্মহীন পরচর্চ্চাপ্রিয় মানুষের নিষ্ঠুর রসনার বিষ এমন তীব্র ও অসহনীয় হইয়া উঠিল যে, বাধ্য হইয়া, বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়া পিতা পুরাতন পল্লী ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বাসা পরিবর্ত্তন করিলেন।

"মা, অতি হতভাগা তোর এই বাবা! মেয়েকে তার দুর্নাম—মিথ্যা গ্লানি থেকে অব্যাহতি দেবার শক্তিও পর্য্যন্ত হ'ল না!"

পিতৃদেবের সৌম্য আননে অশ্রুর বন্যা নামিয়া আসিল। এমন ভাবে বাবাকে কোনও দিন বিচলিত হইতে দেখি নাই। তিনি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া রহিলেন।

পুরুষ-জাতির উপর সমগ্র হৃদয় বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। কেন? নারী কি এতই উপেক্ষণীয়? আমার শরীরে জ্যোৎস্নার তরঙ্গ নাই; কিন্তু আমি ত অপ্রিয়দর্শনা নহি। শিক্ষা?—তাই বা কয় জন কলেজের ছেলে, এই বয়সে আমার মত সুশিক্ষা পাইয়াছে? সাহিত্য, ইতিহাস,—এ দেশী বিদেশী, বাবা ত আমায় ভাল করিয়াই পড়াইয়াছেন! বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতি মোটামুটি আমিও ত শিখিয়াছি। কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়ার্ডওয়ার্থ, সেলি, মাইকেল হইতে রবীন্দ্রনাথ, ডিকেন্স টলষ্টয় হইতে বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি বাবার কাছে এই বয়সে যতটুকু পড়িয়াছি, কলেজের কয় জন ছেলে তাহা জানে? তবে কেন আমি উপেক্ষণীয়া? গৃহকর্ম্ম?—গরীবের মেয়ে আমি, ইহাতে ত আমার জন্মগত অধিকার! তবে?

বাবার কণ্ঠলগ্ন হইয়া শুধু ডাকিলাম, "বাবা! বাবা!"

আত্মসংবরণ করিয়া বাবা আমার মাথায় হাত রাখিলেন।

৩

নূতন পল্লীর অপেক্ষাকৃত নিভৃত প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র একতল গৃহে আবার সংসার সাজাইয়া লওয়া গেল। বাবা ক্রমশঃই পরিশ্রমের মাত্রা বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার রচনায় আমিও কিছু কিছু সাহায্য করিতে লাগিলাম। সংশোধিত পাণ্ডুলিপির নকলের কার্য্য প্রধানতঃ আমিই করিতাম।

নূতন বাসায় আসিবার পর এক জন সুদর্শন যুবক মাঝে মাঝে বাবার কাছে আসিতে লাগিলেন। শুনিলাম, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। বাবাব কথা-সাহিত্যে সুনাম আছে, তাই তাঁহার কাছে এই যুবক নিজের রচনা দেখাইয়া সে সম্বন্ধে দোষ-ত্রুটি সংশোধন করাইয়া লইতে আসিতেছেন। ছাত্র বা শিক্ষার্থী পাইলে বাবার আনন্দ ও উৎসাহের সীমা থাকিত না।

বাহিরের ঘরে কেহ উপস্থিত থাকিলে আমি কখনই সেখানে যাইতাম না। অবশ্য এ বিষয়ে বাবার কোন নিষেধ ছিল না। তিনি আধুনিক মতের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী ছিলেন না; কিন্তু আমার বাবার মত উদার—নারীজাতি সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল মানুষের সংবাদ আমি জানি না। তিনি কখনও আমার কোন কার্য্যে বাধা দিতেন না, তবে কর্ত্তব্য সম্বন্ধে পৃথিবীর মহীয়সী নারীদিগের জীবনাদর্শের

কথা সকল সময়ে উল্লেখ করিতেন। দাদা আমাদের পরলোকগতা জননীর একখানি তৈলচিত্র রচনা করাইয়াছিলেন। দেখিতাম, বাবা প্রত্যহ দুই বেলা সেই তৈলচিত্রের সম্মুখে নিমীলিত-নয়নে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া কি ধ্যান করিতেন। তাঁহার রচনার মধ্যে কোথাও আধুনিক নারীপ্রগতির বিরুদ্ধে বা অনুকূলে কোনও তীব্র মন্তব্যের সমাবেশ দেখি নাই; তবে নারীর উচ্চতর, মহত্তর আদর্শের যে ছবি তাঁহার লেখনীতে ফুটিয়া উঠিত, বিংশ শতাব্দীর নারীপ্রগতির কথা তাহাতে যেন ম্লান হইয়া যাইত। তিনি আমার পিতা—এ জন্য তিনি আমার অসীম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও পূজার পাত্র সত্য; কিন্তু তাহা ছাড়াও তাঁহার রচনার আমি ভক্ত শিষ্যা ছিলাম।

বাবার ছাত্রস্থানীয় এই যুবকটির ঘন ঘন গতায়াতে আবার নূতন পল্লীতে জনরব গজাইয়া উঠিতে লাগিল। যে পল্লী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহার কুৎসিত জনশ্রুতিও কেমন করিয়া জানি না, এই পল্লীতেও আরব্যোপন্যাসে বর্ণিত বিপুলাবয়ব জিন্ দৈত্যের ন্যায় মাথা খাড়া দিয়া উঠিল।

এখানে আসিবার পর যে কয় স্থান হইতে বিবাহ-সম্বন্ধ আসিয়াছিল, পাকা দেখার পরও তাহা ভাঙ্গিয়া গেল। বাবার মুখের হাসি একবারেই নিভিয়া গেল। গৃহকোণের অন্ধকারকে সখীভাবে আলিঙ্গন করা ব্যতীত অন্য পথও রহিল না।

কয়েক মাস যাওয়া-আসার পর, বাবার যুবক শিষ্যটি অকস্মাৎ যেন উধাও হইয়া গেলেন। সেই সঙ্গে জনরব সহস্রশীর্ষ অজগরের ন্যায় বিষের অনল উদ্গীর্ণ করিতে লাগিল। আমরা ত এমনই একঘরী হইয়া থাকিতাম। পাড়ার কেহই বাবার সহিত কোনও দিন যাচিয়া আলাপ করিতে আসেন নাই। অধিকাংশই কেরাণী বা ব্যবসায়ী ছিলেন। সাহিত্য-রসের সহিত বোধ হয় তাঁহাদের কোন পরিচয় ছিল না। পল্লীর কোন নারীই—তরুণী, বালিকা বা প্রৌঢ়া কেহই এই ভাগ্যহতা দরিদ্র-কন্যার সহিত বাক্যালাপের সুযোগ করিয়া লইতে পারে নাই। সে জন্য আমারও যে বিশেষ আগ্রহ অথবা দুঃখ ছিল, তাহাও সত্য নহে।

অষ্টাদশ বসন্ত পায় পায় আকাশের গাঢ় নীলিমা-সাগরে নিঃশব্দে ডুবিয়া গেল। প্রকৃতির কখনও পরিবর্ত্তন হয় না। তাহার হাস্য ও ক্রন্দন শুধু মানুষের মনে।

দাদার পত্র যথানিয়মে আসিতেছিল। বিংশ শতাব্দীর দৃঢ়মনা কর্ম্মী পুরুষ বাবাকে লিখিলেন, "সরমার ভাগ্যে যদি বিবাহ না-ই থাকে, তাহাতে হতাশ হইবার কারণ দেখি না। এ দেশে পুরুষ নাই, তাই তাহার যোগ্য পাত্রও মিলিতেছে না। বাঙ্গালী এখনও গাঢ় নিদ্রায় আচ্ছন্ন। এত দিন বৃথাই আশা করিয়াছিলাম, দেশে জাগরণ আসিয়াছে। কুম্ভকর্ণের জাতির নিদ্রাভঙ্গের বিলম্ব আছে। আপনি উপনিষদ ও গীতার তপোবনে তাহার তপস্যার ব্যবস্থা করুন।"

কিন্তু পল্লীর অশান্ত তরুণ-দল শুধু আমাকে নহে, বাবাকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিল। কুমারী তরুণীর পাণিগ্রহণের পাত্র নাই; কিন্তু প্রথম রিপুর বাহুবন্ধনে নিষ্পিষ্ট করিবার লোকাভাব পল্লীগ্রামে কেন, সহরেও নাই। জানালার ফাঁকে হাতছানি, ছাদের উপর হইতে বিচিত্র ভঙ্গী—শ্লীলতা ও শিষ্টাচারের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। রসরাজের উল্লিখিত ভূতের দৌরাত্ম্য "কাঁচা বয়স" দেখিয়া দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। "গলায় দড়ির" অভিনয় পর্য্যন্ত নিরুপদ্রবেই অভিনীত হইয়া চলিল। লোষ্ট্র সহযোগে প্রণয়লিপির উৎপাতে বাড়ীর ছাদ ও অঙ্গন পর্য্যন্ত কলুষিত হইয়া উঠিল।

বাবার সহিষ্ণুতা দেখিয়া চমৎকৃত হইলাম। অহোরাত্র লেখনী অবিশ্রাম চলিতেছে। তাঁহার শীর্ণ আননে একটা বিচিত্র দীপ্তি ক্রমেই সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল। আমি শঙ্কিত হইলাম।

সে দিন সন্ধ্যার পর বাবা গৃহে ফিরিয়াই বলিলেন, "মা জননী ছেলের জন্য বড় ভয় পেয়েছে, না, সরমা?"

অনেক দিন বাবার মুখে এমন প্রসন্ন হাসি দেখি নাই। বিস্মিতভাবে তাঁহার দিকে চাহিলাম।

তেমনই প্রসন্নভাবে হাসিয়া তিনি বলিলেন, "চল্ মা, দিন কতক এই পাপ জায়গা ছেড়ে কোন এক তীর্থে গিয়ে বাস করি।"

বলিলাম, "তাই চল, বাবা! কিন্তু—"

বাবা হাসিয়া বলিলেন, "টাকা? সে হবে'খন।"

"কোথাও যেতে গেলে, অনেক টাকা খরচ। এত টাকা তুমি কোথায় পাবে, বাবা!"

পিতৃদেব আমার হাতে একতাড়া নোট দিলেন।

এ যে অনেক! একসঙ্গে এত টাকা জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে আমাদের হাতে আসিতে দেখি নাই। বিস্মিতভাবে বলিলাম, "এত টাকা তুমি কোথায় পেলে, বাবা?"

গণিয়া দেখিলাম, তিন শত টাকার নোট।

হাসিতে হাসিতে বাবা বলিলেন, "দু'খানা উপন্যাসের গ্রন্থস্বত্বের বিনিময়ে—আজ প্রকাশকের কাছে দু'খানা নূতন বই বেচে এলাম।"

দুইখানি মৌলিক উপন্যাসের বিনিময়-মূল্য তিন শত টাকা! হাঁ, বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যিকের অদৃষ্টে ইহার অধিক প্রাপ্য সাধারণতঃ দুর্ল্লভ।

বাবা বলিলেন, "আর দেরী নয়, কালই রওনা হ'তে হবে। এ জায়গা সহ্য হচ্ছে না। অন্ততঃ মাস পাঁচেক ত জুড়িয়ে আসি।"

সেই ভাল। পশ্চিমের স্বাস্থ্যকর জলবায়ু বাবার জন্য বিশেষভাবে প্রয়োজন।

৪

কোন বালাই নাই। সাঁওতাল পরগণার কোনও নিভৃত সহরের ক্ষুদ্র বাড়ীতে পিতা ও পুত্রীর বৈচিত্র্যহীন জীবনেও যেন একটা অনবদ্য শান্তির বাতাস বহিতেছিল। পরনিন্দা, পরচর্চ্চার অবকাশ ও সুযোগ—যাঁহারা বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য এ সকল স্থানে আসেন, তাঁহাদের বড় একটা থাকে না।

পিতার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতে দেখিয়া তাঁহাকে শীঘ্র কলিকাতায় ফিরিতে দিলাম না। সঞ্চিত অর্থে ছয় মাস চালাইয়া দেওয়া গেল। এখানে বসিয়াই বাবা গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রকাশকের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। সুতরাং সংসার একবারে শীঘ্র অচল হইবার সম্ভাবনা নাই।

দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে পিতার সহিত মুক্তবায়ু সেবন করিয়া আমার মনেরও শান্তি ফিরিয়া আসিতেছিল। দেহে যৌবনশ্রী আরও পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

বৎসর এইভাবে চলিয়া গেল। কিন্তু পিতাকে আবার অত্যন্ত বিচলিত ও চিন্তাশীল দেখিলাম। অনেক সময় তিনি আমার দিকে নিবদ্ধদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠেন, বুঝিতে পারি। মুখে কোন কথা না বলিলেও, আমার জন্য প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, তাহা অনুমান করিয়া বাবার জন্য আমি আরও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলাম। তিনি যে এত দিনের মধ্যে আমার একটা গতি করিতে পারিলেন না, এই দুর্ভাবনায় প্রতিদিন তাঁহার শরীর ও মন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, ইহা বুঝিবার মত বয়স ও বুদ্ধি আমার যথেষ্টই ছিল।

হিন্দুর ঘরে উনিশ বৎসরের মাতৃহীনা কন্যাকে অবিবাহিতা রাখা যে কিরূপ গুরু সমস্যা, তাহা বুঝিতে পারি। কিন্তু উপায় কি? কেহই যখন আমাকে বরণ করিতে চাহে না, দরিদ্রের কন্যাকে কোনও ভদ্র ঘরের চরিত্রবান্ যুবকই যখন গৃহলক্ষ্মীর পদে প্রতিষ্ঠিত করিতে সম্মত নহেন, তখন সে জন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি? পৃথিবীতে যত ফুল ফুটে, সবই কি দেবতা ও মানুষের কাজে লাগে? অনেক ফুলই ত অরণ্যে প্রস্ফুটিত হইয়া, নিঃশব্দে অন্যের অগোচরে বিস্তৃত অরণ্যের ভূমিশয্যায় তাহার পুষ্প-জীবনের সমাধি লাভ করে! সে জন্য দুঃখ করিয়া কোন ফল নাই।

তবে বাবার জন্যই আমার সমস্ত অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিত। আমি যদি না জন্মিতাম, তাহা হইলে আজ তাঁহাকে প্রতিদিন অসহ্য যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হইতে হইত না।

প্রভাতে বাবার জন্য চায়ের পেয়ালা লইয়া যখন তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইলাম, বাবা তখন নীরবে মুক্ত আকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া তিনি হাত বাড়াইয়া পেয়ালাটা গ্রহণ করিলেন। তার পর বলিলেন, "মা, কা'ল কল্‌কাতায় যাচ্ছি। জিনিসপত্র সব গুছিয়ে রাখ।"

বলিলাম, "কেন বাবা, এখানে ত বেশ আছি। আবার কল্‌কাতা?"

বিস্মৃতপ্রায় গত জীবনের অনেক কথাই মনে পড়িল। শৈশবের সুখস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম-যৌবনের গ্লানিপূর্ণ জীবন, নিন্দুকের অলস রসনানিক্ষিপ্ত মিথ্যা কুৎসা ও ইন্দ্রিয়-লালসায় অধীর, উচ্ছৃঙ্খল পুরুষের উৎপীড়ন! না, না,—এখানেই জীবনের অবশিষ্ট কাল, শেষ মুহূর্ত্ত, অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পৃথিবীর নিকট বিদায় লইব। আমার সাধের বাঙ্গালার রাজধানীর বক্ষে ফিরিয়া গিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালা মায়ের বুকে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই বক্ষঃশোণিতে

বর্জ্জিত হইয়া, দেশ-জননীর আলিঙ্গনে ফিরিয়া যাইবার প্রবৃত্তি নাই, ইহা কি কম দুর্ভাগ্যের কথা! কিন্তু তথাপি ইহা সত্য—প্রদীপ্ত ভাস্করের ন্যায়ই অখণ্ড সত্য!

বাবাকে বলিলাম।

তিনি হাসিলেন। সে হাসি মর্ম্মান্তিক ব্যথারই দ্যোতক। বক্ষঃশোণিত গাঢ় হইয়া যেন ওষ্ঠপ্রান্তে জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে! বাবা বলিলেন, "ওরে পাগ্‌লী মেয়ে! তোর বাবা আর ক'দিন? তোর দাদার পরিণামও ত বুঝতে পাচ্ছিস্। অষ্টবাহু রাক্ষসের কবলে পড়লে তবু পরিত্রাণ আছে; কিন্তু সে যে জীবন-প্রবাহের আবর্ত্তে পড়েছে, তাকে তলিয়ে যেতে হবেই। কোন আশা নেই। তার পর এই নির্ম্মম, লুব্ধ, হিংস্র সংসারের মাঝখানে তোর অবস্থা কি হবে, ভেবে দেখ! আমরা থাক্‌তেই লাঞ্ছনা ও অপমান থেকে রক্ষা করতে পারছি না, আর—"

বাবা শিহরিয়া উঠিলেন।

আমি বলিলাম, "তোমার চা জুড়িয়ে গেল, বাবা!"

"যাক্—" বলিয়া বাবা পেয়ালাটা এক পাশে রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ঘরের মধ্যে তিনি অত্যন্ত গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলাম। বাবাকে চিন্তামুক্ত করিবার জন্ত এই তুচ্ছ প্রাণ উৎসর্গ করা বিন্দুমাত্র কঠিন নহে; কিন্তু আমিও ত সম্পূর্ণ নিরুপায়!—ভগবান্! ভগবান্!

"না, সরমা!—কল্‌কাতায় যাওয়াই ঠিক। একটা সুবিধা হয়েছে, সেটা ছাড়া হবে না!"

আমি আর দাঁড়াইলাম না। বাবার জন্ত আর এক পেয়ালা গরম চা আনিয়া দিতে হইবে।

৫

"অভাগা যগ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়!"—এই কবি মানব-অদৃষ্টের সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে নিশ্চিতই সুপরিচিত ছিলেন। কথাটা প্রতিবর্ণে সত্য।

কলিকাতায় এক নূতন পল্লীতে আসিবার পর, পাত্রপক্ষ আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিয়া গিয়াছিলেন। পাকা দেখার কথাও স্থির হইয়াছিল। কিন্তু অকস্মাৎ এক দিন সংবাদ আসিল,—এ বিবাহ হইবে না। পত্রযোগে তাঁহারা বাবাকে এ সংবাদ দিয়াই নিরস্ত হন নাই। বাবা যে সত্য গোপন করিয়া তাঁহার বিংশবর্ষীয়া ব্যভিচারিণী কন্তাকে তাঁহাদের গলায় ঝুলাইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, এ জন্ত শঠ, প্রবঞ্চক প্রভৃতি সুমিষ্ট বচন-প্রয়োগে তাঁহারা পিতাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। আমার জন্ত দড়ি ও কলসীরও ব্যবস্থা দিয়াছিলেন।

বাবা আমাকে এ পত্রের বিষয় গোপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার খাতা-পত্র গুছাইয়া রাখিবার সময় দৈবক্রমে আমি পত্রখানি আবিষ্কার করিয়াছিলাম। সে দিন তিনি বিশেষ কোন কাজে বাহিরে গিয়াছিলেন।

পড়িতে পড়িতে আমার সমস্ত রক্ত মাথায় আসিয়া জমা হইল। বাবার কোনও দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয়ের নিকট সংবাদ লইয়া পাত্রপক্ষ জানিয়াছেন যে, বাবার কাছে এক জন যুবক সর্ব্বদাই আসিত। সেই যুবকের সহিত তাঁহার কন্যার অবৈধ-মিলন ঘটে। যুবক নিরুদ্দেশ। অবৈধ-মিলনের কুৎসিত ফলটিকে গোপন করিবার জন্য বাবা তাঁহার কন্যাকে লইয়া এত দিন অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। এখন আসরে নামিয়া সেই অচল কন্যাকে ভদ্রবংশে চালাইবার চেষ্টা করিতেছেন। ইত্যাদি।

হায়! বাঙ্গালী হিন্দুর ঘরের কুমারী যুবতী!—ভাগীরথীর শীতল বক্ষেও তাহাদের স্থান হয় না!

সমগ্র শরীরে আগুন জ্বলিতে লাগিল। উঃ! এই জঘন্য পৃথিবীতে মানুষ থাকে!

কিন্তু জীবনের মোহ, পৃথিবীর আকর্ষণের মায়া ত্যাগ করিতে পারিলাম না। কিছুতেই দুর্ব্বলতাকে জয় করিয়া এ দেহের ধ্বংস করিবার শক্তি খুঁজিয়া পাইলাম না। আশা নাই, তথাপি নিভৃত মনের গুপ্তকোণে ও কাহার স্পন্দন?—বাঁচিয়া রহিলাম।

বাবা প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া আরও দুই স্থান হইতে ক্রমান্বয়ে পাত্রের সন্ধান করিয়া আনিলেন। বিস্ময়ের বিষয়, বিরাট রাজধানীতে পাশের বাড়ীতে মানুষ অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিলেও কেহ কাহারও সংবাদ রাখে না; কিন্তু আমার বিবাহ-সম্বন্ধ আসিলেই আমার কুৎসার কথা রটনা করিবার লোকাভাব নাই। ক্রমে ভিত্তিহীন, মিথ্যা অপবাদ পল্লবিত হইয়া এমনভাবে বিস্তৃত হইল যে, দিবালোকে বাবার গৃহ হইতে বাহির হওয়াও কঠিন সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল।

এক দিন রুক্ষকেশে বাবা উন্মত্তের মত ঘরে আসিয়া বলিলেন, "আর পারি না, এক বাটি বিষও এখন অমৃত! প্রকাশকও আর বই নিতে চায় না! বলে—!"

কি যে বলে, তাহা বুঝিলাম। জন্মদাতা পিতা, পরমারাধ্য পিতৃদেব, অভাগিনী কন্যার জন্য অপযশঃ ও নিন্দার ভারে দিবাভাগেও লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারেন না! আমার জন্যই তাঁহার অন্ন-সংস্থানের পথও রুদ্ধ! আমার কি অপরাধ দেবতা! তুমি ত জান প্রভু, দেহ ত দূরের কথা, মনও কখনও কলুষস্পর্শ করে নাই! তবে কেন এই মিথ্যা জঘন্য অপবাদ—লাঞ্ছনা! এমন জীবন বহন করার অপেক্ষা মৃত্যুও লক্ষবার বাঞ্ছনীয় নহে কি?

সমস্ত রজনী অনিদ্রার পর মুখ বুজিয়া সকালে বাবার খাবারের আয়োজন করিলাম।

স্নেহলতা!—স্নেহলতা! তুমি সহায়হীনা নারীর মুক্তির পথ দেখাইয়া দিয়াছ। ভগিনি, তোমার দেশে অকারণে লাঞ্ছিতা তোমার এই হতভাগিনী ভগিনীকে টানিয়া লও!

বাবা এখন বাড়ী নাই! তিনি এইমাত্র চন্দননগরে গিয়াছেন। নিশ্চয়ই সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিতে পারিবেন না। এখনই চমৎকার সুযোগ।

রক্ত কি চরণবিশিষ্ট জীব? মাথার ভিতর চরণ-বিন্যাসের দ্রুত, নির্ম্মম শব্দ অবিশ্রান্ত চলিয়াছে। পৃথিবী কি আজ রক্তাম্বর ধারণ করিয়াছে? সূর্য্যের আলোকে শোণিতধারার প্রবাহ কি ভীষণ!

চিরবিদায়ের পূর্ব্বে বাবার কাছে ক্ষমা চাহিয়া যাইব না? পাষাণ-প্রাচীরের আবেষ্টনমধ্যে দাদা চরম নিশ্বাস ত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত—শোভাময়ী ধরণীর নিকট শেষ বিদায় লইবার পূর্ব্বে দাদার চরণে প্রণতি-নিবেদন অবশ্যই করিতে হইবে!

অন্তিম বলে লেখনী ধারণ করিলাম। হাত কাঁপিতেছে, পৃথিবী আবর্ত্তিত হইতেছে, মস্তিষ্কে অগ্নি গর্জ্জন করিতেছে! —তা করুক। শেষ কর্ত্তব্য এখনও বাকী!

* * * *

শক্তিহীনা নারীর চির-আশ্রয়—বোতলবাহী কেরোসিন! তুমি অন্ধকার দূর কর, মুহূর্ত্তমধ্যে লোকাতীত স্থানে চির-দুঃখীকে লইয়া যাও। আজ তোমাকে সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিয়া আমি ধন্য।

উন্মত্তের ন্যায় প্রাণ খুলিয়া হাসিতে ইচ্ছা করিতেছিল। আর মুহূর্ত্ত পরে যেখানে যাইব, সেখানে কোন জ্বালা নাই! তাই পৃথিবীর নির্ম্মম, পাষাণ, ক্রূর মানুষগুলাকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছিল, এই ত তোমাদের ক্ষমতা! মানুষকে চূর্ণ করিতে পার, তাহার হৃদয়কে ছিন্ন, দীর্ণ করিতে পার, ধ্বংস করিতে পার, কিন্তু আশ্রয় দিতে পার না, গড়িতে পার না—রক্ষা করিবার শক্তি তোমাদের নাই। তবে এত বড়াই কিসের?

কিন্তু একটি শব্দও মুখ হইতে উচ্চারিত হইল না। সমস্ত পৃথিবী যেন শব্দহীন হইয়া আমার মস্তিষ্কমধ্যেই শব্দের অনন্ত কারখানা স্থাপন করিয়াছিল। তথা হইতে শব্দ-নিক্রমণের কোনও উপায়ই ছিল না।

মুহূর্ত্ত!—আর একটি মুহূর্ত্ত! প্রাচীরে জননীর তৈল-চিত্র! সে দিক্ হইতে প্রবল আয়াসে মুখ ফিরাইয়া লইলাম। তাঁহার প্রশান্ত আননে যে স্নিগ্ধ হাস্যের দীপ্তি রহিয়াছে, তাহার আলোকে আমার সংকল্প টুটিয়া যাইতে পারে।

দীপশলাকা তুলিয়া লইলাম।

কিসের শব্দ?—না, ও কিছু নহে! আমারই বিভ্রান্ত মস্তিষ্কের অন্তর্গত শব্দের গুরুগর্জ্জন।

এ কি! হাত কাঁপিতেছে কেন? দুর্ব্বলতা?—না, ভূমিকম্প হইতেছে! তৃতীয় বারেও শলাকা বাহির করিবার পূর্ব্বে দীপশলাকার আধার ভূমিতলে পড়িয়া গেল।

সামান্য আধারের এমন প্রচণ্ড শব্দ! রুদ্ধ দরজাতেও প্রচণ্ড ঝঞ্চনা বাজিয়া উঠিল।

কম্পিত, আন্দোলিত, সিক্ত দেহকে নত করিয়া ভূমিতল হইতে দীপশলাকার বাক্স তুলিয়া লইবার জন্য হস্ত প্রসারিত করিলাম।

আবার প্রচণ্ড ঝঞ্চনা!—ধপাস্, ধুপ্!

মাথা তুলিবার সঙ্গে সঙ্গে দেখিলাম, দুই বাহু দ্বারা পিতৃদেব আমাকে তুলিয়া ধরিয়াছেন। দ্বার মুক্ত।—আরও যেন কাহার মূর্ত্তি বিস্ফারিত-নেত্রে আমার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে!—অন্ধকারে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

জানি না, কতক্ষণ এমনভাবে কাটিয়াছে! উন্মীলিত-নেত্রে চাহিয়া দেখিলাম, আমারই শয়নকক্ষে, আমারই শয্যায় আমি শায়িতা। উদ্বেগব্যাকুল-নয়নে বাবা আমার

মাথার উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার পার্শ্বে, কে গো তুমি? তোমাকে যেন স্বপ্নে কবে দেখিয়াছিলাম!

না, চিনিয়াছি, বাবারই শিষ্যস্থানীয় কথা-সাহিত্য-শিক্ষার্থী তিনি!

মুখ ফিরাইয়া লইলাম।

শুনিলাম, তিনি বলিতেছেন, "ব্যাপার এত দূর গড়িয়েছে, তা ত জান্‌তাম না। আমি রেঙ্গুনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের কাঠের বড় ব্যবসা আছে। কাকাবাবু হঠাৎ মারা যাওয়ায় তাড়াতাড়ি যেতে হয়েছিল। আমার জন্য আপনাদের এই দুর্দ্দশা হয়েছে জান্‌লে—"

বাবা বাধা দিয়া বলিলেন, "সে দোষ তোমার নয়, আমাদের অদৃষ্ট।"

শুনিলাম, তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলিতেছেন, "আমি অযোগ্য নই। আপনাদেরই স্বজাতি। সরমাকে আমায় দিন। এ ফুলের বোঝা আমিই সুখে বয়ে বেড়াব। এখানে এসেই আপনাদের অনেক সন্ধান করেছি। শেষে আপনার প্রকাশকের কাছে সংবাদ পেয়ে আসছিলাম। পথে দেখা। আর একটু দেরী হলেই—উঃ!—আশীর্ব্বাদ করুন।"

ধীরে ধীরে ফিরিয়া চাহিলাম। ধরণী বর্ণহীনা নহে। আর ভগবান্! তিনি সত্যই দয়াময়!

দেখিলাম, বাবা নতজানু তাঁহাকে তুলিয়া আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছেন।

ভগবান্! আত্মহত্যার মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়া এ কোন্ সুধাভাণ্ড অভাগিনীর জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলে, প্রভু!

মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

চতুর-চূড়ামণি

১

সন্ধ্যালোক-ছায়াচ্ছন্ন শ্বেতগম্বুজকিরীটী সুদৃশ্য প্রাসাদের মুক্তবাতায়নে বসিয়া একটি বালিকা নীরবে সুনীল গগন-পানে চাহিয়া ছিল। বালিকা পঞ্চদশবর্ষীয়া। নিম্নে নীলমণিময়ী যমুনা কালোরূপের লহর তুলিয়া, দশমীর উজ্জ্বল শশাঙ্কের তরল কিরণে, মৃদু পবনে তালে তালে নাচিতেছিল। তরঙ্গভঙ্গশীতল অলস সমীরণ নবপ্রস্ফুটিত প্রসূনগন্ধে কোমলভাবে বহিতেছিল, বালিকার অলক-গুচ্ছ লইয়া মধুর লীলা করিতেছিল। দূরে আলোকমালা-বিভূষিতা কোলাহলময়ী রাজধানী প্রশান্তির স্থিরক্রোড়ে ক্রমে আবেশময়ী হইয়া আসিতেছিল। অবসাদের মদির-ছায়া সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িতেছিল।

নীলিমার পানে চাহিয়া চাহিয়া বালিকা একাগ্রমনে যেন কাহার স্বপ্নমূর্ত্তি কল্পনা-পটে আঁকিতেছিল। বিরল-নক্ষত্র-মালা একে একে চাঁদের আশে-পাশে ফুটিয়া উঠিতেছিল।

সহসা দূরাগত মৃদু মধুর বংশীরবে যমুনার বক্ষ কাঁপিয়া উঠিল। বালিকাও সেই অলস উচ্ছ্বাসে, সেই মুরলীর মোহন তানে, বিশাল স্নিগ্ধোজ্জ্বল চক্ষুর্দ্বয় আরও বিস্ফারিত করিয়া যমুনার দিকে চাহিয়া দেখিল, কিন্তু অস্ফুট চন্দ্রালোকে কিছুই দেখা গেল না। ক্রমে অমৃতবর্ষি-বংশীধ্বনি নিকটতর হইয়া আসিল। বালিকা সেই কৌমুদীস্নাত যমুনার উপর দেখিল, কিছু দূরে একখানি ক্ষুদ্র তরণী তীরাভিমুখে আসিতেছে। সমুদয় প্রাণখানি কাণের কাছে আনিয়া সে সেই সঙ্গীত শুনিতে লাগিল, আনন্দ-তরঙ্গ তাহার কৃষ্ণ আঁখিপটে খেলিতে লাগিল।

হঠাৎ বাঁশীর শেষ তান যমুনাম্বু-সঞ্চারী পবনে মিলাইয়া গেল, আর সেই ক্ষুদ্র মরালগামিনী তরণী বৃক্ষচ্ছায়াচ্ছন্ন শ্বেত-মর্ম্মর-প্রস্তরশোভিত সুদৃশ্য সোপানপার্শ্বে আসিয়া থামিল—কে এক জন লম্ফ দিয়া তীরে নামিল।

"রিজিয়া! রিজিয়া!"

সে মৃদু মধুর আকুল আহ্বান বালিকার কর্ণে পৌঁছিল। কয়েক মুহূর্ত্তে অন্তঃপুরোদ্যানের ক্ষুদ্র দ্বার সাবধানে উন্মুক্ত হইল। নবযৌবন-স্ফুরিতাঙ্গী রিজিয়া রূপের তরঙ্গে হেলিতে দুলিতে ধীরে ধীরে সেই সোপানশ্রেণীর উপর আসিয়া দাঁড়াইল।

যে ডাকিয়াছিল—সে পুরুষ। নীরবে সে রিজিয়ার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বালিকার ক্ষুদ্র করযুগল গ্রহণ করিল। ঈষদ্বিভিন্ন পত্রান্তরাল হইতে চন্দ্র উঁকি মারিতেছিল। খণ্ড-জ্যোৎস্না প্রস্তরের উপর পড়িয়া কাঁপিতেছিল।

"মনাইম্!—"

বালিকার কণ্ঠস্বর আর ফুটিল না; কে যেন তাহার গলা চাপিয়া ধরিল। আগ্রহ-কম্পিতকণ্ঠে মনাইম্ বলিল,—"কি বলিতেছিলে, রিজিয়া?"

একটু থামিয়া সযত্নে হৃদয়াবেগ দমন করিয়া রিজিয়া বলিল,—"তুমি আর এমন করিয়া আসিও না, পিতা বা আর কেহ জানিতে পারিলে কি সর্ব্বনাশ হইবে, জানি না!"

প্রশান্তস্বরে মনাইম্ বলিল,—"তখন বলিব, আমাদের কোন অসদভিপ্রায় নাই; তখন প্রকাশ করিব, আমি তোমার পাণি-প্রার্থী।"

"না মনাইম্! তখন কে ইহা বিশ্বাস করিবে! আর তুমি জান ত পিতার কি প্রতিজ্ঞা?"

"শুনিয়াছি।"

মনাইমের স্বভাবসিদ্ধ মধুর স্বর কিছু গম্ভীর, কিছু বিকৃত হইল। ধীরে ধীরে সে বলিল,—"তাহাই হউক। শুন রিজিয়া! যত দিন না আমি তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, যত দিন না তোমার পিতার অভিমতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারি, যত দিন না নিজ বুদ্ধির দ্বারা নিজের উন্নতির পথ উন্মুক্ত করিতে পারি, তত দিন আর তোমার কাছে আসিব না, তত দিন তোমা হইতে দূরে রহিব। যদি কখনও তাহা পারি, তখন তোমার পিতার নিকট হইতে তোমায় চাহিয়া লইব, নচেৎ—"

মনাইমের কণ্ঠস্বর কাঁপিয়া উঠিল, সে যৌবনদীপ্ত গাম্ভীর্য্যময় মুখমণ্ডলে বিষাদের চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল, বুঝি সে প্রদীপ্ত নয়নে এক ফোঁটা অশ্রুও আসিয়াছিল!

রিজিয়ার স্বর্ণকমল মুখখানি যেন পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। কি এক অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি এতটুকু সঙ্কুচিত হইল। কোমল নয়নপল্লবে মুক্তাবিন্দু ঝরিতে লাগিল। মনাইমের হস্ত অতি কোমলভাবে চাপিয়া বালিকা বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলিল,—"মনাইম্, কেন তুমি হতভাগিনীর জন্য এরূপ বিপদে পা দিবে! আমাকে তুমি ভুলিয়া যাও, ভাব, রিজিয়া স্বপ্ন; ভাব, রিজিয়া নাই! তুমি ইচ্ছা করিলে দিল্লীর সহস্র সুন্দরী তোমার চরণতলে আত্মসমর্পণ করিবে।"

রিজিয়া চিত্রলিখিতবৎ দাঁড়াইয়া রহিল!

মনাইম্ আর দাঁড়াইল না। তীরলগ্ন তরীতে আরোহণ করিয়া নৌকা খুলিয়া দিল।

বালিকা ডাকিল,—"মনাইম্!"

তরণী ততক্ষণ অনেক জলে। সে উত্তর দিল না। বালিকা আবার ঈষদুচ্চস্বরে ডাকিল,—"মনাইম্, শুন।"

অস্পষ্ট স্বরে মনাইম্ বলিল—"আজ আর শুনিব না, যদি—"

শেষ কথা কয়টি সোপানোপরিপ্রহত তরঙ্গ-শব্দে মিশাইয়া গেল। নৌকা দ্রুতবেগে স্রোতের মুখে চলিল।

ধীরে ধীরে রিজিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন একখানি উজ্জ্বল স্বপ্নদৃষ্ট আলেখ্য সরিয়া গেল।

রিজিয়ার পদতলে সোপানবক্ষে তরঙ্গ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছিল। বালিকা শুনিল, দূরে কাহার বাঁশীর তানে বিষাদ-সঙ্গীত উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে, তরঙ্গে তরঙ্গে নৈশসমীরণে কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

২

প্রভাত-সূর্য্যের কনক-কিরণ শ্যাম বৃক্ষ-শীর্ষে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে না উঠিতে পাড়ার কৃষক-সম্প্রদায়ের কয়েক জন নব প্রতিবেশীর গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল।

সঘন আহ্বানে নিদ্রিত ব্যক্তির নিদ্রাভঙ্গ হইল। যুবক বাহিরে আসিল।

তখন বৃক্ষশাখে বসিয়া দোয়েল ঝঙ্কার দিতেছিল, অদূরে প্রভাত-পবন-বিক্ষোভিত বীচিমালিনী যমুনা-হৃদয়ে শ্বেত-পক্ষ ফুলাইয়া তরণী ভাসিয়া যাইতেছিল।

যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা যুবককে নিকটে ডাকিয়া কাণে কাণে কি বলিল। উচ্চ হাস্যে সে বলিয়া উঠিল,—"বাঃ, মজা মন্দ নয়। কে বলিল, আমি সম্রাটের মেষ চুরি করিয়াছি? কে দেখিয়াছে?"

বৃদ্ধ করিম খাঁ বলিল,—"বালক, যাহা বলিলাম, বিশ্বাস করিতে হয় কর। তুমি প্রত্যহ আমাদের মাংস বিলাইতেছ, এ কথা সত্য। সম্রাটের ভেড়া প্রত্যহ চুরি যাইতেছে, এ কথাও সত্য। তোমার এমন সঙ্গতি কি আছে যে, প্রত্যহ মাংস বিলাইতে পার? যাহা হউক, সম্রাটের কাণে এ কথা পৌছিয়াছে। তোমাকে ধরিবার জন্য সিপাহী আসিতেছে। এখনও সময় আছে, পলাইতে পার; কিন্তু আর কিছু পরে সে সুবিধা পাইবে না।"

যুবক তাচ্ছীল্য-দৃষ্টিতে, উপেক্ষার সহিত সে কথায় কাণ না দিয়া নদীর কূলের দিকে চলিল। তৃণ-বিরল সূর্য্য-কিরণ-দীপ্ত সৈকতভূমে সে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িল।

বসিয়া বসিয়া একমনে যুবক তরঙ্গভঙ্গ-চঞ্চল জলে রবিকিরণবিলাস দেখিতে লাগিল। তখন অবশ্যম্ভাবী বিপদ তাহার শিরোপরে নৃত্য করিতেছিল, তাহা সে একবারে বিস্মৃত হইয়াছিল।

হঠাৎ পশ্চাদ্দেশে কোন কঠিন শীতল পদার্থের স্পর্শে তাহার চমক ভাঙ্গিল। চাহিয়া দেখিল, পাঁচ জন সশস্ত্র সিপাহী তাহার গতিরোধ করিয়া নিঃশব্দে দণ্ডায়মান। তাহাদের মধ্যে এক জন বলিল—"যুবক, আমার সহিত আইস।"

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সে বলিল—"কোথায় যাইতে হইবে?"

উত্তর হইল—"দরবারে।"

বিনা বাক্যব্যয়ে যুবক তাহাদের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। রক্ষিগণ সবিস্ময়ে দেখিল, তাহার মুখে ভয়ের লক্ষণমাত্র নাই; বরং মুখমণ্ডলে প্রীতিহাস্য প্রতিভাত হইতেছে।

৩

মণি-মুক্তা-শোভিত, বিবিধ উজ্জ্বল-বেশধারী ওমরাহ-বেষ্টিত আমখাসের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া গম্ভীর স্বরে সম্রাট্ বলিলেন—"বালক! তরুণ বয়সে তোমার এ দুর্ম্মতি হইল কেন?"

অবিচলিত যুবক তেমনই গম্ভীর স্বরে কহিল,—জাঁহাপনা, এ দাসের প্রতি এমন আজ্ঞা করিতেছেন কেন? কোন্ অপরাধে আমায় এখানে আনায়ন করা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না।"

সম্রাটের ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল। পূর্ব্বাপেক্ষা উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—"উদ্ধত যুবক, এবার তোমার বাচালতা মাফ্ করিলাম। কিন্তু কেন তুমি আমার মেষ চুরি করিয়াছ? আর এই দোষের জন্য তোমার কি শাস্তি হইবে, জান?"

সে বজ্রগম্ভীর স্বরে সমগ্র আমখাস কাঁপিয়া উঠিল। অনেকে যুবকের ভবিষ্যৎসম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন।

সাহসে ভর করিয়া যুবক বলিল,—"শাহান শাহ, পৃথিবীর বাদশাহ, ইচ্ছা করিলে আপনি এখনই আমার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন; তজ্জন্য আমি কাতর নহি। কিন্তু দুঃখ এই, সাক্ষাৎ ধর্ম্মতুল্য সম্রাটের বিচার-পদ্ধতি আজ ভিন্ন প্রকার দেখিতেছি।"

যুবকের রমণীজনমনোহর মূর্ত্তি, গুম্ফ-শ্মশ্রুহীন, প্রতিভা-দীপ্ত কমনীয় স্ত্রীজনদুর্লভ মুখমণ্ডল এবং ততোধিক তাহার নির্ভীক ভাব দর্শনে সম্রাট্ অত্যন্ত প্রীত হইলেন। তিনি ধীরগম্ভীর স্বরে বলিলেন,—"ভাল, পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ কর যে, তুমি নির্দ্দোষ। আমরা তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিব, যদি তাহাতে উত্তীর্ণ হইতে পার, পুরস্কৃত হইবে; নচেৎ তোমার পরিণাম প্রাণদণ্ড।"

যুবকের মুখমণ্ডলে কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হইল না। সে বলিল,—"জাঁহাপনার যেরূপ অভিরুচি।"

সম্রাট্ তখন বলিলেন,—"শুন, তোমাকে আমার আরব-দেশীয় শ্বেত অশ্বটি কৌশলে চুরি করিতে হইবে। যদি কল্য বেলা দ্বিপ্রহরের মধ্যে দুই জন সশস্ত্র-রক্ষি-বেষ্টিত অশ্বটি অপহরণ করিতে না পার, তাহা হইলে জানিও, এক ঘটিকার সময় তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।"

যেন কিছু হতাশ হইয়া যুবক বলিল,—"জনাব, এ বড় কঠিন পরীক্ষা, অন্য পরীক্ষা আজ্ঞা করুন।"

বাদশাহ বলিলেন,—"আমার দ্বিতীয় আজ্ঞা নাই।"

৪

দিল্লীর প্রান্তস্থিত বৃহৎ শ্যামতৃণ-মণ্ডিত প্রান্তরের মধ্যে এক তুঙ্গচূড়াসুশোভিত প্রকাণ্ড মস্‌জিদ। এক ব্যক্তি তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া উর্দ্ধস্থ ঘটিকা-যন্ত্রের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া কি ভাবিতেছিল। তাহার হস্তে একগাছি বৃহৎ রজ্জু লৌহ-কীলক-বিশিষ্ট হইয়া মাটীতে লুটাইতেছিল।

যুবক কয়েক মুহূর্ত্ত এইরূপ চাহিয়া চাহিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল। তার পর ধীরে ধীরে মস্‌জিদের সোপানোপরি দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণাগ্র লৌহকীলক দেওয়ালে প্রোথিত করিল। তার পর সাহসে ভর করিয়া ঐ উপায়ে ক্রমে ক্রমে সেই হিমগিরি-চূড়াতুল্য উচ্চ মস্‌জিদ-শিখরে আরোহণ করিল। তখন সবে ১১টা বাজিয়াছিল। সে অতি সন্তর্পণে সেই বৃহৎ ঘটিকা-যন্ত্রের সময়জ্ঞাপক কাঁটা দুইটি স্থানচ্যুত করিয়া একটা বাজাইয়া দিল। ঘটিকা-যন্ত্রোত্থিত শব্দ নির্জ্জন প্রান্তর কম্পিত করিয়া দূরস্থ বনানী-সীমায় মিলাইয়া গেল।

যুবক পূর্ব্ববৎ ক্ষিপ্র-গতিতে নিম্নে অবতরণ করিয়া রজ্জু হস্তে সম্মুখস্থ বনমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই দুই জন সশস্ত্র বলিষ্ঠ সিপাহী এক সুদৃশ্য,হৃষ্টপুষ্ট শ্বেত আরবী অশ্ব সমভিব্যাহারে মস্‌জিদ-প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইল। এক জন ঘড়ির দিকে চাহিয়া বলিল,—"ও চাচা, এ যে একটা বেজে গেছে দেখি।"

এব্রাহিম ঘড়ি দেখিয়া বলিল,—"সত্যই তো রে মিঞাজান, তবে সে চোর বেটা এতক্ষণ ধরা পড়েছে, ব্যাটার ফাঁসী হয়ে গেছে।"

তখন দুই জন খানিক বেদম হাসিল। সম্রাট বলিয়া-ছিলেন, যদি তাহারা নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত ঘোড়াটিকে রক্ষা করিতে পারে, তাহা হইলে তাহারা প্রত্যেকে শত আসরফি পুরস্কার পাইবে।

হস্তগতপ্রায় বিপুল পুরস্কারলাভের আশায় তাহারা উল্লাসে অধীর হইয়া পড়িল এবং নিজ নিজ প্রণয়িনীর ভাবী উল্লাস স্মরণ করিয়া কটিবন্ধস্থ চর্ম্মপেটিকা হইতে বোতল বাহির করিয়া সদ্যঃসুখদায়িনী সুরা দেবীর সেবায় মন দিল। খানিক পরে দুই জনে রঙ্গিন নেশায় টলিতে টলিতে অশ্বসহ সম্মুখস্থ বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইল।

প্রবেশমাত্রেই উভয়ে সবিস্ময়ে দেখিল, এক বৃহৎ বৃক্ষ-শাখে লম্বমান রজ্জুফাঁসে এক মৃতদেহ ঝুলিতেছে। তাহার লোল জিহ্বা, কোটর-বহির্গত চক্ষু! ভয়ে তাহাদের সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল।

এব্রাহিম বলিল,—"এই না সেই চোর বেটা ?"

দ্বিতীয় সিপাহী বলিল,—"হাঁ, ধরা পড়বার ভয়ে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে !"

সে স্থলে দাঁড়াইতে তাহাদের আর সাহস হইল না। যাই উভয়ে বনান্তরালে অদৃশ্য হইল, অমনই আপাত-প্রতীয়-মান মৃত ব্যক্তি কৌশলে গলদেশ হইতে রজ্জুবন্ধন মুক্ত করিয়া নিম্নে নামিয়া পথান্তরে বনমধ্যে চলিয়া গেল।

সিপাহীদ্বয় হাসিতে হাসিতে, টলিতে টলিতে, গল্প করিতে করিতে বনপথে চলিতেছিল। সহসা মিঞাজান দেখিল, আবার সেই! বৃক্ষশাখায় বিকটাকার দোদুল্যমান শব-দেহ ! সে চমকিয়া উঠিয়া জড়িত স্বরে বলিল,—"কি মুস্কিল বাবা ! নেশার ঝোঁকে ফের সেইখানেই এসে পড়-লেম যে রে !"

এব্রাহিম হাসিয়া বলিল,—"তুই বেটা দিন-কাণা। সে দেখেছি বটগাছে, এটা যে বকুলগাছ রে, বেটা।"

মিঞাজান রাগিয়া বলিল,—"আরে দূর, তুই তো দেখছি ভারি সমজদার! একটা লোক দু'জায়গায় ম'রে ঝুলছে নাকি !"

তখন এব্রাহিম কি একটা কটু বলিল। প্রতিবাদে মিঞাজান তাহাকে আরও দুইটা মিঠা বাৎ শুনাইয়া দিল। আর যায় কোথা! সুরামত্ত দুই বীরের অতি বিচিত্র ভাষায় বক্তৃতার তরঙ্গ ছুটিতে লাগিল। উভয়েই উভয়ের ভ্রম সপ্রমাণার্থ চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই কম নহে। নিজ ভ্রম স্বীকার করিয়া অপরের নিকট ন্যূনতা স্বীকার করা, অন্য সময়ে সম্ভব হইলেও, এ সময়ে কেহ তাহাতে সম্মত হইতে চাহিল না।

অবশেষে বক্তৃতার চোটে মদের নেশাটা কিছু তরল হইয়া আসিলে, সাব্যস্ত হইল, ঘোড়াটিকে সেইখানে বাঁধিয়া রাখিয়া (পাছে আবার স্থান ভুল হয়!) দ্রুতগতিতে পূর্ব্বস্থলে গিয়া দেখিয়া আসিবে, তাহাদের পথ ভুল হইয়াছে, —কিম্বা চোর এক না দুই।

নিকটস্থ বৃক্ষকাণ্ডে ঘোটক বন্ধন করিয়া উভয়ে তর্কের মীমাংসার্থ চলিয়া গেল।

এ দিকে চোর অমনই বৃক্ষ হইতে নামিয়া, তাহাদের বুদ্ধি-মত্তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া, হাসিতে হাসিতে ঘোটকা-রোহণে দ্রুত প্রস্থান করিল।

কয়েক দণ্ড পরে বুদ্ধির মূর্ত্তিমান বৃহস্পতিদ্বয় ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সর্ব্বনাশ!—কোথায় বা ঘোড়া আর কোথায় বা মৃত চোর! তাহাদের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। কালনেমির লঙ্কাভাগের মত তাহাদের দৃষ্টিতে হস্তগতপ্রায় পুরস্কারের সুখস্বপ্ন হঠাৎ ছায়াবাজীর মত শূন্যে মিলাইয়া গেল।

* * * * *

সংবাদ যথাসময়ে সম্রাটের কাণে পৌঁছিল। বিস্মিত বাদশাহ যুবককে ডাকাইয়া বলিলেন—"অতি উত্তম! কিন্তু আরও একটি পরীক্ষা তোমায় দিতে হইতেছে। এইবার বুঝিব, তোমার বুদ্ধির দৌড় কতদূর। আজ হইতে সপ্তাহমধ্যে আমার প্রধানা বেগমের শয়ন-কক্ষের শয্যাস্তরণ অপহরণ করিতে হইবে! কিন্তু এমন সময়ে চুরি করিতে হইবে, যখন বেগমের সহিত আমি কক্ষে অবস্থান করিব। উত্তীর্ণ হও, পুরস্কার মিলিবে, নহিলে প্রাণদণ্ড।"

যুবকের মুখকান্তি গম্ভীর হইল। অতি ধীরে ধীরে বলিল—"জাঁহাপনা, এও কি সম্ভব ?"

সম্রাট বলিলেন,—"সে বিচার সপ্তাহ পরে হইবে।"

৫

সন্ধ্যার সময় উজ্জ্বল আলোকমালাময়ী রং-মহালের প্রথম তোরণে আনন্দোচ্ছ্বাস তরঙ্গে তরঙ্গে উছলিয়া উঠিতেছিল। গোলাপ-আতরের স্নিগ্ধ সৌরভ, বংশীরব-মিশ্রিত উচ্চ হাসির সহিত শৈত্য, সান্ধ্য অনিলে ভাসিয়া বেড়াইতেছিল, সোহাগে মাতামাতি করিতেছিল। প্রধান দ্বাররক্ষকের অপরিসর ক্ষুদ্র কক্ষের অনাবৃত ভূমিতলে এক ষোড়শী তাতার-রমণী নৃত্যের সহিত গান করিতেছিল। তাহার সুগঠিত পূর্ণতায়তন সুন্দর দেহের দোলনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৌন্দর্য্যের শত তরঙ্গ উঠিতেছিল, লাবণ্য ভাসিয়া বেড়াইতেছিল। তাহার সূক্ষ্ম ওড়নাবৃত নয়নদ্বয় কচিৎ প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল, আর উপস্থিত দর্শক-বৃন্দ সেই কজ্জলরেখাঙ্কিত উজ্জ্বল নয়নযুগলে আবেশ-বিহ্বলতার স্বপ্ন-ছবি দেখিয়া করতালি-শব্দে আনন্দোচ্ছ্বাস আরও বর্দ্ধিত করিতেছিল। যুবতী আবার যখন নাচিয়া নাচিয়া গাহিতেছিল—

"আঁখি কি কাজোরা সহি, বোল তু বোলো!"

তখন অনেকে ভাবিতেছিল, ইহার চরণে পড়িয়া মরিলে স্বর্গের কতটা সুখ বাকি রহিল!

যুবতী যখন দেখিল যে, তাহার নৃত্য-গীতের এক প্রকার অশরীরী মাদকতা সমবেত দর্শক-মণ্ডলীর উপর ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তখন সে নৃত্যগীত বন্ধ করিয়া দাঁড়াইল। দ্বাররক্ষক আমোদে গলিয়া টলিয়া টলিয়া বলিল—"তোফা! তোফা!—বহুৎ তারিফ বিবিজান্, মেরা দিল্ তর্ হো গিয়া। হাম্ এইসা তয়ফাওয়ালী কভি নেহি দেখা হ্যায়! লেও।" এই বলিয়া সে এক টুকরা রজতখণ্ড বক্‌সিসস্বরূপ তাহার সম্মুখে নিক্ষেপ করিল।

রমণী তাহা স্পর্শ না করিয়াই মৃদুস্বরে বলিল—"খাঁ সাহেব, ওটা রেখে দাও। আমি ত আর সত্যি সত্যি নাচওয়ালী নই যে, তোমার কাছ থেকে বক্‌সিস লইব। তোমরা গান শুন্‌তে চাইলে, তাই গাইলাম; তা ব'লে ভেবো না, এটা আমার ব্যবসা। লোকের কাছে বাঁদী-গিরি ক'রে আমরা খাই; তাই যদি একটা যোগাড় ক'রে দাও তো, খাঁ সাহেব, আমার বড় উপকার করা হয়।"

এই বলিয়া এক মর্ম্মভেদী কটাক্ষের সহিত যুবতী তাহার প্রতি চাহিল। ইতিপূর্ব্বে খাঁ সাহেব তাহার নাচ-গানে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিল, এখন তাহার ব্যবহারে আরও প্রীত হইল। বলিল, "বিবিজান, তা তুমি যদি খাজাঞ্চীখানার খোদ বেগমের সঙ্গে দেখা করিতে পার, তা হ'লে বুঝি কিছু হ'তে পারে।"

খাজাঞ্চীখানার বেগম সম্রাটের প্রিয় ক্রীতদাসী। বাঁদী নিযুক্ত করা, পানাহার প্রভৃতির তত্ত্বাবধারণ ও রংমহালের অন্যান্য সকল কর্ম্মের ভার ইঁহার উপর ছিল।

তাতার যুবতী বলিল—"খাঁ সাহেব, তা তুমি যদি অনুগ্রহ ক'রে একবার দেখা করাইয়া দাও।"

রক্ষকবর তখন নিকটস্থ এক জন খোজার কাণে কাণে কি বলিয়া দিল। সে সেলাম করিয়া যুবতীকে অনুবর্ত্তিনী হইবার ইঙ্গিত করিয়া খাজাঞ্চী বেগমের মহলে প্রবেশ করিল।

বাঁদী-বেগম সকল শুনিয়া বেশ করিয়া রমণীকে একবার দেখিয়া লইলেন। তাহার অল্পবয়স, সুন্দর মুখশ্রী, রংমহালে বাঁদী হইবার পথ সুগম করিয়া দিল। সাধারণ রমণী অপেক্ষা কিছু দীর্ঘাকার হওয়াতেও তাহার সৌন্দর্য্য-হানি না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

বেগম বলিলেন—"বাঁদী, তুই ফাইফরমাস খাটিতে পারিবি?"

সম্মতিসূচক ইঙ্গিতে রমণী তাহার সাগ্রহ অভিলাষ ব্যক্ত করিল।

বেগম বলিলেন—"তবে অদ্য হইতে তুই প্রধানা বেগমের কার্য্যে নিযুক্ত হইলি।"

৬

পরদিন অনেক অনুসন্ধানের পর নূতন বাঁদী জানিতে পারিল, অদ্য রাত্রিতে সম্রাট প্রধানা বেগমের কুঞ্জে পদার্পণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিবেন। দাসীদিগের বলয়-হস্ত-তাড়িত, শিখিপুচ্ছ-কোমল, সঘন সম্মার্জ্জনী-প্রহারে গৃহ-শয্যা পরিষ্কৃত হইয়া বাদশাহের অভ্যর্থনার জন্য বিচিত্র বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল। রসনা-তৃপ্তিকর অন্যজন-দুর্লভ সুপক্ক বাদশাহী ভোগের সুগন্ধ পবনে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

বাঁদী দেখিল, এখনই উপযুক্ত অবসর। কোন দ্রব্য কিনিবার অছিলায় সে রঙমহাল হইতে বাহির হইল। কিছু কাল পরে যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন কোন সূক্ষ্মদর্শী যদি তাহাকে লক্ষ্য করিত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, বাঁদী কোন গুরু দ্রব্য বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া রাখিয়াছে। কক্ষ-মধ্যে প্রবেশ করিয়া যুবতী অন্যের অলক্ষ্যে কোন গুপ্তস্থলে আনীত পদার্থটি রাখিয়া দিল। তার পর দূর হইতে সেই মহোৎসবের আয়োজন দেখিতে লাগিল। নিতান্ত আবশ্যক ব্যতীত সে কাহারও সহিত মিশিত না, বড় একটা কথাও কহিত না। তাহার প্রতি কেহ লক্ষ্যও করে নাই; কাহারও মনে তাহার সম্বন্ধে কোন সন্দেহের ছায়াপাতও হয় নাই। সেই বিপুল রাজপ্রাসাদে কে কাহার তত্ত্ব লয়!

সন্ধ্যার আলোক জ্বলিয়া উঠিলে, বাঁদী পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যটি সযত্নে বস্ত্রমধ্যে লুকাইয়া রাখিল। তার পর সাঁচ্চাদার রঙ্গীন বসনের নিশান উড়াইয়া বেগম সাহেবের আশে-পাশে ঘুরিতে লাগিল।

বাদশাহের ভাবী আগমন কল্পনায় বেগমের প্রাণের আনন্দ উছলিয়া পড়িতেছিল। ভাবিতে ভাবিতে সেই কৃষ্ণকুঞ্চিত অপূর্ব্ব কবরী-গ্রথিত মস্তিষ্ক গরম হইয়া উঠিল। নূতন বাঁদীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আতরদান্, গোলাপ-পাশ।"

অর্থ বুঝিয়া বাঁদী, বেগমের কক্ষে প্রবেশ করিল।

স্ফাটিকাধারের উজ্জ্বল আলোকরশ্মি সুদৃশ্য রমণীয় কিংখাব আস্তরণাচ্ছাদিত শয্যার উপর পড়িয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্য বিকাশ করিতেছিল। ক্ষিপ্রহস্তে যুবতী শয্যাস্তরণ সরাইয়া দ্রুত সঞ্চালিত তীক্ষ্ণাগ্র ছুরিকা দ্বারা সুকোমল গদির শ্বেতদেহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। কিয়দংশ পালক সরাইয়া বস্ত্রাচ্ছাদিত সযত্ন-রক্ষিত প্রসূতি সমেত নবপ্রসূত মার্জ্জার-শাবকগুলি তন্মধ্যে স্থাপন করিয়া যুবতী শয্যাস্তরণ পূর্ব্ববৎ বিস্তৃত করিয়া দিল। বাহিরে তুষারশীতল সমীরণ থাকিয়া থাকিয়া রুদ্ধ বাতায়নে আসিয়া ফিরিতেছিল। মার্জ্জার-দল দিব্য আরামে সুখসেব্য রাজপর্য্যঙ্কে নিঃশব্দে শুইয়া রহিল।

কয়েক মুহূর্ত্তে এই সকল কার্য্য শেষ হইল, কেহ ইহা লক্ষ্য করিল না। বাঁদী গোলাপপাশ লইয়া ফিরিয়া গেল।

আমোদে আহ্লাদে, পানে আহারে রজনী যখন গভীর হইয়া আসিল, তখন সম্রাটের মনে পড়িল, এখন বিশ্রাম করিতে হইবে। বিশ্রামার্থ উভয়ে শয়নমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বেগম গুরু ভোজনে কিছু কাতর ছিলেন। প্রবেশমাত্রেই অবসাদক্লান্ত কোমল দেহ শয্যাতলে ঢালিয়া দিলেন। কিন্তু শয্যামধ্যস্থ লুক্কায়িত প্রাণিগুলি সে কোমলতার মর্ম্ম বুঝিল না, সে কুসুমভারে ব্যথিত হইয়া মার্জ্জার-শিশুগুলি অস্ফুট কাতরোক্তি করিয়া উঠিল। সন্তান-বাৎসল্যে জননী সগর্জ্জনে ক্রুদ্ধা বাঘিনীর মত গা-ঝাড়া দিয়া উঠিল। সেই অভূতপূর্ব্ব আকস্মিক ঘটনায় বেগম-সাহেব ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ব্যাপার না বুঝিয়াই সম্রাটও সভয়ে হাঁকিলেন—"কোন্ হায়! জলদি আও।"

উন্মুক্ত অস্ত্রধারিণী দ্বার-রক্ষিণী কক্ষদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল। বাদশাহ উজ্জ্বল আলোকে যখন প্রকৃত ব্যাপার দেখিলেন, তখন লজ্জিত হইয়া গৃহপ্রবেশপরায়ণা রক্ষিণীকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিলেন।

তার পর সম্রাট ও বেগমের মধ্যে একটা বড় হাসির ঘটা পড়িয়া গেল। লহরে লহরে মধুর হাস্য গৃহ কম্পিত করিয়া তুলিল। যখন হাস্যবেগটা কিছু মন্দীভূত হইয়া আসিল, তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া বাদশাহ প্রসূতি সমেত মার্জ্জার-শিশুগুলিকে সেই বহুমূল্য শয্যাস্তরণে বাঁধিলেন। তার পর বাতায়ন উন্মুক্ত করিয়া তীক্ষ্ণ শৈত্যবায়ু-পীড়িত পৃথিবীর মুক্তক্রোড়ে শয্যাস্তরণ সমেত হতভাগ্য জীবদিগকে নিক্ষেপ করিলেন। সম্রাট মনে করিয়াছিলেন, তাহাদের দুরাকাঙ্ক্ষা, অবিমৃষ্যকারিতার উপযুক্ত শাস্তি এই।

নিম্নে কাহার আগ্রহ-কম্পিত হস্ত বাতায়নতলে প্রসারিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। পতনমাত্র সে তাহা সযত্নে বসনান্তরালে লুকাইয়া রাখিল।

৭

প্রতিহারী আসিয়া সংবাদ দিল—"জাঁহাপনা, পূর্ব্বপরিচিত সেই যুবক চোর দরবারে প্রবেশ করিয়া সম্রাটকে কি বলিতে চাহে।"

সম্রাটের স্বপ্ন ভাঙ্গিল। তিনি বলিলেন—"উজীর, কাল না সেই অদ্ভুত চোরের পরীক্ষাদিবস উত্তীর্ণ হইয়াছে?"

উজীর সম্মতিসূচক মস্তক হেলাইয়া বলিলেন—"আজ্ঞা হাঁ, জাঁহাপনা!"

"নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারিয়া ধরা দিতে আসিয়াছে!"

সম্রাট যুবককে দরবারে প্রবেশ করিতে আজ্ঞা দিলেন।

অবিলম্বে যুবক ধীরে ধীরে, গর্ব্বিতপদে সভামধ্যে প্রবেশ করিল। সহস্র উৎসুক দৃষ্টি তাহার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল। অভিবাদনানন্তর যুবক একটু মৃদু হাসিয়া বলিল—"জাহাঁপনা, আপনার প্রশ্নের উত্তর আনিয়াছি, দেখুন দেখি, ইহাই আপনার শয্যাস্তরণ কি না?"

সম্রাটের আজ্ঞানুসারে উজীর কথিত দ্রব্যের আবরণ উন্মুক্ত করিলেন। সহস্র দৃষ্টির সম্মুখে সেই বহুমূল্য আস্তরণ ঝলসিয়া উঠিল। সম্রাট্ স্পন্দিতহৃদয়ে দেখিলেন, মার্জ্জারভয়-ভীত হইয়া যাহা তিনি গত রাত্রিতে সুদীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত, সুরক্ষিত অন্তঃপুরোদ্যানে ফেলিয়া দিয়াছিলেন, ইহা সেই শয্যাচ্ছাদন! তখন সম্রাটের নিজ নির্ব্বুদ্ধিতার বিষয় স্মরণ হইল।

কিছু কাল নীরবে থাকিয়া সম্রাট বলিলেন—"ভাল, দ্বিতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছ। কিন্তু আরও একটা পরীক্ষা দিতে হইবে।"

সম্রাটের মনে একটা কঠিন প্রশ্নের কল্পনা উদিত হইতেছিল।

গম্ভীর স্বরে আবার বলিলেন—"যদি আজ হইতে এক পক্ষমধ্যে আমার ইহুদি বেগমকে রংমহাল হইতে সকলের চোখে ধূলি দিয়া অপহরণ করিতে পার, তবেই বুঝিব, তুমি চতুর বটে! পার ভাল, আশাতীত পুরস্কারের সহিত অব্যাহতি পাইবে; আর না পারিলে প্রাণদণ্ড।"

যুবকের স্বভাবসিদ্ধ প্রফুল্ল মুখকান্তি পাণ্ডু হইয়া গেল। এ নিদারুণ পরীক্ষায় সে কিরূপে উত্তীর্ণ হইবে? ইহুদি বেগমকে সে জানিত। সম্রাট সুদূর সমুদ্রপার হইতে বহু অর্থ-বিনিময়ে তাহাকে আনাইয়াছিলেন। এককালে সে সম্রাটের প্রিয়তমা প্রণয়িনী ছিল। সুরক্ষিত, সূর্য্য-চন্দ্র-প্রবেশ-রহিত, রংমহালের অভ্যন্তর হইতে প্রৌঢ়াপ্রায় রমণীকে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়া কি মানবসাধ্যের অতীত নহে?

নীরব অভিবাদনে যুবক বিদায় লইল।

৮

সম্রাটের বিশাল অন্তঃপুরে নওরোজার মহোৎসবে পুরবাসিনী সকলেই মাতিয়াছে। দিল্লীর সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডার আজ রংমহালে রূপের দোকান খুলিয়া দিয়াছে। যাবতীয় আমীর ওমরাহের অন্তঃপুর-মহিলা সকলেই আজ রংমহালে সমবেত। রমণী ক্রেতা, রমণী বিক্রেতা, রমণী দর্শক। চারিদিকে, প্রফুল্ল সজীব শতদল সম রূপসীবৃন্দ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কলহাস্যে, নূপুরনিক্কণে, অলঙ্কারের মধুর শব্দে এক অপূর্ব্ব সঙ্গীত সৃষ্টি করিতেছে। তাহাদের ভ্রমর-কৃষ্ণ উজ্জ্বল নয়নের বিলাস-চঞ্চল মদির কটাক্ষে, কত স্বপ্ন-জগতের যবনিকা মুহূর্ত্তে উদ্‌ঘাটিত হইতেছিল, সরস মধুর বচনে কত গীতিকাব্যের সৃষ্টি হইতেছিল; আর সে ধীর ললিত চরণ-বিন্যাসে সৌন্দর্য্যের শত লীলা-তরঙ্গ উঠিতেছিল।

যৌবনের ভরা 'ভাটায়' প্রৌঢ় বয়সে ইহুদি বেগমের যুবতী সাজিবার সাধ অন্তর্হিত হয় নাই। প্রবীণতা বয়সে নহে, মনে। তাই আজ এ বসন্তোৎসবে বসন্তের রাণী সাজিয়া একবার পূর্ব্ব-স্মৃতিটিকে মূর্ত্তিমতী করিয়া তুলিবেন বলিয়া, তিনি লুপ্ত-যৌবনের সুপ্ত সৌন্দর্য্য বিচিত্র রমণীয় বসন-ভূষণে জাগাইয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেছিলেন। বহুকাল-বিস্মৃত অনভ্যস্ত প্রায় গুপ্ত কটাক্ষের কয়েকটি মর্ম্ম-ভেদী শর মাজিয়া ঘষিয়া নয়নের প্রান্তদেশে সাজাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এইরূপে সম্রাটের পূর্ব্ব-প্রণয় স্মরণ করিয়া বিগত-যৌবনের বৃত্তিগুলি সজাগ করিয়া হেলিয়া দুলিয়া অপূর্ব্ব রঙ্গে বেগম দোকানে দোকানে ফিরিতেছিলেন। তাঁহার এ অপূর্ব্ব বেশ, বয়সের সহিত অসামঞ্জস্য দেখিয়া বিক্রেতা সুন্দরীগণ উচ্ছ্বসিত হাস্যবেগ বসনপ্রান্তে বৃথা সংযত করিবার চেষ্টা পাইতেছিল। বেগমের চোখে কিন্তু তাহা পড়িতেছিল না।

বেগম এইরূপে মনের উল্লাসে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছেন, এমন সময় সহসা কেহ পশ্চাদ্দিক্ হইতে তাঁহার বসন টানিয়া ধরিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, সামান্য বেশে এক অল্পবয়স্কা যুবতী। কিছু বিস্মিতের মত বেগম বলিলেন—"তুমি কি চাও গা?"

ওষ্ঠে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া সে অন্যের অশ্রাব্য স্বরে কহিল—"একটু অন্তরালে আসুন, কোন বিশেষ কথা আছে।"

কৌতূহলী বেগম তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনতিদূরস্থ এক নির্জ্জন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলন। স্ত্রীলোকটি দ্বার রোধ করিয়া দিল। বেগম তাহার ব্যবহারে কিছু বিস্মিত হইলেন।

রমণী ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"ভয় পাইবেন না। আপনারই কোন উপকারের জন্য আপনাকে এখানে আনিয়াছি।"

বেগম বলিলেন—"শীঘ্র বল, কি দরকার?"

কয়েক মুহূর্ত্ত কি ভাবিয়া স্ত্রীলোকটি বলিল—"বেগম সাহেব! এক ব্যক্তি আপনাকে চুরি করিবে শুনিয়াছিলেন কি?"

বেগম বলিলেন—"এই কথার জন্য তুমি আসিয়াছ? হাঁ, তা শুনিয়াছি, আর সে হতভাগ্য তো নিজে কল্য ধরা দিয়াছে। আগামী কল্য তাহার ফাঁসী হইবে। কিন্তু তা কেন?"

রমণী গম্ভীরভাবে বলিল—"সেই চোরের একান্ত ইচ্ছা, মৃত্যুর পূর্ব্বে সে আপনার সহিত দেখা করিয়া গুটি কয়েক কথা আপনাকে বলিয়া যায়। সে কয়েকটি ঔষধ ও মন্ত্র জানে, আপনাকে তাহা বলিয়া যাইতে তাহার একান্ত অভিলাষ।"

বেগম অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"কেন, আমাকে সে ঔষধ দিবে কেন? এ পৃথিবীতে কি আর কোন লোক নাই?"

"আজ্ঞা হাঁ, বেগম সাহেব, তা আছে, কিন্তু সে বলে,

যাঁহার জন্য তাহার প্রাণদণ্ড হইতেছে, তাঁহাকেই একটি অমূল্য বিদ্যা দিয়া যাইবে। আর আপনি ভিন্ন এ রঙ্গমহালে সে বিদ্যা পাইবার উপযুক্ত লোক নাই। তা, আপনি কি সে হতভাগ্যের প্রতি এ কৃপা করিবেন না, তাহার অন্তিম প্রার্থনা রাখিবেন না?"

এই বলিয়া রমণী অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে বেগমের পানে চাহিল।

কিছু অন্যমনা হইয়া বেগম বলিলেন—"সে কি কি বিদ্যা জানে?"

একটু আশ্বস্ত হইয়া রমণী বলিল,—

"প্রথম বিদ্যা দ্বারা প্রভূত ধনের অধিকারী হওয়া যায়।"

তাচ্ছীল্য-দৃষ্টির সহিত বেগম বলিলেন—

"দিল্লীর সম্রাট অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যশালী কে?"

"দ্বিতীয় বিদ্যা জানিলে বৃহস্পতি তুল্য বুদ্ধিমান্ হয়।"

হাসিয়া বেগম বলিলেন—"বুদ্ধি দ্বারা কেহ কখনও সুখী হয় না, আমার তাহাতে আবশ্যক নাই।"

ভ্রূক্ষেপ না করিয়া রমণী আবার বলিল—"তৃতীয় বিদ্যা জানিলে চির-যৌবন লাভ করা যায়।"

এই বলিয়া বিজয়দর্পে সে একবার বেগমের প্রতি গুপ্ত কটাক্ষ করিল।

বেগম বলিলেন—"হাঁ, এ বিদ্যাটা অমূল্য বটে!" তাঁহার প্রাণের মধ্যে যুবতী সাজিবার সাধ প্রবল হইয়া উঠিল। চোরের ক্ষমতার উপর তাঁহার বিশেষ বিশ্বাস হইয়াছিল।

মনোভাব বুঝিয়া আগন্তুক রমণী বলিল—"বেগম সাহেব, অনুমতি করিলে এ বাঁদী আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইবার উপায় করিতে পারে।"

বেগমের মনে তখন কেবল সম্রাটের ক্রোধোদ্দীপ্তির কথা মনে আসিতেছিল। তিনি বলিলেন,—"সম্রাট যদি জানিতে পারেন, তাহা হইলে কি হইবে? আর সে ব্যক্তি যে পর-পুরুষ?"

সে বলিল—"আমি এমনভাবে আপনাকে বাহিরে লইয়া যাইব যে, কেহ আপনাকে চিনিতে পারিবে না। আবার দুই চারি দণ্ড পরে গোপনে আপনাকে রাখিয়া যাইব। আর সে ব্যক্তি পর-পুরুষ হইলেও আপনার পুত্রস্বরূপ, আপনি তাহার মাতৃস্থানীয়া, এ কথা সে বলিয়া দিয়াছে।"

যে একটু বাধা ছিল, রমণীর কথায় তাহা দূর হইল। বেগম বলিলেন,—"তাহার জন্য যে তুমি এত করিতেছ, সে তোমার কে?"

একটু হাসিয়া রমণী বলিলেন—"পরে সকল শুনিতে পাইবেন, এখন এই মাত্র জানিয়া রাখুন, সে আমার অতি আপনার।"

কয়েক মুহূর্ত্তে রমণীর দ্রুত অভ্যস্ত-হস্ত-সঞ্চালিত ছদ্ম-বেশে বেগম বাঁদীরূপে পরিবর্ত্তিত হইলেন। কেহ তাঁহাকে হঠাৎ চিনিতে পারিবে, এমন উপায় রহিল না। তখন উভয়ে গোপনে রঙ্গমহাল হইতে বহির্গত হইলেন।

৯

রক্ষী আসিয়া সভয়ে সংবাদ দিল, যে গৃহে চোরকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল, তথায় সে নাই। বাতায়নের লৌহদণ্ড কয়েকটি খণ্ড খণ্ড অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে।

ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া, সিংহাসননিম্নে পদাঘাত করিয়া, জলদগম্ভীরস্বরে সম্রাট বলিলেন, "এখনই তাহাকে সন্ধান করিয়া বাহির কর; আর আমি শুনিতে চাই, কি নিমিত্ত তাহাকে কারাগারে আবদ্ধ করা হয় নাই? আমি সকলের গর্দ্দান লইব।"

সকলে প্রমাদ গণিল। চোরের সন্ধানে তখনই সিপাহী ছুটিল।

এমন সময় কাঁপিতে কাঁপিতে অন্তঃপুররক্ষক খোজা আসিয়া কহিল—"জাঁহাপনা, ইহুদি বেগম সাহেবকে পাওয়া যাইতেছে না।"

সংবাদ শুনিয়া সম্রাটের চমক ভাঙ্গিল; গুপ্ত পলায়নের রহস্য সহসা তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। বিস্ময়ে লজ্জায় সম্রাটের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সভাস্থ ওমরাহবৃন্দও মন্ত্রমুগ্ধবৎ বসিয়া রহিলেন। উজীর ভাবিলেন, এ বালক তো সামান্য নহে।

সহসা দরবারের দ্বারে একটা গোল উঠিল। দর্শকসমূহ ঈষচ্চঞ্চল হইয়া উঠিল। নকিব ফুকরাইল—"পূর্ব্বোক্ত চোর শিবিকা সহ দ্বারে দণ্ডায়মান।"

সম্রাট বিচলিত স্বরে কহিলেন—"শিবিকা অন্দরে লও, যুবককে এখানে প্রেরণ কর।"

রহস্যময় যুবক ধীরে ধীরে সম্রাটের সিংহাসনসমীপে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুন্দর মুখশ্রী সফলতার উজ্জ্বল বিভায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সম্রাট বলিলেন—"অদ্ভুত বালক, তোমার ন্যায় বুদ্ধিমান্ কৌশলী ব্যক্তি আমার দিল্লী দরবারে নাই। আজ যে প্রতিভা-বলে, বুদ্ধি-কৌশলে তুমি সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাটকে পরাজিত করিলে, সে বুদ্ধিকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।"

যুবক নীরবে মস্তক নত করিয়া রহিল। তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল নয়নে সন্তোষ-চিহ্ন বিকশিত হইয়া উঠিল।

সম্রাট আবার মধুরস্বরে বলিলেন—

"তোমার প্রাণদণ্ড হইতে ত অব্যাহতি দিলামই; বরং এখন তুমি কি পুরস্কার পাইতে ইচ্ছা কর, বল।"

ধীরে ধীরে মস্তক উন্নত করিয়া যুবক বলিল—"জাঁহাপনা, এ দাস আপনার কৃপা ব্যতীত অন্য কিছুই প্রার্থনা করে না।"

বিস্মিত বাদশাহ বলিলেন—"বালক, এই বিশাল ধন-গৌরবিণী দিল্লীনগরীর মধ্যে এমন কোন জিনিস নাই কি, যাহা লইতে তোমার ইচ্ছা হয়? তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

"শাহানশাহ, এ দাস অর্থ-বিভবের কাঙ্গাল নহে।"

বাদশাহ চমৎকৃত হইলেন। সভাস্থ সকলে ঔৎসুক্যপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। সকলেই যেন সাগ্রহে কোন রহস্যদৃশ্যের অবতারণার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সম্রাট বলিলেন—"যুবক, এত দিন তোমার নাম প্রকাশ কর নাই, আজ কি বলিতে বাধা আছে?"

"এখন বলিতে বাধা নাই। এ দাসের নাম মনাইম্ খাঁ।"

সভাস্থ অনেকেই একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন।

কেহ কেহ সমস্বরে বলিলেন—"মনাইম্ খাঁ! কোন্ মনাইম্?"

যুবক একটু হাসিয়া বলিল—"দিল্লীর বাদশাহ, পৃথিবীর সম্রাট, আমার অপরাধ লইবেন না, এ অধম পরলোকগত স্বর্গীয় ওমরাহ আপনার বিশ্বস্ত পারিষদ আহম্মদ খাঁর পুত্র।"

সম্রাট চমকিয়া উঠিলেন। সভাস্থ অনেকে আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, মৃত আহম্মদ খাঁকে কে না চিনিত!

সম্রাট প্রীতিনম্রস্বরে কহিলেন—"মনাইম্, কোন্ দুঃখে তুমি এমন দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে?"

লজ্জায় মনাইমের গোলাপী গণ্ডে রক্তজবা ফুটিয়া উঠিল। অস্পষ্ট স্বরে কহিল—"জাঁহাপনা, এত লোকের সম্মুখে—"

অসমাপ্ত উত্তরের প্রত্যুত্তরে সম্রাট ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "আমার আরও নিকট আইস। ইহার মধ্যে কোন গুপ্ত রহস্য আছে।"

মনাইম্ সম্রাটের আজ্ঞামত ধীরে ধীরে লজ্জানম্রস্বরে সকল বর্ণনা করিল। শুনিয়া সম্রাট বলিলেন—"নির্ব্বোধ! ইহার জন্য তোমার এরূপ বিপদে ঝাঁপ দেওয়া যুক্তিসঙ্গত হয় নাই, পূর্ব্বে আমায় জানাইলে সকল সুবিধা হইত। যাহা হউক, এখন তোমার মনোবাসনা সফল হইল। নির্ব্বিঘ্নে গৃহে ফিরিয়া যাও।"

তার পর উজীরকে ডাকিয়া অন্যের অশ্রাব্য স্বরে কি বলিলেন, শুনিয়া বিস্ময়ানন্দে মন্ত্রিবর একবার মনাইমের দিকে চাহিলেন, তার পর মস্তক নত করিয়া বলিলেন—"জনাবের যেরূপ অভিরুচি।"

মনে মনে ভাবিলেন, আমার রিজিয়ার অদৃষ্টে কি খোদা এমন বর মিলাইবেন!

১০

ফুল্লজ্যোৎস্নাময়ী রজনী। উজ্জ্বল চন্দ্রালোকে হিমকণা সহস্র প্রদীপ্ত হীরকখণ্ডবৎ নবকিশলয়ের উপর জ্বলিতেছে। মৃদু নব-বসন্তসমীরণে ধীরে ধীরে নাচিতেছে। রিজিয়া সেই বাসন্তী চন্দ্রমাদীপ্ত আকাশতলে, বিশাল কুসুম-কাননে প্রস্তরাসনে বসিয়া করলগ্ন-কপোলে কি চিন্তা করিতেছিল। তাহার ফুল্ল শতদল-গণ্ডে বিষাদের কৃষ্ণরেখা অঙ্কিত হইয়াছিল। সুদীর্ঘ নয়নে চিন্তার অবসাদছায়া ভাসিতেছিল।

আজ দুই মাস মনাইম্ চলিয়া গিয়াছে। আর রিজিয়া অনন্যকর্ম্মা হইয়া কেবল তাহারই চিন্তায় এই দীর্ঘ দুই মাস কাটাইয়াছে। হায়! সে কি কুক্ষণেই পিতার প্রতিজ্ঞার কথা মনাইম্‌কে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল! তাহা না হইলে সে ত আজ দিনান্তে, না হউক, সপ্তাহে একবার করিয়াও সে প্রিয়মূর্ত্তি দেখিতে পাইত!

বালিকার নয়নপল্লবে নিরুদ্ধ অশ্রুবিন্দু ফুটিয়া উঠিল। হয় ত এই মুহূর্ত্তেই মনাইম্ কোন বিষম বিপদ-সাগরে সন্তরণ করিতেছে, হয় ত তাহার জীবন-রঙ্গভূমির উপর কোনও নিষ্ঠুর হৃদয়হীন অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে বালিকা শিহরিয়া চক্ষু নিমীলিত করিল।

সহসা কেহ অঙ্গুলি দ্বারা তাহার মস্তক স্পর্শ করিল। স্পন্দিত-হৃদয়ে, সভয়ে বালিকা পশ্চাৎ ফিরিয়া চাহিল। এ কি?—সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে, না—বাস্তবের প্রতিকৃতি সত্য সত্যই তাহার নয়নসমক্ষে প্রতিভাসিত!

রিজিয়া সেই শ্বেতচন্দ্রালোকে সবিস্ময়ে দেখিল, সেই পুষ্প-সৌরভ-বাসিত কুঞ্জবীথিকায় দাঁড়াইয়া তাহার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—মনাইম্।

সহসা চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে তাহার ভরসা হইল না। নির্নিমেষ-নয়নে উভয়ে উভয়কে দেখিতে লাগিল। যখন রিজিয়া বুঝিল, মনাইম্, স্বপ্ন নহে, তখন কি এক অব্যক্ত আনন্দস্রোত তাহার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ওতপ্রোত করিতে লাগিল। সে আনন্দবেগ সংযত করিবার জন্য বালিকা কমলকোমল করযুগল বক্ষের উপর চাপিয়া ধরিল।

"রিজিয়া, রিজিয়া! আর তোমাকে কেহ আমার নিকট হইতে কাড়িয়া লইতে পারিবে না। আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া আজ তোমার পিতার নিকট হইতে তোমায় প্রার্থনা করিবার জন্য আসিয়াছি।"

মনাইমের সুমধুর আশ্বাসবাক্যে বালিকার উদ্বেল হৃদয় আরও উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সে আবেগ দমন করিতে না পারিয়া রিজিয়া মনাইমের প্রশান্ত বিশাল বক্ষে মুখ লুকাইল। সমগ্র প্রকৃতি তখন তাহার কাছে সঙ্গীত-ময়ী হইয়া উঠিল। স্বপ্নরাজ্য যেন স্বর্গের সুখচিত্র খুলিয়া তাহার দৃষ্টির সম্মুখে ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তার পর সেই নীলাম্বরতলে, কৌমুদীস্নাত কুঞ্জকুটীরে মর্ম্মরাসনে বসিয়া মনাইম্ রিজিয়ার নিকট একে একে সকল বর্ণনা করিল। চতুর চুড়ামণির চতুরতার ইতিহাস শুনিতে শুনিতে বিস্ময়ে, হর্ষে, গর্ব্বে বালিকার উৎফুল্ল হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল।

নির্ম্মাল্য, কার্ত্তিক, ১৩০৩।

তপস্যার ফল

১

সুদৃশ্য ও মূল্যবান্ সান্ধ্যবেশে সজ্জিত পুত্রকে ডাকিয়া মাতা বলিলেন, "ওরে সুকু, সত্যেন এখনও এল না কেন? তা'কে ভাল ক'রে বলেছিলি ত?"

ব্যস্তভাবে সুকুমার নীচে নামিতেছিল। সে চলিতে চলিতে ঘাড় ফিরাইয়া মৃদুহাস্যে বলিল, "হ্যাঁ, মা, আমি নিজে তাকে বিশেষ করেই ব'লে এসেছি। তা'র একটা জরুরী কাজে একটু দেরী হবে; কিন্তু সে নিশ্চয় আসবে।"

মাতার প্রসন্নমুখ আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তখন সন্ধ্যার অন্ধকারকে নির্ব্বাসিত করিয়া সমগ্র বাড়ীটা বিদ্যুতের প্রদীপ্ত আলোক-বিকাশে ঝলমল্ করিয়া উঠিয়াছিল। তৃণশ্যামল, বিস্তৃত প্রাঙ্গণের বুকের উপর আলোর ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। নিম্নতলের সুসজ্জিত কক্ষগুলি ফুলের ঘন-সুগন্ধে আমোদিত। প্রাচুর্য্যের মাধুর্য্যধারা সকল বিষয়েই যেন কানা ছাপাইয়া উঠিতেছিল; শুধু সমাগত নর-নারীর পরিমিত কলহাস্য ও আলাপনের মৃদুগুঞ্জন বৈদ্যুতিক পাখার রূঢ়শব্দকে অতিক্রম করিতে পারিতেছিল না।

মিঃ রায় স্বনামধন্য কৃতী ব্যারিষ্টার। তাঁহার একমাত্র পুত্র সুকুমার, এম, এ, পাশের পর পৈতৃক ব্যবসায় শিখিবার জন্য বিলাতে যাইতেছে; সেই জন্যই আজ প্রীতি-ভোজের বিপুল আয়োজন। মিঃ রায় শুধু প্রসিদ্ধ ব্যবহারাজীব নহেন, প্রচুর পৈতৃক বিষয় ও ধন-সম্পত্তিরও মালিক। অর্থোপার্জ্জন না করিয়াও সুকুমার পৈতৃক সম্পত্তির উপস্বত্বে পরম-সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত; কিন্তু মিঃ রায় অত্যন্ত কর্ম্মপ্রিয়; অলস জীবন-যাত্রার তিনি ঘোর বিরোধী ছিলেন। পুত্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে তাঁহার "পসার" ও প্রতিপত্তির প্রভাবে সহজে সাফল্যলাভ করিতে পারিবে, এই আশায় তিনি সুকুমারকে বিলাতে পাঠাইতেছিলেন।

মিঃ রায় প্রতীচ্য-সভ্যতা, বিলাসিতা ও আদব-কায়দার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। যদিও বিলাত হইতে আসিবার পর, পিতার আদেশানুসারে তিনি স্বগ্রামে গিয়া যথারীতি প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন এবং এ পর্য্যন্তও হিন্দু-সমাজের বন্ধন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া লয়েন নাই, তথাপি আহারে ব্যবহারে—জীবন-যাত্রার প্রণালীতে তিনি য়ুরোপীয় প্রথাই বহুলাংশে অবলম্বন করিয়াছিলেন। তিনি বড় একটা দেশে যাইতেন না, দেশের সাধারণ লোকের সহিত সংস্রবও রাখিতেন না। কলিকাতার বিরাট সমাজে সবই অবাধে চলিয়া যায়, সুতরাং প্রতিবাদের কোনও আশঙ্কাই ছিল না। মিঃ রায় একটা বিষয় আবিষ্কার করিয়াছিলেন—বিংশ শতাব্দীতে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের অন্তর্গত থাকার প্রধান লাভ এই যে, সকল সম্প্রদায়ে অবাধে মিলা-মেশার ইহাতে বিশেষ সুবিধা, বাধার বালাই আদৌ নাই। বিশেষতঃ বৈবাহিক ব্যাপারে হিন্দু সমাজই প্রশস্ত। অতএব যাহারা বুদ্ধিমান্, তাহাদের ধর্ম্মান্তর গ্রহণের কোন প্রয়োজন নাই।

সহধর্ম্মিণীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ্চাত্য সভ্যতায় দীক্ষিত করিতে না পারিলেও আংশিকভাবে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইয়াছিল। তবে পুত্র ও কন্যাকে তিনি মনের মত করিয়াই গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলেন।

পুত্র সুকুমার ও কন্যা অরুণাকে তিনি আধুনিকভাবে উচ্চশিক্ষা দিয়াছিলেন। কন্যাকে অবরোধের উচ্চ প্রাচীর-বেষ্টনে তিনি ঘিরিয়া রাখেন নাই; বাহিরের আলোকে তাহাকে টানিয়া আনিয়াছিলেন। ম্যাট্রিক্ পাশের পর সে দস্তরমত ডায়োসিসন্ কলেজে এবার আই, এ পড়িতেছিল। সে পিয়ানো বাজাইত; গৃহ-প্রাঙ্গণে ব্যাডমিন্টন্ খেলিত; মোটরে চড়িয়া প্রত্যহ ভ্রাতা বা পিতার সহিত মুক্তবায়ু সেবন করিতে যাইত। তবে মিঃ রায় তাহাকে অবাধ সম্মিলনে যাইতে দিতেন না। সেটা জন্মগত কুসংস্কার অথবা গৃহিণীর নির্ব্বন্ধাতিশয্য—কাহার প্রভাবে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন।

২

নিমন্ত্রিত মহিলাগণকে কুমারী অরুণা সমাদরে অভ্যর্থনা করিতেছিল। মাতা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া যথাসাধ্য তাহাকে

সাহায্য করিতেছিলেন। অরুণার কিশোর দেহ সমুজ্জ্বল বসন ও রত্নালঙ্কারের সমাবেশে মনোহারিণী শোভা ধারণ করিয়াছিল। বসন্তের রাণীর মত লোকমোহিনী সেই সুন্দরীর বর-বপুর দিকে সকলেই ক্ষণিক মুগ্ধনেত্রে চাহিতেছিল—বিশেষতঃ সুকুমারের নবীন বন্ধু-বৃন্দ!

মিঃ রায় অদূরে ভদ্র-মহোদয়গণের সহিত আলাপে নিমগ্ন।

সহসা হল-ঘরের মধ্যে হারমোনিয়ম বাজিয়া উঠিল। মধুরকণ্ঠে কেহ গাহিয়া উঠিল—

"রেখ মা দাসেরে মনে,
এ মিনতি করি পদে—"

বারান্দার এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সুকুমার নবাগত কয়েকটি বন্ধুর সহিত সোৎসাহে আসন্ন বিলাত-যাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিল। গানের ঝঙ্কার তাহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র সে বলিয়া উঠিল, "এই যে সত্যেন এসেছে!"

বন্ধুবর্গসহ সে সুসজ্জিত হল-ঘরে প্রবেশ করিল। নিমন্ত্রিত নর-নারীও তথায় সমবেত হইতেছিলেন। আজিকার আসরে সত্যেন্দ্ররই গান গাহিবার কথা ছিল। পরিচিতগণের মধ্যে সুরতানলয়যোগে আর কেহ তেমন চমৎকার গাহিতে পারিত না বলিয়াই আজ বিশেষরূপেই এই ভারটি তাহার উপর দেওয়া হইয়াছিল

সে তখন গাহিতেছিল—

"সাধিতে মনের সাধ, ঘটে যদি পরমাদ;
মধুহীন করো নাক তব মনঃ-কোকনদে।"

গায়কের তরুণ, সুন্দর আননে ভাবের গাম্ভীর্য্য, তন্ময়তা, রাগিণীর রূপ যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। মুগ্ধভাবে শ্রোতৃবর্গ গান শুনিতে লাগিলেন। সুকুমার দেখিল, গায়কের পার্শ্বে তাহার মাতা ও ভগিনী দাঁড়াইয়া। সত্যেনের অঙ্গে অতি সাধারণ পরিচ্ছদ। সেই সুবেশ-সুবেশা নর-নারীর মধ্যে তাহাকে নিতান্তই দীন-হীনের মতই দেখাইতেছিল।

তরুণ-কণ্ঠের মধুস্রাবী সঙ্গীতে সকলেই প্রীত হইলেন। একে একে সত্যেন্দ্র রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও কান্তকবির কয়েকটির উৎকৃষ্ট গান গাহিবার পর সে আসন ত্যাগ করিল।

জনৈক হ্যাটকোটধারী মাননীয় অতিথি প্রশ্ন করিলেন, "ছোক্‌রাটি কে হে?"

মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি চেন না বুঝি? আমাদের প্রতিবেশী অনাদি বাবুর ছেলে।—কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক অনাদিবাবুর নাম শুনেছ ত? তিনি এখন পেন্সন নিয়েছেন। ওর নাম সত্যেন। ছেলেটি বড় ভাল। ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বরাবরই ফার্ষ্ট হয়ে আসছে। এবার বি, এস্‌-সি, দেবে।"

প্রশ্নকর্ত্তা বলিলেন, তবে ত দেখছি ছেলে ভালই। কিন্তু বেশ-ভূষাটা অসভ্যের মত কেন? হাঁটুর কাছে কাপড় উঠেছে। ভদ্র-সমাজে একটু ভাল কাপড়-চোপড় প'রে আসা উচিত। জামাটাও ত বিশ্রী!"

মিঃ রায় সহাস্যে বলিলেন, "ওটা সত্যেনের খেয়াল। দেশী সুতার কাপড় ছাড়া ও পরে না। ওর বাবাও তাই; ভারী স্বদেশী।"

অরুণা ইতিমধ্যে কখন্ পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা তিনি লক্ষ্যও করেন না। সত্যেন্দ্রের সম্বন্ধে পিতা ও পিতৃ-বন্ধুর আলোচনার সবটাই সে শুনিতে পাইয়াছিল। পিতার শেষ বক্তব্য শুনিয়া মিঃ বন্দ্যোপাধ্যায় যেরূপ মুখভঙ্গী করিলেন, তাহা অরুণার দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

সকলেই যখন গল্প-গুজবে ব্যস্ত, তখন অরুণা ধীরে ধীরে মাতার সহিত কথোপকথনে রত সত্যেন্দ্রের পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। বাস্তবিক, আজিকার এই উৎসব-সভায় অমন জঘন্য দীনবেশে সত্যেন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেও বিরক্ত হইয়াছিল। বাড়ীতে কি একখানা তাঁতের কাপড়ও ছিল না? ফরিদপুরের জোলার তৈয়ারী ছিটের কাপড়ের জামা পরিয়া কোনও ভদ্র-সমাজে, উৎসব-সভায় কোন ভদ্র-সন্তান কি আসিয়া থাকে? বহরমপুর বা আসামের রেশমী, এণ্ডি অথবা মুগার চাদরের দাম দিতে সত্যেনদার পিতা নিশ্চয়ই অসমর্থ নহেন। তবে অমন একখানা বিশ্রী মোটা চাদর—না, বড়ই বাড়াবাড়ি।

আশৈশব ক্রীড়া-সঙ্গী, প্রতিদিনের সহচর, প্রতিবেশী সত্যেন্দ্রকে একটু উষ্মার সহিতই সে কথাগুলি শুনাইয়া দিল; সময় ও ক্ষেত্রবিশেষে বেশ-ভূষার প্রতি লক্ষ্য রাখা যে প্রত্যেক ভদ্র-সন্তানের অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য, এ কথাটা সে একটু রূঢ়ভাবেই বলিয়া ফেলিল। বেশের দৈন্য যে উচ্চাভিলাষহীনতার পরিচায়ক, সংসারে যাহারা শ্রী ও স্ত্রী লাভ করিতে চাহে, তাহাদের পক্ষে এমন ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ততা

যে আদৌ শোভন নহে, এ কথাটা বলিতেও সে ছাড়িল না।

কথাগুলি অন্যের অশ্রাব্য স্বরে বলিয়াই অরুণা লঘু ও দ্রুতগতিতে অন্যদিকে চলিয়া গেল। তাহার মাতা কন্যার এই আকস্মিক উত্তেজনা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। সর্ব্বাপেক্ষা বিস্মিত হইল সত্যেন্দ্রনাথ। স্বদেশের বেশ-ভূষার প্রতি অরুণার এমন বিরাগ ও বিদ্বেষ কেন? সত্যেন্দ্র ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইল; কিন্তু মনের ভাব প্রকাশ করিল না; শ্রীমতী রায়ের দিকে চাহিয়া শুধু একটু হাসিল।

সত্যেন্দ্রকে দুই চারিটা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া মিসেস্ রায় কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন। সত্যেন্দ্র তখন নিজের বেশ-ভূষার দিকে চাহিয়া দেখিল। কৈ? তাহার কাপড়, জামা, চাদর ত মলিন অথবা ছিন্ন নহে! তবে হাঁ, ঐশ্বর্য্য-গর্ব্ব বা বিলাসিতার প্রকাশ তাহাতে নাই। তাহার বেশ-ভূষা নিতান্তই আড়ম্বরবিহীন—কোঁচার প্রান্তভাগ ভূমি-চুম্বনে বিরত এবং ভৃত্যের নিপুণ-হস্তের প্রসাধন-কৌশলের চিহ্নমাত্র তাহাতে নাই। এটা কি অপরাধ?

ভোজনাগারে অতিথিবর্গ সমবেত হইতেছিলেন। সুকুমার সকলকে ডাকিয়া লইয়া যাইতেছিল। সত্যেন্দ্র এ বিষয়ে বন্ধুকে সাহায্য করিতে লাগিল। সে তখন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়াছে।

সকলে আসন গ্রহণ করিলে, সুকুমার সত্যেন্দ্রকেও বসিবার জন্য হাত ধরিয়া টানিল। সত্যেন্দ্র মৃদু হাসিয়া নিম্ন-স্বরে বলিল, "সুকুমারদা! তুমি ভুলে যাচ্ছ, আজ যে ৩০শে আশ্বিন! আজ ত আমার উপবাস।"

সুকুমার বলিয়া উঠিল,"তুই কি এখনও সে সব পাগলামী ছাড়তে পারিস্‌নি? ভাঙ্গা বাঙ্গালা ত অনেক দিন আগে জোড়া লেগে গেছে! এখন ত ৩০শে আশ্বিন কেউ 'অব্-জারভ' করে না। সবতাতেই তোর বাড়াবাড়ি!"

সত্যেন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "কিন্তু আমি করি। অনেক দিনের অভ্যাস, এখন ছাড়তে পার্‌ছি না।"

অরুণার সঙ্গে মাতাও সেই দিকে আসিতেছিলেন। কথাটা শুনিয়া শ্রীমতী রায় বলিলেন, "তা বেশ ত। ওকে পীড়াপীড়ি কর্‌বার দরকার কি? প্রত্যেকের মত ও বিশ্বাসের একটা মূল্য আছে, বাবা।"

অরুণা একবার তীব্র-দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্রের পানে চাহিল। তাহার পর গম্ভীরভাবে সে ভোজনাগারে প্রবেশ করিল।

সত্যেন্দ্রনাথ ঘুরিয়া ফিরিয়া, কে কি পাইল না পাইল, তাহার তদ্বির করিতে লাগিল।

৩

বিলাতী মেলের চিঠি দেখিয়াই সত্যেন্দ্র তাড়াতাড়ি উহা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু পড়িতে গিয়াই সে বুঝিল, উহা তাহার জন্য লিখিত নহে। খামের উপর তাহারই শিরোনামা আছে সত্য; কিন্তু পত্রখানি অন্যের উদ্দেশ্যে লিখিত। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে সে বুঝিল, সুকুমার বিলাত হইতে এ পত্র মিঃ রায়কে লিখিয়া ভ্রমক্রমে তাহার শিরোনামাযুক্ত খামে ভরিয়া পাঠাইয়াছে। সুতরাং আজিকার মেলে তাহারও একখানা পত্র নিশ্চয়ই আসিয়াছে। সেখানা হয় ত মিঃ রায় পাইয়াছেন। সুকুমার বিলাত হইতে প্রায়ই তাহাকে পত্র লিখিত।

পরের পত্র পড়ার অভ্যাস সত্যেন্দ্রের ছিল না। সে উহা সযত্নে ভাঁজ করিয়া খামের মধ্যে রাখিতে যাইবে, এমন সময় এক স্থলে তাহার নামের উল্লেখ দেখিয়া সে একটু কৌতূহলী হইল। এই দীর্ঘ পত্রে সুকুমার তাহার পিতার নিকট তাহার সম্বন্ধে কি লিখিয়াছে?

"হ্যাঁ" ও "না"র দ্বন্দ্বে অবশেষে "হ্যাঁ"ই জয়লাভ করিল। সে তাড়াতাড়ি সবটাই পড়িয়া ফেলিল। পড়িতে পড়িতে তাহার সুগৌর মুখমণ্ডল ক্ষণে আরক্ত ক্ষণে ম্লান হইতে লাগিল।

অরুণার সহিত তাহার বিবাহের কথা লইয়া বোধ হয় নিজেদের মধ্যে আলোচনা হইয়া থাকিবে। তাই সুকুমার লিখিয়াছে, "সত্যেন খুবই ভাল ছেলে সন্দেহ নাই। সে যে এম্, এস-সিতেও প্রথম হইবে, তা ত আমি জানিতাম। মা যে সত্যেনকে বড়ই স্নেহ করেন, সে ত খুবই স্বাভাবিক। ওর দিকে বরাবরই তাঁর টান আছে। কিন্তু সত্যেনের সঙ্গে অরুণার মিলনটা সুসঙ্গত হইবে না। অরুণাকে যে ভাবে লালন-পালন করিয়াছেন, তাহাতে সাদা-সিধা মধ্য-বিত্ত পরিবারে তাহাকে আদৌ মানাইবে না। সত্যেনকে আমিও খুব ভালবাসি; কিন্তু তাহার চাল-চলন, জীবন-যাত্রার প্রণালী আমাদের অপেক্ষা স্বতন্ত্র। অরুণা ইহাতে

সুখী হইতে পারিবে না। আপনার যুক্তিই ঠিক। প্রচুর ধন-সম্পত্তি না থাকুক, অন্ততঃ কোনও সিভিলিয়ানের সঙ্গে অরুণার বিবাহ হওয়া উচিত। এখন তাড়াতাড়ি করিবার প্রয়োজন নাই। মা'কে বুঝাইয়া রাখিবেন। অরুণার বয়স ত মোটে সতের। এখনই ব্যস্ত হইলে চলিবে কেন? আমি ফিরিয়া গেলে ধীরে-সুস্থে সব ব্যবস্থা করা যাইবে।"

সত্যেন্দ্র আর পড়িতে পারিল না। একটি দীর্ঘনিশ্বাস সহ সে পত্রখানি খামের মধ্যে ভরিয়া রাখিল।

হাঁ, অরুণাকে লাভ করা তাহার পক্ষে দুরাশামাত্র। শুধু ধনীর সন্তান নহে বলিয়াই যে সে উপেক্ষিত হইতেছে, তাহা নহে; ভোগ-বিলাসে সে স্পৃহাহীন, ইহাই তাহার অপরাধ। স্বদেশের পরিচ্ছদে সে দেহ আবৃত করে, দেশ-মাতৃকার প্রতি তাহার ভক্তি আছে, এই জন্যই সে ধনীর দুলালীর যোগ্য পাত্র নহে!

সত্যই ত; ভাঙ্গা বাঙ্গালা জোড়া লাগিবার পর তাহার পরিচিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহই ত তাহার মত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধাভরে দেশ-মাতার মোটা কাপড়ে অঙ্গ আচ্ছাদিত করে না! এখন ত বিদেশী বস্ত্রের প্রচলন পুরাদমেই হইতেছে। তবে এত দিন সে যাহাকে পবিত্রতম কর্ত্তব্য বলিয়া বুঝিয়াছিল, তাহা পালন করার ফলেই কি সে এখন অন্যতম প্রার্থনীয় কাম্যফল হইতে বঞ্চিত হইতেছে?

সত্যেন্দ্র ভাবিতে লাগিল।

এই সুকুমার তাহার বাল্য-সহচর, অরুণা তাহার শৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গিনী। পাশাপাশি দুইটি বাড়ীর অধিবাসীদিগের মধ্যে দীর্ঘকাল ধরিয়া ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়তা জন্মিয়াছে। মাতৃহীন সত্যেন শ্রীমতী রায়ের নিকট হইতে মাতৃস্নেহ লাভ করিয়াছে। দিন ও রাত্রির অধিকাংশ সে মিঃ রায়ের বাড়ীতেই কাটাইয়াছে। তাঁহার বিশাল উদ্যানে তাহাদের বাল্য, কৈশোর ও প্রথম-যৌবনের কত দীর্ঘ মধু-দিবস ও সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ হইয়াছে, তাহার ইতিহাস সত্যেন্দ্রের মনের পৃষ্ঠায় গভীরতম রেখাচিত্রে অঙ্কিত নাই কি?

শ্রীমতী রায়ের ভাবভঙ্গী ও কথার ইঙ্গিতে, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সে এমন বুঝিয়াছিল যে, অরুণার সহিত তাহার মিলন একান্ত অসম্ভব নহে। আবাল্য-সহচরীকে জীবন-সঙ্গিনী-রূপে পাইলে যে তাহার জীবন সার্থক হইবে, তাহা সে বুঝিত। তাই সে সাফল্যলাভের জন্য আপনাকে সকল প্রকারে গড়িয়া তুলিতেছিল। তাহার অন্তরের এই গোপনীয় ও পবিত্রতম বিষয়টি সে বাক্য, ব্যবহার বা ইঙ্গিতেও কখনও প্রকাশ পাইতে দেয় নাই। অরুণা তাহার অনুরাগিণী কি না, তাহা জানিবার জন্যও কোনও দিন সে একটু অধীরতা প্রকাশ করে নাই। সে তাহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশ হইতে যে আশ্বাসবাণী ধ্বনিত হইতে শুনিত, তাহাতেই পরিতৃপ্ত ছিল।

বহুক্ষণ স্তব্ধভাবে চিন্তার পর সে উঠিয়া দাঁড়াইল। হাঁ, পত্রখানি মিঃ রায়কে দিয়া আসাই সঙ্গত। সে অনিচ্ছাক্রমে পত্রখানা যে পড়িয়াছে, তাহাও সে অস্বীকার করিবে না। তাহার চিরপোষিত আশালতা সমূলে ছিন্ন হইয়া গেল সত্য; তবে—

বিমূঢ়ভাবে আবার সে আসনে বসিয়া পড়িল। করতলে মস্তক রক্ষা করিয়া সে আপনার ভবিষ্যতের আলোকহীন, উৎসাহশূন্য, নিরানন্দ জীবনের কথা ভাবিতেছিল কি?

ঘড়ীতে টং টং করিয়া চারিটা বাজিয়া গেল! বোধ হয়, তখন তাহার চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে চমকিত-ভাবে সোজা হইয়া বসিল। সঙ্কল্প স্থির করিয়া সে জামা গায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল।

৪

"এস সত্যেন, ব'স ব'স। হাঁ, ভাল কথা, তোমাকে সুকুমার বিলাত থেকে একখানা পত্র লিখেছে, আমার নামের খামে ভুল ক'রে পাঠিয়েছে। পত্রখানা আমি খুলে ফেলেছিলাম।"

মৃদুহাস্যে মিঃ রায় পত্রখানা সত্যেন্দ্রের হাতে অর্পণ করিলেন। সত্যেন্দ্র পকেট হইতে তাহার নামের পত্র বাহির করিল। কম্পিত হস্তে সে উহা মিঃ রায়কে দিয়া বলিল, "আমায় মাপ করবেন, আমিও না জেনে—"

বাধা দিয়া সহাস্যে মিঃ রায় বলিলেন, "ওঃ, বুঝেছি! তা তুমি অত কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন? দোষ ত তোমার নয়। আমিও ত না জেনে তোমার চিঠি খুলেছিলাম! তুমি ব'স দেখি, বাবা।"

সত্যেন সম্মুখস্থ আসনে বসিয়া প্রবাসী বন্ধুর সংক্ষিপ্ত পত্রখানা পড়িল। পরীক্ষার সাফল্যলাভের জন্য সে সত্যেন্দ্রকে সুদূর সাগরপার হইতে সর্ব্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত করিতেছে।

মিঃ রায় তখনও পত্রপাঠে নিবিষ্ট। সত্যেন্দ্র একবার গোপন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিল। তাঁহার প্রসন্ন মুখমণ্ডলে গাম্ভীর্য্যের স্তব্ধ ছায়া দেখিয়া সে আবার চক্ষু নামাইয়া লইল। তাহার পর আবার যখন সে মিঃ রায়ের দিকে চাহিল, তখন সে দেখিল, তিনি স্থিরদৃষ্টিতে তাহাকে দেখিতেছেন।

আরক্তমুখে সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "আমায় ক্ষমা করবেন, পত্রখানা আমি প'ড়ে ফেলেছি!"

প্রশান্তকণ্ঠে মিঃ রায় বলিলেন, "তাতে তোমার কোন অপরাধ নেই, সত্যেন্।"

কক্ষমধ্যে গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। সে নীরবতা এমনই গাঢ় যে, সত্যেন্দ্র তাহার বক্ষঃস্পন্দনের শব্দ পর্য্যন্ত শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল।

আনত মস্তক তুলিয়া সত্যেন্দ্র মিঃ রায়ের প্রতি পুনরায় চাহিবামাত্র তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "এখন তুমি আইন পড়্‌বে, না অন্য কোন লাইনে যাবে; কি ঠিক করেছ?"

সত্যেন্দ্র সহসা বলিয়া ফেলিল, "আপনি আমায় কি পরামর্শ দেন?"

"আমি?—আমি ত উপযুক্ত বিচারক নই! তোমার বাবার কি মত?"

"আজ্ঞে, তিনি এখনও কিছু বলেন নি। তবে—" বলিয়াই সে একটু থামিল। তার পর পুনরায় আবেগভরে বলিয়া ফেলিল, "আমার ইচ্ছা বিলাতে যাব।"

"বিলাতে যাবে?—ব্যারিষ্টার হ'তে?"

কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র উৎসাহ অথবা আগ্রহের পরিচয় না পাইয়া সত্যেন যেন মুসড়িয়া পড়িল। তাহার বুকের মধ্যে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ হইল।

অনেক কষ্টে কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া সে বলিল, "ইচ্ছা আছে, সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষাটা একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।"

"ওঃ!" বলিয়াই তিনি নিবিষ্টভাবে সত্যেন্দ্রনাথের আরক্ত, সুগৌর মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর পূর্ব্ববৎ উৎসাহশূন্য কণ্ঠে বলিলেন, "তোমার বাবার এতে মত আছে?"

দৃঢ় অথচ মৃদুস্বরে সত্যেন বলিল, "বাবার মত কি হবে, জানি না। তবে তাঁর অমত হ'লে স্বর্ণ-সাম্রাজ্যের সম্ভাবনায় আশাও আমার ত্যাগ করতে হবে।"

উভয়ের নয়ন মিলিত হইল। মিঃ রায়ের উজ্জ্বল দৃষ্টির বেগ সহিতে না পারিয়াই কি সত্যেন্দ্র চক্ষু পুনরায় নত করিল?

"ভাল কথা। তোমার উন্নতি হ'লে আমাদেরও আনন্দ।"

এইবার তাঁহার কণ্ঠস্বরে প্রচ্ছন্ন আবেগ ও ঔৎসুক্যের একটা অতি মৃদু ঝঙ্কার কি সত্যেন্দ্র অনুভব করিতে পারিয়াছিল? অথবা উহা তাহারই মস্তিষ্কের খেয়াল মাত্র?

সত্যেন উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার বক্ষের মধ্যে যে কথা গুমরিয়া উঠিতেছিল, তাহা ত প্রকাশ করা যায় না।

"একটু দাঁড়াও, সত্যেন্।"

স্তব্ধভাবে সে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বে আসিয়া স্কন্ধদেশে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া মিঃ রায় বলিলেন, "তুমি সুকুমার ও অরুণার অন্তরঙ্গ বাল্যসুহৃদ্। যদি তুমি বিলাত যাও, তবে তোমার প্রত্যাবর্ত্তনের আগে আমি তাহাদের, অন্ততঃ অরুণার বিবাহ দিব না। বিলাত যাইবার আগে এ কথাটুকু তোমার জানা দরকার।"

কৃতজ্ঞ নয়নে সত্যেন্দ্র মিঃ রায়ের দিকে চাহিল।

এই সময় বেহারা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মিসেস্ ও মিস্ রায় মোটরে বসিয়া তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। সান্ধ্য-বায়ু-সেবনে তাঁহারা প্রত্যহই এই সময়ে বাহির হইয়া থাকেন।

উভয়ে কক্ষের বাহিরে আসিলেন। শ্রীমতী রায় সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিলেন, "এই যে, সতু! আমাদের সঙ্গে মোটরে একটু বেড়িয়ে আসবে চল না।"

পূর্ব্বে শত শতবার সে ইঁহাদের সহযাত্রী হইয়াছে। প্রস্তাবটি আদৌ নূতন নহে। কিন্তু আজ সে একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

তাহার দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চাহিয়া সহসা অরুণা বলিয়া উঠিল, "উনি কি ঐ রকম বেশে আমাদের সঙ্গে যেতে পারেন, তাই বুঝি ভাবছেন? তা সত্যি, আমি কিন্তু ওরকম কদর্য্য বেশ আদৌ পছন্দ করি না। এত লেখাপড়া শিখেও যে মানুষ এমনতর, তার কি কোন দিন কিছু হয়; তুমিই বল দেখি, মা?"

সত্যেন্দ্রের মুখমণ্ডল সহসা পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। আজ উত্তরে সে কোনও কথা যেন খুঁজিয়া পাইল না। কি বলিবে? বলিবার কি আছে?

শ্রীমতী রায় কন্যার দিকে তীব্রদৃষ্টিপাত করিয়া সত্যেন্দ্রকে বলিলেন, "তা হোক্, তুমি এস ত, বাবা।"

সবিনয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া, "জরুরী কায আছে" বলিয়া সে দ্রুতপদে সে স্থান ত্যাগ করিল। ব্যথাটা আজও বড় জোরে তাহার বক্ষে বুঝি বাজিয়াছিল, তাই মোটরে উপবিষ্টা, লোকমোহিনী অরুণার কৌতুকহাস্য-বিকসিত মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিবার ইচ্ছাও তাহার ছিল না।

৫

"বাবা!"

অধ্যয়নরত পিতা স্থির ও প্রসন্নদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিলেন। পুত্রের সুন্দর আননে চিন্তার ক্লিষ্ট রেখা দেখিয়া অনাদি বাবুর স্নেহ-প্রবণ কোমল হৃদয় দুলিয়া উঠিল।

চশমাটা খুলিয়া, বইখানি মুড়িয়া টেবলের উপর রাখিয়া তিনি স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "কি, সতু, তোমার কিছু বল্‌বার আছে?"

নতশীর্ষে, মৃদুকণ্ঠে সত্যেন্দ্র বলিল, "আমায় বিলাতে সিবিল সার্ব্বিস্ পড়্‌তে যেতে দেবেন, বাবা?"

প্রৌঢ় অধ্যাপক স্থিরদৃষ্টিতে কিয়ৎকাল পুত্রের আননে আলোক ও অন্ধকারের লীলা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সংসার-বন্ধনের একটিমাত্র স্মৃতি এই সত্যেন্দ্র! সারাজীবন ধরিয়া, মাতৃহীন পুত্রকে তিনি মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। সে তাঁহার আদরের দুলাল, বংশের গৌরব, জীবনের অবলম্বন। পিতাপুত্রে কোন ব্যবধানই ছিল না। তাহার দৈনন্দিন জীবনের কোন ঘটনাই স্নেহশীল, কর্ত্তব্য-পরায়ণ পিতার দৃষ্টি অতিক্রম করিত না। পুত্রের হৃদয়টি তাঁহার কাছে দর্পণবৎ ছিল। কিন্তু মুখে তিনি কোনও দিন পুত্রকে কোনও প্রশ্ন করেন নাই, প্রয়োজনও ছিল না। যাহার স্নেহ, মমতা, ভালবাসার কেন্দ্র একটি, সে-ই জানে, কোন প্রশ্ন না করিয়াও কেমন করিয়া তাহার স্নেহপাত্রের মনের লুকান কথাটা পর্য্যন্ত দর্পণে প্রতিবিম্বিত ছবির মত সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে মিঃ রায়ের সহিত নিভৃত আলাপের কথা বোধ হয় প্রৌঢ়ের মনে পড়িল। নিমীলিত নেত্রে তিনি কিয়ৎকাল ভাবিতে লাগিলেন। সত্যেন্দ্র ব্যগ্রভাবে পুনঃ পুনঃ পিতার মুখের দিকে চাহিতে লাগিল।

প্রশান্তস্বরে অনাদি বাবু বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু বিলাতে ঠিক ভাবে থাক্‌তে পার্‌বে, সতু?"

সত্যেন্দ্র বোধ হয়, কথাটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাই সে একটু বিস্মিতভাবে পিতার দিকে চাহিয়া রহিল।

তেমনই শান্ত স্নিগ্ধকণ্ঠে পিতা বলিলেন, "সেখানে নানা রকমের প্রলোভন; বড়ই পিচ্ছিল পথ; কি জানি, আমার সতু যদি পড়িয়া যায়!"

সত্যেন্দ্রের মুখমণ্ডলে যেন সিন্দুরের রক্তরাগ ছড়াইয়া পড়িল। সে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনার আশীর্ব্বাদে, বাবা, আমি সব জয় কর্‌তে পার্‌ব।"

"তা তুমি পার্‌বে—তবু বাপের মন। আর ত আমার কেউ নেই!"

সত্যেন্দ্রের নয়নযুগল আর্দ্র হইয়া আসিল। সে বলিল, "তবে থাক্, বাবা—আমি যাব না।"

মৃদুহাস্যে পিতা বলিলেন, "না, সতু, তোমার জীবনের পথে আমি অন্তরায় হব না। তুমি জয়মুকুট লাভ ক'রে বাঞ্ছিত ফল অর্জ্জন কর, এর চেয়ে বড় কামনা আমার আর কিছু নেই। আমি কয়েক দিন থেকেই তোমাকে বিলাতে পাঠাবার আয়োজন ক'রে রেখেছি। যাতে শীঘ্র তুমি পাশপোর্ট পাও, তারও ব্যবস্থা হয়ে গেছে। মাসে তুমি তিন শ ক'রে টাকা পাবে, তাতেই সেখানকার খরচ চালিয়ে নিও।"

সত্যেন্দ্র বিস্মিত হইল। কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বেও বিলাতে যাইবার চিন্তা তাহার মনে উদিত হয় নাই, অথচ তাহার পিতা গোপনে গোপনে তাহার বিলাতযাত্রার সমস্ত আয়োজন করিয়া রাখিয়াছেন! অথচ সে জানিত, তাহার পিতা অপরিণত বয়সে বিলাতযাত্রার বিশেষ বিরোধী ছিলেন।

সত্যেন্দ্র বলিল, "তিনশ টাকা আমায় দিলে আপনার চলবে কিসে, বাবা? আপনি ত মোটে—"

বাধা দিয়া পিতা বলিলেন, "সে জন্য তোমার কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না, বাবা।—কোম্পানীর সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত

হয়েছে, আমি এক বৎসরের মধ্যে তিনখানা বই লিখে দেব, তার জন্ম তারা আমায় তিন হাজার টাকা রয়ালটি দেবে। এক হাজার অগ্রিম পেয়েছি, তাতে তোমার জাহাজ-ভাড়া, কাপড়-চোপড় প্রভৃতি হয়ে যাবে। টাকার জন্ম তোমার ভাব্‌তে হবে না।"

সত্যেন্দ্র মুগ্ধ হইল। কিন্তু সে বুঝিতে পারিল না, তাহার বিলাতযাত্রার জন্ম পিতার এত আগ্রহ কেন?

অনাদি বাবু চশমা-জোড়া তুলিয়া লইয়া বলিলেন, "একটা কথা আছে, তোমার বিলাতযাত্রার কথাটা একবার মিঃ রায়কে জানিয়ে দিও।"

সত্যেন্দ্রনাথ উৎসাহভরে বলিল, "তাঁকে একটু আগেই আমি ব'লে এসেছি যে, বাবার মত পেলে আমি বিলাতে যাব।"

"ওঃ!" বলিয়াই পিতা মুহূর্ত্তমাত্র পুত্রের পানে চাহিলেন। তাহার পর বলিলেন, "তবে তুমি প্রস্তুত হ'তে থাক।"

সত্যেন্দ্র পিতার কক্ষ ত্যাগ করিলে, প্রৌঢ় যুক্তকরে ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। সত্যেন্দ্র যদি তখন ফিরিয়া আসিত, তবে দেখিতে পাইত, তাহার পিতার সৌম্য আননে একটা পবিত্র দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, আর তাঁহার নয়নপল্লবে মুক্তাবিন্দু ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে।

৬

কোথা দিয়া বৎসর চলিয়া গিয়াছিল, সত্যেন্দ্র তাহার কোনও সন্ধানই রাখে নাই। এক বৎসরের মধ্যে তাহাকে পরীক্ষা শেষ করিতে হইবে বলিয়া সে উগ্র তপস্যায় রত হইয়াছিল। দেশে অথবা বিদেশে—পৃথিবীর কোথায় কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে, তাহার কোনও সন্ধানই সে রাখিত না। আহার, অত্যল্প নিদ্রা ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় নিত্য-কর্ম্মগুলি ছাড়া আর সকল সময়েই সে একাগ্রমনে অধ্যয়ন করিত, একটিমাত্র বৎসরের মধ্যে তাহাকে সাফল্যলাভ করিতে হইবে, ইহাই ছিল তাহার ধ্যানের একমাত্র বিষয়। সে কাহারও সহিত বড় একটা মিশিত না, অধ্যয়নের বিষয় ছাড়া প্রসঙ্গান্তরের আলোচনায়ও যোগ দিত না। অনেক কথা অনেক সময় তাহার কাণের মধ্যে প্রবেশ করিত বটে, কিন্তু মনের রুদ্ধদ্বারের কাছে আসিয়া সবই ফিরিয়া ফিরিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে পিতার নাতিদীর্ঘ পত্রের উত্তরে সে আপনার অধ্যয়নের ইতিহাস লিখিয়া প্রবাস-জীবনের সহিত দেশের যোগসূত্র রক্ষা করিত মাত্র। সে যখন বিলাতে, সেই সময় সুকুমারও দেশে ফিরিয়াছিল। পঁহুছা সংবাদ দেওয়া ছাড়া সে মিঃ রায় অথবা সুকুমারকে বড় একটা পত্র লিখে নাই। অবকাশই তাহার ছিল না। তবে অরুণার স্মৃতি? হাঁ, সেটা ত তাহার সঙ্গের সাথী। সেই স্মৃতিই ত তাহাকে তপস্যায় শক্তি প্রদান করিত।

এমনই ভাবে, ধ্যানমগ্ন অবস্থায় সে সিবিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদান করিয়া শেষ দিন বাসায় ফিরিতেই নিদারুণ দুঃসংবাদে তাহার মন একবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার কোন আত্মীয়ের পত্রে সে জানিতে পারিল, তাহার স্নেহময় পিতা স্বর্গধামে যাত্রা করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার জীবন-বিমার পঁচিশ হাজার টাকা তিনি উইল করিয়া তাহাকে দিয়া গিয়াছেন। পিতা যে এত টাকায় জীবন-বিমা করিয়া-ছিলেন, তাহা এ যাবৎ সত্যেন্দ্রের অগোচরই ছিল।

পিতৃশোকে অধীর সত্যেন্দ্রনাথ তিন দিন ঘরের বাহির হয় নাই। মৃত্যুকালে সে পিতার সেবায় বঞ্চিত হইল বলিয়া নিজেকে সহস্রবার ধিক্কার দিল। হায়! কেন সে বিলাতে আসিয়াছিল!

ক্রমে শোকের প্রথম আঘাত সহ্য হইয়া গেলে সে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া উদাস প্রাণে নানাস্থানে একা একা ঘুরিয়া বেড়াইল। অবশেষে এক দিন সে জানিতে পারিল, প্রশংসার সহিত সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বোম্বাইয়ের কোনও জিলার জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে নিযুক্তও করিয়াছেন। এই সাফল্যের সংবাদে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা তৃপ্তি পাইতেন, তাঁহাকে মনে করিয়া সত্যেন্দ্র অশ্রুপাত করিল।

সুকুমার ও মিঃ রায়কে এত দিন পরে সাফল্যলাভের সংবাদ দিয়া সত্যেন্দ্র জানাইল যে, শীঘ্রই সে কলিকাতায় যাইতেছে।

* * * *

গাড়ী-বারান্দায় ট্যাক্সি আসিবামাত্র, য়ুরোপীয় বেশে সজ্জিত সত্যেন্দ্রনাথ লাফাইয়া নীচে নামিল। সে কবে আসিবে, এ সংবাদ কাহাকেও দেয় নাই। গ্রাণ্ড হোটেলে আসবাবপত্র রাখিয়া সে সোজা মিঃ রায়ের বাড়ী আসিয়াছিল। দুই জন

বাঙ্গালী ভৃত্য তাড়াতাড়ি "সাহেবের" কাছে ছুটিয়া আসিল। মিঃ রায়ের উর্দ্দীপরা তক্‌মাধারী চাপরাশীর পরিবর্ত্তে এ সব কাহারা? তবে কি মিঃ রায় এখানে এখন থাকেন না?

কিন্তু বহুক্ষণ তাহাকে সন্দেহ-দোলায় থাকিতে হইল না। তাহার চিরপরিচিত লাইব্রেরী-ঘর হইতে ধুতিপরা পাঞ্জাবীগায় একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক বাহিরে আসিলেন। সত্যেন্দ্র মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে মিঃ রায়কে চিনিল। কিন্তু বিস্ময়ে তাহার কণ্ঠ হইতে একটি শব্দমাত্র বাহির হইল না। সর্ব্বদা য়ুরোপীয় বেশে সজ্জিত মিঃ রায়ের এ কি পরিবর্ত্তন! সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে?

মিঃ রায় সত্যেন্দ্রকে দেখিয়া দুই বাহু বাড়াইয়া বলিলেন, "সত্যেন্, তুমি কখন্ এলে? এস, বাবা, এস!"

বাহুবন্ধনে সত্যেন্দ্রকে বাঁধিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "তোমার সাফল্যের সংবাদে বড়ই খুসী হয়েছি, বাবা। আজ তোমার বাবা, আমার বন্ধু অনাদি বাবু নেই, সেই যা দুঃখ। চল, ভিতরে যাই।"

সত্যেন্দ্র চলিতে চলিতে বলিল, "সুকুমারদা কোথায়?"

"সুকুমার? সে ত এখানে এখন নেই! মফঃস্বলে গেছে।"

"মফঃস্বলে? কোন কেসে বুঝি?"

"না, না, সে প্রোপাগাণ্ডা ওয়ার্কে গেছে।"

"প্রোপাগাণ্ডা?"

"ওঃ! তুমি কোন খবর রাখ না বুঝি? তা রাখবেই বা কেমন ক'রে? এক বৎসর দেশ-ছাড়া, আবার পরীক্ষায় ব্যস্ত ছিলে। ভারতবর্ষে যে ঘোর অসহযোগ আন্দোলন চল্‌ছে। সে তাই দেশের মধ্যে খদ্দরপ্রচার-কার্য্যে লেগে গেছে।"

সত্যেন্দ্রনাথ প্রকৃতই এ সকলের কোন সন্ধান রাখিত না। এক বৎসরের অবকাশে দেশের মধ্যে এত পরিবর্ত্তন? সে চাহিয়া দেখিল, মিঃ রায়ের পরিধানে খদ্দর, গায় খদ্দরের পাঞ্জাবী।

সত্যেন্দ্র কম্পিতকণ্ঠে বলিল, "সুকুমারদার বিয়ে হয় নি?"

মিঃ রায় বলিলেন. "সুকুমার এখন বিয়ে কর্‌তে রাজি নয়। তা ছাড়া আমি ত তোমাকে কথা দিয়েছিলাম, শুভ কায তুমি না আসা পর্য্যন্ত হবে না। বিশেষতঃ তোমার বাবার কাছেও আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম, তুমি সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষা দিয়ে ফিরে না আসা পর্য্যন্ত অরুণাকেও কোথাও বিয়ে দেব না। সে প্রতিজ্ঞা আমি রেখেছি।"

সত্যেন্দ্র এতকাল পরে অন্ধকারের মধ্যে যেন আলোক-রশ্মি দেখিতে পাইল। তাহার অন্তরের গোপনতম কথাটি তাহার পিতারও অগোচর ছিল না। এমন পিতা হইতে আজ সে বঞ্চিত!

ততক্ষণে মিঃ রায় দ্বিতলে উঠিয়াছিলেন। সম্মুখের বারান্দায় ও কাহারা? সত্যেন্দ্র রুমালে চক্ষু মুছিয়া লইল। না, তাহার দৃষ্টিবিভ্রম হয় নাই। মোটা বস্ত্রে অঙ্গ আবৃত করিয়া মা ও মেয়ে চরকায় সূতা কাটিতে ব্যস্ত।

"চেয়ে দেখ, কে এসেছে?"

শ্রীমতী রায় কোট-প্যাণ্টধারী সত্যেন্দ্রের সুগঠিত ও সুন্দর মুখখানি দেখিয়াই তাহাকে চিনিতে পারিলেন। বিলাতের জল-বায়ুর গুণে তাহার সৌন্দর্য্য শতগুণ বাড়িয়াছিল। সহাস্যমুখে তিনি তাহার নত মস্তকে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কুমারী অরুণাও সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল। চির-পরিচিত, আলুথালু বেশধারী সত্যেন্দ্রনাথকে য়ুরোপীয় পরিচ্ছদে কি সুন্দর মানাইয়াছিল, সে কি তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল?

কিছুক্ষণ আলাপের পর মিঃ রায় কার্য্যান্তরে নীচে নামিয়া গেলেন। শ্রীমতী রায় অতিথি-সৎকারের আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন।

অবনতমুখে অরুণা তখনও চরকা চালাইতেছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ আরক্তমুখে নিম্নস্বরে বলিল, "এতদিন পরে কি আমি যোগ্যতা অর্জ্জন কর্‌তে পেরেছি, অরুণা? আমাদের মিলন-পথের প্রধান অন্তরায় কি দূর হয়ে যায় নি?"

অরুণা তখনও নতমুখে কায করিয়া যাইতেছিল। সহসা মুখ তুলিয়া দৃঢ়স্বরে সে বলিল, "মিলন-পথের ব্যবধান যে আরও বেড়ে গেছে, সত্যেন বাবু!"

কি নিদারুণ কথা! সত্যেন্দ্রের মাথা ঘুরিতে লাগিল। সে কিছুই বুঝিতে পারিল না; স্খলিতকণ্ঠে বলিল, "কেন, অরুণা, কেন?'

তেমনই প্রশান্ত ও উত্তেজনাশূন্য স্বরে অরুণা বলিল, "ম্যাঞ্চেষ্টার, লণ্ডন প্রভৃতির সঙ্গে কি চট্টল, কলিকাতা একাসনে বস্‌তে পারে? বিশেষতঃ আমার বাবা ও দাদা

আদালতের কাষ ছেড়ে দেশের কাষে যোগ দিয়েছেন, আর আপনি—অসম্ভব সত্যেন্ বাবু, অসম্ভব!"

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা সত্যেন্দ্রের হৃদয়ঙ্গম হইল। তবে এক বৎসর ধরিয়া সে এ কি করিল? অদৃষ্টের এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! যাহাকে লাভ করিবার জন্য সে আপনার বহু প্রার্থনীয় জীবনের পবিত্রতম ব্রতও ভঙ্গ করিয়াছে, আজ সেই অপরাধেই কি তাহার এই শাস্তি?

উদ্‌ভ্রান্তস্বরে সত্যেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "কিন্তু সে ত তোমারই জন্য, অরুণা! তোমাকে খুসী করবার জন্য, তোমার দাদা ও বাবাকে সন্তুষ্ট করবার জন্য নিজেকে ভিন্ন-ভাবে গ'ড়ে তুলেছি।"

ক্ষুদ্র করপল্লব-যুগল যুক্ত করিয়া, মিনতিপূর্ণ, কোমল ও মৃদুকণ্ঠে অরুণা বলিল, "তাঁদের জন্য আমি আপনার কাছে মাপ চাইছি। আমাকেও আপনি ক্ষমা করুন!"

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়, ১৩২৯।

টুপীটা দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া, গায়ের কোট, ওয়েষ্টকো[illegible] প্রভৃতি খুলিতে খুলিতে সত্যেন্দ্র বলিয়া ফেলিল, "তোমাদে[illegible] বাড়ী খদ্দরের কাপড়, চাদর বেশী আছে? আমায় ভিক্ষ[illegible] দেবে?"

অরুণা স্নিগ্ধদৃষ্টি তুলিয়া সত্যেন্দ্রের পানে চাহিয়া বলি[illegible] "আছে; কিন্তু—"

"কিন্তু নয়, অরুণা। ও সব আমি শুনতে চাই না[illegible] বাবার পঁচিশ হাজার টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে কি আমাদে[illegible] সংসার চালাতে পারব না?"

চরকা ফেলিয়া অরুণা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার দীর্ঘায়[illegible] সজল, কৃষ্ণতার নয়নের দৃষ্টিতে সত্যেন্দ্র কি দেখিল, তা[illegible] সে-ই জানে।

সেই সময়ে জলখাবারের থালা লইয়া শ্রীমতী রায় ডাকি[illegible]লেন, "সত্যেন্, একটু জল খাবে এস।"

ত্যাজ্যপুত্র

১

"ভজা!"

মেঘ-গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর ডাক শুনিয়া নিদ্রালস ভজহরি খানসামার তন্দ্রা টুটিয়া গেল। সে দ্রুতপদে মনিবের সম্মুখে আসিয়া আদেশ-প্রতীক্ষায় দাঁড়াইল।

"চন্দু বাবুকে পাঠিয়ে দে।"

প্রভুর ভ্রূভঙ্গিভীষণ মুখ হইতে এই সংক্ষিপ্ত আদেশ শুনিয়া অনাগত আশঙ্কায় প্রাচীন ভৃত্যের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। দীর্ঘকাল জমীদার-বাড়ীর কাযে তাহার মাথার কেশ শুভ্র হইয়া গিয়াছিল। হরমোহন বাবুর পিতার আমল হইতে সে এই বাড়ীতেই মানুষ। সে বর্ত্তমান মনিবের 'হাল-চাল' ভালই জানিত। শঙ্কিত-চিত্তে সে আদেশ প্রতিপালন করিতে চলিয়া গেল।

অল্পকাল পরে চন্দ্রনাথ পিতার কক্ষে প্রবেশ করিল। পঁচিশ বৎসরের যুবা, এম, এ, ও বি, এল পরীক্ষা পাশ করিবার পর হাইকোর্টে নাম লিখাইলেও, পিতার সম্মুখে আসিতে তাহার চরণযুগল যেন কুণ্ঠিত হইতেছিল।

পুত্রকে দেখিয়া পিতা একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। আষাঢ়ের বর্ষোণোন্মুখ মেঘ-ভরা আকাশের মত তাঁহার আনন গম্ভীর। হরমোহন হাসিতে জানিতেন না বলিয়া একটা অপবাদ ছিল, অন্ততঃ দুষ্ট লোক তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপই রটনা করিত। তাঁহার কাছে হাস্যটা ঘোর অসভ্যতা ও প্রগল্‌ভতার পরিচায়ক—বিশেষতঃ শব্দময় উচ্চহাস্য। তাঁহার পরিচিত ব্যক্তির সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু বন্ধু কেহ ছিল কি না, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। আত্মীয়-স্বজনগণ সকলেই জানিতেন, জমীদার হরমোহন সুরুচির অবতার, অত্যন্ত স্বল্প-ভাষী এবং নৈতিক নিষ্ঠার মূর্ত্ত বিগ্রহ। তাঁহার কাছে হাস্য অশ্লীল, বড় করিয়া কথা বলা অসভ্যতা, গুরু-লঘুর পার্থক্য মানিয়া না চলা অমার্জ্জনীয় অপরাধ। বলিয়াছি, জমীদার হইলেও আবগারী বিভাগের সহিত কুটুম্বিতা করা দূরে থাকুক, কেহ তাঁহাকে কোনও দিন ধূমপান পর্য্যন্ত করিতে দেখেন নাই। তাম্বুল-চর্ব্বণকে তিনি বিলাসিতার দ্যোতক বলিয়া ঘৃণা করিতেন।

পিতার হাস্যলেশ-হীন, অপ্রসন্ন মুখের গম্ভীর দৃশ্য চন্দ্রনাথ চিরকালই দেখিয়া আসিতেছে; কিন্তু আজ যেন মেঘাচ্ছন্ন আকাশে অমানিশার অন্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছিল।

সে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আমায় ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ—কথা আছে।"

চন্দ্রনাথ ফরাসের এক প্রান্তে উপবেশন করিল।

কক্ষমধ্যে তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল না। কিছুমাত্র ভণিতা না করিয়াই হরমোহন বলিলেন, "শুনলাম, মা নাকি তাঁ'র সব সম্পত্তি তোমার নামে লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছেন?"

কথাটা সহজভাবে উচ্চারিত হইলেও চন্দ্রনাথের কাণে যেন একটু বেসুরে বাজিল। সে সংক্ষেপে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"তা কথাটা আমার কাছে লুকিয়েছো কেন?"

বিস্মিতভাবে চন্দ্রনাথ বলিল, "লুকোব কেন?—সে ইচ্ছে ত আমার ছিল না, বাবা! আজ সকালে সবে দেশ থেকে ফিরে এসেছি, তার পরেই কোর্টে গিয়েছিলুম। এই ত কতক্ষণ সেখান থেকে ফিরে আসছি।"

"ও!—তাই বুঝি ইষ্টারের ছুটীতে দেশে যাওয়া হয়েছিল!—কি রকম লেখাপড়া হ'ল?—তাঁ'র সব সম্পত্তিই দান করেছেন?"

চন্দ্রনাথ ঠিক বুঝিতে পারিল না, তাহার পিতার কথার অন্তরালে শুধুই কৌতূহল, অথবা শ্লেষের তীক্ষ্ণমুখ কাঁটাগুলি মাথা উঁচু করিয়া আছে কি না! সবিস্ময়ে সে মুহূর্ত্ত পিতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল, তাহার পর বলিল, তাঁ'র সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিয়েছেন।"

"বটে!—সব!—কিন্তু তুমি ত জান, আমি তাঁ'র ছেলে, আমাকে না দিয়ে, পৌত্রকে, শুধু একা তোমাকে দেওয়া তাঁ'র ঘোর অন্যায়! তাঁ'র নিজের দুই ছেলে থাকতে, এক জনের এক সন্তানকে সব দেওয়া গুরুতর পক্ষপাতিতা, অবিচার! তোমারও কিন্তু নেওয়া উচিত হয়নি।"

চন্দ্রনাথ কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিবার পর বলিল, "আমিও তাঁ'কে বলেছিলাম, বুঝিয়েছিলাম; কিন্তু আমার কোন কথা তিনি শোনেন নি। তিনি বলেছিলেন, তাঁ'র সব সম্পত্তি

বিলিয়ে দেবেন, তবু কাকাবাবু বা তাঁর ছেলেদের দেবেন না। কাকাবাবু তাঁর সঙ্গে কোন দিন ভাল ব্যবহার করেন নি, আজকাল নাকি আরও নানা রকমে কষ্ট দিতেছেন, তাই তিনি এত নারাজ। আর—"

যুবক সহসা রসনাকে সংযত করিল। যে কথাটা জিহ্বাগ্রে আসিয়াছিল, তাহা উচ্চারণ করা সঙ্গত নহে। তাহার পিতাও যে তাহার পিতামহীর সহিত কোন দিন পুত্রের যোগ্য ব্যবহার করেন নাই, পিতামহের মৃত্যুর পর নানা কার্য্যে মাতার নয়নে অশ্রুর স্রোত বহাইয়াছিলেন, সত্য হইলেও তাহার মুখ হইতে সে কথাটা বাহির হওয়া কখনই সঙ্গত নহে।

পিতা হরমোহন তাহা লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "কি বল্‌ছিলে?"

চন্দ্রনাথ কথাটা ঘুরাইয়া লইয়া বলিল, "ঠাকুরমা মনে বড় ব্যথা পেয়েছেন। তিনি আর কাহাকেও সম্পত্তি দিতে চান না। মৃত্যুর পর পাছে সকলে ভাগাভাগি ক'রে নেয়, এ তিনি সহ্য কর্‌তে পারবেন না, বলেছেন। আমি প্রথমে নিতে চাইনি; শেষে দেখলাম, তাঁ'কে অসুখী করা আমার উচিত নয়। কোলে-পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন, যদি এ কাযে তাঁ'র তৃপ্তি হয়, কেন করব না? তা ছাড়া ন্যায়-সঙ্গত অধিকারও ত আছে!"

গর্জ্জন করিয়া হরমোহন বলিলেন, "অধিকার!—আমরা থাকতে তোমার কিসের অধিকার? আমরা ছেলে—মায়ের জিনিসে ছেলের অধিকার আগে। ছেলের পর ত পৌত্র। আমাদের না দিয়ে তোমাকে কেন দিলেন? তাঁর আরও পৌত্র ত আছে!"

চন্দ্রনাথ ধীরভাবে বলিল, "আমার ভাইদের বঞ্চিত রেখে একা আমি সে সম্পত্তি ভোগ করব না, বাবা!"

"সে অভিপ্রায় তোমার যদি না হবে, তবে একা তোমার নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে নিলে কেন?—সব তোমার চালাকি।"

পিতা ক্রমেই উষ্ণ হইয়া উঠিতেছেন দেখিয়া চন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিল, "তিনি সেই ভাবেই দানপত্র লিখিয়ে-ছিলেন।"

"তুমি প্রতিবাদ কর্‌তে পারতে। ও সব কিছু নয়; তুমি উকীল হয়েছ, ঘোর স্বার্থপর তুমি। সকলকে ফাঁকি দেবার জন্য, তাঁ'র কাছ থেকে সব তুমি লিখিয়ে নিয়েছ!"

চন্দ্রনাথের সুন্দর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। পিতার স্নেহ হইতে সে চিরদিনই বঞ্চিত। জ্ঞানসঞ্চারের পর, পিতার স্নেহলাভ দূরে থাকুক, দুই দণ্ডও সে কোনও দিন পিতার সঙ্গ পাইয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হয় না। পিতামহ ও পিতামহীর ক্রোড়েই সে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। পিতামহ যত দিন জীবিত ছিলেন, অধিকাংশ কাল সে তাঁহারই সঙ্গলাভ করিয়াছিল। সে তাঁহার নয়নপুত্তলী ছিল; তাহার কোন সাধ, কোন বাসনা তিনি অপূর্ণ রাখেন নাই। বড় হইয়া সে প্রতি মাসে ৫ শত টাকা খরচ করিলেও কাহারও কাছে কোনও দিন কৈফিয়ৎ দিতে হয় নাই। পিতামহের দান, মুক্তহস্ততা তাহার চিত্তে এমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, অর্থ-ব্যয় সম্বন্ধে কোনরূপ সঙ্কোচ কোনও দিন তাহার মনে ক্ষোভের সঞ্চার করে নাই। জমীদারীর আয় যে পরিমাণ ছিল, বংশানুক্রমিক ব্যবসায়ের আয় তদপেক্ষা অনেক বেশী ছিল, কাজেই অর্থের অভাব তাহাকে কোন দিন বোধ করিতে হয় নাই। অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে ললিতকলার চর্চ্চায় তাহার খরচ খুবই বেশী ছিল। তাহার এই প্রকার সংযম-হীন অর্থব্যয় দেখিয়া হরমোহন মনে মনে অত্যন্ত বিরক্ত হইতেন। তাঁহার সংযত জীবনে নীতিজ্ঞান অত্যন্ত প্রবল ছিল বলিয়া পুত্রের ব্যবহারে তিনি উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা করিতেন। কিন্তু অসন্তুষ্ট ও বিরক্ত হইলেও পুত্রকে এ বিষয়ে তিনি শাসন করিতে পারিতেন না। পিতাকে তিনি ভক্তি না করুন, অত্যন্ত ভয় করিতেন। সহৃদয়, তেজস্বী পিতার কৃত কার্য্যের প্রতিবাদ করিবার সামর্থ্য তাঁহার ছিল না এবং নীতিজ্ঞানের সংস্কার বশতঃ পিতার কার্য্যে সমালোচনা করাকে তিনি গুরু অপরাধ বলিয়াই মনে করিতেন। সুতরাং মতের বিরোধী হইলেও পিতার অভিমতকে শিরোধার্য্য করিয়া লইতে হইত।

পাঁচ বৎসর সেই পিতা পরলোকে। সমগ্র সম্পত্তির প্রভু এখন তিনি। পিতৃবিয়োগের পর হইতেই পুত্রকে তাঁহার মতানুবর্ত্তী করিবার জন্য হরমোহন চেষ্টা করিতেছিলেন। পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলেও তাহাকে বালকের ন্যায় শাসন করিবার স্পৃহা তাঁহাতে বিদ্যমান ছিল। পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ যে শুধু শাসক ও শাসিতের তথাকথিত সম্বন্ধ নহে, তাহাতে যে বন্ধুত্বেরও অবকাশ আছে, এ কথা হরমোহনের সম্পূর্ণ অগোচর ছিল—তিনি তাহা স্বীকারও করিতেন না। পুত্র পিতাকে ভয়

করিবে, সম্মান দেখাইবে, নতমস্তকে শুধু আদেশ-পালনে তৎপর হইবে। তাহা ছাড়া আর কিছু নহে। সুতরাং পুত্রের হৃদয় তিনি জয় করিতে পারেন নাই। পিতামহের অপরিসীম স্নেহ, অপরিমেয় বিশ্বাস ও নির্ভরতায় যে তরুণ হৃদয় গঠিত হইয়াছিল, বিপরীতমুখী শাসনপদ্ধতি তাহাকে বশ করা দূরে থাকুক, দিন দিন বিক্ষুব্ধ করিয়াই তুলিয়াছিল।

পিতার নীরস, স্নেহহীন, কঠোর বাক্য তাই আজ উচ্চ-শিক্ষিত যুবকের মনে বিদ্রোহের সঞ্চার করিল। কিন্তু অসামান্য ধৈর্য্য সহকারে চন্দ্রনাথ উদ্যত বাণীকে জিহ্বাগ্র হইতে সরাইয়া দিয়া ধীরভাবে বলিল, "আপনি অন্যায় কথা বলছেন।"

হরমোহন আপনাকে সংবরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বটে! লেখাপড়া শিখে এই জ্ঞান বুঝি তোমার হয়েছে? গুরুলঘুজ্ঞান নেই—বাপের সঙ্গে কি ক'রে কথা বলতে হয়, শেখনি! যাক্—একটা কথা জেনে রাখ, আমার মা'র সম্পত্তিতে তোমার এখন কোন অধিকার জন্মে নি। আমাদের দু'ভাইয়ের নামে সব রেজেষ্ট্রী ক'রে লিখে দাও! বুঝেছ?"

উত্তরাধিকারসূত্রে চন্দ্রনাথও অসহনীয় ঔদ্ধত্যলাভ করিয়াছিল। পিতা যদি স্নেহের সহিত আদেশ করিতেন, তবে হয় ত সে আপত্তি করিত না; কিন্তু চির-পিতৃস্নেহ-বঞ্চিত যুবক আপনাকে আর সংযত করিতে পারিল না। সে উন্নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া বলিল, "ঠাকুরমা আমাকে শপথ করিয়ে নিয়েছেন। আমি তো পেরে উঠব না।"

অগ্নিগর্ভ গিরির ন্যায় হরমোহন স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তাহার পর কঠোর কণ্ঠে বলিলেন, "তুমি জান, সমস্ত সম্পত্তির আমি মালিক? আমার বড় ছেলে হলেও আমি ইচ্ছা করলে তোমায় ত্যাজ্যপুত্র করতে পারি।"

ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া চন্দ্রনাথ নত-মস্তকে দাঁড়াইয়া রহিল।

"যদি নিজের ভাল চাও, কালই সব রেজেষ্ট্রী ক'রে দেবে।"

কম্পিত ওষ্ঠাধরকে কষ্টে কিছু সংযত করিয়া চন্দ্রনাথ দৃঢ়-কণ্ঠে বলিল, "অসম্ভব!—আমায় ক্ষমা করুন।"

বজ্রকঠোর কণ্ঠে হরমোহন বলিলেন, "অবাধ্য সন্তান! যাও, তোমার মুখ দেখতে চাই না। আমার বাড়ীতে তোমার স্থান নেই। আজ হ'তে কোন সম্বন্ধ তোমার সঙ্গে নেই!—তুমি ত্যাজ্যপুত্র।"

সমগ্র অট্টালিকা যেন সেই গুরুগর্জ্জনে শিহরিয়া উঠিল। স্তম্ভিত চন্দ্রনাথ মুহূর্ত্ত বজ্রাহতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সত্যই কি তাহার পিতা, জন্মদাতার সম্মুখে সে দাঁড়াইয়া? এই কি সংসার?—পুত্রস্নেহ, পিতাপুত্রের সম্বন্ধ এমনই ক্ষণভঙ্গুর?

দ্বারের দিকে মুখ ফিরাইতেই প্রাচীর-বিলম্বিত পিতামহের স্নেহমণ্ডিত সৌম্য-প্রতিকৃতি তাহার দৃষ্টিকে আকৃষ্ট করিল। ঐ দেবোপম, উদার-হৃদয় পিতামহের স্নেহশীতল বক্ষে তাহার একাধিপত্য ছিল বলিয়াই কি আজ সে লাঞ্ছিত, গৃহবিতাড়িত?

তাহার জিহ্বাগ্রে কঠোর প্রতিবাদ জমা হইয়াছিল, নয়নে ক্ষোভ ও অভিমানের অশ্রু অগ্নিকণার ন্যায় জ্বলিয়া গলিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছিল। প্রবল শক্তিতে সে তাহা-দিগকে সরাইয়া দিয়া নীরবে কক্ষ ত্যাগ করিল।

২

"চিঠি আছে, বাবু!"

প্রভাতে খোলা জানালার ধারে বসিয়া চন্দ্রনাথ একখানা আইনের বই পড়িতেছিল। হরকরার ডাকে হাত বাড়াইয়া সে খামে আঁটা পত্রখানা লইল। নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, চিঠিখানা তাহারই নামে। হস্তাক্ষর সুপরিচিত; সে বুঝিল, কে তাহাকে লিখিয়াছে। কিন্তু খাম খুলিয়া পত্র পড়িবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ সে প্রকাশ করিল না। যদি কেহ সে সময় ঘরের মধ্যে থাকিত, তবে দেখিতে পাইত, মৃদু, ম্লান হাস্যরেখা তাহার অধরপ্রান্তে উদ্ভাসিত হইয়াছে।

চা লইয়া ভৃত্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। এক চুমুক চা পান করিয়া সে মুহূর্ত্ত নয়ন নিমীলিত করিল; তাহার পর টেবলের উপর হইতে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। পত্রে এইরূপ লেখা ছিল।—

"শ্রীচরণেষু,

দাদা, তুমি ত আমাদের কথা ভুলিয়া গিয়াছ। বড় দেখিতে ইচ্ছা করে; কিন্তু তুমি ত এখানে আসিবে না। আসিতে বলিবারও পথ নাই। শ্বশুরবাড়ী যখন থাকি, সেখানেও তুমি যাইতে চাহ নাই। তবে দেখা কেমন করিয়া হইবে? তোমার ওখানে যাইতে পারিলে দেখা হয়, কিন্তু বাবার কঠোর আদেশ—সে হইবে না। তাঁহার নিষেধ না মানিয়া যাইতে পারি; কিন্তু মন দুর্ব্বল—কোন দিন আদেশ লঙ্ঘন করিতে শিখি নাই। তাঁহার কাজের বিচার করিবার

শক্তিও আমাদের নাই ; অভাগিনী ছোট বোন্‌কে সে জন্য ক্ষমা করিও। অদৃষ্ট ছাড়া কাহাকে দোষ দিব ? বৌদিদিকে লইয়া কত আমোদ-আহ্লাদ করিব, বরাবরই এ সাধ ছিল ; কিন্তু এমনই ভাগ্য, তাঁহার চেহারা পর্য্যন্ত দেখিবার সুযোগও ঘটিল না।

আজ একটা কথা জানাইতেছি। এ বাড়ীর কেহ তাহা তোমাকে জানাইবে না, সে সাহস ও অধিকার কাহারও নাই ; মা'র পর্য্যন্ত নাই। কিন্তু আমি ত আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। বাবার কঠিন পীড়া—সে শরীর আর নাই। ডাক্তার বলিতেছেন, জীবনের আশা অল্প। আমরা মেয়েমানুষ শুধু কাঁদিতেই জানি, কাঁদিয়া পাহাড় ভাসাইতে পারি। হেম ও তারাপদ এখনও কিছু বুঝে না। সংসারেও নানা বিশৃঙ্খলা। তোমাকে কি বলিব, তুমি বড় ভাই, তোমাকে উপদেশ দিবার অধিকারও নাই। তুমি পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্—তোমার কর্ত্তব্য তুমিই ভাল বুঝিবে। প্রণাম লও।

ইতি—

স্নেহের বোন্ লীলা।"

পত্রখানা ধীরে ধীরে টেবলের উপর রাখিয়া চন্দ্রনাথ মনোযোগ সহকারে চা-পান করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে একটা ক্ষীণ হাস্যরেখা তাহার ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিতেছিল। তাহা বিজয়ীর আনন্দ-গর্ব্ব, অথবা দীর্ণপ্রাণের ব্যথার রেখা !

চায়ের পেয়ালা রাখিয়া দিয়া একটা সিগার ধরাইয়া চন্দ্রনাথ চেয়ারে হেলান দিয়া বসিল। তিন বৎসরের কঠোর জীবনযাত্রার মর্ম্মান্তিক স্মৃতিগুলি কি সিগারের ধূমের মত উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর ?

স্কলারশিপলব্ধ অর্থের দ্বারা ক্রীত কতকগুলি আইন-গ্রন্থ, শয্যা ও একটি ট্রাঙ্ক লইয়া স্মরণীয় রজনীতে প্রায় রিক্তহস্তে সেই যে সে আশৈশবের স্মৃতিভরা গৃহ ত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দারিদ্র্যকে বরণ করিয়া জীবন-সংগ্রামে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, তাহার ইতিহাস ত জীবনের প্রত্যেক মুহূর্ত্তকে তিক্ত করিয়া রাখিয়াছে। সে স্মৃতি কি ভুলিতে পারা যায় ?

ভোগায়তন দেহ, চির-সুখাভ্যস্ত জীবন—অভাবের সহিত কোন পরিচয় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যাহার ছিল না, তাহার পক্ষে প্রতিদিনের অন্ন-সংস্থান করিবার বিপুল প্রয়াস কি কষ্টকর, কি ভীষণ, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া অন্যের কল্পনার অতীত। আলো-বাতাস-বিহীন মেসের ঘরে বাস, অশনবসনের দারুণ বিভীষিকা ! অভাব, দীনতা তাহার যৌবনের সকল সুখ-স্বপ্নকে যবনিকার অন্তরালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। হাইকোর্টে নাম লেখা থাকিলেও, আশু উপার্জ্জনের আশায় পুলিস-কোর্টে সমস্ত দিন মক্কেলের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকা তাহার জীবনকে দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছিল, তথাপি সে হতাশ হয় নাই। প্রতি পদে বাধার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া সে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

পিতামহী-প্রদত্ত সম্পত্তির আয় হইতে আইনের বলে সে স্বল্পায়াসে টাকা লইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিত ; কিন্তু চন্দ্রনাথ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সে অনাহারে মরিবে, তথাপি সে টাকা নিজের জন্য ব্যয় করিবে না। জিদ ও শপথের বশে সে তাহার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার ত্যাগ করে নাই, সে জন্য তাহাকে পিতৃদ্রোহী হইতেও হইয়াছে ; কিন্তু অন্যের দানলব্ধ অর্থের দ্বারা সে আর আপনাকে রক্ষা করিবে না, কখনই নহে। নিজের শক্তি ও সাধনার বলে যদি সে আত্মরক্ষা করিতে পারে, পায় ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারে, তবেই সে দাঁড়াইবে, নচেৎ জীবন-সংগ্রামে সে আত্মবিসর্জ্জন করিবে। কাপুরুষের, অপদার্থের জন্য সংসার নহে, তাহাদের মরাই ভাল। বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও অটুট স্বাস্থ্য লইয়া যদি সে আত্মপ্রতিষ্ঠায় অসমর্থ হয়, তবে তেমন জীবনধারণের প্রয়োজন কি ?

একাগ্র-সাধনার, প্রাণপাত পরিশ্রম ও চেষ্টার দ্বারা সে জীবন-সংগ্রামে টিকিয়া গিয়াছিল। প্রচুর ধনাগম না হইলেও ওকালতী ও সাহিত্যচর্চ্চার দ্বারা স্বাধীনভাবে সে কলিকাতার খরচ চালাইয়া লইতেছে। বিজয়-মুকুটের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত নহে।

সিগারের ধূম কুণ্ডলাকারে উঠিয়া বাতায়ন-পথে বাহির হইতে লাগিল।

কিন্তু জন্মদাতা পিতা ও আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহার দুঃস্বপ্নের মত চিরদিনই তাহাকে অনুসরণ করিতে থাকিবে। পিতৃগৃহ হইতে বিতাড়িত হইবার কয়েক মাস পরে পিতামহীকে লইয়া পিতা ও পিতৃব্যের সহিত যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, তাহা সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রপরিবারের পক্ষে শ্লাঘ্য নহে। আজ সেই পুরাতন কাহিনীর স্মৃতি তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল।

কোনও বন্ধুর প্রেরিত তারের সংবাদে সে জানিতে পারিয়াছিল, দেশে গিয়া পিতা ও পিতৃব্য তাহার স্নেহময়ী পিতামহীকে দানপত্র নাকচ করিবার জন্য পীড়ন করিতেছেন, নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছেন। সে ঘটনার কথা মনে করিতেও আজ তাহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। ধন-সম্পত্তির লোভ মানুষকে এমনই হেয় করিয়া তুলে? পিতামহীকে রক্ষা করিবার বাসনায় দেশে—গ্রামে উপস্থিত হওয়ায় যে আগুন জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম হইয়াছিল, তাহার পরিণাম কি ভীষণই না হইত! এক দিকে পিতা ও পিতৃব্যের ধন-বল, জনবল এবং অক্ষুণ্ণ প্রতাপ; অপর দিকে সে একা, সহায়হীন, সম্পদহীন যুবকমাত্র। তথাপি তাহাকে দেশের লোক যমের ন্যায় ভয় করিত। পিতামহের আমলে দেশস্থ ইতর-ভদ্র সকলেই তাহার দুঃসাহস, বুদ্ধিমত্তার ও কূট কৌশলের অনেক পরিচয় পাইয়াছিল। সুতরাং তাহার আগমনে দেশমধ্যে একটা বিরাট চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। সুবিধা পাইলে তাহাকে প্রাণে মারিতেও কেহ কেহ কুণ্ঠিত হইবে না, এ সংবাদও সে পাইয়াছিল। কিন্তু সে ত বল প্রকাশ করিতে যায় নাই। তথাপি জিলা-হাকিমের আদেশে চন্দ্রনাথকে দারোগা নজরবন্দী করিয়া রাখিয়াছিল—পাছে অশান্তি বা গোলযোগ ঘটে। জিলার য়ুরোপীয় হাকিম গোপনে সরেজমীনে তদন্ত করিতে আসিতেছেন, পূর্ব্বাহ্নে জানিতে পারিয়া অন্যের অগোচরে সে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করায় হাঙ্গামা অনেকটা হাল্কা হইয়া গিয়াছিল। নির্ভীক চন্দ্রনাথ অকপটে ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়াছিল। হাকিম তাহাকে সঙ্গে লইয়া অতর্কিতভাবে জমীদার-বাটীতে উপস্থিত হয়েন—প্রাঙ্গণে তখনও লাঠিয়ালের দল জমায়েৎ হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল; বুদ্ধিমান্ হাকিম চন্দ্রনাথের কথার যাথার্থ্য তখনই বুঝিয়াছিলেন। তাহার পর সূক্ষ্ম যবনিকার অন্তরালে অবস্থিতা বৃদ্ধার জবানবন্দী লইয়া 'সাহেব' যখন জানিতে পারিলেন, তিনি পুত্রদিগের কাছে থাকিতে চাহেন না, পৌত্রের কাছে যাইতে চাহেন,তখন পিতা ও পিতৃব্যের পরাজয়ে চন্দ্রনাথ হৃষ্ট হইলেও সুখী হইতে পারে নাই। ইচ্ছা করিলে সে তাঁহাদিগকে অবৈধ আটকের ধারায় ফেলিয়া প্রতিশোধ লইতে পারিত; কিন্তু তাহার ফৌজদারী আইনজ্ঞান এমনভাবে প্রশ্নজালের সৃষ্টি করিয়াছিল যে, আইনের ফাঁদে কাহাকেও জড়িত করা চলে না। সহৃদয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহিরে আসিয়া এ জন্য তাহাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে পিতামহীকে মুক্ত করিতে আসিয়াছিল, উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইয়াছিল।

চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছিল। চন্দ্রনাথ উহা ধরাইয়া লইল।

বাস্তবিক পিতার সহিত সংঘর্ষ হওয়াই কি তাহার অদৃষ্ট-লিপি? এমন দুর্ভাগ্য লইয়া কয় জন পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে? কোন দরিদ্র ঘরের সুলক্ষণা কন্যার সহিত তাহার বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে বহুপূর্ব্বে তাহার পিতামহ কথা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ মৃত্যু না হইলে সেইখানেই তাহার বিবাহ হইত। কিন্তু তাহার পিতা মনে মনে এ বিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কালাশৌচ গত হইলে যখন বিবাহের পুনরায় প্রস্তাব হইল, হরমোহন বাঁকিয়া দাঁড়াইলেন। রাজাবাবুর ঘরে (দেশে সকলেই তাঁহাদিগকে রাজাবাবু বলিত) দরিদ্রের কন্যা আসিবে, হরমোহন তাহাতে সম্মতি দিতে পারেন না। ধনবানের অসামান্য সুন্দরী কন্যার সন্ধান মিলিল। তখন চন্দ্রনাথ বাঁকিয়া বসিল, সে বিবাহ করিবে না। যে পিতামহ তাহার কোনও সাধ অপূর্ণ রাখেন নাই, তিনি পরলোকগত হইলেও তাঁহার সাধ, শপথ ভাঙ্গিয়া যাইবে—অসম্ভব। সে কখনই তাঁহার পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করিবে না। এই বিষয় লইয়া যখন তৃতীয় ব্যক্তির মারফতে বাদানুবাদ চলিতেছিল, সেই সময়েই চন্দ্রনাথ গৃহ-বিতাড়িত হয়।

কিন্তু পিতামহের অন্তিম সাধ সে পূর্ণ করিয়াছিল। এক বৎসর পূর্ব্বে, আয়ের স্বচ্ছলতা হইবার পর, নানা বাধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও পিতামহের নির্দ্দিষ্ট পাত্রীকে সে গৃহলক্ষ্মী করিয়া আনিয়াছে। সে সময়েও তাহার পিতা কি কম প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়াছিলেন? কিন্তু—

সহসা দ্বারপথে মনুষ্যমূর্ত্তির ছায়া পড়িল। চন্দ্রনাথের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হইয়া গেল। সে দেখিল, শুভ্রবসনা পিতামহী দাঁড়াইয়া।

ঘরে কেহ নাই দেখিয়া তিনি পৌত্রের কাছে আসিলেন। টেবলের উপর খোলা চিঠি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "কে লিখেছে, দাদা?"

"লীলা।"

"লীলা?—কি লিখেছে সে?"

"অনেক কথা, বাবার অসুখ—অবস্থা ভাল নয়। প'ড়ে দেখ।"

বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার চশমা নেই, তুই প'ড়ে শোনা।"

চন্দ্রনাথ পড়িয়া গেল। বৃদ্ধার আননে ছায়াপাত হইল। তিনি মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "আমায় একখানি গাড়ী আনিয়ে দিবি, দাদা?"

"এখনই যাবে, ঠাকুরমা?"

পাংশু-মুখে বৃদ্ধা বলিলেন, "যা-ই সে করুক, আমি ত মা! মায়ের প্রাণ—"

কথা সমাপ্ত হইল না; তিনি মুখ ফিরাইয়া লইলেন। ছয় মাস আগে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে কাল হরণ করিয়া লইয়াছিল।

চন্দ্রনাথ বাহিরে—আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "ভজা দাদাকে সঙ্গে নিয়ে তুমি যাও, আমি গাড়ী আনতে পাঠাচ্ছি।"

ভজহরি চন্দ্রনাথের পিতামহের আদরের ভৃত্য ছিল। চন্দ্রনাথকে সে কোলে-পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছিল। গৃহ-বিতাড়িত চন্দ্রনাথের মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া কিছু দিন পরে সে তাহার কাছে আসিয়া জোর করিয়া আপনার স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছিল।

"তুই ত যাবি নে, দাদা?"

"আমি?—ঠাকুরমা, তোমাদের মায়ের প্রাণ—কথাটা ঠিক। কিন্তু সব মায়ের প্রাণ কি এক?—বাপের প্রাণ,—থাক, তুমি যাবার যোগাড় কর গে।"

পৌত্রের কেশরাজির উপর সস্নেহে হাত বুলাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "ভুলতে পারিসনি, ভাই? অভিমান হবারই কথা।"

"অভিমান?—"

চন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে বিদ্যুদ্‌বিকাশের মত হাস্যরেখা খেলা করিয়া গেল।

বৃদ্ধার নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। এই স্বল্পভাষী, গভীর-হৃদয়, ভাবপ্রবণ পৌত্রের অন্তরের কোন্ কথা তাঁহার অগোচর ছিল? তরুণ যুবকের দেহে তিনি স্বামীর যৌবনকালের প্রতিচ্ছবি দেখিতেন, পিতামহের প্রকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে সে যেন সম্পূর্ণরূপে লাভ করিয়াছিল।

অন্যমনস্কভাবে চন্দ্রনাথ বলিল, "ঠাকুরমা, তোমার দানপত্রটা নিয়ে যাও। বাবা ও কাকাবাবুর ছেলেদের নামে সব লেখাপড়া ক'রে দিও।"

পৌত্রের আননে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া পিতামহী মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। তাহার পর দৃঢ়-স্বরে বলিলেন, "প্রাণটা মায়ের সত্য; কিন্তু চন্দু, আমি যা করেছি, ভেবে চিন্তেই করেছি। এ বিষয়ে আমায় তুই কোন কথা বলিসনে, ভাই।"

বৃদ্ধা ভিতরে চলিয়া গেলেন।

চন্দ্রনাথ স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

৩

চুপ!—কোন শব্দ যেন না হয়! রোগ যেখানে মৃত্যুরূপ ধরিয়া সতর্ক ও অমোঘ গতিতে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে দীর্ঘশ্বাসকেও চাপিয়া রাখিতে হইবে; পাছে সে শব্দেও মরণ-পথযাত্রীর দীর্ঘকালের সংসারমায়া-মুগ্ধ চিত্তের সঞ্চিত সংস্কার স্পন্দিত হইয়া উঠে। ধীরে সাবধানে পদক্ষেপ কর—হৃদয়ের আলোড়নকে চাপিয়া পিষিয়া ফেল!

অতি লঘুগতিতে, নিঃশব্দপদসঞ্চারে চন্দ্রনাথ অন্তঃপুরের বিস্তৃত রোগ-গৃহে প্রবেশ করিল। কত কাল পরে?

পারিবারিক প্রবীণ চিকিৎসক রোগীকে পরীক্ষা করিয়া দ্বারের নিকট আসিতেই চন্দ্রনাথকে দেখিতে পাইলেন। এ বাড়ীর ইতিহাস প্রবীণ ডাক্তারের অগোচর ছিল না। সস্নেহে চন্দ্রনাথের হাত ধরিয়া তিনি বারান্দায় গিয়া দাঁড়াইলেন; মৃদু স্বরে বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলেন। জীবন-প্রবাহ যেরূপ ক্ষীণধারায় বহিতেছে, তাহাতে যে কোনও সময়ে অন্তিম যবনিকা নামিয়া আসিতে পারে।

চন্দ্রনাথ নীরবে ডাক্তারের সতর্ক বাণী ও উপদেশ শুনিল; প্রতিবাদ অথবা অনুমোদন তাহার বাক্যে বা ব্যবহারে প্রকাশ পাইল না। চিকিৎসক তখনকার মত চলিয়া গেলে চন্দ্রনাথ রোগীর কক্ষে ছায়া-মূর্ত্তির মত প্রবেশ করিল। গৃহের এক কোণে একটিমাত্র বিদ্যুতের আলো জ্বলিতেছিল। সেই নিস্তব্ধ স্বল্পালোকদীপ্ত গৃহের মধ্যে যাহারা বসিয়াছিল, সকলেরই দৃষ্টি যুগপৎ তাহার দিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

কিশোর কনিষ্ঠযুগল ও সহোদরার অশ্রু-ম্লান আননের প্রতি একবার চাহিয়াই চন্দ্রনাথ রোগ-শয্যার দিকে দৃষ্টি

ফিরাইল। শিরোদেশে ও পদতলে ক্ষোদিত পাষাণ-মূর্ত্তির মত দুই জন রমণী বসিয়াছিলেন। বৃদ্ধার আনন গম্ভীর, ম্লান। জননীর নয়নে নৈরাশ্য ও আসন্ন শোকের পূর্ব্বাভাস।

রোগীর পদতলের দিক্ হইতে জমাট দীর্ঘশ্বাস ও চাপা ক্রন্দনের অস্ফুট ধ্বনি নির্গত হইতেই চন্দ্রনাথ স্বীয় ওষ্ঠে তর্জ্জনী স্থাপন করিল। অমনই মন্ত্রবলে যেন সব থামিয়া গেল।

রোগীর মাথার দিকের দেওয়ালে যে সুস্থ, সবল-দেহ, গম্ভীরাকৃতি পুরুষের প্রতিকৃতি দুলিতেছিল, শয্যাশায়ী, কঙ্কালসার এই রোগীর সহিত তাহার সাদৃশ্য কতটুকু? আসন্ন-মৃত্যুর তুষার-শীতল অঙ্গুলীর স্পর্শে স্বাস্থ্য, শক্তি ও সৌন্দর্য্যের সকল সম্পদ এমনই নিশ্চিহ্নভাবে অপহৃত হইয়াছে! প্রশস্ত ললাটের সে প্রবল ভ্রূকুটি-রেখা কোথায় গেল?—মুখের সে দৃঢ়, অবিচলিত গাম্ভীর্য্য?

চন্দ্রনাথ বহুক্ষণ নিস্পন্দভাবে, চেতনাহীন অথবা আশু সুপ্ত রোগীর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মাতার অবগুণ্ঠনমুক্ত মাথার উপর, সীমন্তদেশে চওড়া লালপাড় সাড়ীর অগ্রভাগ যেন জ্বল-জ্বল করিতেছিল। রক্তলেশহীন পাণ্ডুর মুখের দিকে সে চাহিয়া থাকিতে পারিল না।

কোন্‌টা বড়?—স্বাভাবিক সংস্কারের প্রভাব, না কর্ত্তব্যের প্রেরণা? চন্দ্রনাথ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিল। হৃদয়-উদ্যানে সুন্দর ও গন্ধভরা ফুলগুলি কোমল দলরাজি বিকসিত করিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল, এই কয় বৎসরে সবই কি শুকাইয়া ঝরিয়া পড়িয়াছে?

সে ত্যাজ্য পুত্র, পুত্রের কোন অধিকারই তাহার নাই। শুধু কর্ত্তব্য, মানুষের কর্ত্তব্য তাহাকে পালন করিয়া যাইতে হইবে। ইহাই তাহার অদৃষ্টলিপি।

যেমন নীরবে সে আসিয়াছিল, ঠিক তেমনই নিঃশব্দে সে কক্ষ ত্যাগ করিল। সে বারান্দায় আসিতেই কনিষ্ঠ সহোদর-যুগল তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। মধ্যম হেমনাথ অশ্রু-জড়িত কণ্ঠে বলিল, "দাদা, আমাদের অপরাধী করো না। বাবার অবস্থা দেখলে ত, এবার ধনে-প্রাণে আমরা মারা যাব।"

অশ্রুহীননেত্রে চন্দ্রনাথ কনিষ্ঠের দিকে চাহিল, কিন্তু সান্ত্বনার কোন কথা সে বলিল না।

"ব্যবসা ও বিষয়ের সব কথা তুমি বোধ হয় জান না। বাবা সেই শোকেই বুঝি চ'লে যাচ্ছেন।"

চন্দ্রনাথ এবার কথা কহিল; বলিল, "সব শুনেছি। এখন ঘরে যাও, ছেলের কর্ত্তব্য পালন কর গে, ভাই!"

"তুমি কি চ'লে যাচ্ছ, দাদা?"

আবার ম্লান হাস্য ক্ষণিকের জন্য চন্দ্রনাথের ওষ্ঠপ্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

অধোবদনে দাঁড়াইয়া হেমনাথ চেষ্টা করিয়া বলিল, "তবু দাদা, তুমি থাক্‌লে—"

হস্তেঙ্গিতে তাহাদিগকে বিদায় দিয়া চন্দ্রনাথ মৃদুস্বরে বলিল, "তোমাদের প্রধান কাজ বাবার সেবা করা, তাই ভাল ক'রে কর।"

উভয়ে মুহ্যমানভাবে ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। চন্দ্রনাথ সিঁড়ির দিকে অগ্রসর হইল। সহসা পার্শ্বের ঘরের খোলা দ্বারপথে এক তরুণী সুন্দরী বাহির হইয়া আসিল।

"দাদা!—"

লীলার গণ্ড বহিয়া ধারায় ধারায় অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল।

"সেই এলে, যদি আর কিছু দিন আগে আস্‌তে, দাদা!"

চন্দ্রনাথ গম্ভীরভাবে বলিল, "সব ভুলে গেছিস, বোন্? বাবার জ্ঞান থাকতে এলে, জোর ক'রে তাঁকে মেরে ফেলা হ'ত না কি? তাঁকে কি এত দিনেও চিন্‌তে পারিসনি?"

লীলা বুঝিল, বুঝিয়া দৃষ্টি নত করিল।

"বৌকে একবার আন্‌লে না কেন?"

কেন?—এই কেন'র উত্তর কে দিবে? ইহার উত্তর আছে কি?

চন্দ্রনাথ শুধু বলিল, "যেখানে তোর নিজের কোন অধিকার নেই, যেখানে তুই অনাদৃতা, উপেক্ষিতা—তোর স্বামীকে সেখানে তুই নিয়ে যেতে পারিস্?"

লীলা আর কথা বলিল না।

চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

৪

ত্যাজ্যপুত্র হইলেও চন্দ্রনাথ পিতৃবিয়োগের পর যথারীতি কাছা গলায় লইয়া অশৌচ পালন ও হবিষ্য করিতে লাগিল। মুখাগ্নির সময় স্বার্থপর আত্মীয়গণ তাহাকে সংবাদ দেয় নাই; দেওয়া প্রয়োজন মনে করে নাই। শোকবিহ্বল, অপরিণতবুদ্ধি

কনিষ্ঠযুগল সে অবস্থায় প্রবীণ আত্মীয়গণের উপদেশানুসারে যন্ত্রচালিতবৎ কাজ করিয়া গিয়াছিল। পিতৃবিয়োগ-শোকে কাতর হইলেও শুধু লীলা কয়েকবার তাহার দাদার কথা তুলিয়াছিল; কিন্তু আত্মীয়গণের প্রচণ্ড কলরব ও বিতণ্ডার স্রোতোধারার বিভীষণ গর্জ্জনে তাহার শোককাতর কণ্ঠের ক্ষীণ শব্দ কোথায় ডুবিয়া গিয়াছিল! পুত্রশোকাতুরা বৃদ্ধা পিতামহী ভূমিশয্যা লইয়াছিলেন, আর সদ্যঃস্বামি-বিয়োগবিধুরা জননীর ত কথাই ছিল না। সংসারে কি ঘটিতেছিল, সে সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই তাঁহার ছিল না।

যথাসময়ে আত্মীয়গণের ব্যবহারের কথা সবই চন্দ্রনাথের কাণে গিয়াছিল; কিন্তু কোনরূপ মন্তব্য সে প্রকাশ করে নাই। সে যখন ত্যাজ্যপুত্র, তখন তাহার বলিবার কি-ই বা ছিল? পিতৃবিয়োগের পর শোকাতুরা মাতা প্রভৃতিকে দেখিতে যাওয়া তাহার কর্ত্তব্য ছিল; কিন্তু নানা দিক ভাবিয়া সে মনের আবেগ সংবরণ করিয়াছিল।

কিন্তু যে দিন হেমনাথ ও তারানাথ তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য আসিল, সে দিন চন্দ্রনাথকে যাইতে হইল। কনিষ্ঠদিগের অশ্রুভরা কণ্ঠের মিনতি সে উপেক্ষা করিতে পারিল না। সে আইন-ব্যবসায়ী, সেই হিসাবেই সে পিতৃগৃহে গমন করিল।

বাহিরের ঘরে যেখানে তাহার পিতামহ, পিতা প্রভৃতি বিষয়-সংক্রান্ত কাজ বা পরামর্শ করিতেন, সেই সুপ্রশস্ত কক্ষে সকলে সমবেত হইয়াছিল। বাহিরের কোন লোক অথবা অন্য কোন আত্মীয়কে হেমনাথ সেখানে আহ্বান করে নাই। তাহারা কয় ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা ও পিতামহী মাত্র তথায় ছিলেন। আজ যে সকল কথা আলোচনা হইবে, তাহা অন্য ব্যক্তির নিকট বলিবার নহে। হিতৈষী আত্মীয়গণ ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেও হেমনাথ এ বিষয়ে দৃঢ়তা দেখাইতে ভুলিল না।

চারিদিকের দ্বার রুদ্ধ করিয়া হেমনাথ বিষয় ও ব্যবসা-সংক্রান্ত বর্ত্তমান অবস্থার কথা যতদূর জানিত, সমস্ত বলিল, পিতা ও খুল্লতাতের বিষয়জ্ঞান সম্বন্ধে অন্ধ ধারণা, এবং কর্ম্মচারীদিগের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফলে, অথবা যে কোন কারণেই হউক, ঋণ যেরূপ বাড়িয়াছে, ব্যবসায়ের যেরূপ ক্ষতি হইয়াছে, এমন কি, এক শত বৎসরের প্রচলিত 'ট্রেডমার্ক' অন্যপক্ষ কৌশলে হস্তগত করিয়া লইয়া যে মহাক্ষতি করিয়াছে, তাহাতে সমূহ বিপদ আসন্ন। কর্ম্মচারী ও আত্মীয়গণ মৌখিক আত্মীয়তা দেখাইলেও ঘোর চক্রান্ত ও ষড়্‌যন্ত্র করিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছে। তাহারা ব্যবসা ও জমীদারীর কাজ কিছুই বুঝে না, এখনও কলেজের পড়াশুনা লইয়া আছে। এ অবস্থায় চন্দ্রনাথ যদি কর্ণধারণ না করে, তবে তরী ঝটিকা-প্রভাবে মাঝ-দরিয়ায় ডুবিয়া যাইবে।

চন্দ্রনাথ নীরবে সকল কথা শুনিয়া গেল। অনেক কথা সে নিজেই জানিত।

হেমনাথ জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে আশাপূর্ণনেত্রে চাহিয়াছিল; কিন্তু চন্দ্রনাথ যখন কোন কথাই বলিল না, তখন নিরাশভাবে সে বলিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি ভার না নিলে সব যাবে। আমরা তোমার অংশ তোমাকে রেজেষ্ট্রী—"

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "চুপ কর, হেম। দেনার হিসাব দেখাতে পার?"

হেমনাথ বলিল যে, কর্ম্মচারীদিগের নিকট হইতে সে কোন সঠিক হিসাব এখনও পায় নাই। তবে মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে পিতা তাহাকে বলিয়াছিলেন, তিনি একটা মোটামুটি হিসাব করিয়া রাখিয়াছিলেন, লোহার আলমারীতে তাহা আছে। পীড়ার প্রথম অবস্থায় কিছুদিন তিনি বৈষয়িক ব্যাপার লইয়া যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আলমারী খোলা হইল। ব্যবসায়ীর মত গম্ভীরভাবে চন্দ্রনাথ নির্দ্দিষ্ট হিসাবের খাতাখানি টানিয়া লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল। সে দেখিল, বিষয়বুদ্ধি সম্বন্ধে পিতার তেমন অভিজ্ঞতা না থাকিলেও শেষদিকে সত্যই তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়াছিলেন। দেনা-পাওনার মোট হিসাব মন্তব্য সহ তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ব্যবসায়ে কি ভাবে ক্ষতি হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃত করিয়া, যেখানে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, চন্দ্রনাথের দৃষ্টি তথায় পড়িল। তিনি লিখিয়াছিলেন, "ব্রজমোহন ও আমার কাহারই বিষয়-বুদ্ধি নাই। ব্রজ ত চলিয়া গিয়াছে। আমিও রুগ্ন, অসমর্থ। যদি আগে এ সব দেখিতাম! যাহারা এমন করিয়া ঠকাইয়াছে, তাহাদিগকে পরাজিত করা এখন অসম্ভব। এক জন—শুধু এক জন চেষ্টা করিলে আবার সব উদ্ধার করিতে পারে। কিন্তু আমি উহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিয়াছি। বাবার বিষয়বুদ্ধি, তেজ ও কৌশল তাহাতে আছে। কিন্তু সেই স্বার্থপর, বিদ্রোহী সন্তানকে আমি ক্ষমা করিতে পারি না।"

চন্দ্রনাথ পাতা উল্টাইয়া গেল। বহুক্ষণ পরীক্ষার পর সে বুঝিল, তাহাদের বংশগৌরব, সম্মান, প্রতিপত্তি আর কয়েক বৎসরের মধ্যে শুধু কিংবদন্তীতেই পর্য্যবসিত হইবে।

হেমনাথ অধীরভাবে বলিল. "বাবার উইল আমরা নাকচ ক'রে দেব। তিনি ভারী অন্যায় ক'রে গেছেন।"

সুপ্তোত্থিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "হেম, যাঁরা এখন পরলোকে, তাঁ'দের কাজের সমালোচনা করা অপরাধ।"

লীলা পিতার লিখিত খাতাখানা পড়িতেছিল। সে জমীদারের কন্যা, জমীদারের গৃহিণী। আপনার সংসারে সে সর্ব্বময়ী কর্ত্রী—স্বামীর মন্ত্রণাদাত্রী। সে বলিয়া উঠিল, "দাদা, তুমি থাকতে সব যাবে? আমাদের পিতৃবংশের নাম ডুবে যাবে?"

চন্দ্রনাথ গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল।

পিতামহী এতক্ষণ চুপ করিয়া সকল কথা শুনিতেছিলেন। দৃঢ়স্বরে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "চন্দু, রায়বংশের মান রক্ষা কর, ভাই।"

রায়বংশের মান? হাঁ, তাহাতে ত তাহার জন্মগত অধিকার। সেই মহাবংশের সম্মান—যে বংশে তাহার পিতামহ জন্মিয়াছেন, যে বংশের রক্তস্রোত তাহার ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে, যে মহাবংশের মহৎ কীর্ত্তিকথা দেশের লোক আজও গান করিয়া বেড়ায়, কতকগুলি ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক, শঠ সেই বংশগৌরবকে ধূলিসাৎ করিয়া দিবে?

সেই বিস্তৃত গৃহমধ্যে, প্রাচীরগাত্রে পূর্ব্বপুরুষগণের তৈলচিত্রসমূহ দুলিতেছিল। সম্মুখেই তাহার পিতামহের প্রতিভাদীপ্ত, হাস্যময় আননের প্রতিচ্ছবি। বহুক্ষণ সে সেই দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ভাবিতে লাগিল।

সহসা সন্নিকটে দীর্ঘশ্বাসের শব্দে সে চমকিয়া উঠিল। পার্শ্বে তাহার জননীর বিষণ্ণ মূর্ত্তি! শ্বেতবসনা, বিষাদিনী প্রতিমাকে যেন ভিন্নলোকবাসিনী দেবী বলিয়া তাহার ভ্রম জন্মিল। জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতেই যে সীমন্তে নারীজাতির শ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদরেখার রক্তরাগ সে দেখিয়া আসিয়াছে, আজ তাহা শুধু শ্বেত রেখায় পর্য্যবসিত। স্বামীর আজ্ঞানুসারিণী, কর্ত্তব্যপরায়ণা জননীকে সে ভালরূপেই জানিত। স্বামীর আদেশ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে গিয়া কিরূপে ক্রমেই তিনি ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার সংবাদ সে যে একবারে পায় নাই, তাহা নহে।

জ্যেষ্ঠপুত্রের হাত ধরিয়া বিষাদিনী মাতা বলিলেন, "তিনি যাই ক'রে থাকুন, চন্দু, তোর ছোট ভাই দু'টিকে আমি তোরই হাতে সঁপে দিলুম, বাবা!"

হৃদয় ও হস্তের কম্পনবেগকে অতিকষ্টে সংযত করিয়া অস্ফুটস্বরে সে বলিল, "আচ্ছা, দেখি।"

৫

রায়-ভবনে উৎসবের আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। চারি বৎসরের কঠোর পরিশ্রম, প্রাণপণ চেষ্টা ও বুদ্ধিকৌশলের প্রভাবে পরলোকগত হরমোহনের সম্পত্তির ঋণ প্রায় শোধ হইয়াছিল। শত বৎসরের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়কে জ্ঞাতিশত্রুদিগের কবল হইতে উদ্ধার করার ফলেই আজ উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল।

চন্দ্রনাথকে সকলেই ভয় করিত। জনরব রটিয়াছিল, পৈতৃক সম্পত্তি ভ্রাতারা তাহাকে ভাগ করিয়া দিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক আত্মীয় ও কর্ম্মচারীরা তাহার কূটবুদ্ধি ও শাসনক্ষমতার প্রভাবে পরাজয় স্বীকার করিয়াছিল। তাহার ব্যবস্থাগুণে ও কর্ম্মতৎপরতায় আয় দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছিল। অনাদায়ী টাকা আদায় করা চন্দ্রনাথের পক্ষে সহজ হইয়া উঠিয়াছিল। আয় বাড়াইয়া ব্যয় কমাইয়া সে এমন বন্দোবস্ত করিয়াছিল যে, নিঃস্বার্থ আত্মীয়বান্ধবগণ তাহার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। এমন সুযোগ্য সন্তানকে ত্যাজ্যপুত্র করা যে হরমোহনের নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক, তাহা একবাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইল। সুদূর-পল্লী হইতেও হিতৈষী আত্মীয় ও প্রজাবৃন্দ চন্দ্রনাথের প্রশংসা করিয়া অভিনন্দন পাঠাইতে লাগিল। জয় ও সাফল্যের আনন্দকে মূর্ত্তি দিবার উদ্দেশ্যেই মাতা ও সহোদরদিগের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে চন্দ্রনাথকে এই উৎসব অনুষ্ঠানে অনুমোদন করিতে হইয়াছিল।

লীলা তাহার স্বামীর সহিত এ উৎসবে যোগ দিতে আসিয়াছিল। অপরাহ্ণে চন্দ্রনাথ যখন একা অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল, তখন লীলা বলিল, "কৈ, বৌদিকে আন্‌লে না, দাদা?"

চন্দ্রনাথ হাসিয়া বলিল, "খোকার জ্বর হয়েছে, তাঁ'কে নিয়ে এই গণ্ডগোলে আসা উচিত কি, বোন্?"

"জ্বর ত সবে আজ হয়েছে। কালই যদি বৌদিকে পাঠাতে, চল্‌ত না কি?"

চন্দ্রনাথ এ পর্য্যন্ত তাহার নিজের বাসাতেই ছিল। বহু অনুরোধ সত্ত্বেও সে পিতৃভবনে বাস করিতে আইসে নাই।

চন্দ্রনাথ ভগিনীকে সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "তা তুই চল্ না, কাল্কে আমাদের ওখানে গিয়ে থাক্‌বি।"

লীলা অভিমানভরে বলিল, "তাঁকে এখানে আনতেই যত দোষ, দাদা?"

মৃদু হাসিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "পাগলি!"

উৎসবের ব্যবস্থা কিরূপ হইয়াছে, দেখিবার জন্য চন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে অন্য দিকে চলিয়া গেল। লীলার সুন্দর ললাট কুঞ্চিত হইল। তাহার দাদার হৃদয়ের রহস্য কি সে বুঝিতে পারিয়াছিল?

* * * *

উৎসবশেষে—পান-ভোজন ও আপ্যায়নে পরিতৃপ্ত হইয়া নিমন্ত্রিতরা চলিয়া গেলেন। কেহই চন্দ্রনাথের প্রশংসার কীর্ত্তন করিতে ভুলিলেন না। হেমনাথ ও তারানাথ হর্ষোৎফুল্লকণ্ঠে সকলকেই বলিয়া বেড়াইল, দাদা ছিলেন বলিয়া আজ তাহাদের এই সৌভাগ্য।

বাড়ীর দাস-দাসী ও ভিখারীদিগকে পরিতোষরূপে খাওয়াইয়া চন্দ্রনাথ যখন দ্বিতলে উঠিল, তখন রাত্রি ১টা। এক চন্দ্রনাথ ছাড়া অভুক্ত আর কেহই ছিল না। সে কর্ম্মকর্ত্তা—একটি প্রাণী অভুক্ত থাকিতে জলগ্রহণ করিতে নাই, পিতামহের জীবনে সেই আদর্শের শিক্ষাই সে পাইয়াছিল।

তত রাত্রিতে স্নান-শেষে চন্দ্রনাথ যখন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া আসিল, লীলা বলিল, "চল দাদা, এইবার তুমি খাবে এস।"

চন্দ্রনাথ পাঞ্জাবীর বোতাম আঁটিতে আঁটিতে বলিল, "হাঁ রে, এই ক'বছরে তোরা আমাকে একেবারেই ভুলে ব'সে আছিস? লোকজন খাওয়ানর পর কোন দিন আমাকে জলস্পর্শ করতে দেখেছিস তোরা? আচ্ছা মা, তুমিই বল!"

সমবেত সকলকেই সে কথা স্বীকার করিতে হইল। লীলাও যে তাহা না জানিত, তাহা নহে।

বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া চন্দ্রনাথ পকেট হইতে একখানা কাগজ টানিয়া বাহির করিল। সহোদর ও খুল্লতাতভ্রাতাকে কাছে টানিয়া লইয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "ঠাকুর-মা যে সম্পত্তি আমায় দান ক'রে গিয়েছেন—যা নিয়ে এত বিবাদ, তোদের সকলকে তা এই দলিলে আমি সমান অংশে ভাগ ক'রে দিয়েছি; রেজেষ্ট্রী করা হয়েছে। আজ আমার কাজের শেষ।"

জোর করিয়া হেমনাথের হস্তের মুঠায় দলিলখানি দিয়া চন্দ্রনাথ উঠিয়া দাঁড়াইল। হেমনাথ ও তারানাথ অশ্রুসিক্তনেত্রে বলিয়া উঠিল, "দাদা, আমরাও যে রেজেষ্ট্রী ক'রে তোমার অংশ তোমাকে লিখে দিয়েছি। দাদা, তুমি আমাদের ছেড়ে যেও না।"

চন্দ্রনাথ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "ভুল করেছ, ভাই! ও সম্পত্তিতে আমার অধিকার নেই, আমি ত্যাজ্যপুত্র, তোমরা দিলেও আমি নিতে পারি না।"

"বাবা যদি অন্যায় ক'রে থাকেন—"

"চুপ কর, তারানাথ! গুরু-নিন্দা করতে নেই—বিশেষতঃ বাবা এখন স্বর্গে গেছেন। তাঁর কাজের বিচার করবার অধিকার কারও নেই। গুরুজনের আদেশ মাথা পেতে নিতে হয়।"

লীলা বলিয়া উঠিল, "দাদা--"

বাধা দিয়া চন্দ্রনাথ বলিল, "বুঝেছি বোন্—তবে আমি কেন বাবার আদেশ পালন করিনি, এই কথা তুমি বল্‌তে চাও? কিন্তু ভুলে যাচ্ছ, লীলা, বাবা আমার গুরু; কিন্তু ঠাকুর্দ্দা, ঠাকুরমা তাঁরও গুরু। আমি আমার বাবার আদেশ সম্পূর্ণ পালন কর্‌তে পারিনি—তাঁর যাঁরা গুরু, তাঁদের আদেশ পালন করেছি মাত্র। বাবা আমায় স্বেচ্ছায় ত্যাগ করেছেন, তাঁর সে আদেশ লঙ্ঘন করবার শক্তি আমার নেই; কোনমতেই তা পারবো না। তোমরা সুখী হও, ভাই।"

সেই উন্নতশীর্ষ, দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠ যুবকের মুখমণ্ডলে সত্যনিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও চরিত্রগর্ব্বের একটা তেজ নির্গত হইতেছিল। কেহ প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইল না।

বিধবা জননী ধীরে ধীরে সন্তানের সমীপবর্ত্তী হইলেন; পুত্রের মস্তকে হাত রাখিয়া বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "বাবা!"

"মা!"

নত হইয়া মাতার চরণধূলি মাথায় লইয়া ত্যাজ্যপুত্র দৃঢ়চরণে কক্ষ ত্যাগ করিল।

মাসিক বসুমতী, আশ্বিন, ১৩৩০।

ভিক্ষা

১

পাটনা জংশন ষ্টেশনে যাত্রিপূর্ণ পঞ্জাব মেল দাঁড়াইয়া ছিল। উহা তখনই ছাড়িবে। প্রথম ঘণ্টা অনেকক্ষণ হইল আরোহী-দিগকে সতর্ক করিয়া বাজিয়া গিয়াছে। যাহারা বিলম্বে টিকিট কিনিয়াছিল, স্থানের আশায় তাহারা ছুটাছুটি করিয়া এক কামরা হইতে অন্য কামরার দ্বারে ব্যগ্রভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছিল। কিন্তু প্রত্যেক কক্ষই যাত্রীতে পরিপূর্ণ। পূজার অবকাশ শেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহারা অবসর-যাপনের জন্য ছুটীতে পশ্চিমের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে-ছিলেন, তাঁহারা সকলেই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে ব্যগ্র, কাজেই গাড়ীতে তিলধারণের স্থান ছিল না।

গার্ড প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা হস্তে পশ্চাতের ব্রেকের কাছে দণ্ডায়মান। তাহার বাম হস্তে বাঁশী। গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই।

এমন সময় সাধারণ ভদ্র-পরিচ্ছদধারী এক বাঙ্গালী যুবক তাড়াতাড়ি একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। চকিতে গাড়ীর মধ্যে চাহিয়া দেখিয়া সে পশ্চা-দ্বর্ত্তী কাহাকে ডাকিয়া বলিল, "মামা, এ দিকে আসুন। এখানে জায়গা আছে। চট ক'রে আসুন!"

একটি প্রৌঢ় হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহার অগ্রে একটি কুলী একটা ট্রাঙ্ক, দুইটি ছোট বিছানার মোট ও একটি 'পোর্টমেণ্ট' লইয়া আসিতেছিতেছিল।

যুবক মুহূর্ত্তমধ্যে দরজার হাতল ঘুরাইয়া উহা খুলিয়া ফেলিল। কিন্তু সে কামরায় প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই কক্ষমধ্যস্থ দুই জন শ্বেতাঙ্গ আরোহী ব্যাঘ্রের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া দরজা চাপিয়া ধরিল; তাহার পর তীব্রস্বরে বলিল, "এই ও, ভাগো হিঁয়াসে! দোস্‌রা কামরামে যাও!"

এইরূপে বাধা পাইয়া যুবক মুহূর্ত্তমাত্র সেই শ্বেতাঙ্গ-যুগলের দিকে দৃষ্টিপাত করিল। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি বলিয়া উঠিলেন, "চল, বাপু, অন্য কামরা দেখি!"

যুবক তখন শান্তভাবে বিশুদ্ধ ইংরাজীতে বলিল, "অন্য গাড়ীতে স্থান নাই। এই গাড়ীতেই আমরা যাইব। পথ ছাড়ুন, সময় নাই।"

শ্বেতাঙ্গযুগল সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল,—"নেহি হোগা। নেটিভ্‌কো ওয়াস্তে দোসরা কামরা হ্যায়। ভাগো, জল্‌দি।"

বৃথা বাক্যব্যয়ের তখন সময় ছিল না। শ্বেতাঙ্গযুগলের বলপ্রকাশ সত্ত্বেও, যুবক অবলীলাক্রমে দ্বার ঠেলিয়া খুলিয়া ফেলিল। তাহারা বাধা দিবার পূর্ব্বেই একলম্ফে সে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দক্ষিণ হস্তের সাহায্যে প্রৌঢ়কে একরূপ টানিয়াই গাড়ীর মধ্যে তুলিল।

তখন গার্ডের হুইশিল বাজিয়া উঠিয়াছিল। হাত বাড়া-ইয়া মোটমাটগুলি ক্ষিপ্রতাসহকারে গাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইয়া যুবক দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। গাড়ী তখন চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুলী পুরস্কারের আশায় গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে ছুটিয়া চলিল। একটা টাকা তাহার প্রসারিত হস্তে গুঁজিয়া দিয়া যুবক কামরার মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

ক্রুদ্ধ দানবের মত শ্বেতাঙ্গ আরোহিযুগল বলিয়া উঠিল, "ড্যাম্ নিগার!" পরক্ষণেই উভয়ে এক একটা বিছানার মোট তুলিয়া লইয়া বাহিরে নিক্ষেপ করিবার উপক্রম করিল। এই দৃশ্যে প্রৌঢ় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

যুবক গর্জ্জন করিয়া বলিল, "খবরদার!"

সঙ্গে সঙ্গে সে দুই হস্তের সাহায্যে উহাদের নিকট হইতে বিছানার মোট দুইটি কাড়িয়া লইল। শ্বেতাঙ্গযুগল তখন মুষ্টি উদ্যত করিয়া ছুটিয়া আসিল। এক জন সন্নিহিত প্রৌঢ়ের স্কন্ধদেশ ধরিয়া বিষম ঝাঁকানি দিল। তিনি "বাবা রে, মলাম", বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন।

যুবক অপূর্ব্ব ক্ষিপ্রতা সহকারে অগ্রবর্ত্তী শ্বেতাঙ্গের কবল হইতে প্রৌঢ়কে সরাইয়া দিয়া "সাহেবকে" এমন ঠেলা মারিল যে, সে অপর ব্যক্তির ঘাড়ে পড়িয়া গেল। টাল সামলাইতে না পারিয়া উভয়ে হুড়াহুড়ি করিতে করিতে বেঞ্চের উপর চিৎ হইয়া পড়িল।

মুহূর্ত্তমধ্যে এই ব্যাপার ঘটিয়া গেল। ট্রেণ তখন প্লাট-ফরম ছাড়াইয়া গিয়াছে।

ত্বরিতগতিতে শ্বেতাঙ্গযুগল উঠিয়া দাঁড়াইল। ক্রোধে তাহাদের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। একটা বাঙ্গালীর হস্তে এমন অপমান! উভয়ের উচ্ছৃঙ্খল রসনা হইতে

ভদ্রলোকের অশ্রাব্য কুৎসিত গালাগালি নির্গত হইতে লাগিল।

প্রৌঢ় বিবর্ণমুখে কর্ণে অঙ্গুলী প্রদান করিলেন। যুবক সগর্জ্জনে বলিয়া উঠিল, "এখনও চুপ কর বলছি!" তাহার মুখে একটা কড়া রকমের গালাগালি আসিয়াছিল, কিন্তু সে রসনাকে বিপুল আয়াসে সংযত করিল।

অগ্রবর্ত্তী শ্বেতাঙ্গ তখন পুনরায় মুষ্টি উদ্যত করিয়া ছুটিয়া আসিল। যুবক অনায়াসে তাহার করপ্রকোষ্ঠ ধারণ করিয়া সবলে তাহাকে বেঞ্চের উপর বসাইয়া দিল।

প্রৌঢ় যুবককে পশ্চাদ্দিক্ হইতে আকর্ষণ করিলেন। "সাহেবের" সঙ্গে মারামারি বন্ধ করা প্রয়োজন বোধে তিনি তাহাকে টানিয়া আনিলেন।

যুবক দেখিল, শ্বেতাঙ্গযুগল কোট খুলিয়া ফেলিয়া জামার আস্তিন্ গুটাইতেছে। তাহারা একটা হাঙ্গামা না বাধাইয়া থামিবে না দেখিয়া যুবকও ক্ষিপ্রহস্তে তাহার কোট ও সার্ট খুলিয়া ফেলিল। গাড়ীর উজ্জল আলোকধারা তাহার নগ্ন পরিপুষ্ট দেহের উপর তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

শ্বেতাঙ্গযুগল যুবকের লৌহকপাটবৎ সুদৃঢ়, বিশাল বক্ষোদেশ এবং পেশী ও শিরাবহুল ভীম বাহুযুগল দেখিয়া সহসা স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। সেই বলময়, লৌহদৃঢ় বাহুযুগল যে সুদৃঢ় লৌহ-শৃঙ্খলও অনায়াসে ছিন্ন করিতে পারে, তাহাদের মত গোটাকয়েক ব্যক্তির মস্তক যে মুষ্ট্যাঘাতে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে, সেই ব্যায়াম-পুষ্ট দেহ দেখিয়া এমন অনুমান করিতে তাহাদের মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব হইল না।

অপেক্ষাকৃত চতুর শ্বেতাঙ্গটি বিনা বাক্যব্যয়ে এক লম্ফে বাঙ্কের উপর তড়াক করিয়া উঠিয়া বসিল। দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গের সম্মুখে গিয়া তাহার স্কন্ধদেশে করপুট রক্ষা করিয়া যুবক বলিল, "এস! একা একা লড়তে চাও? না একসঙ্গে দু'জনেই? আমি তা'তেও প্রস্তুত।"

শ্বেতাঙ্গটি তখন গর্ব্বিতভাবে বলিল, "কাঁধ ছেড়ে দাও।"

মধুরভাবে একটা ঝাঁকানি দিয়া যুবক বলিল, "তোমরা যে ভদ্রলোক নও, তা আগেই বুঝেছিলাম। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ হয়েও যে তোমরা এমন কাপুরুষ, এমন ইতর, জানতাম না। বৃদ্ধের গায় হাত দিতে লজ্জা হ'ল না? এ গাড়ীটা কি তোমার পৈতৃক সম্পত্তি? আমাদের প্রথম শ্রেণীর টিকিট আছে। কিন্তু কোন গাড়ী খালি নাই দেখে, এই গাড়ীতে উঠেছি। তোমাদের তা'তে কোন ক্ষতি হয়নি ত। তার পর, কুৎসিত গালাগালি আমরাও যে না জানি, তা নয়। তবে আমরা ভদ্রসন্তান, ওগুলো উচ্চারণ করতে আমাদের বাধে। ভাল, এখন তোমাকে যদি এই জানালা দিয়ে বিছানার পুঁটলির মত রেল-লাইনের উপর ফেলে দিই, কে তোমাকে রক্ষা করতে পারে, বল ত?"

ঝাঁকানির বেগে শ্বেতাঙ্গের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সত্যই এই বাঙ্গালীটা তাহাকে আরও অপমান করিবে না কি?

যুবক তাহার বাহু ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

সহসা সুমিষ্টকণ্ঠে কেহ বলিয়া উঠিল, "বাবু, বাবু! থাম!"

যুবক ফিরিয়া চাহিল। কামরার অপর পার্শ্বস্থ আসনের প্রতি এতক্ষণ তাহার দৃষ্টি পড়ে নাই। সে আসনে যে অন্য কোনও আরোহী আছেন, তাহা লক্ষ্য করিবার অবকাশ সে এতক্ষণ পায় নাই। এখন সে চাহিয়া দেখিল, এক প্রসন্ন-মূর্ত্তি বৃদ্ধ ইংরাজ সেই আসনে বসিয়া আছেন।

বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "বাবু, লোকটাকে ছাড়িয়া দাও। উহারা যেরূপ অভদ্র ব্যবহার করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি বাক্শক্তিরহিত হইয়াছিলাম। আমি বৃদ্ধ, তোমার পিতার বয়সী। আমি বলিতেছি, উহাকে ক্ষমা করিলে ভগবান্ তোমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন।"

মৃদু হাসিয়া যুবক বলিল, "ওরা যেরূপ কাপুরুষ, তাহাতে ওদের কিছু শিক্ষা দেওয়া উচিত।"

বৃদ্ধ ইংরাজ বলিলেন, "বাবু, তোমাদের দেশে এক জন মহাত্মা প্রচার করিতেছেন, কাহাকেও হিংসা করিতে নাই। তুমি কি তাঁহাকে শ্রদ্ধা কর না?"

যুবক বলিল, "ও! আপনি মহাত্মা গন্ধীর কথা বলছেন?"

"হাঁ। যীশুর জীবনের আদর্শ এই মহাপুরুষ যেমন বুঝিয়াছেন, বিংশ শতাব্দীতে এমন আর কেহ বুঝেন নাই। তাঁহার সাধনা সার্থক হউক। তোমাদের ধর্ম্ম বলে, 'ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ।' কেমন, নয় কি?"

যুবক সবিস্ময়ে এই বৃদ্ধ ইংরাজের দিকে চাহিল। কে ইনি? ইনি সংস্কৃত ভাষাও জানেন!

সে ধীরে ধীরে পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাঙ্গকে ত্যাগ করিয়া আপনার সার্ট কোট পরিধান করিল; তার পর তাঁহার কাছে গিয়া বলিল, "আপনি কিছু মনে করবেন না। আমি উহার কোন অনিষ্ট করতাম না। ততটা কাপুরুষ আমি নই। তবে একটু

মজা দেখা যাচ্ছিল। এখন একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? মহাশয়ের পরিচয়—"

বৃদ্ধ বলিলেন, "আমি এক জন ধর্ম্মযাজক। তোমাদের দেশে মহাত্মা গন্ধী অসহযোগ আন্দোলন করিতেছেন। উহার গতি ও পরিণতি দেখিবার জন্য আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। মিষ্টার গন্ধী প্রকৃতই মহাপুরুষ।"

যুবক বৃদ্ধের অনুরোধে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। মাতুলও ভাগিনেয়ের পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। তাহার পর উভয়ের মধ্যে আলোচনা জমাট বাঁধিয়া উঠিল।

যুবক বলিল, "মহাত্মা গন্ধীর প্রতি আমার শ্রদ্ধা আছে বটে, কিন্তু তাঁহার অহিংস অসহযোগনীতির কথা আমি বুঝতে পারি না। বিশেষতঃ চরকার সাহায্যে ভারতবর্ষের মুক্তিলাভ ঘটবে, স্বরাজ হবে, তা আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারি না।"

পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাঙ্গযুগল আগ্রহসহকারে এই আলোচনা শুনিতেছিল। ধর্ম্মযাজক বলিলেন, "যুবক, তুমি কেন, তোমাদের দেশের অনেকেই পারেন না। কিন্তু ইংলণ্ডে এমন অনেক লোক আছেন, যাঁরা তোমাদের গন্ধীর এই আন্দোলনকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেন না। চরকার শক্তি এখনই ইংলণ্ডের পক্ষে প্রচণ্ড হইয়া উঠিয়াছে। কথাটা বুঝিয়া দেখিও।"

আলোচনা ক্রমে বিষয়ান্তর অবলম্বন করিল, অবশেষে বৃদ্ধ বলিলেন, "যুবক, তুমি কি কর? তোমার নামটি জানিতে পারিলে আমি সুখী হইব।"

সে বলিল, "আমার নাম সুধীরচন্দ্র রায়। আমি হাইকোর্টে ওকালতী করি।"

বৃদ্ধ বলিলেন, "ভবিষ্যতে যদি কখনও দেখা হয়, তোমার নাম আমার মনে থাকিবে।"

২

সান্ধ্য-ভ্রমণ শেষে সুধীরচন্দ্র হল-ঘরের সম্মুখ দিয়া নিজের বৈঠকখানার দিকে যাইতেছে, এমন সময় পিতা হরকুমার বাবু ডাকিলেন, "সুধীর, একবার এদিকে এস ত!"

"আজ্ঞে, যাই" বলিয়া সুধীরচন্দ্র বৈদ্যুতিক আলোকদীপ্ত কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। একটা টেবলের পার্শ্বে হরকুমার বাবু কি একটা তালিকা লইয়া বসিয়াছিলেন।

পিতা বলিলেন, "তোমার বন্ধুবান্ধবদের নামের তালিকাটা কোথায়?"

আজ সুধীর একটু বিমনাই ছিল। পিতার প্রশ্নে সে সহসা চমকিয়া উঠিল; বলিল, "এবার ত আমি কোন লিষ্ট করিনি, বাবা!"

বিস্মিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "কেন? ২৫শে নবেম্বরের কথা ভুলে গেছ? আর ত বেশী দেরি নেই। এখন লিষ্ট না পেলে ত একটু অসুবিধা হবে!"

সুধীরচন্দ্র নত দৃষ্টিতে বলিল, "এবার কোন বন্ধুবান্ধবকে আমি বলতে চাই না।"

বৃদ্ধ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার পুত্রের দিকে চাহিলেন, তার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "কেন? কি হয়েছে?"

পুত্র গম্ভীরভাবে বলিল, "অতগুলো টাকা শুধু শুধু ব্যয় ক'রে কোন লাভ নেই, বাবা।"

বিস্মিতভাবে পিতা আবার পুত্রের দিকে চাহিলেন। এমন কথা কোন দিন ত তিনি সুধীরের মুখে শুনেন নাই! তের বৎসর বয়স হইতে সুধীরচন্দ্র সিঁথির বাগান-বাটীর ভোজে প্রতিবারই কি উৎসাহই না প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, আজ সহসা তাহার এ বৈরাগ্য কেন?

সুধীরের পিতা হরকুমার বাবু হাইকোর্টের এক জন খ্যাতনামা এটর্ণী। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসর ধরিয়া এই ব্যবসায় করিয়া সম্প্রতি পুত্রের হস্তে সে কার্য্যের ভার দিয়া অবসর লইয়াছেন। কলিকাতার অধিকাংশ বড় বড় ইংরাজ তাঁহার বন্ধু। হাইকোর্টের জজ হইতে আরম্ভ করিয়া লাটদপ্তরের সেক্রেটারী, বড় বড় বণিক প্রভৃতি সর্ব্বশ্রেণীর শ্বেতাঙ্গ এবং গণ্যমান্য বাঙ্গালীর সহিত তাঁহার বিশেষ হৃদ্যতা। দীর্ঘকাল ধরিয়া তিনি প্রতি বৎসর নবেম্বর মাসে একবার করিয়া সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও বাঙ্গালী রাজপুরুষ ও ভদ্রলোকগণকে তাঁহার সিঁথির বাটীতে ভোজ দিয়া আসিতেছেন। পুত্র বড় হইলে তাহার পরিচিত ইংরাজ ও বাঙ্গালী বন্ধুবর্গও সে সম্মিলনে নিমন্ত্রিত হইতেন। ইদানীং সুধীরচন্দ্রই সে বিরাট ভোজ-ব্যাপারের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিত। কিন্তু এবার সহসা তাহার এ ঔদাসীন্য কেন?

ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন, "লাভালাভের কথা ভেবে ত, বাবা, এ কাজটা করা হয় না! অনেক দিনের ব্যবস্থা, হঠাৎ বন্ধ করাই বা কেন?"

বিনীতভাবে পুত্র বলিল, "আপনার বন্ধুবান্ধবদের অবশ্য আপনি নিমন্ত্রণ করতে পারেন, কিন্তু আমার কোন বন্ধুকেই ঐ ব্যাপারে আনতে চাই না। আমার এখন মনে হয় যে, এত দিন এ টাকাগুলো আমরা জলেই ফেলে দিয়ে এসেছি। তার বদলে যদি অন্য কোন সৎকাজে দেওয়া হ'ত!"

পিতা এবার স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের মুখের দিকে চাহিলেন; দেখিলেন, সে বলিষ্ঠ সুন্দর আননে যেন একটা মৌন বেদনার ক্লিষ্ট রেখা বিদ্যমান। পুত্রকে তিনি চিরদিন বন্ধুর মতই দেখিতেন। পিতাপুত্রের মধ্যে বয়স বা সম্বন্ধের ব্যবধান কোন দিনই ছিল না। এই সন্তানটির গর্ব্বে তিনি আত্ম-প্রসাদ অনুভব করিতেন। কি লেখাপড়া, কি ব্যায়াম, কি আলাপ-ব্যবহার, সকল বিষয়েই তাহার প্রতিভা বাল্যকাল হইতে প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই সে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনের মুখোজ্জ্বল করিয়াছে। তাহার শারীরিক শক্তিও তেমনই প্রচণ্ড। সঙ্গীতেও তাহার প্রতিভার বিকাশ দেখা যায়। সর্ব্বোপরি তাহার চরিত্রটি অনুকরণের যোগ্য। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন কৃতী সন্তানের জন্য পিতার হৃদয় কি অনির্ব্বচনীয় সুখই না লাভ করিত! পিতা-মাতার প্রতি কি অবিচল ভক্তি, সহোদরার প্রতি তাহার কি অকৃত্রিম স্নেহ! এক কথায় এমন পুত্রের পিতা বলিয়া হরকুমার আপনাকে পরম সৌভাগ্যশালী মনে করিতেন।

কিয়ৎকাল স্থিরদৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া পিতা সহাস্যে বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ, বুঝেছি। রেলগাড়ীর সেই ব্যাপারটা থেকেই তোমার পরিবর্ত্তন ঘটেছে। কেমন, না?"

সঙ্গী মাতুল মহাশয়কে পুনঃ পুনঃ সনির্ব্বন্ধ নিষেধ করা সত্ত্বেও ভাগিনেয়ের রেলগাড়ীর কীর্ত্তির কথা তিনি বাড়ীর সকলের কাছেই প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রৌঢ় সে দিন আপনাকে খুব অপমানিত মনে করিয়াছিলেন; তাই তিনি শ্বেতাঙ্গযুগলের অভদ্র ব্যবহার ও পরিশেষে সুধীরচন্দ্রের নিকট তাহাদিগের শৃগালবৎ আচরণের কথাটা গোপন করিতে পারেন নাই।

লজ্জিতভাবে সুধীর বলিল, "আজ্ঞে, সে কথাটা মিথ্যা নয়। তবে আমি কাহারও উপর কোন বিদ্বেষ বা ঘৃণা পোষণ ক'রে এ কথা বলিনি। আমার কথাটা এই যে, যাঁদের প্রচুর আছে, তাঁদের সেবায় টাকা ব্যয় না ক'রে, যারা প্রকৃত অভাবগ্রস্ত, তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করলে তার সার্থকতা আছে।"

"তা বটে। তবে এত দিনের একটা অনুষ্ঠান! হঠাৎ বন্ধ করলে একটা কথা উঠতে পারে ত, বাবা!"

সুধীরচন্দ্র দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "আমাদের টাকা, আমরা খরচ করবো, তার জন্য কারও কাছে জবাবদিহি করতে হবে কেন? আর, চিরকালই যে আমরা এমনভাবে খরচ ক'রে যাব, তারই বা ন্যায়-সঙ্গত কোন্ যুক্তি আছে? যে দিন-কাল পড়েছে, তা'তে এ রকম ক'রে টাকা ব্যয় করাও শোভন নয়। যাঁদের ভরা পেট, তাঁদের জন্য অথবা বিদেশী ধনকুবেরদের জন্য টাকা ব্যয় না ক'রে, আমাদের দেশের যারা না খেয়ে রয়েছে, বাবা, তাদের জন্য টাকাটা আমায় ভিক্ষা দিন!"

পিতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া শশব্যস্তে বলিলেন, "ভিক্ষা কি রে, সুধীর? সব টাকাই ত তোর। যেমন ভাবে খরচ করতে চাস্, কর্, বাবা! আমার কোন আপত্তি নেই।"

তাঁহার কণ্ঠস্বরে স্নেহ উছলিয়া উঠিল! সগর্ব্বে তিনি পুত্রের উন্নতশীর্ষ দেহের দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা তৃপ্তির দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; তাহার পর আবার বলিলেন, "গতবারে কত টাকা ভোজে খরচ হয়েছিল, মনে আছে?"

সুধীরচন্দ্র বলিল, "বোধ হয় হাজার দশেক হবে।"

"আচ্ছা, টাকাটা তুমি কোথায় দিতে চাও?"

পুত্র বলিল, "সার প্রফুল্লচন্দ্রের নিকট পাঠিয়ে দেব। খুলনার দুর্ভিক্ষের কথা কাগজে পড়েছিলেন ত?"

"বেশ। ঐ দশ হাজার আর অতিরিক্ত পাঁচ হাজার এই পনের হাজার টাকার চেক কা'ল নিও।"

পুত্রের আননে হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে কক্ষান্তরে চলিয়া গেল।

৩

"অমন ক'রে আছিস কেন, বাবা? কি হয়েছে?"

প্রভাতে চা-পানের পর সুধীরচন্দ্র অন্যদিনের মত আজ বহির্ব্বাটীতে যায় নাই; অন্দরমহলে, তাহার মাতার বসিবার একখানি খাটের উপর চিৎ হইয়া শুইয়াছিল।

মাতার প্রশ্নে পুত্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। তাহার সদাপ্রসন্ন আননে সত্যই চিন্তার কালিমা-রেখা ফুটিয়া

উঠিয়াছিল। সুধীরচন্দ্র হাই তুলিয়া বলিয়া উঠিল, "ভাল লাগে না, মা, কিছুই যেন ভাল লাগে না?"

ব্যস্তভাবে মাতা বলিলেন, "কোন অসুখ করছে না কি, বাবা?"

"না, মা, অসুখ করেনি। শরীর ভালই আছে।"

মাতা সস্নেহে বলিলেন, "তবে আবার কি হ'ল?"

কি যে হইয়াছে, তাহা নিজেই সে ভাল জানে না। তবে যে ভাবে সে দিন কাটাইতেছে, তাহা যে আর ভাল লাগিতেছে না, এই কথাটাই আজ কয়দিন ধরিয়া তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতেছে।

বাতায়ন-পথে বাহিরের আকাশের দিকে ক্ষণিক চাহিয়া সে বলিল, "আমার আদালতে যেতে ইচ্ছে করে না, মা।"

"তা বেশ ত, যদি না হয়, আজ নাই বা গেলি।"

মাথা নাড়িয়া সুধীরচন্দ্র বলিল, "আজ ব'লে নয়। আর মোটেই যেতে ইচ্ছে নেই, মা।"

মাতা সবিস্ময়ে পুত্রের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"বলিস্ কি রে!"

"হ্যাঁ, মা, সত্যি বল্‌ছি, আমার আর এ ব্যবসা করতে মোটে ইচ্ছে নেই। আচ্ছা, তুমিই বল দেখি, মা, এত লেখাপড়া শিখে, রামের শ্যামের টাকা নিয়ে বড় মানুষ হওয়ায় কোন তৃপ্তি আছে কি? এক জন চাষী এতটুকু বিদ্যা না শিখেও যা উৎপন্ন করে, আমাদের মত যারা বিদ্যার জাহাজ, তারা তার হাজার ভাগের এক ভাগও পারে কি?"

মাতা প্রশংসমান দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কথা মিথ্যে নয়।"

সুধীরচন্দ্রের মাতা কিতাবতী বিদ্যার হিসাবে শিক্ষিতা মহিলা নহেন। তিনি কোন বিদ্যালয়ে কোন দিন পড়েন নাই। তবে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী মন্দ জানিতেন না। বাল্যকাল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া পর্য্যন্ত সুধীরচন্দ্র তাহার গৃহশিক্ষকের অনুপস্থিতিতে অনেক সময় মাতার নিকট হইতে সকল প্রকার শিক্ষার সাহায্য পাইয়াছিল। তাহার ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞান মাতার জীবনের আদর্শে সে লাভ করিয়াছিল। পুত্রের মনের গতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি তাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সুধীরচন্দ্র মাতার সতর্ক স্নেহদৃষ্টির ছায়ায় থাকিয়াই সকল বিষয়ে উন্নতি করিতে পারিয়াছিল।

সোৎসাহে সে বলিয়া চলিল, "এত লেখাপড়া তোমরা ত শেখালে; কিন্তু সে বিদ্যার সাহায্যে এক পয়সা মূল্যের জিনিসও উৎপন্ন করতে পার্‌ছি? জীবন ধ'রে কেবল অন্যের ধনভাণ্ডারের টাকা আমরা লুঠে আন্‌ছি বৈ ত নয়। নদীর এক কূল ভাঙ্গছে, অন্য কূল গ'ড়ে উঠছে, এই মাত্র প্রভেদ। দেশের ধনভাণ্ডারে আমরা এক পয়সাও সঞ্চয় করতে পারছি না। এতে লাভ আছে কিছু কি, মা?"

স্থির-দৃষ্টিতে মাতা পুত্রের দিকে চাহিলেন। কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া কোন্ পথে সন্তানের মন ছুটিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা তোমার ইচ্ছাটা কি শুনি?"

সুধীরচন্দ্র কক্ষমধ্যে পদচারণা করিতে করিতে সহসা জননীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি কিছু উৎপন্ন করতে চাই। এর, তার ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার থেকে অর্থ সঞ্চয় না ক'রে, প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে কিছু সঞ্চয় করতে চাই।"

মাতা তাহার কথা ঠিক বুঝিতে পারিলেন কি না, বুঝা গেল না। সুধীরচন্দ্র বলিয়া চলিল, "আচ্ছা মা। আমাদের বিলাসপুর পরগণায় প্রায় একশ বিঘা জমী খাসে আসে। সে জমীটায় কাপাস-তূলার চাষ করলে কেমন হয়?"

"সে কথা আমি কি বুঝি, বাবা। তোমরা যা ভাল বুঝবে, তাই করবে। ওঁকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখলে পার।"

কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া সহসা উত্তেজিতভাবে সুধীর বলিল, "আচ্ছা, মা, বাবাকে ব'লে তুমি আমায় বিশ হাজার টাকা দেওয়াতে পার?"

"বিশ হাজার টাকা নিয়ে কি করবি?"

"একটা তাঁতের আর চরকার কারখানা খুলব। তা'তে দু'পয়সা রোজগারও হবে, দেশের কাজও করা যাবে। সেটা ভাল নয় কি?"

দেশের মধ্যে যে মহা আন্দোলনের স্রোতঃ চলিতেছিল, তাহার তরঙ্গ আসিয়া হরকুমার বাবুর অন্তঃপুরেও আঘাত করিয়াছিল। ভারতবর্ষের নর-নারীমাত্রেরই হৃদয় তাহাতে অল্পাধিক পরিমাণে বিচলিত। সুধীরের মাতাও বাদ পড়েন নাই। তথাপি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তা, সে ত ভালই হবে, বাবা। তবে ওঁর মত নিতে হবে। তুই একবার নিজেই বলিস্। আমিও বল্‌ব। টাকার ত অভাব নেই। কেন দেবেন না?"

সে কথা সত্য। এটর্ণীপ্রবর হরকুমার রায়ের বহু লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত। তাহা ছাড়া বাড়ীভাড়া বাবদে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা আদায় হইত। স্থানে স্থানে যে জমীদারী আছে, তাহারও বার্ষিক আয় আনুমানিক বিশ হাজার টাকা। পোষ্য-সংখ্যাও খুব অধিক নহে; স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূ এবং কয়েকটি আত্মীয়। একমাত্র কন্যা বিভার বিবাহ ভাল ঘর-বর দেখিয়াই দিয়াছিলেন। কন্যাটি মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার নিকট থাকিত।

সুধীর হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা, মা! তোমার এম্-এ, বি-এল পাশ-করা ছেলে এটর্ণীগিরি ছেড়ে চাষা আর তাঁতি হ'বে, তা'তে তোমার আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হবে না ত?"

কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করিয়া মাতা বলিলেন, "ছেলের কথা শোন!"

সহসা একটি হাস্যময়ী সুন্দরী কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, "দাদা, তোমাদের সব কথা আমি আড়ি পেতে শুনেছি!"

মাতা ও পুত্র হাসিয়া উঠিলেন।

সুন্দরী বিভা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দাদা, এস না, তোমায় একটা মজার জিনিস দেখাই।"

ভ্রাতা ভগিনীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল; অনেকগুলি কক্ষ অতিক্রম করিবার পর নিম্নতলস্থ একটি প্রশস্ত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। সুধীরচন্দ্র এ দিকে কদাচিৎ আসিত। কারণ, সেই সুসজ্জিত, আলো-বাতাস-সেবিত অন্তঃপুর-কক্ষে পাড়ার মেয়েরা আসিয়া মাঝে মাঝে জটলা করিয়া থাকেন বলিয়া বাড়ীর পুরুষরা সে দিকে নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে কখনও আসিতেন না। সুধীর বহুকাল এ অঞ্চলে আইসে নাই। কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই একটা ঘর্ঘর শব্দ তাহার কাণে গেল। সে সবিস্ময়ে দেখিল, তাহারই গৃহলক্ষ্মী মনোরমা একাগ্রমনে চরকায় সূতা কাটিতেছে। সেই ঘরে আরও দুই তিনখানি চরকা। একটা ঝুড়িতে খানিকটা তুলা ও টেবলের উপর দশ বারো বাণ্ডিল সূতা।

সুধীরের পদশব্দ শুনিয়াই মনোরমা আরক্ত-মুখে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল্। যেন অপরাধজনিত আতঙ্কের ছায়া সহসা সেই সুন্দর আনন আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

ভগিনীর দিকে ফিরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে সুধীর বলিয়া উঠিল, "তোরা এ সব কি করেছিস্ রে?"

হাসিতে হাসিতে বিভা বলিল, "ঘোর ষড়্‌যন্ত্র, দাদা! তোমরা সব এর বিরোধী। তাই বুঝেই গোপনে আমরা তোমাদেরই অন্তঃপুরে চরকা চালাচ্ছি।"

সে সরল উচ্ছ্বসিত হাস্যে সুধীরের হৃদয় যেন আনন্দে শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল, "তাই ত দেখছি, বোন্! এ সব কবে এল? বাবা কিছু বলেন নি?"

"তোমাদের জানিয়ে কি করেছি? তোমরা থাক বাইরে, আপিসে। এ দিকে সে দিন 'দেশবন্ধুর' স্ত্রী ও ভগিনী আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। চরকা তাঁরাই দিয়ে গেলেন। তাঁদের কি উপেক্ষা করা যায়? বৌদি একটা নিলেন। মা-ও বাদ গেলেন না। আর আমিই বা ছাড়ি কেন? তাই তিন জনেই তোমাদের অগোচরে সূতা-কাটা আরম্ভ ক'রে দিয়েছি।"

এ দিকে মনোরমা দাঁড়াইয়া দাড়াইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল। সে শ্বশুর ও স্বামীকে যে ভাবে এত দিন দেখিয়া আসিয়াছে, তাহাতে হয় ত এই চরকার ব্যাপার লইয়া একটা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া যাইতে পারে। বিভা বৌদিদির অবস্থাটা বোধ হয় কতকটা অনুমান করিতে পারিয়াছিল। সে বলিয়া উঠিল, "বাঃ বৌদি, তুমি শীতের দিনেও দেখি একেবারে ঘেমে গেছ! বাতাস দেব?"

সুধীরচন্দ্র ধীরে ধীরে চরকায় কাটা এক বাণ্ডিল সূতা হাতে লইয়া পরীক্ষা করিতে লাগিল; তাহার পর প্রসন্ন হাস্যে বলিল, "বাঃ রে! বেশ সরু সূতা ত! এ কার তৈয়ারী?"

বিভা বলিল, "বৌদিদির, আমি ১০০ নম্বরের পর্য্যন্ত সূতা কাটতে পারি। কিন্তু মা আর বৌদিদি দু'জনেই ১২০ নম্বরের সূতা কাট্‌তে শিখেছেন। দু'মাসের চেষ্টায় এতটা হয়েছে, দাদা!"

"বলিস কি? দু'মাস ধ'রে তোরা এ ব্যাপার চালাচ্ছিস, অথচ আমরা কেউ জানি নে!"

সুধীরচন্দ্র ধীরে ধীরে পত্নীর চরকার কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া উহা পরীক্ষা করিয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া বলিল, "ও কি! তুমি অমন করছ কেন? তুমি ভাবছ, আমি রাগ করব? ভুল, ভুল! আমি ভারি খুসী হয়েছি। মনো, তোমরা যে এমন চমৎকার সূতা তুল্‌তে শিখেছ, এতে আমি গর্ব্ব বোধ করছি।"

তাহার পর একটু থামিয়া সহাস্যে সে বলিল, "কিন্তু তোমার বাবা যদি জানতে পারেন, বোধ হয়, তিনি এতে

সুখী হবেন না। তিনি হয় ত এতে রাজদ্রোহের গন্ধ পেতে পারেন! কি বল?"

এতক্ষণে মনোরমা একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

"দাদা, তুমি আমাদের স্কুলে ভর্ত্তি হবে? বৌদিদি তোমায় চরকায় সুতা তোলা শেখাবেন! রাজি আছ?"

হাসিতে হাসিতে সুধীর বলিল, "খুব! কবে থেকে বল, আজই যদি শেখাতে চাস্, আমি রাজি।"

৪

সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর সুধীরচন্দ্র রাত্রির আহার-শেষে লেপের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল। মাঘ মাস, খুব জোরেই শীত পড়িয়াছিল।

মাথার ধারের বৈদ্যুতিক আলোকটা জ্বালিয়া সে একখানা বই লইয়া পড়িতে লাগিল। সারাদিনের মধ্যে এই সময়টাই সে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া থাকে। গল্পটা যখন বেশ জমিয়া আসিয়াছে, এমন সময় পত্নী মনোরমা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল।

দরজা বন্ধের শব্দে সুধীর মুখ তুলিয়া চাহিল। পত্নীকে দেখিয়া বলিল, "আজ মুখটা ভারি হাসি হাসি যে?"

সহাস্যে মনোরমা বলিল, "কাঁদতে কাঁদতে আবার কোন্ দিন ঘরে আসি?"

"না, তা নয়। তবে আজ হাসির বহরটা যেন বেশী ব'লেই মনে হচ্ছে। তাই বলছি, ব্যাপার কি?"

মনোরমা স্মিতহাস্যে বলিল, "না, তেমন কিছু নয়। তবে আজ এ মাসের সুতার দাম ১৮৲ টাকা হাতে এসেছে; তাই, বোধ হয়, তুমি খুসী-খুসী ভাব দেখছ।"

সুধীরকুমার শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া বলিল, "এ মাসে সূতা তুলে ১৮৲ টাকা তুমি পেয়েছ?"

"আমি ত কম। মা'র সুতার দাম ২২৲ টাকা হয়েছে। ঠাকুরঝি ১৭৲ টাকা পেয়েছে।"

"বটে! কোথায় সুতা বেচলে?"

"কেন? কংগ্রেস কমিটী যে সুতা কেনেন, তা জান না? আমরা সেখানেই পাঠিয়ে দেই।"

প্রশংসমান দৃষ্টিতে পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া সুধীর বলিল, "আচ্ছা, সুতা ত কাট; কিন্তু সংসারের কাজ কর কখন্?

মনোরমা এবার আর উচ্চহাস্য রুদ্ধ করিতে পারিল না। কিন্তু পাছে শ্বশুর বা শাশুড়ীর কর্ণে তাহার ধ্বনি প্রবেশ করে, সেই জন্য সে কষ্টে আপনাকে সংবরণ করিল।

তাহার পর ধীরে ধীরে স্বামীর একখানি হাত নিজের করপ্রকোষ্ঠে চাপিয়া ধরিয়া সে বলিল, "ওগো! এটা বুঝলে না? সারাদিনই কি আমরা চরকা নিয়ে ব'সে থাকি? ঘর-সংসারের কাজ করবার পর যে সময়টা অবসর পাই, তখনই চরকা নিয়ে বসি। গল্পও চলে, কাজও হয়।"

সুধীর বলিল, "দেখ, ও টাকাটা তুমি আলাদা ক'রে রেখে দিও। আর এবার হ'তে তোমাদের চরকার সব সুতা আমি নেব। আমাদের তাঁতের কারখানায় মিহি সুতার বড় অভাব। বুঝলে, এ মাস থেকে তোমার, মা'র ও বিভার সব সুতো আমার চাই।"

"তা, বেশ। কিন্তু নগদ দাম দেবে ত?"

সুধীর হাসিয়া বলিল, "আমার সবই নগদ। আমি ধারে কারবার করি না।"

তখন স্বামি-স্ত্রী উভয়েই হাসিয়া উঠিল। সে হাস্যধ্বনি ভাগীরথীর কলোচ্ছ্বাসের মত মধুর ও পবিত্র।

কিয়ৎকাল নীরবতার পর একটু কুণ্ঠিতভাবে মনোরমা বলিল, "একটা কথা বলব, আমার একটা অনুরোধ রাখবে?'

সুধীরচন্দ্র পত্নীর চম্পকাঙ্গুলী লইয়া খেলা করিতে করিতে বলিল, "তোমার কথা কবে রাখিনি, মনো?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া পত্নী বলিল, "আমাকে এক জায়গায় যেতে দেবে?"

সুধীরচন্দ্র হাসিয়া বলিল, "সব কথাটা খুলেই বল, তা না হ'লে বুঝব কি ক'রে বল?"

মৃদু, স্নিগ্ধকণ্ঠে মনোরমা বলিল, "নারী-কর্ম্মমন্দিরের সম্পাদিকা আজ এসেছিলেন।—পুরে একটি নারীসঙ্ঘ হয়েছে। সেখানকার মহিলারা চরকায় সুতাকাটা শিখতে চান। কিন্তু সেখানে শেখাবার কেউ নেই। সম্পাদিকা ও আরও তিন চারি জন মহিলা সেখানে যাবেন। আমাদেরও সঙ্গে নিতে চান। পর্দ্দানশীন মহিলা দুই চারি জন সঙ্গে থাকলে সেখানকার মহিলার দল আরও উৎসাহিতা হবেন। শুধু তাই নয়, দলের মধ্যে যাঁরা আছেন, খুব বেশী মখরের সরু সুতা চরকায় তাঁরা এখন তুলতে শেখেন নি।

ঠাকুরঝি ও আমাকে পেলে তাঁদের সুবিধা বেশী হবে। কি বল?"

সুধীরচন্দ্র পত্নীর প্রতি বিদ্রূপ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। কথা শেষ হইলে সে হাসিয়া উঠিল, তাহার পর বলিল, "ও বাবা! তোমরা ত কম নও। শুধু চরকায় সূতা তোলা নয়! আবার দেশবিদেশে গিয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ করবার জন্যও কোমর বেঁধে ব'সে আছ! তোমার বাবা শুনলে কি বলবেন, একবার ভেবে দেখেছ?"

মনোরমা অন্যমনে বলিয়া উঠিল, "বাবাকে অনেক দিন দেখিনি। দাও না আমায় ওঁদের সঙ্গে পাঠিয়ে। ওখান থেকে ফিরে আসবার সময় বাবার কাছে দিনকতক থেকে আসব। বাবা যেখানে থাকেন, সেই দিকেই ত—পুর।"

সুধীরচন্দ্র নীরবে কিয়ৎকাল কি চিন্তা করিল; তাহার পর বলিল, "দেখ, মনো, এতে আমার কোন অমত নেই। যে কাজের জন্য যেতে চাচ্ছ, তা'তে বাধা দেওয়া পাপ। বিশেষতঃ এখন নারীকেও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করতে হবে। কিন্তু একটা কথা আছে, তোমরা চিরকাল অন্তঃপুরচারিণী; বাইরের বিপদ থেকে আত্মরক্ষা করবার ক্ষমতা ত তোমাদের নেই। আমি ত তোমাদের সঙ্গে যেতে পারব না। তা ছাড়া বাবার ও মা'র মত আগে দরকার!"

মনোরমা তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "মা'র অমত নেই। ঠাকুরের মতও পাব। ঠাকুরঝি ও মা সে ভার নিয়েছেন। আর ঠাকুরজামাই যে আমাদের সঙ্গে যাবেন। তুমি কাজ ছেড়ে এখন যেতে পারবে না, তা আমরা জানি। সঙ্গে ঠাকুরজামাই থাকবেন, নারী-কর্ম্মমন্দিরের পাঁচ সাতটি মহিলা ও আমরা যাব, কে আমাদের অপমান করবার সাহস পাবে? তা ছাড়া, তুমি যে এত দিন ধ'রে স্বাগোর ডম্বল, ডেভেলপার শেখালে, তার কি কোন মূল্য নেই?" বলিয়াই সলজ্জ দৃষ্টিতে সে স্বামীর পানে চকিতে একবার চাহিল।

সুধীরচন্দ্র আবেগভরে বলিল, "মনোরমা, মা যদি মত দিয়ে থাকেন, বাবা যদি বাধা না দেন, তবে আমিও আপত্তি তুলব না। দেশের কাজে দেশের নারীশক্তিকে জাগিয়ে তোলা দরকার। তোমাদের প্রাণে যখন আপনা থেকেই সে ইচ্ছা এসেছে, তখন তা'তে যে বাধা দিতে যায়, সে অতি দুর্ভাগ্য। আমার খুব মত আছে। পারি যদি আমিও তোমাদের সঙ্গে গিয়ে সে দৃশ্য দেখে আসব।"

মনোরমা স্বামীর উদার, প্রশান্ত, লৌহকপাট তুল্য বক্ষে মাথা রাখিয়া একবার চক্ষু নিমীলিত করিল।

৮

সমগ্র ভারতবর্ষ যে আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল, —পুরে তাহার স্রোতের ধারা বিসর্পিত গতিতে বহিয়া চলিয়াছিল। পূর্ণতোয়া নদীতীরে এই মহকুমার সহরটি অবস্থিত। ব্যবসা-বাণিজ্যেরও উহা একটি প্রধান কেন্দ্র। সহস্র সহস্র শ্রমজীবী সহরের নানা স্থান পূর্ণ করিয়াছিল। বাণিজ্যস্থল বলিয়া বহু বৈদেশিকও কার্য্যোপলক্ষে এখানে বসবাস করিতেন।—পুর অন্যান্য জিলার মহকুমার মত নহে। এজন্য ইহার শ্রী দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছিল।

অহিংস অসহযোগ আন্দোলন এখানে ছিল সত্য, তবে এমনভাবে নহে যে, অন্যান্য স্থলের ন্যায় ১৪৪ ধারা এখানে প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্থাৎ এখনও পর্য্যন্ত—পুরের স্বেচ্ছাসেবকগণ পিকেটিং অথবা অন্যান্য বিষয়ে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের ন্যায় দৃঢ়তা অবলম্বন করেন নাই। স্কুলের ছাত্রগণ এখনও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে নাই। ব্যবহারাজীবরা আদালতের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধই রাখিয়াছিলেন। সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত অবস্থার ভদ্রলোকগণের অধিকাংশ তখনও মধ্যপথ অবলম্বন করিয়াই নিরাপদে অবস্থান করিতেছিলেন। শুধু শ্রমজীবি-সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দেখা যাইতেছিল।

এমনই সময়ে সহসা—পুরের নারী-সমাজে একটা চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইল। কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই মহিলাবৃন্দ আপনাদের মধ্যে একটা ছোটখাট দলের সৃষ্টি করিবার চেষ্টায় ছিলেন। জনৈক প্রসিদ্ধ চিকিৎসকের পত্নী ও ব্যবসায়ীর ভগিনী চরকা শিখিবার বাসনা প্রকাশ করেন। ব্যবসায়ীর গৃহে এক দিন সমগ্র সহরের মহিলাবৃন্দ আহূত হয়েন। খুলনার দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের জন্য কিছু কিছু অর্থও সেই সভায় সংগৃহীত হয়।

ক্রমে নারীদিগের জন্য একটা চরকা ও বয়ন-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প হইল। উহার জন্য মহিলারা নানাপ্রকার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সহরের নারী-সমাজের সহসা

এই জাগরণ পুরুষদিগের মধ্যেও অল্পাধিক পরিমাণে সংক্রমিত হইল।

ঠিক এমন সময়ে এক দিন প্রভাতে সহরের নরনারী চমকিতভাবে শুনিল, কয়েকটি শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীর অধীনস্থ কুলী-সম্প্রদায়ের সহিত স্থানীয় পুলিসের সংঘর্ষ হইয়াছে। জনসাধারণ, বিশেষতঃ সহরের ভদ্র-সম্প্রদায় ইহাতে শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ব্যাপারটা এই—মুসলমান-প্রধান এই পল্লী-সহরে খিলাফৎ ও কংগ্রেসের দলে বহুসংখ্যক শ্রমজীবী ছিল। একবার মহরম উপলক্ষে এ স্থানের দারোগার সহিত মুসলমান সম্প্রদায়ের মনোমালিন্য জন্মে। মহকুমার সুযোগ্য ম্যাজিষ্ট্রেট ও তদানীন্তন পুলিস-ইনস্পেক্টার অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিতায় সে যাত্রা গোলযোগ বাড়িতে পারে নাই। কিন্তু দারোগার অশিষ্ট ব্যবহারের কথা মুসলমানগণ ভুলিতে পারেন নাই। দারোগাও নিশ্চিন্ত ছিল না। সেও এই খিলাফতীদিগকে জব্দ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিল।

সে সুযোগও উপস্থিত হইল। জনসাধারণের মধ্যে ইতঃপূর্ব্বে একটা সালিশী-সমিতি গঠিত হইয়াছিল। সহরের সন্নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের মধ্যে কাহারও সহিত কোন ব্যক্তির কোনপ্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইলে, গ্রামবাসীরা এই সালিশী-সমিতির নিকট দরবার করিত। মণ্ডলরা যাহা ব্যবস্থা করিয়া দিত, উভয় পক্ষ তাহাই মানিয়া লইত।

অল্পদিন পূর্ব্বে একটা গ্রাম্য গোলযোগ সালিশী আদালতে মীমাংসিত হয়। বোধ হয়, দণ্ডিত ব্যক্তি সে ব্যবস্থা মাথা পাতিয়া লইতে পারেন নাই, অথবা হয় ত দারোগারও গোপন ইঙ্গিতে সাহস পাইয়া সেই ব্যক্তি থানায় আসিয়া সালিশী মাতব্বরদিগের এক জনের নামে মারপিটের অভিযোগ করে। দারোগা তখন সদলবলে গিয়া সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া আনে। সেই যুবক আবার স্থানীয় কংগ্রেস-সমিতির এক জন স্বেচ্ছাসেবক।

সংবাদটা ঝড়ের মত বেগে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। সহরের যেখানে যত শ্রমজীবী ছিল, তাহারা এ সংবাদে অধীর হইয়া পড়িল। তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান। দলে দলে তাহারা থানার সম্মুখে আসিয়া সমবেত হইল এবং বলিতে লাগিল, তাহাদেরই নির্দ্দেশমত সালিশী ব্যবস্থা হইয়াছে। সুতরাং তাহারা সকলেই অপরাধী। যখন এক ব্যক্তিকে হাজতে রাখা হইয়াছে, তখন তাহাদের সকলকেই জেলে দেওয়া হউক, অথবা উহাকে এখনই মুক্ত করিয়া দেওয়া হউক।

মহকুমার হাকিম তখন কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র ছিলেন। অস্থায়ী ভারপ্রাপ্ত দেশীয় হাকিম এই ব্যাপারে আপনাকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত মনে করিলেন। পূর্ব্বে যে জনপ্রিয় ইনস্পেক্টার সেখানে ছিলেন, তিনি তখন অন্যত্র বদলী হইয়া গিয়াছেন. নূতন যিনি ভার লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি স্থানীয় ব্যাপারে অনভিজ্ঞ। সুতরাং কঠিন সমস্যার মীমাংসা করা দুরূহ হইয়া পড়িল।

দেশীয় হাকিম অবশেষে জামীন লইয়া বন্দীকে ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। আসামী দৃঢ়তা সহকারে বলিল যে, সে নিরপরাধে ধৃত হইয়াছে, সুতরাং জামীন সে দিবে না। সমস্যা গুরুতর হইতেছে দেখিয়া হাকিম স্থানীয় জেলে আসামীকে পাঠাইলেন। তখন তাহার অনুগামী হইবার জন্য শ্রমজীবীরা বাঁধভাঙ্গা বন্যাপ্রবাহের ন্যায় জেলের দিকে ছুটিল। দেশীয় হাকিম ধীরতা সহকারে কাজ করিতেছিলেন বটে, কিন্তু দৃঢ়তা দেখাইতে পারিলেন না। তাহার ফলে হাঙ্গামা জটিল হইয়া উঠিল।

অবশেষে তিনি ব্যবস্থা করিয়া আসামীকে ছাড়িয়া দিলেন। জনতা তখন ক্ষুব্ধ—বিচলিত। স্থানীয় জননায়কগণ কোনও মতে তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন না। দারোগার উপর শ্রমজীবিগণের দারুণ আক্রোশ ছিল; সে-ই সকল অশান্তির মূল, ইহা ভাবিয়া তাহারা তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িল। তখন জনস্রোত থানার দিকে ছুটিল। দারোগাও আত্মরক্ষার জন্য বীরত্ব দেখাইল। তাহার ফলে উন্মত্ত জনতা থানার কোন কোন জিনিস পুড়াইয়া দিল। দারোগা ইত্যবসরে অন্য পথ দিয়া পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিল। শ্রমজীবীরা তখন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেল।

পল্লী-সহরের সর্ব্বত্র এই নিদারুণ সংবাদ ছড়াইয়া পড়িল। ভদ্র অধিবাসীরা বিপদাশঙ্কায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তার-যোগে সদরে সংবাদ গেল। সেই দিন সন্ধ্যায় মোটরযোগে অতিরিক্ত সামরিক পুলিস আসিয়া পৌঁছিল। জিলার জয়েন্ট ম্যাজিষ্ট্রেট "সাহেব" ও বাঙ্গালী পুলিস-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট রায়সাহেব ব্যানার্জ্জি ঘটনাস্থলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুলিস-ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলও স্বয়ং ছুটিয়া আসিলেন। সহরে হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

স্থানীয় মহিলাদিগেরও সেই দিন যে সভা হইবার কথা ছিল, তাহা বন্ধ হইয়া গেল। জনরব নানাপ্রকার কথা রটনা করিতে লাগিল। সকলেই উৎকণ্ঠিতভাবে ঘটনার পরিণতি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন।

৬

সহসা সংবাদ রটিল যে, মহিলাবৃন্দকেও গ্রেপ্তার করিবার জন্য আয়োজন হইতেছে; পুলিস-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট মহিলা-দিগের নামের তালিকা প্রেরিত হইয়াছে। উৎসাহী পুলিস,—পুরের যাবতীয় আন্দোলন পিষিয়া ফেলিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ব্যানার্জ্জি সাহেবও না কি মহিলাদিগের এ ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। রমণী ঘর-সংসারের কাজ লইয়া থাকিবে, দেশের কাজে তাহাদের এত মাতামাতি কেন?

সহরের প্রবীণগণ এই ব্যানার্জ্জি সাহেবকে উত্তমরূপেই চিনিতেন। এক সময়ে তিনি এখানেই ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন। তখন—পুরের জনসাধারণকে কি উৎকণ্ঠাতেই না দিনযাপন করিতে হইত! এমন জবরদস্ত পুলিস-কর্ম্মচারী কখনও এ দেশে আসেন নাই। তাঁহাকে অপ্রসন্ন করিবার ক্ষমতা কাহারও ছিল না। নানা উপায়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীকে ভূমি-শায়ী করিয়া ছাড়িতেন। সম্মান ও অর্থের দিকে তাঁহার তুল্য তীক্ষ্ণদৃষ্টি ছিল। উপরওয়ালাদের সন্তুষ্ট করিবার তিনি প্রকৃষ্ট প্রণালীও না কি উত্তমরূপে অবগত ছিলেন। তাই ক্রমে ক্রমে অতি সহজে তিনি জিলার পুলিস-কর্ত্তার পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি যে কর্ত্তব্যপরায়ণ ও নিমকহালাল কর্ম্মচারী, সে বিষয়ে সরকারের বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জনসাধারণ তাঁহাকে যমের ন্যায় ভয় করিত এবং "শতহস্তেন বাজিনঃ" এই চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিয়া তাঁহার সংস্রব হইতে দূরে থাকিত। অথচ রাজ-পুরুষগণের সঙ্গে তিনি ছায়ার ন্যায় বিচরণ করিতেন। সরকার এ জন্য ব্যানার্জ্জি সাহেবের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন, এবং বিগত বর্ষে রায় সাহেব উপাধিতে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া দিয়াছেন।

এ হেন ব্যক্তি যখন মহিলাদিগের নামের তালিকা লইয়া তাঁহাদের চরকা-"ফোবিয়ার" প্রতিষেধক নির্ব্বাচনে অগ্রসর, তখন সহরের মাতব্বর মডারেট সম্প্রদায়ও বিশেষরূপে চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কয়েক জন স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ব্যাপারটি ভাল করিয়া জানিবার জন্য অস্থায়ী মহকুমা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গমন করিলেন। সেখানে রায় সাহেব বন্দ্যোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন। কথাটা উঠিতেই দেশীয় হাকিম মহোদয় আম্‌তা আম্‌তা করিয়া প্রকাশ করিলেন যে, জনরব নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে।

রায় সাহেব প্রচণ্ড হাস্যের সহিত বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, কতকগুলি স্ত্রীলোককে ধরা হইবে বটে, কিন্তু তন্মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা নাই।

তবে ত কথাটা সত্য! মধ্যবর্ত্তীরা সম্ভ্রান্তশ্রেণীর অন্তর্গত বটে, সুতরাং তাহাদের পত্নী, কন্যাগণ হয় ত রেহাই পাইতে পারেন; কিন্তু তথাপি মহিলাদিগকে গ্রেপ্তারের পরামর্শ ত চলিতেছে! কি সর্ব্বনাশের কথা! রায় সাহেবের মত শ্রেণী-বিভাগ করিয়া নারীর সম্মানের তারতম্য করিবার মনের অবস্থা তাঁহাদের তখনও হয় নাই। কাজেই নারীর সম্মান—তা সে সম্ভ্রান্ত অথবা দরিদ্র কিম্বা মধ্যবিত্তের ঘরেরই হউক না কেন—সর্ব্বত্রই সমান। অন্ততঃ তাঁহাদের শিক্ষা-দীক্ষা সেই প্রকারেরই ছিল। তাই তাঁহারা কয়েক জন সম্মিলিত হইয়া একটি পরামর্শ-সভার অনুষ্ঠান করিলেন। স্থির হইল, তাঁহাদের মধ্যে কয়েক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি গবর্ণরের নিকট সশরীরে পৌঁছিয়া এই অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবেন এবং এমন ভাবে নারীর প্রতি জুলুম চলিলে দেশের মধ্যে অশান্তির অনল তীব্রতম তেজে জ্বলিয়া উঠিতে পারে, তাহা দৃঢ়তার সহিত বুঝাইয়া দিবেন।

কিন্তু এত দূর অগ্রসর হইবার পূর্ব্বে পুলিস বিভাগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ণধারের সহিত দেখা করিয়া সব কথা তাঁহাকে জানাইলে ক্ষতি কি? তিনি ত এখন এখানেই উপস্থিত আছেন! বৃদ্ধ ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলই বা কি বলেন, শুনা যাউক না।

প্রস্তাবটি মন্দ নহে। তখন দুই জন মাতব্বর মডারেট ডেপুটেশনে প্রেরিত হইলেন। উভয়েই পূর্ব্বে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। পুলিসের বড় কর্ত্তার সহিত তাঁহাদের জানাশুনাও ছিল।

অযথা কালবিলম্ব না করিয়া উভয়ে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেলের বাংলোয় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেব তখন একাই

ছিলেন। তিনি উভয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ভদ্রলোক-যুগল সবিস্তারে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করিলেন।

বৃদ্ধ শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "কৈ, আমি ত ইহার বিন্দুবিসর্গও জানি না! যাহা হউক, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। কোনও মহিলা, তা যে শ্রেণীরই হউক না কেন, কখনই ধৃত হইবেন না। আমি আপনাদিগকে অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছি, আপনারা নির্ভাবনায় থাকুন।"

প্রতিনিধি-যুগল সাহেবকে কৃতজ্ঞতা জানাইয়া বিদায় লইলেন। উহার অব্যবহিত পরেই রায় সাহেব ব্যানার্জ্জি মহোদয় স্থানীয় পুলিস ইন্‌স্পেক্টরের সহিত তথায় দ্রুতগতিতে উপনীত হইলেন। বড়কর্ত্তা তাঁহাদিগকে বসিতে বলিয়া আগমনের অভিপ্রায় জানিতে চাহিলেন। রায় সাহেব বুঝাইয়া দিলেন, স্থানীয় নারীগণ দিন দিন বড়ই বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিতেছে। তাহারা এঙ্গোরা ফণ্ডে চাঁদা দেয়, খুলনা দুর্ভিক্ষের জন্য টাকা তুলে, আবার চরকা-স্কুল প্রতিষ্ঠিত করিয়া সূতা কাটিতে চাহে। ইহাতে দেশের মধ্যে ঘোর অশান্তি উপস্থিত হইবে। এখন যদি কয়েকটি মহিলাকে গ্রেপ্তার করা যায়, তবে সব ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে। তাই তিনি একটা তালিকা প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছেন। সকলেরই নামে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা বাহির করিতে হইবে। তিনিই তাহা করিতে পারিতেন। তবে স্বয়ং হুজুর যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন, তখন হুজুরের স্বাক্ষরই আইন অনুসারে অত্যাবশ্যক।

ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ধীরভাবে রায় সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণ করিলেন। তাহার পর ইন্‌স্পেক্টরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাহিরে গিয়া প্রতীক্ষা কর। রায় সাহেবের সঙ্গে আমার কিছু গোপনীয় কথা আছে।"

সে ধীরে ধীরে বাহিরে চলিয়া গেল। তখন বৃদ্ধ গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "ব্যানার্জ্জি, মহিলাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার পরামর্শ তোমায় কে দিল? তোমার মতিভ্রম হইয়াছে। না, তাহা হইবে না। আমি এইমাত্র দুইটি ভদ্রলোকের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়াছি যে, কোন মহিলাকেই গ্রেপ্তার করা হইবে না। তুমি এ সঙ্কল্প ত্যাগ কর।"

রায় সাহেব বিস্মিত হইলেন। তাঁহার এত সাধের আয়োজন কে এমন করিয়া মাটী করিয়া দিল! আজ যে তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী চারিদিকে প্রচারিত হইত। শঙ্কিত নাগরিকগণ তাঁহার দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ দেখিয়া চমৎকৃত হইত। আর তা ছাড়া—যাউক। ভাগ্যে যখন তেমন সম্মানাদি নাই, তখন উপায় কি? তথাপি তিনি বড়কর্ত্তাকে জানাইতে ছাড়িলেন না; নানা রকম কারণ প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পুলিস বিভাগের কর্ম্ম করিয়া বুড়াও ঝানু হইয়াছিলেন, তিনি কিছু-তেই মতের পরিবর্ত্তন করিলেন না।

তাহার পর একটা ড্রয়ার টানিয়া একখানা কাগজ বাহির করিয়া "সাহেব" বলিলেন, "রায় সাহেব, তুমি এখানকার মহিলাদের নামের একটা তালিকা তৈয়ার করাইয়াছ। কিন্তু কলিকাতা হইতে যে সকল মহিলা আসিয়াছেন, তাঁহাদের পরিচয় কিছু জান?"

রায় সাহেব বলিলেন, "সকলের জানি না। দু এক জনের সম্বন্ধে জানি।"

"যাঁহারা খ্যাতনামা, তাঁহাদের পরিচয়ই জান। তাহা ছাড়া জান না? আমার গোয়েন্দা বিভাগ ইহাদের প্রত্যেকের পরিচয় সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছে একখানা প্রতিলিপি পাঠাইয়াছে। একখানা তোমার কাছে রাখ, কাজে লাগিতে পারে।"

রায় সাহেব হাত বাড়াইয়া কাগজখানি লইলেন। চালটা ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহার মেজাজটা ভাল ছিল না, কাজেই তখন পড়িবার প্রবৃত্তি ও অবকাশ হইল না। সযত্নে তিনি উহা পকেটে রাখিয়া দিলেন।

সাহেব বলিলেন, "কাল সকালে একবার দেখা করিও। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তোমাকে গোটাকয়েক কথা বলিয়া যাইব।"

"যে আজ্ঞে" বলিয়া সেলাম বাজাইয়া, ক্ষুণ্ণ-মনে জিলার পুলিসের কর্ত্তা বাহিরে আসিলেন। ইন্‌স্পেক্টার তাঁহার মুখ দেখিয়াই ব্যাপার বুঝিল।

তখন নীরবেই উভয়ে "সাহেবের" বাংলো ত্যাগ করিলেন।

৭

আজ আর কোনও বিষয়ে রায় সাহেবের উৎসাহ ছিল না। সন্ধ্যার পরেই আলো জ্বালিয়া তিনি কিছুক্ষণ ধূমপান করিলেন। পুরাতন পরিচারক গোপাল মনিবের ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া মাঝে মাঝে দ্বারপথে উঁকি মারিয়া দেখিতেছিল।

পল্লী অঞ্চলে মাঘের শীত আরও দুর্জ্জয় বোধ হইতেছিল। রায় সাহেব টেবলের ধারে বসিয়া একখানি বই লইয়া পড়িবার চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাহাও ভাল লাগিল না। আজ যেন কেমন এক প্রকার শ্রান্তি আসিয়া অকস্মাৎ তাঁহার মনের উপর চাপিয়া বসিয়াছিল।

বইখানি রাখিয়া দিয়া তিনি মহিলাদিগের নামের তালিকাটি বাহির করিলেন। উঃ! প্রায় পঞ্চাশটি নাম! তন্মধ্যে ধনসম্পত্তিশালী, সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলার সংখ্যাও কম নহে! কি আপশোষ! কি আপশোষ!

সকালবেলা "সাহেব," কলিকাতা হইতে সমাগতা মহিলাদের সম্বন্ধে যে কাগজখানি দিয়াছিলেন, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পকেট হইতে সেখানা টানিয়া বাহির করিলেন, দেখাই যাক না। তাহারা কাহাদের ঘরণী!

সাতটি মহিলা আজ তিন দিন এখানে আসিয়াছেন। তন্মধ্যে দুই জনের নাম তিনি জানেন। কিন্তু বাকী পাঁচটি কে?

বৃদ্ধ একে একে নাম কয়টি পড়িয়া গেলেন। সহসা তিনি চমকিয়া উঠিলেন।

"মনোরমা দেবী!" মনোরমা! এ কোন্ মনোরমা? না, না, নামের সাদৃশ্য দেখিয়া চমকিত হইলে চলিবে কেন? এ নামের ত কত নারীই আছে!

বৃদ্ধের দৃষ্টি তাড়াতাড়ি পরিচয়ের অংশের দিকে ছুটিয়া গেল।

"বাবা! বাবা!"

বৃদ্ধ সর্পদষ্টের মত চমকাইয়া লাফাইয়া উঠিলেন। এ কাহার কণ্ঠস্বর! বীণাধ্বনিবৎ মধুর, অমৃতধারার ন্যায় পবিত্র, হৃদয় এ প্রাণগলান স্নেহের ধ্বনি যে তিনি অনেক দিন শুনেন নাই। এই সুদূর পল্লী-সহরের প্রান্তে এ সুধাসিক্ত সম্বোধন কি তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার বলেই শব্দময় হইয়া উঠিল?

পুরাতন ভৃত্য গোপাল দ্রুতবেগে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর আনন্দ-কম্পিত কণ্ঠে উত্তেজিতভাবে বলিয়া উঠিল, "বাবু, দিদিমণি! দিদিমণি!"

বৃদ্ধ সবেগে চেয়ার ঠেলিয়া দ্বারের কাছে আসিতেই সম্মুখে বস্ত্রাবৃতা নারীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। প্রজ্বলিত আলোকধারা নবাগতার প্রসন্ন পদ্মের মত মুখের উপর ঝলসিয়া উঠিল। সত্যই ত, এ যে তাঁহার একমাত্র সন্তান, মনোরমা! তাঁহার আঁধার ঘরের মাণিক, পরলোকগতা পত্নীর সাধের কন্যা, জীবনের ধ্রুবতারা মনোরমা! এই কন্যাকে উপলক্ষ করিয়াই হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় এত দিন সংসারে লীলাখেলা করিতেছিলেন। অর্থের প্রতি, সম্মান-প্রতিপত্তির প্রতি বিপুল আসক্তি; তাও এই মনোরমার জন্য। এই একটিমাত্র কন্যাকে সুখী করিবার জন্য তিনি না করিয়াছেন কি?

পত্নী এক বৎসরের শিশুকে রাখিয়া যখন পরপারে যাত্রা করেন, ইচ্ছা করিলে হীরালাল তখন আবার বিবাহ করিতে পারিতেন। কিন্তু মনোরমার মুখ চাহিয়া তিনি সে প্রলোভন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার পর বুকে পিঠে করিয়া তিনি মাতৃহীনা কন্যাকে বড় করিয়াছিলেন। অবশ্য সে সময়ে তাঁহার বিশ্বস্ত ভৃত্য গোপালও এ বিষয়ে তাঁহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিয়াছিল।

তাহার পর কন্যাকে তিনি উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়া ভালঘরের সুশিক্ষিত পাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই তিনি পেন্সন লইলে পারিতেন; কিন্তু কন্যার জন্য আরও অধিক অর্থ-সঞ্চয় করিবার দুর্নিবার স্পৃহা তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে দেয় নাই। কন্যার অর্থের অভাব ছিল না। কিন্তু হীরালাল অর্থকেই পরমার্থ জ্ঞান করিয়া "অধিকন্তু ন দোষায়" হিসাবে কেবলই কন্যার জন্য অর্থ-সঞ্চয় করিতে করিতে—শেষে সেই নেশাতেই ভোর হইয়াছিলেন।

বালকের ন্যায় ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তিনি পদলুণ্ঠিতা কন্যাকে তুলিলেন। তাহার পর পরম স্নেহে তাহার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া বলিলেন, "মা, তুই এখানে?"

পিতাপুত্রী তখন কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সাক্ষাতের বিপুল আনন্দ উভয়েরই হৃদয়ে মুখে উছলিয়া উঠিতে লাগিল। কুশল-প্রশ্ন করিতে করিতে টেবলের ধারে চেয়ারে উভয়ে উপবিষ্ট হইলেন। গোপাল তখন তাড়াতাড়ি তাহার দিদিমণির জন্য রন্ধনাদির ব্যবস্থা করিতে গেল।

পিতা বলিলেন, "তুই এখানে কার সঙ্গে এসেছিস, মা? আমাকে একটু খবর দিলিনি কেন?"

সহাস্য-মুখে মনোরমা কহিল, "আপনি এখানে আছেন, যদি আগে জানতাম, তা হ'লে লিখতাম বৈ কি! আমরা আজ তিন দিন এখানে এসেছি। চৌধুরী মহাশয়দের বাড়ীতে আমরা অতিথি।"

রায় সাহেব চমকিয়া উঠিলেন। মনোরমা বলে কি? কন্যার দিকে ভাল করিয়া চাহিতে তাহার অঙ্গে খদ্দর-বেশ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল, তবে কি—? টেবলের উপর রক্ষিত পরিচয়ের তালিকাটির দিকে চাহিয়া তিনি মনে মনে পড়িলেন—"মনোরমা দেবী, সুধীরচন্দ্র রায়ের পত্নী। সুপ্রসিদ্ধ জমীদার ও এটর্ণী হরলাল রায়ের পুত্রবধূ। রায় সাহেব হীরালাল বন্দ্যোপাধ্যায় পুলিস সুপারিণ্টেডেণ্টের এক-মাত্র দুহিতা।

অবাক্ বিস্ময়ে তিনি কয়েক মুহূর্ত্ত কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন। উঃ! আর একটু হইলে কি সর্ব্বনাশই হইত! ভাগ্যে "সাহেব" ছিলেন! তাহার পর ভগ্নকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "মা, তুই কি শেষে স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে দেশে দেশে বেড়াতে লাগলি? তোর শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী সবাই তোকে এমন-ভাবে ছেড়ে দিলে?

তেমনই মধুর হাস্যে মনোরমা বলিল, "তা'তে কোন দোষ আছে কি, বাবা? কোন মন্দ কাজ কি করছি? আর অনু-মতির কথা বল্‌ছেন? তা আমার শ্বশুর-শাশুড়ী মত দিয়েছেন। তবে বক্তৃতা করতে আমি আসিনি। চরকায় সূতা কাটা দেখাবার জন্যে এসেছি। আমার ননদ নন্দাইও সঙ্গে আছেন।"

হীরালাল নীরবে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তাঁহার হৃদয়ে তখন কি ঝটিকা বহিতেছিল!

নিতান্ত বিমূঢ়ভাবে তিনি সম্মুখের দীপাধারের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মনোরমা ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইল; তাহার পর ধীরে ধীরে পিতার কাছে আসিয়া তাঁহার রজত-শুভ্র কেশরাজির মধ্যে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে করিতে ডাকিল—"বাবা!"

সে স্নেহস্পর্শে বৃদ্ধের সমস্ত শরীর যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল, সুখাবেগে তিনি নয়ন নিমীলিত করিলেন। কন্যার মধুর পিতৃ-সম্বোধনে তাঁহার হৃদয়ে একটা অব্যক্ত আনন্দ-সমুদ্র উথলিয়া উঠিল। বৃদ্ধ চোখ মেলিয়া কোমল স্বরে বলিলেন, "কি মা?"

"আমায় একটা ভিক্ষা দেবেন, বাবা?"

ভিক্ষা! তাঁহার একমাত্র সন্তান, সংসার-মরুভূমির এক-মাত্র ওয়েসিস্‌স্বরূপ কন্যা ভিক্ষা চাহিতেছে? তাঁহার যাহা কিছু, সবই যে তাহার! শুধু তাহারই জন্য তিনি এখনও প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। তাহাকে ভিক্ষা দিতে হইবে?

পিতা ব্যাকুলভাবে কন্যাকে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিয়া উঠিলেন, "বলিস্ কি, মা? ভিক্ষা কি রে! সবই যে তোর, মনো! কি চাস্, বল্।"

মনোরমার মুখমণ্ডল সহসা দীপ্ত হইয়া উঠিল। সে পিতার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "বাবা! খেটে খেটে আপনার শরীর মাটী হয়ে যাচ্ছে। এ বয়সে আর কেন? আপনি এখন অবসর নিন্. বাবা! আমি আপনার সেবা করব। চলুন বাবা, কাশী যাই। আমি শ্বশুর-শাশুড়ীকে ব'লে কিছু দিন আপনার সেবা করব, বাবা! আর টাকার কি দরকার? আপনার যা আছে, পায়ের উপর পা রেখে রাজার হালে চ'লে যাবে, বাবা! তা ছাড়া পেন্সন ত পাবেন। এ বয়সে আপনি এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াবেন, সে আমার সহ্য হবে না। চলুন, কাশী যাই। এ ভিক্ষা আমায় দেবেন?"

বলিতে বলিতে মনোরমার মুখমণ্ডলে স্নেহময়ী জননীর—মাতৃ-ত্বের ছবি যেন ফুটিয়া উঠিল। বৃদ্ধ একবার উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে সেই মধুর, স্নেহব্যাকুল মুখচ্ছবি দেখিলেন, তাহার পর টেবলের উপর মাথা রাখিয়া কয়েক মুহূর্ত্ত কি চিন্তা করিতে লাগিলেন।

মনোরমা পিতার মস্তকে, কেশে তেমনই ভাবে অঙ্গুলী-সঞ্চালন করিতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে সে আবার বলিয়া উঠিল, "বাবা!"

সহসা মাথা তুলিয়া তিনি কন্যার দিকে চাহিলেন। কন্যার মুখে আজ পরলোকগতা সাধ্বী পত্নীর ব্যাকুলতাপূর্ণ দৃষ্টি, উদ্বেগ যেন ফুটিয়া উঠিতেছিল। তাঁহার মনে হইল, সুদূর, লোকা-তীত রাজ্য হইতে কাহার কাতর প্রার্থনা যেন কন্যার কণ্ঠ-ধ্বনিতে শব্দময় হইয়া উঠিতেছে! বৃদ্ধের উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্ক-মধ্যে বিদ্যুৎ ধাঁধিয়া গেল। তাঁহার যেন মনে হইল, স্বয়ং অন্নপূর্ণা আজ ভিখারিণীর সাজে তাঁহার কাছে হাত পাতিয়া রহিয়াছে!

ব্যাকুলভাবে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কন্যার মস্তক বুকের উপর রাখিয়া তিনি বালকের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন, "মা! মা রে!"

* * * *

প্রভাতে ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল ভ্রমণোপযোগী বেশভূষা করিয়া চা পান করিতেছেন, এমন সময় রায় সাহেব হীরালাল তথায় কার্ড পাঠাইয়া দিলেন। "সাহেব" তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

রায় সাহেব নমস্কার করিয়া "সাহেবের" সম্মুখে

দাঁড়াইলেন। "সাহেব" একবার অপাঙ্গে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "হীরালাল, আমি এখনই চলিয়া যাইতেছি। আমার সেলুন প্রস্তুত। শুধু তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম। এখানকার কাজ এক রকম মিটিয়াছে। যাহা বাকী আছে, তুমি শেষ করিও। ভাল কথা, মহিলাদের গ্রেপ্তার সম্বন্ধে আর কোন গোলযোগ করিও না। বুঝিয়াছ?"

কলের পুতুলের ন্যায় রায় সাহেব ঘাড় নাড়িয়া গেলেন।

পকেট হইতে ঘড়ীটা টানিয়া লইয়া একবার দেখিয়া "সাহেব" আপন মনে বলিলেন, "ওঃ, এখনও দশ মিনিট সময় আছে। আর একটা কথা। আর মাসখানেক পরে আমি ছুটী লইয়া বিলাত যাইতেছি। সম্ভবতঃ আর ফিরিব না। বহু দিন পরিশ্রম করিয়াছি, এখন বিশ্রাম করিব। হয় ত তোমার সঙ্গে এই শেষ দেখা। তোমার কর্ম্মদক্ষতায় আমি সন্তুষ্ট আছি। যদি তোমার কোন প্রার্থনা থাকে, বলিতে পার; আমি সাধ্যমত তোমার উপকার করিতে ক্রটি করিব না।"

হীরালাল "সাহেবকে" ধন্যবাদ জানাইয়া বলিলেন, "সাহেব, আপনার কাছে আমার একটি প্রার্থনা আছে। সেই জন্যই আমি বিশেষ করিয়া আপনার কাছে আসিয়াছি। যদি আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করেন, আমি যত দিন বাঁচিব, আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকিব।"

বলিতে বলিতে রায় সাহেব একখানি দরখাস্ত "সাহেবের" হস্তে প্রদান করিলেন।

"সাহেব" নিবিষ্টচিত্তে উহা পাঠ করিয়া সবিস্ময়ে বলিলেন, "সে কি! তুমি পেন্সন চাও? কেন, কেন, তোমার অতিরিক্ত কার্য্যকাল কি শেষ হইয়াছে?"

হীরালাল বলিলেন, "আজ্ঞে, এখনও আরও দুই বৎসর আমি কাজ করিতে পারি। কিন্তু 'সাহেব', আর এ শরীরে সহ্য হইতেছে না। আমার তৃতীয়বারের অতিরিক্ত কার্য্যকাল আর পাঁচ দিন পরে শেষ হইবে। সেই সঙ্গেই আমায় রেহাই দিবেন, এই আমার প্রার্থনা। আপনি থাকিতে থাকিতে আমার ব্যবস্থা করিয়া গেলে কোন গোলযোগ হইবে না।"

"সাহেব" কয়েক মুহূর্ত্ত স্থিরদৃষ্টিতে রায় সাহেবের মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "বুঝিয়াছি। এখন অবসর লইলে কিছুকাল সরকারী বৃত্তি-ভোগের অবসর পাইবে। সেই আরামের লোভে যাইতে চাহিতেছ। বেশ, আমি তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম। নমস্কার রায় সাহেব, ভগবান্ তোমায় শান্তি দিন!"

"সাহেব" কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন।

মাসিক বসুমতী—বৈশাখ ১৩২৯

সিংহের ল্যাজ

১

বন্ধুরা তাহার নাম দিয়াছিল—সিংহের ল্যাজ। পশুরাজের লাঙ্গুলের সহিত দীনবন্ধুর কোন সাদৃশ্য ছিল কি না, ইতিহাসে তাহার উল্লেখ নাই; তবে বন্ধুগণ তাহার অগোচরে এই উপাধির উল্লেখ করিয়া যে পরমানন্দ লাভ করিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

মাইনর পরীক্ষায় কোনরূপে উত্তীর্ণ হইবার পর দীনবন্ধু সে কালের প্রবেশিকা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল; কিন্তু গণিত শাস্ত্রের সহিত চির-অপ্রণয় হেতু দীনবন্ধু প্রবেশিকার দ্বার-দেশে হোঁচট খাইয়া পড়িয়া গিয়াছিল। ইহাতে উদ্যমহীন না হইয়া সে সংস্কৃত সাহিত্যের মন্দিরে অর্ঘ্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। কালিদাস ও ভবভূতির নাটক ও কাব্যের কোন কোন অংশ অনেক সময় আবৃত্তি করিয়া সে বন্ধুবর্গকে শুনাইত। বিশেষতঃ বাঁধান উত্তররামচরিতখানা প্রায়ই তাহার হাতে দেখা যাইত। উহার পৃষ্ঠদেশে সোনার জলে ছাপান "ভবভূতিবিভূতিবিভোর দীনবন্ধু" এই অংশটুকু পাঠ করিলে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি তাহার অনুরাগের পরিচয় সম্বন্ধে কোনও সন্দেহেরই অবকাশ থাকিতে পারে না।

সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যেরও সে অনুরক্ত ভক্ত ছিল। স্বয়ং গদ্য অথবা পদ্য রচনায় কৃতিত্ব দেখাইতে না পারিলেও তাহার রসজ্ঞতা সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। সে যে সমজদার পাঠক ও কঠোর সমালোচক, সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তরুণ বন্ধুবর্গের অনেকেরই মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় হইয়াছিল। এ জন্য বন্ধু ও সতীর্থ-মহলে প্রকৃতই সে বিশেষ খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্ত হইলেও সে সাহিত্যসেবীমাত্রকেই শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করিত না। এ জন্যও নবীন সাহিত্যসেবী বন্ধুরা তাহাকে সমধিক শ্রদ্ধা করিত। কেহ কিছু রচনা করিলে দীনবন্ধুকে না শুনাইয়া কোন সাহিত্যিক বন্ধু তাহা প্রকাশের চেষ্টা করিত না। দীনবন্ধুর নিকটে কোনও রচনা সমাদৃত হইলে তাহারা মনে করিত, প্রকৃতই তাহাতে সার ভাগ পাওয়া যাইবে।

দীনবন্ধুর আরও একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, সে ছোটকে যেমন নগণ্যজ্ঞানে উপেক্ষা করিতে পারিত, বড়র গুণগানে তেমনই পঞ্চমুখ ছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের বাজারে যাহারা সস্তায় কবি ও ঔপন্যাসিক নাম কিনিবার চেষ্টা করিতেছিল, তাহাদের অনেকের রচনায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকের রচনার সাদৃশ্য উদ্ধৃত করিয়া সে বন্ধুবর্গকে চমৎকৃত করিয়া দিত। এ জন্য প্রকৃতই বন্ধুগণ তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিত না।

কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সমালোচনাশক্তি যেমন বাড়িয়া যাইতেছিল, সতীর্থ ও বন্ধুবর্গের সহিত তাহার সংস্রবও তেমনই বিরল হইয়া পড়িতেছিল। দীনবন্ধুর লক্ষ্য সর্ব্বদাই ঊর্দ্ধদেশে ছিল। স্থান অথবা পাত্রপাত্রীবিশেষে সে আশে-পাশে অথবা নিম্নে চাহিলেও বন্ধুরা প্রায়ই অভিযোগ করিত, দিন দিন তাহার দৃষ্টি ঊর্দ্ধগামিনী হইতেছে। সম্ভবতঃ সাহিত্যে আভিজাত্যই তাহার আদর্শ ছিল।

কোনও সতীর্থ ও বাল্যবন্ধুর গৃহে সে দীর্ঘকাল যাপন করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিল। এই নিখিল বিশ্বে তাহার আপনার জন কেহ ছিল না। ধনী পিতার একমাত্র বংশধর এই বন্ধুটি দীনবন্ধুর যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিত। এ জন্য দীনবন্ধু, হরেন্দ্রনাথের অনুগত হইবারই সম্ভাবনা।

উল্লিখিত বন্ধু সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু পরিচিত হওয়ায় তাহার সাহায্যে সাহিত্যরসপিপাসু দীনবন্ধু বঙ্গের খ্যাতনামা বহু নবীন ও প্রবীণ সাহিত্য-রথীর সহিত পরিচিতও হইয়াছিল। সাংসারিক অন্যান্য বিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে না পারিলেও দীনবন্ধু অল্পদিনের মধ্যে কোনও প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও সাহিত্যরথীর বিশেষ ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অবসরসময়ে সে বহুক্ষণ তাঁহার বাড়ী কাটাইত, সভাসমিতি যেখানেই হউক না কেন, বাগ্মিবর যেখানেই যাইতেন, ছায়ার ন্যায় দীনবন্ধু তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

একটা নূতন চাকরী বন্ধুদিগের সাহায্যে যোগাড় হইবার পর সে পূর্ব্ববন্ধুর গৃহত্যাগ করিয়া মেসে চলিয়া গিয়াছিল। কারণ, সাহিত্য-মহারথের সহিত সর্ব্বদা মিলামিশা করিবার সুযোগ তাহাতে বেশী হইত। বন্ধুবর্গের সমালোচনার হাঙ্গামাও বড় একটা পোহাইতে হইত না।

এই সময় হইতে দীনবন্ধুর ঊর্দ্ধগামিনী দৃষ্টি ক্রমেই স্থিরতা লাভ করিল—কদাচিৎ আশে-পাশে নিক্ষিপ্ত হইত।

তাহার ব্যবহারের পার্থক্য এবং তাহার মুখে বাগ্মিবর সাহিত্যিক বন্ধুর উক্তি ও মতের ঘন ঘন প্রতিধ্বনি শুনিয়া কোনও স্পষ্টভাষী দুর্মুখ বন্ধু দীনবন্ধুর নামের শেষে 'সিংহের ল্যাজ' জুড়িয়া দিয়াছিল। এই নূতন উপাধি আবিষ্কারের পর বন্ধুরা দীনবন্ধুর প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে, ঐ নামেই তাহাকে অভিহিত করিত। দীনবন্ধু তাহার এই নূতন উপাধিলাভের সংবাদ জানিত কি না, তাহা প্রকাশ নাই; তবে উপযাচক হইয়া কেহ যে তাহাকে এই সংবাদ জ্ঞাপন করে নাই, তাহা যথার্থ।

দীনবন্ধুর নূতন নাম বা উপাধির ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

২

আকাশে গাঢ় মেঘের মসিপ্রলেপে অপরাহ্ণের আলোক ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ঝটিকার ও বৃষ্টির আসন্ন সম্ভাবনা দেখিয়া পল্লীর গৃহস্থবধূ ও কন্যারা সম্মুখের পুষ্করিণী হইতে বাসন মাজা, কাপড় কাচা প্রভৃতি কাজ তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতেছিল।

বাল্যবন্ধুর বৈঠকখানাঘরে বহুদিন পরে দীনবন্ধু উপবিষ্ট। তাহার ঊর্দ্ধগামিনী দৃষ্টি আজ কোনমতেই মেঘনম্র আকাশে স্থির থাকিতে পারিতেছিল না। এই ঘরে সে দীর্ঘকাল কাটাইয়াছে। ঐ পুষ্করিণী, তীরবর্ত্তী পল্লীগৃহগুলি তাহার সুপরিচিত। যাহারা ছোট ছিল, আজ তাহাদের দেহ সময়ের রেখাপাতে পুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথাই কি তাহার বার বার মনে পড়িতেছিল? অথবা মেঘমেদুর আকাশ দেখিয়া প্রবাসী যক্ষের "আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে" স্মরণ করিয়া তাহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল, কিংবা রবীন্দ্রনাথের "তরুণী পথিকললনারা" তাহার চিত্তমাঝে নীপশাখা রচনা করিয়া দোল খাইবার যোগাড় করিতেছিল? যাহাই হউক, আকাশমার্গ ত্যাগ করিয়া পুষ্করিণীর ঘাটে কর্ম্মরতা তরুণীর আন্দোলিত দেহলতিকার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া দীনবন্ধু যে সৌন্দর্য্যের ধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই।

বাতাসের বেগ প্রবল হইয়া উঠিল। পুষ্করিণীর দক্ষিণ তীরের পার্শ্বে রাজপথে ধূলির ধ্বজা তুলিয়া বাতাস ছুটিতে আরম্ভ করিল। বারিধারা নামিয়া আসিবার বিলম্ব নাই। এমন সময় রমেশ ও রবীন্দ্র দ্রুতপদে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল।

দীনবন্ধুর মুগ্ধ, অপলক দৃষ্টি তখনও বাতায়নের বাহিরে—পুষ্করিণীর ঘাটে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল। বহু দিন পরে দীনবন্ধুকে কাছে পাওয়ায় উৎসাহের আতিশয্যে হয় ত বন্ধু-যুগল তাহা লক্ষ্য করিতেও পারে নাই।

রমেশ সোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "এই যে দীনদা, তুমি এখানে? আমরা তোমাকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ হয়ে গেছি। শেষে শুনলাম, দুপুরবেলাই তুমি বেরিয়ে গেছ। হরেন বাড়ী আছে ত?"

দ্বিতীয় বন্ধু রবীন্দ্র বলিল, "তোমাকে এখানে পেয়ে ভালই হ'ল। একটা জরুরী কথা আছে, দীনদা।"

বয়স হিসাবে সে সতীর্থগণের সকলেরই বড় ছিল।

আকাশ কাঁপাইয়া মেঘ কয়েকবার ভীষণ-রবে ডাকিয়া উঠিল। জোরে বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিল। ত্রস্ত অঞ্চল গুটাইয়া রমণীরা দ্রুত স্ব স্ব ভবনে আশ্রয় লইতে ছুটিল।

সৌন্দর্য্যের একনিষ্ঠ ভক্ত দীনবন্ধু ঊর্দ্ধপানে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "ভারী চমৎকার!"

বন্ধুযুগল একবার পরস্পর দৃষ্টিবিনিময় করিয়া লইল। তাহাদের অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা ক্রীড়া করিয়া গেল।

রমেশ বলিল, "কোন্‌টা চমৎকার দীনদা? প্রকৃতির এই লীলা, না তরুণীর পলায়ন?"

সক্রোধে বন্ধুর প্রতি চাহিয়া দীনবন্ধু বলিল, "ভারী ফাজিল হয়েছিস তোরা। কি যে বলিস্!"

রবীন্দ্র বলিল, "ওর যেমন কথা, দীনদা। তা তুমি একা ব'সে কেন? হরেন বাড়ী নেই?"

গম্ভীরভাবে দীনবন্ধু বলিল, "আছে বৈ কি, কিন্তু তার আক্কেলটা দেখ। আকাশে মেঘ দেখেই সেই যে সে বাড়ীর ভেতর গেছে, আধ ঘণ্টার মধ্যে আসবার আর নামটি নেই।"

দীনবন্ধুর প্রকৃতির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে, সে কোনও বিষয়ে সহসা কৌতূহল বা আগ্রহ প্রকাশ করিতে চাহিত না। বন্ধুরা কেন আজ তাহাকে এমন ভাবে খুঁজিতেছে, তাহা জানিবার আগ্রহ থাকিলেও, কৌতূহল প্রকাশ করিয়া সে আপনাকে অন্যের কাছে খর্ব্ব করিতে রাজি ছিল না।

দীনবন্ধুর মন্তব্য শেষ হইতে না হইতেই একখানা বড় থালা লইয়া হরেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। অমনই সকল আলোচনা যেন মন্ত্রবলে থামিয়া গেল। লুব্ধ নেত্রগুলি অকস্মাৎ একযোগে সেই দিকে ধাবিত হইল। সমগ্র থালা জুড়িয়া ঘৃত-ভর্জ্জিত চিঁড়ার মোহন শোভা! এ দৃশ্যে বাদলের দিনে কোন্ রসিকের রসনা শুষ্ক থাকিতে পারে?

টেবলের উপর থালাখানা রাখিয়া হরেন্দ্র মৃদুহাস্যে বলিল, "বাদলার দিনে লাগবে ভাল হে, তাই তোমাকে বসিয়ে রেখে গিন্নীকে দিয়েই ভাজিয়ে আনলুম। কিছু মনে করো না, দীনদা।"

মনে করিবার মত কিছু ছিল না। বন্ধুদিগের তৃপ্তির জন্য ধনীর সুখলালিতা পত্নীকে দিয়া চিঁড়া ভাজাইয়া আনার মধ্যে যে আন্তরিকতা ছিল, তাহা বন্ধুদিগের অগোচর রহিল না। এমন অনেকবারই হইয়াছে। বৃথা বাক্য-ব্যয়ের প্রয়োজন তখন আর কেহ অনুভব করিল না। সাকারের অভাব না ঘটিলে লোক নিরাকারের ভজনা করিতে চাহে না। ইহাই বোধ হয় সাধারণ নিয়ম। যখন কোন আকারবিশিষ্ট বাস্তব পদার্থের রসের সহিত কাহারও রসনার সংযোগ ঘটে, তখন কি সে অবাস্তব, শুষ্ক শব্দের বোঝা বহিয়া আপনাকে ক্লান্ত করিতে চাহে?

চারি বন্ধুর উৎসাহে ভাজা চিঁড়াগুলি অল্পসময়ের মধ্যেই স্থানপরিবর্ত্তন করিল। ভিতর হইতে উৎকলবাসী টিকীধারী ভদ্রলোকবাহিত লুচির থালা ও চা আসিয়া উপস্থিত হইল। বন্ধুবর্গের সরস রসনায় তখন নানা বিষয়ের আলোচনা একে একে আবির্ভূত হইতে লাগিল।

দীনবন্ধু অবকাশ পাইলেই গুরুজীর সম্বন্ধে আলোচনা করিবার উৎসাহ ছাড়িতে পারিত না। বন্ধুরা, বাগ্মিবরের সাহিত্যিক প্রতিভার সমাদর করিলেও তাহারা তাঁহার সকল মতকে দীনবন্ধুর ন্যায় মাথায় তুলিয়া ধরিতে সম্মত ছিল না। কিন্তু দীনবন্ধুর প্রতিজ্ঞা, সে সকলকে তাহার মতানুবর্ত্তী করিয়া লইবেই।

হরেন্দ্র বলিল, "তা যাই বল, দীনদা, তোমার গুরুজী রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে একেবারে গল্পসাহিত্যে পাড়ি জমিয়ে ভাল কাজ করেন নি। তাঁর উদ্ভট মত কেউ বরদাস্ত করতে পারে না। সে দিন ফাল্গুনের সংখ্যায় গল্প সম্বন্ধে তিনি আমার মত জানতে চেয়েছিলেন। লেখকের নাম ছিল না, কাজেই জানতাম না যে, ছদ্ম নামে ও গল্পটা তাঁরই লেখা। আমি বলেছিলুম, ওটা গল্পই নয়। বিবাহিতা স্ত্রী স্বামীর ঘর ছেড়ে দিয়ে, এক বৎসর একা স্বামীর গুরুর কাছে রইলেন, তার পর স্বামী তাঁকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করলেন, এর গল্পত্ব এবং আদর্শ একেবারেই বস্তুতন্ত্রহীন।"

দীনবন্ধু তীব্র দৃষ্টিতে বন্ধুর দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কথা তুমি তাঁর মুখের উপর বললে কি ক'রে?"

হরেন্দ্র বলিল, "তখন ত জানতাম না, 'হেমপ্রভা'র গল্প লেখক তোমারই গুরুজী; পরে জানতে পেরেছি। যদি তখন জানতেম, তিনিই সে গল্পের লেখক, তা হ'লে ব'লে আসতাম, তিনি অনধিকারচর্চ্চা ক'রে ভাল করেন নি। পরিণতবয়সে, বার্দ্ধক্যের সূচনায় ঔপন্যাসিক না হলেও মহাভারত অশুদ্ধ হ'ত না।"

গুরুজীর নিন্দাবাদে দীনবন্ধু জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু হরেন্দ্রকে সে অন্যের তুলনায় ভয় ও শ্রদ্ধা করিত—বোধ হয়, একটু ভালও বাসিত। কারণ, অসময়ে সেই তাহার একমাত্র আশ্রয় ছিল। সাহিত্যক্ষেত্রে যশস্বী লেখক বলিয়াও হরেন্দ্রের প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু আজ সে আর সহ্য করিতে পারিল না। সে বলিয়া উঠিল, "দেখ হরেন, ওসব তোমাদের বুঝবার বিলম্ব আছে। বৈষ্ণব-সাহিত্য ভাল রকম না বুঝতে পারলে, তিনি যে রসের চিত্র এঁকেছেন, তা ধরতে পারবে না। বৈষ্ণব-সাহিত্যে তাঁর মত অধিকার আর কার আছে, বল ত? পরকীয়া তত্ত্ব—"

সহসা বাধা দিয়া রমেশ বলিল, "দীনদা, পরকীয়া ছেড়ে এখন স্বকীয়ার দিকে একটু অবহিত হও। ও সব তত্ত্ব ত আমরা বুঝব না। ছায়া, মায়া, হেঁয়ালী রেখে আসল বস্তুতন্ত্র হওয়া যাক্। যে কাজে আজ এসেছি, তাই শোন।"

রবীন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ, সেটা যেমন জরুরী, তেমনই দরকারী।"

হরেন্দ্র জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে বন্ধুদিগের প্রতি চাহিল। দীনবন্ধু সহসা দৃষ্টিকে পুনরায় ঊর্দ্ধদিকে প্রেরণ করিল। আকাশে তখন মেঘ ও বিজলীর লীলা চলিতেছিল।

রমেশ বলিল, "আমাদের পাড়ার মহেন্দ্রবাবুকে তুমি বোধ হয় দেখেছ, হরেন? তিনি—কোম্পানীর বড় বাবু। অনেকগুলি মেয়ে তাঁর আছে। লোকটা দরাজ হাত ব'লে কিছু জমাতে পারেন নি। মেয়েগুলিও অপ্সরা নয়। কাজেই জান ত বরের বাজারে তাঁকে বেগ পেতে হচ্ছে। উপস্থিত

বড় মেয়েটির বিয়ের জন্ত ব্যস্ত হয়েছেন। পয়সাকড়ি বেশী দিতেও পারবেন না, খরচও করতে পারবেন না। দীনদার কথা তাঁকে বলেছিলেম। বয়স একটু বেশী শুনেও তিনি রাজী আছেন। আমাদেরও বেশী টাকার প্রয়োজন নেই জেনে তিনি যাতে এ বিবাহ হয়, তার জন্ত অনুরোধও করেছেন।"

রবীন্দ্র বলিল, "দীনদার মত জানি, টাকা সামান্ত হলেই চ'লে যাবে। আর আমরা ৫ জন না হয় চাঁদা ক'রে কাজ সেরে ফেল্‌ব, কি বল, দীনদা ?"

দীনবন্ধু মুখে কিছু বলিল না, শুধু মৃদু ঘাড় নাড়িল।

হরেন্দ্র গম্ভীরভাবে বলিল, "তা দীনদা'র বয়স এমন বেশীই বা কি ? আমার চেয়ে ছ' বছরের বড়। বোধ হয়, দাদার এই ৩৪ চল্‌ছে ; কেমন না ?"

রমেশ বলিল, "বিশেষতঃ চির-কৌমার্য্যের ফলে দাদার শরীর বেশ আছে। মাথায় একটু টাক পড়েছে বটে, কিন্তু একটা চুলও পাকেনি।"

হরেন্দ্র প্রশ্ন করিল, "মেয়েটি দেখেছ ? বয়স কত, দেখতে কেমন ?"

রবীন্দ্র চাকরের হাত হইতে আলবোলার নলটা লইয়া বলিল, "দেখতে শ্যামবর্ণ, বয়স বারো চল্‌ছে।"

হরেন্দ্র বলিল, "আমার বড় মেয়ে রাণুর বয়সী। তা নেহাৎ অশোভন হবে না।"

রমেশ বলিল, "দাদার এই প্রথম পক্ষ, আমাদের মনুর শাস্ত্রমতে এই বয়সেই বিয়ে হওয়া উচিত।"

বারিধারা ঝর-ঝর শব্দে পড়িতেছিল, 'গুরুগর্জ্জনে নীল অরণ্য শিহরিয়া' উঠিবার সম্ভাবনা কলিকাতা সহরে না থাকিলেও মানুষের অন্তর যে চমকিয়া উঠিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমগ্র প্রকৃতি আজ যেন সঙ্গীতে ভরিয়া উঠিয়াছে। দীনবন্ধুর প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছিল, বিধাতা তাহাকে সঙ্গীতমুগ্ধ—পিপাসু হৃদয় দিয়াছেন, কিন্তু কণ্ঠ দেন নাই। যদি তাহার কণ্ঠে সুর থাকিত, তবে—তবে সে আজ প্রাণমাতান বাদলগানে সকলকে অভিভূত করিয়া ফেলিত।

বহুকাল পরে বিবাহের প্রস্তাব দশ বৎসর পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিল, তখন হেলায় সে সুযোগ সে হারাইয়াছিল। তখন সঙ্কল্প ছিল, কৃতী না হইয়া বিবাহ করিবে না। কিন্তু সহায়-সম্পদহীন সামান্ত বেতনের আত্মীয়-বর্জ্জিত কেরাণীকে তাহার পর সহসা কেহ আর কন্তাদানের প্রস্তাব করেন নাই। এত দিন পরে আবার যদি সে সুযোগ আপনা হইতে আসিয়া থাকে, সে কি তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে ? বয়সের অসামঞ্জস্য ?—বাঙ্গালীর মেয়ে, বিবাহের জল গায়ে পড়িলেই দেখিতে দেখিতে সকল অসামঞ্জস্য ঢাকিয়া ফেলিবে।

হরেন্দ্র বলিল, "তা হ'লে ঠিক ক'রে ফেলা যাক্, দীনদা ?"

"তা তোমরা যদি ভাল বোঝ, আমার আপত্তি নেই। তবে একটা ভাল চাকরী—"

বাধা দিয়া রমেশ বলিল, "সে সব কথাও হয়েছে। মহেন্দ্র-বাবু তাঁর আপিসেই তোমার একটা ভাল চাকরী ক'রে দেবেন বলেছেন।"

হরেন্দ্র বলিল, "তবে আর বাধা কি ? শুভস্য শীঘ্রং। আগামী রবিবারে মেয়ে দেখে, পাকা কথা দেওয়া যাবে।"

ভিতর হইতে ঠিক সেই সময় শঙ্খ বাজিয়া উঠিল। ঘরে ঘরে তখন সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছিল।

৩

সর্ব্বাঙ্গ খদ্দরে ভূষিত দীনবন্ধুকে দেখিয়া আপিসের কেরাণী সহকর্ম্মীরা সবিস্ময়ে তাহার দিকে চাহিল।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগ হইতে এ পর্য্যন্ত দীনবন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধবগণও কোনও দিন তাহাকে স্বদেশী দ্রব্যের প্রতি তেমন অনুরাগ প্রকাশ করিতে দেখে নাই। সে কোনও দিন য়ুরোপীয়ভাব বা আচার-ব্যবহারের ভক্ত ছিল না—কোনও য়ুরোপীয়কে সমধিক শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেও দেখিত না—সে কথাও মিথ্যা নহে ; কিন্তু তথাপি যেহেতু স্বদেশজাত, সেহেতু তাহাকে শ্রদ্ধাভরে মাথায় রাখিতে হইবে, এমন দেশভক্তি দীনবন্ধুর কোষ্ঠীতে লেখা ছিল না। দেশের বাতাস, দেশের জল, দেশের ফল, ফুল প্রভৃতির প্রতি তাহার সমধিক ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। কবির সঙ্গীত—দেশভক্তির মন্দাকিনীধারাপূত কবিতা, স্তোত্র সবই তাহার ওষ্ঠাগ্রে বিরাজ করিত ; দেশের নেতৃগণ ওজস্বিনী ভাষায় স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে যেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহা দীনবন্ধুর নখদর্পণে ছিল বলিলেই হয় ; কিন্তু তাই বলিয়া ছালার চট দেহ আবৃত করিয়া দেশভক্তির পরিচয় দিতে হইবে, এমনতর স্বদেশপ্রীতি দীনবন্ধুর ছিল না।

দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকাকে গৃহিণী করিবার পর দীনবন্ধু শ্বশুরের চেষ্টায় তাঁহারই আপিসে ৫০৲ টাকা বেতনের চাকরী পাইয়াছিল। দুই বৎসর ধরিয়া সেই চাকরী করার ফলে এবং শ্বশুরের চেষ্টায় সে সহরের উপকণ্ঠস্থিত পল্লীতে শ্বশুরালয়ের নিকটেই সস্তায় একটা ছোট বাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া ফেলিয়াছিল। বাড়ী তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই বলিয়া তখনও সে শ্বশুরালয়ে সুখে দিন কাটাইতেছিল।

আপিসের কেহ দুই বৎসরের মধ্যে দীনবন্ধুকে খদ্দর দূরের কথা, বঙ্গলক্ষ্মী মিলের কাপড় পর্য্যন্ত পরিতে দেখে নাই। কাজেই আজ তাহার দেহে খদ্দর দেখিয়া সকলেরই বিস্ময়-বোধ হইল।

বড়বাবুর জামাতা বলিয়া আপিসের সকলেই প্রথমতঃ তাহাকে একটু খাতির করিয়া চলিত। কিন্তু দীনবন্ধুর সদা ঊর্দ্ধগামী দৃষ্টি এবং পাণ্ডিত্যাভিমান অনেককেই আঘাত করিত। কোন প্রসঙ্গের আলোচনা হইলে সে এমন বড় বড় কথা এমন ভাবে বলিতে আরম্ভ করিত এবং বাঙ্গালা দেশের প্রথিতযশা সাহিত্যিক, বক্তা ও নেতার সহিত সে যে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত, এই সকল কথা এমন ভাবে প্রকাশ করিত যে, অনেকের চিত্ত তাহাতে বিকৃত হইয়া উঠিত। প্রথমতঃ নিঃশব্দে বা বিনা প্রতিবাদে তাহার মতামতকে তাহারা শুনিয়া যাইত বটে, কিন্তু ক্রমে সে ভাব আর রহিল না। অপেক্ষাকৃত যুবক এবং কোন কোন স্পষ্টভাষী প্রৌঢ় মাঝে মাঝে তাহাকে দুই চারিটি অপ্রিয় সত্য কথা শুনাইতেও কুণ্ঠিত হইত না।

জনৈক স্পষ্টভাষী সহকর্ম্মী মৃদুহাস্তে বলিয়া উঠিল, "কি সর্ব্বনাশ! দীনবন্ধুবাবুর সর্ব্বাঙ্গে খদ্দর?"

তখনও আপিসের কাজ আরম্ভ হয় নাই। কেরাণীরা তখনও একে একে আফিসে আসিতেছিল। কলবাবু—টাইপিষ্ট বাবুকে সকলেই 'কলবাবু' বলিয়া ডাকিত—গোঁড়া স্বদেশী এবং পরিহাস-রসিক বলিয়া আপিসে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর পূর্ব্ব-ইতিহাস তিনি কিছু কিছু জানিতেন, কারণ, রমেশ ও রবীন্দ্র যে পল্লীতে থাকিত, তাঁহার বাড়ী সেইখানে। অনতিক্রান্ত-যৌবন কলবাবু পরিপুষ্ট, বৃহৎ গুম্ফে তা দিতে দিতে বলিয়া উঠিলেন, "এতে বিস্ময়ের কারণ কি আছে, ভায়া? দীনবন্ধুবাবু শুধু উপর-ওয়ালার নকল করেছেন বৈ ত নয়!"

চারিদিক্ হইতে সকলে ধরিয়া বসিল, "সে কি রকম, রায় ম'শায়?"

রায় মহাশয় বলিলেন, "তা জান না বুঝি? উনি বাক্যে স্বদেশভক্তির এত পরিচয় দেন, অথচ বিদেশী জিনিস ছাড়া কিছুই ত ব্যবহার করেন না কেন? তার হেতু হচ্ছে, ওঁর যিনি আদর্শ বা উনি যাঁকে গুরু ব'লে মানেন, তিনি মস্ত বড় বক্তা ও রাজনীতিবিশারদ ব'লে পরিচিত। দেশের এক জন ভক্ত সন্তান বলেও তাঁর নাম আছে। কিন্তু উনপঞ্চাশ নম্বর রেলীর থান ছাড়া এ পর্য্যন্ত কেউ একখানা মিলের কাপড়ও তাঁকে পরতে দেখেছ?"

দীনবন্ধুর আপাদমস্তক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল, তাহার অধরোষ্ঠ কম্পিত হইতে লাগিল। কিন্তু এই কলবাবুটি স্বদেশী হইয়াও আপিসের "বড়সাহেবের" বড় প্রিয় এবং আপিসের সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিত। দীনবন্ধু তাহা জানিত। তাই সে অতিকষ্টে আপনাকে সংযত করিল।

কেরাণীরা কৌতুক অনুভব করিয়া বলিল, "তাতে দীনবন্ধু-বাবুর কি?"

"আহা! এই সোজা কথাটা বুঝতে পাচ্ছ না? মহাত্মা গন্ধীর প্রভাবে সমগ্র দেশটা মেতে উঠেছে। চারিদিকেই এখন খদ্দরের গান। এই ১৯২১ অব্দটাকে বড় সোজা মনে করো না, ভায়া! চারিদিকের ভাবগতিক দেখে দীনবন্ধু-বাবুর ওস্তাদও মত বদলে ফেলেছেন। অর্থাৎ এত দিন বাক্যে তিনি ঘোর স্বদেশভক্ত ছিলেন—মনের কথা জানি না—এখন কায়িক ব্যবহারেও তার প্রমাণ দিয়েছেন। সিংহের সর্ব্বাঙ্গে স্পন্দন দেখা দিলে, তাহার ল্যাজটিও কি নিস্পন্দ থাকে, ভায়া?"

এক জন বলিয়া উঠিল, "উপমাটা ঠিক বোঝা গেল না, রায় ম'শায়!"

রায় মহাশয় দীনবন্ধুর দিকে কটাক্ষ করিয়া বলিলেন, "ও আর বুঝে কাজ নেই। কি বলেন, দীনবাবু?"

দীনবন্ধু আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না; অপমানে ও লজ্জায় তাহার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে সক্রোধে বলিয়া উঠিল, "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরা-ধার। ভদ্রলোকের সম্মান ভদ্রলোকেই রাখে। অন্যত্র তা পাবার আশা—দুরাশা।"

জনৈক তরুণ কেরাণী লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "দীনবাবু,

রসনাকে সংযত করুন, আপনার পাণ্ডিত্য দেখাতে চান্ দেখান, কিন্তু ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করবেন না।"

তখন দীনবন্ধুর মাথায় শোণিতস্রোত প্রবলবেগে ধাবিত হইতেছিল। সে গলার স্বর উন্নত করিয়া অল্পশিক্ষিত বাঙ্গালীর ব্যবহারের তীব্র প্রতিবাদ করিতে লাগিল। সীমা ছাড়াইয়া সে এমন অনেক কথা বলিয়া ফেলিল যে, তাহাতে কেরাণীদিগের কৌতুকপ্রবৃত্তির স্থলে ক্রোধই প্রবল হইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ হেড একাউণ্টেণ্ট সেই সময় অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "দীনবন্ধুবাবু, আপনি বাড়াবাড়ি করছেন। আপনার শ্বশুর বড়বাবু হলেও মনে রাখবেন, এটা আপনার বৈঠকখানা-ঘর নয়, এটা আপিস। আপনি লেখাপড়া কিছু জান্‌লেও, মনে রাখবেন, অন্যেও মূর্খ নয়। আর যদি পাণ্ডিত্য দেখাতে হয়, আপনার সাহিত্যিক মজলিসে দেখাবেন। এখানে 'সাহেবের' মাইনে যেমন নিচ্ছেন, তেমনই তাঁর কাজ করবেন। বক্তৃতা বা গল্প করবেন না।"

এই কথার পর দীনবন্ধু সহসা চুপ করিয়া গেল। ক্রোধ তাহার অন্তরকে দগ্ধ করিলেও এই কবুল জবাবের পর আর কথা বলা চলে না। অপর কেরাণীরা দীনবন্ধুর অবস্থা দেখিয়া মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল।

প্রহৃত কুক্কুরের ন্যায় দীনবন্ধু আপনার আসনে গিয়া বসিল। তাহার শ্বশুর বড়বাবু হইলেও এই বৃদ্ধটিও 'সাহেবের' প্রিয়পাত্র এবং আপিসের ছোটবাবু। তাহার শ্বশুরের অপেক্ষাও কোন কোন বিষয়ে ইহার প্রভাব বেশী।

দীনবন্ধুর বিনীত ভাব দেখিয়া যুবকের দল কৌতুক অনুভব করিল এবং কাহারও কাহারও ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাস্য-রেখা উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

৪

"দেখুন, আমার চাকরী করা পোষাচ্ছে না।"

জামাতার রোষরক্ত গম্ভীর আননে মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাত করিয়া মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "কি হয়েছে?"

হাত-পা নাড়িয়া দীনবন্ধু বলিল, "আপনি কি কিছু জানেন না? আপনার প্রশ্রয় পেয়েই ত ওরা আমার পেছনে অমন ক'রে লাগে।"

জামাতার রূঢ় ও অবিনীত বাক্য শুনিয়া মহেন্দ্রবাবু শুধু বিস্মিত হইলেন না, একটু বিরক্তিও বোধ করিলেন। কিন্তু ব্যবহারে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, "কি হয়েছে, শুনি?"

"রোজই আমার একটা না একটা দোষ বার করা ওদের স্বভাব দাঁড়িয়েছে। কেন, আমি কি করেছি, ও বছর আপিস শুদ্ধ লোক আমাকে এক দিন কি অপমানটাই না কর্‌লে। আপনাকে জানালেম, একটু হেসে আপনি উড়িয়ে দিলেন। এখন ত রোজই, আমার দোষ না থাকলেও—দোষ বার করা চাই। আজ 'সাহেবের' কাছে নিয়ে গিয়ে আমায় ছোট বাবু যে রকম অপমান করালেন, তা কি আপনি জানেন না?"

মহেন্দ্রবাবু গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তা আমি কি করব, বাপু। দোষ ত তোমার সত্যিই হয়েছিল। আপিসের কাজ না ক'রে তুমি যদি চণ্ডীদাসের কবিতা বা 'চৈতন্য-চরিতামৃত' পড়, সেটা কি আমার দোষ?"

দীনবন্ধুর মন একেই বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল, শ্বশুরের মন্তব্য শুনিয়া তাহার চিত্ত তিক্ততায় ভরিয়া গেল।

মহেন্দ্রবাবু বলিয়া চলিলেন, "আমার পৈতৃক সম্পত্তি নয়, কোম্পানীর আপিস। তারা মাইনে দেয়, আমরা কাজ করি। হিসাবের রিটার্ণ বিলেতে পাঠাতে হবে, সে কাজ ফেলে রেখে সাহিত্য-চর্চ্চা করা তোমার কি শোভন হয়েছিল? তা ছাড়া সবাই তোমার ব্যবহারে বিরক্ত। আমার জামাই ব'লে তোমাকে ত তারা মাথায় ক'রে রাখতে পারে না। তবু আমার খাতিরে তারা তোমার অনেক অসঙ্গত ব্যবহার সহ্য ক'রে এসেছে। পাঁচ জনকে নিয়ে আমায় কাজ করতে হয়। তোমার খাতিরে তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার ত করতে পারি না।"

বিদ্রূপ-হাস্যে দীনবন্ধু বলিল, "ওঃ, বুঝলাম, আপনিই তবে আমাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করবার জন্য তাদের উৎসাহিত করেছেন।"

জামাতার ঔদ্ধত্য এবার মহেন্দ্রবাবু আর সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি তীব্রকণ্ঠে বলিলেন, "সকলে যে বলে, সে ঠিক কথা,—তোমার মন অত্যন্ত ইতর। সওদাগরী আপিসে যারা চাকরী করে, তারা কেউ তোমার মত পণ্ডিত নয়। তাদের কাছে তুমি বিদ্যে ফলাতে যাও কেন, বাপু?

তুমি কাজের তেমন উপযুক্ত নও, তবু দু'বছরের মধ্যে তোমার ২০ টাকা মাইনে বেড়েছে। কিন্তু তুমি এম্‌নি—"

প্রৌঢ় ভদ্রলোক সহসা আপনার রসনাকে সংযত করিলেন। ঘরের বাহিরে জ্যেষ্ঠা কন্যার উদ্বেগ-ব্যাকুল মুখ দেখিয়া তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না।

দীনবন্ধু বলিয়া উঠিল, "বেশ, আমি ছোটলোক, আপনার সংস্রবে থাক্‌তে চাইনে। কা'ল থেকে আর আপিসেও যাব না। মেয়েকে নিয়ে আপনি থাকুন।"

ঝড়ের বেগে দীনবন্ধু নিজের ঘরের দিকে চলিয়া গেল। শয্যার উপর কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

শ্বশুরের অপেক্ষা সে কিসে নিকৃষ্ট? বংশমর্য্যাদা ও পাণ্ডিত্য কি তাহার বেশী নহে? তাঁহার কালো মেয়েকে সে ত বিনা অর্থেই গ্রহণ করিয়াছিল। চাকরী?—তা সে ত সে নিজের কলমের জোরেই করিতেছিল।

চারি বৎসরে বাড়ী তৈয়ার করা ছাড়া হাজার টাকা ত তাহার ব্যাঙ্কে মজুত। তবে সে কেন শ্বশুরবাড়ী থাকিবে? এত দিন তাঁহারা ছাড়েন নাই বলিয়াই ত সে ঘরজামাই হিসাবে রহিয়াছিল। নূতন বাড়ীতে ভাড়াটিয়া না থাকিলে সেখানে সে চলিয়া যাইত। যাক্‌, সে মেসেই থাকিবে।

দীনবন্ধু উঠিয়া নিজের বাক্‌স গুছাইতে লাগিল। না, সে কোনমতেই এখানে থাকিবে না। চাকুরী ছাড়িয়া দিবে, ছেলে পড়াইবে। মাসে ২০ কুড়ি টাকা হইবে না? ব্যাঙ্কে জমা টাকাও ত আছে।

ছোটলোকরা বলে কি না 'সিংহের ল্যাজ'। আবার 'সাহেবে'র কাছে লইয়া গিয়া নানারূপে তাহার কি লাঞ্ছনাই না করিয়াছে। সে সাহিত্যরসিক—গুণের ভক্ত, তাই সকলে তাহাকে এমন করিয়া লাঞ্ছনা করিবে?

ষোড়শী পত্নী কুণ্ঠিতভাবে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। দীনবন্ধু আপন মনে জিনিস গুছাইতে লাগিল।

স্ত্রীর যৌবনের প্রথম আকর্ষণের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিয়াছিল। বৈষ্ণব-সাহিত্য ঘাঁটিয়া সে একটি সার কথা বাহির করিয়াছিল। পরকীয়া প্রেমতত্ত্বটির সে একনিষ্ঠ ভক্ত ছিল। তাহার গুরুজীর ন্যায় সে বিশ্বাস করিত, প্রকৃত প্রেম পরকীয়া নহিলে হয় না। এ জন্য পত্নীর নিকট একনিষ্ঠ পতিত্বের গৌরব-রক্ষায় সে কোনও দিন যত্ন প্রকাশ করে নাই। স্ত্রীকে প্রয়োজনীয় তৈজসপত্রের মতই সে মনে করিত মাত্র।

মৃদুস্বরে পত্নী বলিল, "ও সব কি হচ্ছে? কোথায় যাচ্ছ?"

"তোমার দরকার? যেখানে খুশী, আমি যাব। তোমার একচোখো বাবার বাড়ীতে থাক্‌ছি না।"

"তা চল না, আমাকেও নিয়ে চল।"

"ভারী সুখ আর কি! তুমি বাপের বাড়ী থাক, আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।"

লাঙ্গুল ঘন ঘন যেন আন্দোলিত হইতে লাগিল।

পত্নী বলিল, "আমাকে এখানে রেখে গেলে সকলে কি বলবে? তোমার মুখ উজ্জ্বল হবে কি?"

"থাম, থাম, আর জ্যেঠামীতে কাজ নেই। যেমন বাপ, তেমনি মেয়ে। বেশী কথা বল যদি—"

মুষ্টি উদ্যত করিয়া দীনবন্ধু বীরের ন্যায় দাঁড়াইল।

অতি দুঃখেও ষোড়শী পত্নীর মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। মৃদুস্বরে সে বলিল, "কিন্তু এটি যদি আপিসের 'সাহেব' বা অন্য কোন কেরাণীর কাছে দেখাতে পারতে, ভাল হ'ত।"

কি ভাবিয়া দীনবন্ধু আত্মসংবরণ করিল, তাহার ট্রাঙ্ক ও বিছানার মোটটা একে একে টানিয়া সদর দরজার কাছে লইয়া গেল।

স্ত্রী হাত ধরিয়া তাহাকে ফিরাইবার চেষ্টা করিল। সবেগে হাত ছাড়াইয়া লইয়া সে গাড়ীর সন্ধানে চলিয়া গেল।

অল্পক্ষণ পরে গাড়ী আনিয়া সত্য সত্যই যখন সে জিনিসপত্র লইয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইবে, তখন শ্বশুর ও শাশুড়ী তাহাকে বহু অনুনয়-বিনয় করিলেন; কিন্তু প্রকৃত বীরের ন্যায় দীনবন্ধু সকলের কাতর বচন ও অশ্রুর বাণগুলিকে ব্যর্থ করিয়া দিয়া গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

৫

সুবৃহৎ সভাপ্রাঙ্গণে বহু শত লোক সমবেত হইয়াছিল। মহাত্মা গন্ধীপ্রবর্ত্তিত দেশের গঠনমূলক কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা এবং খদ্দর-প্রচারের সুবিধা সম্বন্ধে বহু মনীষী নেতা আজ বক্তৃতা করিবেন। বাঙ্গালার জননায়ক সভায় নেতৃত্ব করিবেন। দলে দলে লোক বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছিল।

দীনবন্ধুও সভায় আসিয়াছিল। তাহার জীবনপথে যিনি আদর্শস্বরূপ, যাঁহাকে অবলম্বন করিয়া সে নানারূপ লাঞ্ছনা ও বিদ্রূপ সহ্য করিয়াছে, দীর্ঘকাল অনুপস্থিতির পর তিনি বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। অদ্যকার সভায় তাঁহার বক্তৃতা করিবার কথা। নানা উপায়ে তিনি এখন কর্ম্মক্ষেত্রের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হইয়াছেন। অর্থ ও যশের কামনায় তিনি পুর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পথ ছাড়িয়া দিয়া নূতন পন্থার অনুসরণ করিতেছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীকে ছাড়িয়া সে জন্য তাঁহাকে মাঝে মাঝে অন্যত্র থাকিতে হয়। তাই দীর্ঘকাল দীনবন্ধু তাঁহার দর্শন পায় নাই। সংপ্রতি তিনি দেশে ফিরিয়াছেন এবং অদ্যকার সভায় যাঁহারা বক্তৃতা করিবেন, তাঁহাদের নামের তালিকায় দীনবন্ধু তাঁহার নাম দেখিয়াছে।

বেকার দীনবন্ধু কয় মাস মেসে থাকিয়া সঞ্চিত অর্থ ভাঙ্গিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছিল। এরূপ ভাবে বেশী দিন চলিতে পারে না। গুরুজী চেষ্টা করিলে তাহার একটা বিহিত হইবার সম্ভাবনা। আজ বক্তৃতার পর সে তাঁহার সহিত তাঁহার বাড়ীতে যাইবে।

বিদ্যুতের আলোকে সভাক্ষেত্র সমুদ্ভাসিত। প্রসিদ্ধ দেশ-নায়কগণ একে একে আসিতে লাগিলেন। উৎসুক-হৃদয়ে দীনবন্ধু বার বার দ্বারের দিকে চাহিতে লাগিল।

অবশেষে একখানা মোটর আসিয়া দাঁড়াইল। দীনবন্ধু দেখিল, হাঁ, তাহারই গুরুজী, প্রসিদ্ধ বাগ্মী তাহাতে উপবিষ্ট। তাঁহার গমনপথের সম্মুখে সে দাঁড়াইল। যুবকের দল তোর-ণের কাছে জটলা করিতেছিল; দীনবন্ধুর গুরুজী মোটর হইতে নামিবামাত্র একটা কোলাহল হইল। দীনবন্ধুর সন্দেহ হইল, ইহা কি জয়ধ্বনি ?

অন্যান্য দেশনায়কগণ সভাক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার সময় যেরূপ জয়ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল, ইহা ত ঠিক তেমন নহে !

দীনবন্ধু গুরুজীর সম্মুখে গিয়া নত হইয়া অভিবাদন করিল। কিন্তু এ কি ? যে তাঁহার নিত্য-পরিচিত, অন্তরঙ্গ পার্ষদ, গুরুজী কি তাহাকে চিনিতেই পারিলেন না ? আভূমিনত নমস্কারের বিনিময়ে মামুলী ক্ষুদ্র ও সংক্ষিপ্ত শিরশ্চালন করিয়াই কি তিনি তাহার প্রতিদান দিলেন ?

সন্দেহ-সংক্ষুব্ধ-হৃদয়ে দীনবন্ধু দ্রুত তাঁহার অনুসরণ করিল। সে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হইতেই এক জন বাধা দিয়া বলিল,—"ও দিকে নয়।"

দীনবন্ধু স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কতবার সে গুরুজীর সহিত কত সভায় গিয়াছে, প্রতিবারই সে তাঁহার নিকটেই বসিবার আসন পাইয়াছে। কিন্তু নিদারুণ বিধি! আজ তাহার অদৃষ্টে এ কি লিখিলে ?

পশ্চাৎ হইতে কেহ বলিয়া উঠিল, "সিংহ যথায়, লাঙ্গুলও সেখানে। যেতে দিন না, মশায় !"

চমকিত হইয়া দীনবন্ধু বক্তাকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য জনতার দিকে চাহিল। কিন্তু যে বলিয়াছিল, তাহার মূর্ত্তি দেখা গেল না।

নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও বিমর্ষভাবে দীনবন্ধু এক পার্শ্বে দাঁড়াইল।

সভাক্ষেত্রে বক্তৃতা আরম্ভ হইল। অন্যমনস্ক দীনবন্ধু প্রথমটা সে দিকে মন দিতে পারিল না। দেশের শ্রেষ্ঠ নায়ক সভাপতিত্ব করিতেছিলেন। তিনি বক্তৃতা করিতে উঠিলে জয়ধ্বনিতে গগনমণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সহস্র সহস্র শ্রোতা শ্রদ্ধাপুর্ণ হৃদয়ে তাঁহার বচনসুধা পান করিতে লাগিল।

ক্রমে অন্যান্য বক্তা বিশদভাবে আলোচ্য বিষয় বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। সর্ব্বশেষে দীনবন্ধু দেখিল, তাহার গুরুজী বক্তৃতা দিবার জন্য আসন ত্যাগ করিয়াছেন।

আজকার ব্যবহারে মনটা নিতান্ত দমিয়া গেলেও সে গুরুজীর বক্তৃতার গৈরিক নিঃস্রাবধারার প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল।

বক্তা মঞ্চের উপর দাঁড়াইবামাত্র, ও কি ! সহসা চারিদিক্ ঘনান্ধকারে ডুবিয়া গেল কেন ? ইহা আকস্মিক না ইচ্ছাকৃত ?

মহাকলরবের মধ্যে কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই আবার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সভা আবার নিস্তব্ধ হইল।

বক্তা আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তখন চারিদিক্ হইতে চীৎকার শোনা গেল, "শুন্‌বো না, শুন্‌তে চাই না। বস্‌তে বলুন।"

এই বিচিত্র ব্যাপারে দীনবন্ধু অভিভূতের মত দাঁড়াইয়া রহিল।

কোলাহল থামিলে সভাপতি মহাশয় সবিনয়ে সকলকে মাননীয় বক্তার কথা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলেন।

কিন্তু প্রচণ্ড কোলাহলে আবার চারিদিক্ নিনাদিত হইয়া উঠিল।

"না, আমরা ওঁর কথা শুন্‌তে চাই না।"

বক্তার মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। যিনি এত দিন জনসাধারণের প্রিয়তম ছিলেন, যাঁহার কথা শুনিবার জন্ত দেশবিদেশ হইতে লোক ছুটিয়া আসিত, আজ তাহাদের নিকট তিনি অবজ্ঞাত!

এক জন প্রবীণ-বয়স্ক শ্রোতা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "উনি ত এখন আর আমাদের নেই, আমাদের ছেড়ে চ'লে গেছেন। বাঙ্গালা ও বাঙ্গালীর সহিত উঁহার কোন সম্বন্ধ আছে বলেও মনে করা যায় না।"

চারিদিক্ হইতে তাঁহার মন্তব্য সমর্থিত হইতে লাগিল।

নিরুপায় সভাপতি মহাশয় তখন সভার কার্য্য স্থগিত রাখিলেন।

* * * *

"বাবাজী! এখনও তোমার রাগ যায়নি?"

দীনবন্ধুর মনে আর একটা তীব্র আঘাত লাগিয়াছিল, তাই শ্বশুরের সস্নেহ সম্ভাষণে আজ আর সে রূঢ় উত্তর দিতে পারিল না।

সভামণ্ডপের বাহিরে আসিতেই শ্বশুরের সহিত দেখা হইয়াছিল। মহেন্দ্রবাবু বলিলেন, "প্রায় এক বৎসর তুমি আমাদের ওদিকে যাওনি, আপিসেও যাও না! অন্ত লোক হ'লে এত দিন চাকরী থাকত না। আমি তোমার নাম সই ক'রে এত দিন তুমি পীড়িত আছ ব'লে 'সাহেবের' নিকট দরখাস্ত ক'রে আস্‌ছি। 'সাহেব' খুব ভালবাসে, তাই তোমার জায়গায় স্থায়িভাবে কোন লোক নেয় নি। সংপ্রতি একটা নূতন গুদাম খোলা হচ্ছে। আমি 'সাহেবকে' ব'লে করে তোমাকে ষ্টোরকিপার ক'রে দেব। মাইনে একশ করেই পাবে। কেমন, রাজি?"

দীনবন্ধুর চক্ষু জলিয়া উঠিল। শ্বশুরের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা চতুর্গুণ বাড়িয়া গেল। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সে এত দিন গর্ব্ব অনুভব করিত, যাঁহার গুণগানে সে সর্ব্বদা পঞ্চমুখ ছিল, আজ তিনি তাহাকে চিনিতেই পারেন নাই। তাহার পর দেশের লোকের কাছে তিনি শ্রদ্ধার আসন হারাইয়া ফেলিয়াছেন। কেহ তাঁহাকে চাহে না। তবে শুধু সে ল্যাজের বোঝা বহিয়া বেড়ায় কেন?

দীনবন্ধু শ্বশুরের পদধূলি লইয়া বলিল, "আপনি আমায় ক্ষমা করুন। 'সাহেব' কি আমায় রাখবেন?"

"সে জন্ত তোমার চিন্তা নেই। তবে কথা, একটু হিসাব ক'রে চলো, এই মাত্র।"

পশ্চাৎ হইতে কাহার স্নেহ আলিঙ্গনে পিষ্ট হইয়া দীনবন্ধু চাহিয়া দেখিল, হরেন্দ্র, রমেশ ও রবীন্দ্র তিন বন্ধুই তথায় দাঁড়াইয়া।

হরেন্দ্র বলিল, "বাঁচলাম দীনদা, এত দিন পরে নিজের ভুলটুকু যে বুঝ্‌তে পেরেছ, এই মঙ্গল।"

শ্বশুর-জামাতার আলাপ তাহারা বোধ হয় শুনিতে পাইয়াছিল।

রমেশ বলিল, "এখন আর সিংহলাঙ্গুল শুন্‌লে মার্‌তে উঠ্‌বে না?"

দীনবন্ধু হাসিয়া বলিল, "সিংহ যখন প্রাণহীন, তখন ল্যাজ কি আর বাঁচিয়া থাকে? এখন থেকে তোমাদের দীনদার পুনর্জ্জন্ম হ'ল।"

বন্ধুরা জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহেন্দ্রবাবু মুখ ফিরাইয়া একটু মুচকিয়া হাসিলেন মাত্র।

মাসিক বসুমতী—আষাঢ়, ১৩৩১

সঙ্গীতের প্রভাব

৬

শেষকালে দোজবর!

ক্ষোভে, দুঃখে, ঘৃণায়, অভিমানে এক একবার আত্মহত্যার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। আমার স্নেহময়, হৃদয়বান্ পিতা—যিনি চিরদিন এমন অশোভন সম্মিলনের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন, তিনি নিজেই শেষে এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন? এ দুঃখ কাহার কাছে নিবেদন করিব? কে তবে আর আমার হৃদয়ের এই নিদারুণ ব্যথা বুঝিবে?

আমরা ধনীর, ঐশ্বর্য্যবিলাসীর সন্তান না হইলেও আমাদের বংশমর্য্যাদা, আভিজাত্য ও সামাজিক সম্মান কম ছিল না। বাবা লাটদপ্তরের কেরাণী হইলেও দারিদ্র্যদুঃখ কাহাকে বলে, তাহা আমরা জানিতাম না। সংসারে প্রাচুর্য্য না থাকিলেও অভাব ছিল না। বাবা বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, সুপণ্ডিত। মা ও বাবা বিশেষ যত্নেই আমাদের চারি ভাই-ভগিনীকে লালন-পালন করিয়া আসিয়াছেন। মা আমার নিপুণা গৃহিণী ছিলেন, তাঁহার কাছে এ বিষয় আমরা ভাল শিক্ষাই পাইয়াছিলাম। বাবা অত্যন্ত বিদ্যানুরাগী—তিনি যত্ন করিয়া বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া আমাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন, নিজেও শিক্ষা দিতেন বিদ্যার প্রতি অনুরাগ, ললিতকলার প্রতি আসক্তি আমাদের বংশানুগত। সুতরাং আমরা সুশিক্ষাই পাইয়াছিলাম। আমরা কখনও স্কুলে যাই নাই—বাবা যাইতে দিতেন না; শুধু ছোট-ভাইটি স্কুলে পড়িত।

অবস্থার অতিরিক্ত ব্যয় করিয়া বাবা আমার দুই দিদিকে ভাল ঘর ও বরে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাহারা পরম সুখে শ্বশুরঘর করিতেছিল। আমি শেষ কন্যা; তাই বাবা আমাকে অপেক্ষাকৃত বড় করিয়া ঘরে রাখিয়াছিলেন। মনোমত সুপাত্র মিলিতেছিল না। তিনিও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সুপাত্র না পাওয়া গেলে বিবাহ দিবেন না। শুনিয়াছি, এই বাছাবাছির হিড়িকে বহু পাত্রকেই তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

তবে অবশেষে আমার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাত্র মনোনীত করিলেন কি করিয়া? কত দিন গল্পচ্ছলে বাবা আমাদের কাছে বলিয়াছিলেন, বিবাহ একবারই হয়—নারী অথবা পুরুষ কাহারও পক্ষে দুইবার বিবাহ সঙ্গত নহে। মানবসমাজে এরূপ বিবাহপ্রথা প্রচলিত থাকিলেও দুইবার বিবাহ ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র। বাবার কথা আমাদের কাছে বেদবাণীবৎ সত্য বলিয়া মানিত হইত। সেই তিনি তাঁহার কন্যার জন্য দ্বিতীয় পক্ষের পাত্রকে কিরূপে নির্ব্বাচিত করিলেন?

শয্যায় শয়ন করিয়া দুঃখে, ক্ষোভে, শোকে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পিতা-মাতার আদর্শ ও শিক্ষার প্রভাবে অন্যায়কে, মন্দকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছিলাম। সংস্কারের প্রভাবে এইরূপ সম্মিলনকে আমি অবৈধ বলিয়া বিশ্বাস করিতাম, তাই আজ নিদারুণ ঘৃণা ও ব্যথায় অন্তর টন্‌-টন্ করিতে লাগিল।

কিন্তু আমার আকারে-প্রকারে বা ব্যবহারে আমার প্রাণের এই গোপন ব্যথার সংবাদ কেহ জানিতে পারিল না। ইহাও পিতা-মাতার শিক্ষার ফল। গুরুজনের প্রতি অশ্রদ্ধা অথবা অবিনয় প্রদর্শন করা কত গুরু অপরাধ, তাহা জানিতাম। ঔদ্ধত্য এবং মানুষের মুখের উপর অপ্রিয় সত্য কথা বলা যে নারীর পক্ষে আদৌ শোভন নহে, তাহা বিশ্বাস করিতাম। সমস্ত জীবনে আমরা এইরূপ শিক্ষাই পাইয়া আসিয়াছি। তাই বুক ফাটিয়া গেলেও প্রতিবাদের একটি শব্দও আমার মুখ হইতে বাহির হয় নাই। সযত্নে মনের অবস্থাকে আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখিয়াছিলাম। শুধু গভীর দুঃখ ও অভিমানে বুকের মধ্যে মেঘ জমিয়া উঠিতেছিল। নিশীথের অন্ধকারে শয্যায় শয়ন করিয়া আর আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলাম না।

সাহিত্যের ভিতর দিয়া নূতন সম্প্রদায়ের দামামার ধ্বনি বাঙ্গালার সমাজবক্ষে ধ্বংসের সংবাদ বহন করিয়া আসিতেছিল, সে সংবাদ আমাদের অগোচর ছিল না। আমরা আধুনিক সাহিত্যের পোকা ছিলাম। বাবা প্রায়ই বলিতেন

যে, এ সকল সমস্যা বস্তুতন্ত্রহীন—ভারতীয় প্রকৃতিতে ইহার সামঞ্জস্যের অভাব দেখা যায়। নবতন্ত্রের পুরোহিতরা খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া বলপূর্ব্বক পাশ্চাত্য ভাবের পঙ্কিল প্রবাহধারাকে ভাগীরথীর পুণ্য-সলিলে মিশাইয়া দিবার চেষ্টা করিতেছেন মাত্র। বাবার এইরূপ ধারণা যে কিরূপ সত্য এবং দৃঢ়, তাহা আমরা জানিতাম। আমিও কায়মনোবাক্যে বাবার কথা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু বিদ্রোহের, উত্তেজনার প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারি নাই। নবতন্ত্রোক্ত মতবাদকে ঘৃণা করিতাম, মনোরম ও লোভনীয় বলিয়া বিষবৎ পরিত্যাজ্য মনে করিতাম; কিন্তু সত্য বলিতে কি, আকাশে বাতাসে বিদ্রোহের জয়ধ্বনি মাতালের মত ফিরিতেছিল, তাহার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে জয় করা অসম্ভব।

সারা দিনের পরিশ্রমের পর মা পার্শ্বে শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছিলেন। আমার নয়ন বিনিদ্র। বোধ হয়, মানসিক যন্ত্রণার আতিশয্যে আমি কোনও রূপ শব্দ করিয়া থাকিব। অন্য শয্যায় বাবা ও বীরেন্দ্র। সম্ভবতঃ বাবা তখনও ঘুমান নাই। তিনি ডাকিলেন, "মিনু, মা! কি হয়েছে রে?"

বুঝিলাম, আমার মানসিক চাঞ্চল্য, রাত্রির অন্ধকারে সাবধানতার সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। না, বাবাকে আমার বুকের ব্যথার সংবাদ দিব না। অনেক দুঃখের পর আমার যোগ্য পাত্র পাইয়াছেন ভাবিয়া আজ তাঁহার মুখে প্রসন্নতার স্নিগ্ধ ছবি দেখিয়াছি। তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত, এমন কথা মা'কে বহুবার বলিয়াছেন। তাঁহার সে তৃপ্তি দেখিয়া মন অভিভূত হয়। না, কোনও মতেই আমি তাঁহার হৃদয়ে নৈরাশ্যের অন্ধকার জাগাইয়া তুলিতে পারিব না। নিজেই জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিব—উহাই বিধিলিপি! বাবাকে কষ্ট দিতে পারিব না।

মুহূর্ত্তমধ্যে ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিয়া ফেলিলাম; মৃদুস্বরে বলিলাম, "কিছু হয়নি ত, বাবা!"

আলোক জ্বালিয়া বাবা উঠিয়া আসিলেন। আমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "ঘুম হচ্ছে না, মা?"

বাবার কণ্ঠস্বরে উৎকণ্ঠা যেন ঝরিয়া পড়িতেছিল। আমি সহজকণ্ঠে বলিলাম, "এখনই ঘুম আস্‌বে; আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন, নইলে অসুখ করবে, বাবা।"

বাবা কয়েক মুহূর্ত্ত স্নেহদৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "মিনু মা, তুই যেন তোর বাবাকে ভুল বুঝিস্ নে! তোর সুখের জন্যই আমি এই বিয়ে ঠিক করেছি। আমি আশীর্ব্বাদ করি, এতে তোর সব দিকেই ভাল হবে।"

বাবা কি কিছু বুঝিয়াছেন? বুক ফাটিয়া বিশ্বজোড়া কান্নার সুর যেন বাহির হইতে চাহিল। দৃঢ়-বলে আত্মসংবরণ করিয়া বলিলাম, "আপনি ঘুমুন, বাবা। একটু বাতাস দেব?"

"কোন দরকার নেই, মা।"

বাবা শয্যার দিকে ফিরিয়া গেলেন।

২

বাড়ীতে বিবাহের উৎসব জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমার সহস্র কল্পিত, অমূর্ত্ত বাধা-বিঘ্নকে বিদ্রূপ ও ব্যর্থ করিয়া নিরূপিত দিন ও লগ্ন আসিয়া উপস্থিত হইল। আত্মীয়স্বজন, পিতা, মাতা সকলেরই মুখে আনন্দের হাসি ধরিতেছিল না। শুধু আমিই মনে মনে পুড়িয়া মরিতেছিলাম। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী হওয়া কত বড় দুর্ভাগ্যের ফল, তাহা যাহার না হইয়াছে, সে কেমন করিয়া বুঝিবে?

শুনিয়াছিলাম, আমার দাদা—পিসীমার ছেলেই এই বিবাহের ঘটক। আমাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর ছিলেন না; তিনিই আমাদের সে অভাব পূর্ণ করিয়াছিলেন। আমার কৌমার্য্যকে বিদায় দিয়া, সীমন্তে নারীজাতির আশীর্ব্বাদরেখা আঁকিয়া দিবার জন্য যিনি আসিতেছেন, তাঁহার সহিত দাদার নাকি প্রগাঢ় বন্ধুত্ব এবং উভয়ে একত্র একই স্কুল-কলেজে পড়িয়াছিলেন। দাদা কলেজের অধ্যাপক হইয়াছিলেন; সংপ্রতি একটা বড় পরীক্ষা দিবার জন্য বিলাতে গিয়াছেন। সেখান হইতে তিনি নাকি বাবাকে এই পাত্রে আমাকে সমর্পণ করিবার জন্য লিখিয়াছিলেন। দাদার বন্ধুটি পাঁচ বৎসর বিপত্নীক—বিবাহের ইচ্ছা ছিল না। অবশেষে মত হইয়াছে। তিনি আমাকে দেখিতেও আসেন নাই। আমার ফটো দেখিয়া নাকি মত দিয়াছিলেন। শুধু লৌকিকপ্রথা বজায় রাখিবার জন্য তাঁহার দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়-বন্ধুরা পাকা দেখিয়া গিয়াছিলেন। সংসারে তাঁহার আপনার বলিবার কেহ নাকি নাই—পিতা, মাতা, ভাই-ভগিনী বহুদিন মৃত। বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উচ্চশিক্ষা পাইয়া পৈতৃক কয়লার ব্যবসায় ও খনির কার্য্য লইয়া আছেন। পাহাড় অঞ্চলে খনির কাছেই পৈতৃক বাড়ীও

বিদ্যমান, সেইখানেই অধিকাংশ কাল থাকেন, কলিকাতাতেও বাড়ী আছে, কিন্তু সেটা প্রায় ভাড়া দেওয়াই থাকে। বাড়ীতে আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে তাঁহার সম্বন্ধে যে আলোচনা হইত, তাহা হইতে এই সকল সংবাদ আমার কাণে গিয়াছিল। প্রচুর অর্থের তিনি মালিক। পৃথিবীতে যাহা সকল প্রকার সুখ ও আরামের শ্রেষ্ঠ উপাদান, সেই অর্থ না কি ভগবান্ তাঁহাকে মুক্তহস্তে দান করিয়াছেন।

কিন্তু আমার মন ইহাতে অভিভূত হয় নাই। অর্থের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু তাহা ত চরম লক্ষ্য নহে। আমার তরুণ হৃদয়ে কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা, অর্থ কি তাহা সার্থক করিয়া তুলিতে পারে? যে পুরুষ একবার অন্য নারীকে হৃদয় দান করিয়াছে, ভালবাসিয়াছে, সে কি করিয়া পুনরায় অপর আর এক জন নারীকে ভালবাসিতে পারে? নারীহৃদয় দিয়া এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারের মীমাংসা করিতে পারি নাই। তাই অনুক্ষণ আমার হৃদয় ঘৃণায় ও কুণ্ঠায় শিহরিয়া উঠিতেছিল।

যাহা অনিবার্য্য, অল্পক্ষণ পরে চিরজীবনের জন্য যে অবস্থার বন্ধনে শৃঙ্খলিত হইয়া পড়িব, সে সম্বন্ধে ক্ষুব্ধ হওয়া উচিত নহে, বুঝিতেছিলাম; কিন্তু মনকে কোনমতেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছিলাম না।

জ্যোৎস্নাময়ী ফাল্গুনের রাত্রিকে নহবতের মধুর রাগিণী অভিনন্দিত করিতেছিল। কিন্তু আমার যেন বোধ হইতেছিল, ইহা আনন্দের উচ্ছ্বাস নহে, আমার হৃদয়ের-শোকপূর্ণ অন্তরের ক্রন্দন-নির্ঝর বাধাবন্ধন চূর্ণ করিয়া রাগিণীর সুরে ছুটিয়া বাহির হইতেছে। ছেলেবেলা হইতেই আমি সঙ্গীতের একান্ত অনুরাগিণী। যত্ন করিয়া গান-বাজনাও শিখিয়াছিলাম। আত্মীয়-স্বজন একবাক্যে প্রশংসা করিয়া বলিতেন, আমার মত সুকণ্ঠী গায়িকা সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেটা হয় ত আত্মীয়স্বজনের অতিশয়োক্তি হইতে পারে; কিন্তু গান যে আমাকে সহজেই পাগল করিয়া তুলিত, তাহা মিথ্যা নহে। তবু আজ নহবতের সুরে যেন বিষ মাখান ছিল!

আনন্দ-কোলাহল ও চীৎকারের মধ্যে আমি বিবাহসভায় নীত হইলাম। আমার হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া তখন কিরূপ চলিতেছিল, তাহা জানি না। তবে আমি যে স্বপ্নাবিষ্টার মত, স্থাণুর মত বসিয়াছিলাম—আমার হাত-পা নাড়িবার, এমন কি, চিন্তা করিবার শক্তি পর্য্যন্ত ছিল না, তাহা অতিরঞ্জন নহে।

সম্প্রদান হইয়া গেল। অদৃষ্ট আর ফিরিবে না।

শুভদৃষ্টির সময় আমার নয়নযুগলে কে যেন সীসা ঢালিয়া দিয়াছিল! তখন ঘৃণা, সঙ্কোচ অথবা লজ্জা—কিছুই বোধ করিতেছিলাম না। শুধু যেন ঘোর নৈরাশ্যের বোঝা বুকের উপর চাপিয়া বসিয়াছে। কাহার তুষারশীতল হস্তের স্পর্শে যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় আবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিল।

চারিদিক্ হইতে অনুরোধ-উপরোধের তাড়া সত্ত্বেও আমি চাহিতে পারিতেছিলাম না। অবশেষে পার্শ্ব হইতে বাবার কণ্ঠস্বর শুনিলাম, "চোখ চাও, মা, চাইতে হয়।" তখন যেন আর নিশ্চল থাকিতে পারিলাম না; আমার আদর্শদেবতা বাবার আদেশ—পালন করিতেই হইবে।

কিন্তু সম্মুখে টোপরের উপর দৃষ্টি পড়িয়াই আবার তখনই নয়ন নিমীলিত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার গলদেশে এক ছড়া মালা আসিয়া পড়িল। আমার হাত ধরিয়া কেহ আমার শিথিল হাতের মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিল। পবিত্রতম শ্রেষ্ঠ বন্ধনের মূল্য এতই তুচ্ছ! এত বড় প্রহসন শুধু আমাদেরই মত হতভাগীদিগকে লইয়াই বুঝি রচিত হইয়া থাকে!

পরক্ষণেই মনে হইল, ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, যাহা স্বীকার করিয়া লইলাম, তাহাকে সর্ব্বান্তঃকরণে মানিয়া না চলিলে গুরু অপরাধই হইবে। সুতরাং মনের এ অবস্থাকে—প্রবৃত্তিকে দমন করিতে হইবে। ভারতবর্ষের পবিত্র ভাবধারা, চিরন্তন পদ্ধতি ও আদর্শকে মনের মন্দিরে স্থাপন করিতে হইবে।

বাসরঘরে আত্মীয়-পরিজনের অসম্ভব ভীড়। বরকে লইয়া সকলেই হাস্য-পরিহাসে আসর জমাইতে ব্যস্ত। তাঁহাকে গান গাহিবার জন্য তরুণীদিগের পক্ষ হইতে প্রচণ্ড অনুরোধ চলিতে লাগিল। অবগুণ্ঠনের অন্তরালে আমি ঘামিয়া উঠিতে লাগিলাম।

বড়দিদি ও মেজদিদি গান গাহিবার জন্য তাঁহাকে খুবই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। কিন্তু তিনি গান গাহিলেন না; জানাইলেন, তাঁহার সামর্থ্যে কুলাইবে না।

এক জন বলিয়া উঠিল, "আমাদের মিনু বড় গাইয়ে। বর একেবারে ও রসে বঞ্চিত, এটা ত ঠিক হ'ল না!"

কোন্‌টাই বা ঠিক হইয়াছিল ?

অনেকের অনুরোধে আমার বড়দিদি হারমোনিয়ম বাজাইয়া গান ধরিল। সে-ও চমৎকার গাহিতে পারিত। গান আরম্ভ হইলেই তিনি সহসা উঠিয়া একটা কাজের অজুহতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন ; কাহারও অনুরোধ কাণে তুলিলেন না। মিষ্ট দৃঢ়তার সহিত সকল আপত্তির খণ্ডন করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। এ ব্যাপারটা কাহাকেও আঘাত করিল কি না, জানি না, কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন ব্যথাটা টন্‌-টন্‌ করিয়া উঠিল। উনি গানেরও ভক্ত নহেন ! চেষ্টা করিয়া মনটাকে অনুকূল পথে চালাইবার উপক্রম করিতেছিলাম, সহসা তাহাতে বিষম ধাক্কা লাগিল। যে গান ভালবাসে না, আমি তাহাকে ভক্তি করিতে পারি না।

গান থামিবার পর তিনি ফিরিয়া আসিলেন।

৩

সংসারচক্রের রথ ঘর্ঘর শব্দে চলিতেছিল। আমার বিবাহিত দিনগুলিও কোথাও থমকিয়া দাঁড়ায় নাই। কাহারই বা দাঁড়ায় ? বিবাহের অনুষ্ঠান শেষ হইয়া গেল। স্বামী কর্ম্মস্থলে চলিয়া গিয়াছিলেন। সকলেই ভাবিয়াছিল, তিনি আমাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবেন। সেটা আদৌ অসঙ্গত হইত না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। এ জন্য আমি সত্যই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলাম।

কিন্তু আমার দুঃখটা কি ? বাস্তবিক দুঃখ করিবার কিছু আছে কি ?—আমার স্বামী রূপবান্‌, অনতিক্রান্ত-যৌবন, সুশিক্ষিত, সুস্থ, সবল এবং প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী। শুনিয়াছি, তাঁহার পরিচিত সকলেই তাঁহার গুণমুগ্ধ। তবে আমার দুঃখ ও ক্ষোভের কারণ কি ?

সত্যই, শুধু ভাবপ্রবণতার দিক্‌ দিয়াই আমি নিজেকে মহাদুঃখী ভাবিয়াছিলাম। আমার হৃদয় অনাস্বাদিত প্রেমের ধ্যানে মগ্ন হইতে চাহিতেছিল। কিন্তু যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তাঁহাতে কি প্রেম আছে ? তিনি ত রিক্তসর্ব্বস্ব। তাঁহার যাহা কিছু ছিল, সবই ত প্রথমা পত্নীকে দান করিয়াছেন. সুতরাং তিনি আমাকে কিছুই দিতে পারেন না। দিতেই যখন অশক্ত, তখন তাঁহার বিবাহ করা উচিত হয় নাই। এইরূপ ধারণা আমার মনে দৃঢ় হইয়া গিয়াছিল। তাই তাঁহাকে আমি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেছিলাম না। কিন্তু সেটা যে আমার অপরাধ, তাহাও ভুলিতে পারি নাই। যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, যাহার আকাশ-বাতাস সাধ্বী নারীর নিশ্বাসে সুপবিত্র, হিন্দুনারীর আদর্শ জীবনযাত্রার লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত যে দেশের ইতিহাসে, পুরাণে এবং সাধারণ ক্ষেত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়, সেই দেশের নারী হইয়া আদর্শচ্যুত হওয়া ত বাঞ্ছনীয় নহে।

কিন্তু তথাপি মনকে ফিরাইতে পারিতেছিলাম না। কারণ, আমার মনে তাঁহার সম্বন্ধে একটা ধারণা দিন দিন দৃঢ় হইতেছিল—তাঁহাতে হৃদয় নামক পদার্থের অভাব! কোনও বিষয়ে তাঁহাকে একবারও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিতে দেখি নাই। তিনি মিষ্টভাষী, শান্তস্বভাব, বিনয়ী, সে বিষয়ে মতভেদ হইবে না ; কিন্তু সংসারের প্রত্যেক বিষয়ে মানুষ যদি ওজন করিয়া চলে, তবে কি মনে হয় না, তাহাতে যথার্থ প্রাণস্পন্দনের অভাব আছে ! শুনিয়াছি, পুরুষ দ্বিতীয়পক্ষের পত্নীর মনোরঞ্জনের জন্য নানাভাবে অভিনয় করিয়া থাকে, কিন্তু আমি ত তাহার কোনও পরিচয় পাইলাম না। অবশ্য তেমন নাটকীয় অভিনয় আমার পক্ষে সহ্য করা কঠিন হইত।

বাবা ও মা'র উপদেশবাণী, চিরাচরিত সংস্কার আমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিত যে, আমার এরূপ মানসিক অবস্থা সমাজ ও সংসারের পক্ষে কল্যাণকর নহে—মনটাকে নিশ্চয়ই মোড় বাঁকাইয়া ফিরাইতে হইবে। অবশ্য স্ত্রীর যাহা সাধারণ কর্ত্তব্য, কলের পুতুলের মত সেগুলি আমি পালন করিয়া যাইতাম। বাহিরের দিক হইতে সে বিষয়ে কেহ আমার অপরাধ লইতে পারিত না।

তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। কিন্তু সর্ব্বদাই যেন কাজে ব্যস্ত। আমি এমন দিন দেখিলাম না যে, তিনি দুই দণ্ড বসিয়া কাহারও সহিত আলাপ করিতেছেন। কলিকাতায় নিজের বাড়ী ছিল, সেখানে তিনি থাকিতেন না, আমাদের এখানেই উঠিতেন। যে দুই চারি দিন থাকিতেন, বাহিরে বাহিরেই অধিকাংশ সময় কাটাইতেন, আহার ও শয়নের সময় শুধু দেখা পাইতাম এত যাঁহার কাজ, তাঁহার পক্ষে পুনরায় বিবাহ কি সঙ্গত হইয়াছে ?

আমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ধরাবাঁধা—নিক্তির ওজনেই হইয়াছিল। প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া অন্য প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে আমি কখনও তাঁহাকে দেখি নাই। তাঁহার প্রাণে সৌন্দর্য্যস্পৃহা, রসানুভূতি আছে, ইহা আমি

বিশ্বাস করিতে পারিতাম না। তিনি আমাকে প্রচুর বস্ত্রালঙ্কার দিয়াছিলেন। যখনই কলিকাতায় আসিতেন, কোন না কোন নূতন বস্ত্র বা অলঙ্কার আনিয়া দিতেন, এ সকল বিষয়ে অভিযোগের কিছু ছিল না। কিন্তু আমার বেশভূষার দিকে যে তিনি কোনও দিন মুগ্ধনেত্রে দেখিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিতে পারি না। ইহা যে অনাদর-প্রসূত, তাহা নহে। তাঁহার সৌন্দর্য্যানুভূতির অভাব।

এ জন্য প্রায়ই আমার মনে হইত, তাঁহার হৃদয় মরুভূমির মত শুষ্ক। তাঁহার পত্রহীন শুষ্ক তরুদেহে নবপল্লবিত লতার স্নিগ্ধ আবেষ্টন তবে কেন তিনি কামনা করিয়াছিলেন? যাহার জীবনে দিবার কিছু নাই, ভোগ করিবার কিছু নাই, সে শুধু কাঙ্গালের মত হাত পাতিয়া থাকে কেন? তাঁহার এই স্বার্থপরতার কথা মনে করিয়া আমি তাঁহাকে ক্ষমা করিতে পারিতাম না।

আমার পল্লবিত দেহ, উচ্ছল যৌবন, মধুভরা কণ্ঠ সবই ব্যর্থ হইয়া গেল! তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে কোন দিন আমার দিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন—এমন মুহূর্ত্তের কথা আমার মনে পড়ে না। অবশ্য এ কথাও ঠিক, আমিও কখনও লক্ষ্য করিয়া দেখি নাই, তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন কি না। তবে এ কথাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, আমার মন তাঁহার দিকে ধাবিত হউক বা না হউক, তিনি আমার দিকে চাহিয়া থাকিবেন, মুগ্ধ হইবেন, এমন কামনা আমার মনের প্রান্তে কখনও উদিত হয় নাই।

তাঁহার প্রতি আমার মন নিতান্ত বিরূপ হইয়া পড়িত—যখন গানের প্রতি তাঁহার ঔদাসীন্য দেখিতাম। গান আমার সকল দুঃখের সান্ত্বনা ও ঔষধ ছিল। প্রাণ খুলিয়া গান গাহিতে পারিতাম বলিয়া আমার এই মর্ম্মান্তিক শোচনীয় অবস্থার কথা আমাকে তেমন অভিভূত করিতে পারিত না। বাড়ীতে গানের বিশেষ চর্চ্চা ছিল সত্য, কিন্তু অনাত্মীয় পুরুষের সাক্ষাতে কোনও দিন আমরা গান গাহি নাই। বাবা তাহা ভালবাসিতেন না, আমাদেরও ইচ্ছা হইত না। কিন্তু আমার সঙ্গীত যিনি একবার শুনিয়াছেন, তাঁহাকেই মুগ্ধ হইতে হইয়াছে। ইহা অহঙ্কারের কথা নহে। সত্যই অশেষ যত্নে আমি সঙ্গীতকলাকে বহুলাংশে আয়ত্ত করিয়াছিলাম।

কিন্তু অদৃষ্টের এমনই পরিহাস, আমার স্বামী কোনও দিন তাহাতে মুগ্ধ হয়েন নাই। এমন অনেকবার হইয়াছে যে, আমি গান গাহিতেছি, তিনি ঘরে আসিয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু দাঁড়াইয়া বা বসিয়া শুনা দূরে থাকুক, প্রয়োজনীয় কাজ যথাসম্ভব শীঘ্র সারিয়া তিনি চলিয়া গিয়াছেন। যেন সঙ্গীতের রাজ্যের সীমা ছাড়াইতে পারিলেই তিনি বাঁচেন।

এইরূপ ব্যবহার আমি ক্ষমা করিতে পারি নাই। গানে যাহার হৃদয় মুগ্ধ হয় না, তাহাকে বিশ্বাস করা চলে না। যে নরনারীর হৃদয় সঙ্গীতে মুগ্ধ নহে, পৃথিবীতে তাহাদের দ্বারা সকল প্রকার কুৎসিত ও নিষ্ঠুর অনুষ্ঠান ঘটিতে পারে। এ জন্য তাঁহার প্রতি আমার চিত্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

সে দিন আকাশ ঘিরিয়া মেঘের খেলা চলিতেছিল। পুঞ্জীভূত নিবিড় মেঘজালে বিশ্বের সঙ্গীত স্তব্ধ হইয়াছিল কি না, জানি না, কিন্তু মনের মধ্যে সুরের ঝঙ্কার—অতি করুণ ও উদাস ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। বাতাসের সঙ্গে বৃষ্টি পড়িতেছিল। আজ দুই দিন তিনি এখানে আসিয়াছেন। পথে ঠাণ্ডা লাগিয়া ও জলে ভিজিয়া সর্দ্দি হইয়াছিল, সামান্য জ্বর দেখা দিয়াছিল। বাবার বিশেষ আপত্তি দেখিয়া তিনি আজ ঘরের বাহির হইতে পারেন নাই। মা'র আদেশে আমিও ঘরের মধ্যে বসিয়াছিলাম, যদি তাঁহার কোন কিছুর দরকার হয়। স্বামীর পরিচর্য্যা স্ত্রীর প্রধান কর্ত্তব্য, এ কথাটা মা সকল সময়েই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেন।

নীরবে বসিয়া আমি কার্পেটের আসন বুনিতেছিলাম। উনি বোধ হয়, খবরের কাগজ লইয়া তারের সংবাদ পড়িতেছিলেন। এমন সময় মেজদিদি সে ঘরে আসিল। সে-ও কয়দিন হইল শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে। মেজদিদি অত্যন্ত গল্পপ্রিয় এবং পরিহাস-রসিকা। সে নিতান্ত মূককেও কথা বলাইতে পারিত। দেখিলাম, মেজদিদির সঙ্গে তিনি দুই চারিটা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

মেজদিদি বলিল, "এমন বাদলার দিনে চুপ ক'রে থাকা দায়। মিনু, একটা গান গা না, ভাই! সুধীন বাবু, মিনুর গান শুনেছেন? বড় চমৎকার গান করে।"

ধিক্কারে আমার মাথা যেন নত হইয়া পড়িল। মেজদিদি ত জানে না, সঙ্গীতে যাহার এতটুকু আসক্তি নাই, তাহার কাছে গানের কথা বলা শুধু সঙ্গীতের অপমান করা।

তিনি বলিলেন, "গান শুনবার অবকাশ কোথায় বলুন?"

মেজদিদি বলিল, "আজ ত আর কাজ নেই, আকাশে

মেঘ, বাতাসে জলের ফোঁটা, গুরু গুরু মেঘের ডাক, এমন অবকাশ ত সকল দিন আসে না, রায় ম'শায়! আজ গান বড় মিষ্টি লাগবে। মিনুর গান শুনলে আপনি খুসী হবেন। মিনু, হারমোনিয়মটার কাছে গিয়ে বস।"

না—মেজদিদির সাধারণ বুদ্ধিরও অভাব দেখিতেছি। ছিঃ, কি লজ্জা! কিন্তু তাহাকে ঠেকাইয়া রাখাও দায়। সে যখন একবার জিদ ধরিয়াছে, তখন গান গাহিতেই হইবে। বিশেষতঃ আমি ত এ কথা বলিতে পারিব না, উনি গানের অনুরাগী নহেন। আমাদের স্বামি-স্ত্রীর মধ্যে যাহাই থাকুক না কেন, তৃতীয় ব্যক্তিকে তাহা জানিতে দিবার অবকাশ দিব কেন?

বারকয়েক প্রতিবাদ করা সত্ত্বেও আমাকে অবশেষে হারমোনিয়মের কাছে গিয়া বসিতে হইল। একবার তাঁহার দিকে অলক্ষ্যে চাহিয়া বুঝিলাম, তিনি যেন কিছু ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার কি সঙ্গীতাতঙ্ক রোগ আছে? প্রথমতঃ একটু কুণ্ঠা ও লজ্জা বোধ হইতেছিল, কিন্তু গান করা অথবা গান শুনার সময় এমন একটা তন্ময়তা আসিত যে, অনেক সময় আমি আত্মবিস্মৃত হইয়া পড়িতাম। শুধু সুরের রাজ্যে তখন মন পড়িয়া থাকিত।

প্রথম চরণ শেষ করিয়া অন্তরার মুখে একবার গানটাকে হারমোনিয়মে বাজাইয়া লইতেছি, এমন সময় মেজদিদির কণ্ঠস্বরে ফিরিয়া চাহিলাম, সে বলিতেছিল, "রায় ম'শায়, বাইরে যাবেন না!"

দেখিলাম, স্বামী মহাশয় বাহিরের বারান্দা অতিক্রম করিতেছেন।

এই উপেক্ষার অপমান আমাকে সহসা যেন পাগল করিয়া তুলিল। কেহ যেন বিষের প্রলেপ আমার সর্ব্বাঙ্গে মাখাইয়া দিয়াছিল! কিন্তু গান থামাইতে পারিলাম না। আমার দিদির কাছে এ দীনতা কি প্রকাশ করা যায়? বাজাইতে বাজাইতে মৃদুস্বরে, সহজকণ্ঠে বলিলাম, "তুমি ব্যস্ত হয়ো না, এখনই ফিরে আসছেন।"

দৃঢ়স্বরে মনকে সংযত করিয়া গানের দিকে মন দিলাম। সুরের প্লাবনে চারিদিক্ ডুবাইয়া দিবার অধীর কল্পনায় গান গাহিতে লাগিলাম। একটা করুণ রাগিণীতে গান ধরিয়াছিলাম। গানের সুরে আমার পুঞ্জীভূত ব্যথা মূর্ত্ত হইয়া উঠে নাই কি?

মেজদিদি চিরদিনই আমার গানের ভক্ত। গান শেষ হইলে সে আমার গলা জড়াইয়া বলিল, "মিনু, তোর মত গলা পেলে আমি আর কিছুই চাইতাম না। সত্যি, তুই কি গানই গাস্!"

দিদির সে স্নেহভরা পক্ষপাত-দোষদুষ্ট প্রশংসারও মূল্য আছে; কিন্তু তাহাতে আমার বুকের যন্ত্রণার তীব্রতা কমিল না।

গান শেষ হইবার পরে তিনি ঘরের মধ্যে আসিলেন। মেজদিদি বলিল, "কোথায় গিয়েছিলেন? এমন গানের সবটা শুনলেন না?"

উত্তরে মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন, "নিকটেই ছিলাম।"

আশ্চর্য্য এই লোকটি! তাঁহার ভাববর্জ্জিত মুখের দিকে চাহিয়া আমি শিহরিয়া উঠিলাম। আমি তাঁহাকে আন্তরিক ঘৃণা করিতে পারি, মনের এমন অবস্থা দেখিয়া নিজের জন্য অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। অধঃপতনের কোন্ পথে আমি চলিয়াছি!

৪

দাদা বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রায় দুই বৎসর তিনি প্রবাসে ছিলেন।

আমার বিবাহের পর এক বৎসর চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু এ পর্য্যন্ত স্বামী তাঁহার কর্ম্মস্থানে আমাকে লইয়া যায়েন নাই। পরম্পরায় শুনিতে পাইতাম, সেখানকার নির্ব্বান্ধব, নির্জ্জনপ্রায় পুরীতে গিয়া আমি দুই দিনও থাকিতে পারিব না—কষ্ট পাইব, এই জন্যই তিনি আমাকে লইয়া যায়েন নাই। আমাকে কোনও দিন এ বিষয়ে তিনি নিজেও কিছুই বলেন নাই, আমিও প্রশ্ন করি নাই। সে ভালই হইয়াছিল; কারণ, অমন শুষ্ক-হৃদয়, সর্ব্ববিধ কলানুরাগ-বিবর্জ্জিত মানুষের সাহচর্য্যে সেরূপ নির্ব্বান্ধব দেশে আমি এক দিনও টিকিতে পারিতাম না।

দাদা বিলাত যাইবার সময় বৌদিদিকে লাহোরে তাঁহার পিত্রালয়ে রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার বালিগঞ্জের বাড়ী এত দিন বন্ধ ছিল। দাদা আসিয়াই বৌদিদিকে আনাইয়াছেন। আমার বিবাহের সময় পিতার কঠিন পীড়ার জন্য বৌদিদি আসিতে পারেন নাই।

দাদা সকালে আসিয়া মা'কে বলিলেন, "মামী-মা, কাল বালিগঞ্জের বাড়ীতে সকলকে যেতে হবে। জনকতক বন্ধু-বান্ধবকে খেতে বলেছি। আপনি না গেলে সব বে-বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। মামা-বাবু চন্দননগরে যাবেন, তিনি থাকতে পারবেন না।"

আমরা তিন ভগিনীই তখন একসঙ্গে ছিলাম। দিদিরা শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছেন। আমাদিগকে দাদা বলিলেন, "তোরা সকাল সকাল যাবি। ওরে মিনু, তুই ত গান-পাগ্‌লা। কালকে ভারী চমৎকার গান হবে রে! এমন গান জীবনে শুনিস্ নি। বাঙ্গালা দেশে এর চেয়ে ভাল গাইয়ে যে কে, তা আমি জানি নে। দেখতে পাবি কাল।"

আমরা খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিলাম। দাদা যেমন পণ্ডিত, তেমনই সদানন্দ। এমন দাদা পাইয়া আমরা গৌরব বোধ করিতাম। দাদার "সাহেবীয়ানা" চাল আদৌ ছিল না। তিনি ভাল অধ্যাপক ছিলেন, বিলাত হইতে আরও বড় উপাধি লইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। গোঁড়া না হইলেও হিন্দুধর্ম্মের তিনি পরম ভক্ত। তিনি যে বাঙ্গালী, তাহা তিনি ভুলেন নাই। আজকাল দেখিতে পাই, অনেকে বিলাত হইতে আসিয়া বাঙ্গালীয়ানার অভিনয় করেন—অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে শ্বেতদেবতা ও তাঁহার আচার-অনুষ্ঠানের ভক্ত হইলেও বাহিরে লোক দেখাইয়া বাঙ্গালীয়ানার অভিনয় করেন, আমার দাদা ঠিক তাহার বিপরীত। দাদার বাড়ীতে বাবুর্চ্চি বা 'বয়' ছিল না।

বৌদিদি আমাদিগকে পাইয়া উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। পাচক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মা'র নেতৃত্বে রন্ধনের ভার আমরাই লইলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই দাদার ফরমাসমত নানাবিধ ভোজ্য প্রস্তুত হইয়া গেল। দাদা আসিয়া বলিলেন, এখন ঠাকুরদের হাতে সব বুঝাইয়া দিয়া আমরা সন্ধ্যার আসরের জন্য যেন প্রস্তুত হইয়া থাকি।

গা ধুইয়া, প্রসাধনশেষে আমরা গানের মজলিসের জন্য উৎসুক হইয়া রহিলাম। যে ঘরে গানের আসর হইয়াছিল, তাহার পার্শ্বের এক কক্ষে আমাদের বসিবার স্থান হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেক জানালা ও দরজায় রেশমের যবনিকা ঝুলিতেছিল। পুরুষরা আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন না, আমরাও দেখিতে পাইব না; কিন্তু গান শুনার কোন বাধা হইবে না। দাদার এতটা পর্দ্দাপ্রিয়তার প্রশংসা করিতে পারিলাম না। চেহারা দেখা গেলে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যায়?

সে দিন বোধ হয় দশমী তিথি। শরতের নির্ম্মল আকাশে চাঁদের স্নিগ্ধ প্রকাশ বড়ই মধুর বোধ হইতেছিল। একটা খোলা জানালার ধারে বসিয়া আমরা বৌদিদির সঙ্গে নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলাম। খানিক পরে সংবাদ আসিল, দাদার বন্ধুরা আসিয়াছেন, এইবার গান আরম্ভ হইবে।

হলঘর হইতে মৃদু গুঞ্জন আমাদের কাণে আসিতে লাগিল। খানিক পরে সেতারের মধুর রনন্, ঝনন্ শব্দ উত্থিত হইল। সেতার বাজাইতে আমিও শিখিয়াছিলাম। অল্পক্ষণ পরে বুঝিলাম, যিনি বাজাইতেছেন, তিনি শুধু উচ্চশ্রেণীর বাদক নহেন—রীতিমত সাধনা না থাকিলে, ভক্ত সাধক না হইলে এমন সুরের কসরত, এমন অপূর্ব্ব নৈপুণ্য প্রকাশ করা অসম্ভব। সেতারে যখন আলাপ আরম্ভ হইল, আমার মনে হইতে লাগিল, আমারই হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সুরের ঝঙ্কার বাহির হইতেছে। দাদার এই বন্ধুটি সার্থক সঙ্গীতচর্চ্চা করিয়াছেন!

আমি স্তব্ধভাবে শুনিতে লাগিলাম।

তাহার পর যন্ত্রবাদ্য বন্ধ হইল। হারমোনিয়মে গান আরম্ভ হইল। আমি উৎকর্ণ হইয়া বসিলাম। সেতারের আলাপের সময় আমাদের অনেকের মধ্যে একটু আধটু চাঞ্চল্য ছিল; কিন্তু গানের সময় সবই যেন মুহূর্ত্তে থামিয়া গেল। এ কি সঙ্গীত! যেন ধারায় ধারায় নন্দনপুর হইতে সুধানির্ঝরস্রোত নামিয়া আসিতেছে! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয় সেই সঙ্গীতসুধাসমুদ্রে অবগাহন করিয়া যেন ধন্য হইল। দাদা সত্যই বলিয়াছিলেন, এমন গান আগে আমি কাহারও কণ্ঠে শুনি নাই। যেমন কণ্ঠ, সুরের আরোহ, অবরোহ তেমনই বিস্ময়কর। বহু দিনের সাধনা, প্রাণপাত পরিশ্রম এবং বিধিদত্ত প্রতিভা না থাকিলে এমন গান কেহ করিতে পারে না। গায়ক যেন ধ্যানের মূর্ত্তিকে কথা ও সুরে জীবন্ত করিয়া তুলিতেছিলেন! কবি সার্থক লিখিয়াছেন,—

"তুমি কেমন ক'রে গান কর হে, গুণি!
আমি অবাক্ হয়ে শুনি, কেবল শুনি!—"

গানের সুরে সুরে আমার জমাটবাঁধা অশ্রুস্তূপ নয়নপথে গলিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। আকাশ ও মর্ত্ত্যে গানে

সুর ভরিয়া উঠিল। আত্মবিস্মৃত হইয়া আমি সুরের সাগরে যেন ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। জগৎ-সংসার সবই যেন আমার নয়নে মিলাইয়া গেল।

এক গান থামিয়া আর একটা গান আরম্ভ হইল। এই-রূপে কতক্ষণ গান চলিয়াছিল, ঠিক স্মরণ নাই, তবে আমার বোধ হইতেছিল, এই সঙ্গীতের প্লাবন যেন অনন্তকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, আর আমি তাহারই স্রোতে ভাসিয়া চলিয়া যাই।

সহসা বৌদিদির কণ্ঠস্বরে আমার চমক ভাঙ্গিল।

"মেজ ঠাকুরঝি, তুমি অবাক্ করলে। সুধীন বাবুর গান তোমরা আগে কখনও শোন নি? ওঁর মত গাইয়ে পেশাদারের মধ্যেও বড় একটা দেখা যায় না। কীর্ত্তনে ওঁর জুড়ি নেই বলেই ত মনে হয়।"

মেজদিদি সবিস্ময়ে বলিলেন, "সুধীন বাবু আবার কে?"

"বাঃ!—আমাদের সুধীন, ঠাকুরজামাই—কেন, এত-দিনের মধ্যে—"

আমার সর্ব্বদেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। আমি কি জাগিয়া আছি? এও কি সম্ভব?

সহসা বৌদিদি আমাকে ধরিয়া না ফেলিলে সেইখানেই পড়িয়া যাইতাম। কিন্তু চোখে সবই যেন ঝাপসা দেখিতেছি!

৫

কয় দিন যেন স্বপ্ন-ঘোরেই কাটিয়াছে। সম্পূর্ণ জ্ঞান হারাইয়া দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করি নাই বটে; কিন্তু আমার অন্তর-রাজ্যে যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল, তাহাতে ধারাবাহিকভাবে সব ঘটনা, সব কথা মনে রাখিতে পারি নাই।

রাত্রিতেই দাদার ওখান হইতে বাড়ী ফিরিয়াছিলাম। তাহার পরদিবস আমরা সকলে রেলে চড়িয়া আজ এই রাজ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। মনে পড়ে, বাবা বলিয়াছিলেন যে, আমার স্বামী মহাশয় সকলকে লইয়া তাঁহার পাহাড়-রাজ্যে যাইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়া পাঠাইয়াছেন। দাদা ও বৌদিদিকে স্বতন্ত্রভাবে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

আমার যেন কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্বই এই কয় দিন ছিল না। শুধু মা ও বাবা যাহা করিতে বলিয়াছেন, যন্ত্রচালিতবৎ তাহাই করিয়াছি। মা, বাবা, দাদা ও বৌদি এবং আমি এই কয়জন আসিয়াছি। দিদিরা তাহাদের কর্ত্তাদের অনুমতি পাইলে পরে আসিতে পারে।

একটা বড় টিলার উপর কি সুদৃশ্য অট্টালিকা! ইহাই আমার স্বামীর বাসভবন। বাড়ীর চারিপার্শ্বে প্রকাণ্ড বাগান। তাহাতে কি নাই? এমন চমৎকার বাগান সহরে কাহার আছে? শিল্পী যেন যত্ন করিয়া কল্পনার সাহায্যে খালি সৌন্দর্য্য রচনা করিয়াছে।

বাড়ীর কোথাও এতটুকু আবর্জ্জনা পর্য্যন্ত নাই। প্রত্যেক ঘর এমন সুসজ্জ থাকিতে পারে, ইহা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। প্রত্যেক শয়ন-কক্ষের পারিপাট্য শুধু কবির কল্পনাতেই সম্ভবপর।

এখনও পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত আমার দেখা হয় নাই। সন্ধ্যার কিছু আগেই আমরা বাড়ীতে আসিয়া পৌছিয়াছি। দাসী ও ভৃত্যরা আসিয়া আমাকে একটু বিশেষভাবেই যেন অভিবাদন করিয়া গেল। আমি কি এখানকার গৃহিণীর যোগ্য হইতে পারিব?

অন্তরের অনুশোচনার জ্বালা কত তীব্র, তাহার পরি-মাপের যন্ত্র কি আবিষ্কৃত হইয়াছে?

কিন্তু কেন তিনি আপনাকে আমার কাছে এমন করিয়া গোপন করিয়া রাখিয়াছিলেন? নিজের অতীত ও বর্ত্তমানকে মানুষ যে এমন করিয়া চাপিয়া রাখিতে পারে, তাহা ত জানিতাম না!

যে দিকে চাহিতেছি, সেই দিকেই গভীর সৌন্দর্য্যানুরাগের প্রকাশ দেখিতেছি। অথচ তাঁহার ব্যবহারে মুহূর্ত্তের জন্তও আমি বুঝিতে পারি নাই, কত মহৎ ও বৃহৎ হৃদয়ের তিনি মালিক!

একটা বড় ঘরের খোলা জানালার ধারে দাঁড়াইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছিলাম। অদূরে আমাদের কয়লার খনির বাহিরের কারখানা-ঘরগুলি দেখা যাইতেছিল। ঘরে উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছিল। ভাবিতেছিলাম, এই ঘরেই বুঝি তিনি রাত্রিবাস করেন।

এমন সময় "মিনু" বলিয়া দাদা ঘরের মধ্যে আসিলেন। মা ও বৌদিদি রন্ধনের তদ্বিরে গিয়াছেন। আমাকে সকল বিষয়েই আজ রেহাই দেওয়া হইয়াছে।

"কি ভাবছিস্, মিনু?"

মৃদু হাসিয়া বলিলাম, "কৈ, বিশেষ কিছু না।"

সহসা দাদা গম্ভীর হইয়া গেলেন; একটু থামিয়া

বলিলেন, "সুধীন আমার ছেলেবেলার বন্ধু। তা'র জীবনের প্রত্যেক দিনের কথা আমি জানি।"

আমি দাদার মুখের দিকে চাহিলাম।

"বিলাতে থাকার সময় প্রতি মেলে সে আমাকে প্রতি সপ্তাহের ঘটনার কথা লিখে পাঠাত। তা'কে আমি এত ভাল জানি ব'লেই তোর সঙ্গে তা'র বিয়ে দেবার জন্য মামাকে লিখেছিলাম।"

আমি আবার দাদার দিকে শঙ্কিতনেত্রে চাহিলাম।

দাদা বলিলেন, "তা'র সব আছে, তবু সে বড় দুঃখী। এত বড় হৃদয়বান্ মানুষ আমি দেখিনি। তা'র প্রথম স্ত্রী তা'র সব সুখ হরণ ক'রে নিয়েছিল। তাই সে জীবনে আর বিয়ে করবে না স্থির করেছিল। কিন্তু আমি জানতুম, তোর সঙ্গে বিয়ে হ'লে সে সুখী হবে—যা তা'র অভাব, তা দূর হবে।"

দাদা আজ এ সকল কি কথা বলিতেছেন? আমার হাত-পা যেন ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল।

"কিন্তু তুই তাকে বুঝতে পারিস নি।—"

"দাদা!" বলিয়া আমি জানালার ধারে বসিয়া পড়িলাম।

"না বোন্, দোষ যে তোর একার, তা বলতে পারি নে। অদৃষ্টই এই বাদ সেধেছে। সুধীনের আগের স্ত্রী মাত্র এক বছর বেঁচে ছিল। তা'র সবই ভাল ছিল; কিন্তু একটা দোষ ছিল, সে সকল রকমে সুধীনকে অধিকার ক'রে থাকবে—অন্য কোন বিষয়ে স্বামী আসক্ত হ'তে পারবে না, এই ছিল তা'র সঙ্কল্প। সুধীন যেমন কাজের ভক্ত, সঙ্গীতকে তা'র চেয়েও সে ভালবাসত। তার এমন সাধনা ছিল যে, গানকে সত্যই সে মূর্ত্তি দিতে পারত। স্ত্রীর সেটা মোটেই ভাল লাগত না। সতীন যেমন দুই চোখের বিষ হয়, সুধীনের সঙ্গীতচর্চ্চাও তা'র কাছে তেমনই বিষের মত বোধ হ'ত। সে নিজে গান জানত, ভালও বাসত; কিন্তু সুধীনের একনিষ্ঠ সঙ্গীতচর্চ্চা সে সহ্য করতে পারত না।"

আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। দাদার কাছে সরিয়া আসিলাম। বিস্ময়ে আমার বুকের মধ্যে যেন কেমন করিতে লাগিল।

দাদা বলিয়া চলিলেন, "এক দিন রাগ ক'রে সে সুধীনের সেতার আছড়ে ভেঙ্গে দিয়েছিল, তা'র পর সুধীন ৩।৪ দিন তা'র সঙ্গে কথা বলেনি, সেই রাগে, অভিমানে সে বিষ পান ক'রে আত্মহত্যা করে।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম।

"সেই দিন থেকে সুধীন প্রতিজ্ঞা করেছিল, সে বিয়ে করবে না—আর যদি কখনও বিয়ে করতে হয়, স্ত্রীর কাছে নিজের সঙ্গীতপ্রিয়তার বিন্দুমাত্র আভাস দিবে না। কোন নারীর গান সে শুনবে না। যে গানের জন্য একটা মানুষ আত্মহত্যা করতে পারে, সে সঙ্গীতচর্চ্চা লোকচক্ষুর অন্তরালে হওয়াই ভাল।"

সহসা কালো রঙের বৃহৎ যবনিকা আমার নেত্রপথ হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল। অনুতাপ, অনুশোচনার ভারে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়িল। আমার মত হতভাগী কে? এত বড় মহৎ হৃদয়কে আমি উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি! আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে কি?

দাদা বলিলেন, "আমার বিশ্বাস ছিল, তুই তা'কে বুঝতে পারবি। এত দিন কিন্তু একটু ভুল হয়েছিল। সুধীন অতটা আত্ম-গোপন না করলেই ভাল হ'ত; সে তোকে আপনার ক'রে নিতে পারত। কিন্তু বাধা কি সে পায় নি? আমি সত্য বলবো, মিনু, তোর যা কর্ত্তব্য ছিল, তা পালন করিস নি। আমি তোকে খুব ভাল জানি, তোর দুর্ব্বলতা কোথায় বুঝতে পেরেছিলাম। যাক্, ভগবানের আশীর্ব্বাদে এখন তোর ভালই হবে।"

নতমস্তকে আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম। যদি কেহ ভুক্তভোগী থাক, তবে আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝিতে পারিবে। ভাষায় তাহা ব্যক্ত করা যায় না।

মাথা তুলিয়া যখন চাহিলাম—দাদা ঘরে নাই। দ্বারপ্রান্তে ও কে দাঁড়াইয়া?

দ্রুত-চরণে অগ্রসর হইয়া তাঁহার চরণে লুটাইয়া পড়িলাম। কি বলিয়াছিলাম, মনে নাই, তবে অশ্রুতে আমার বক্ষের বসন যে ভিজিয়া গিয়াছিল, তাহা পরে বুঝিয়াছিলাম।

তিনি শুধু তাঁহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলমধ্যে সস্নেহে আমাকে ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নয়নে যে দীপ্তি, যে ভাবের প্রবাহধারা তখন দেখিয়াছিলাম, তাহা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আমাকে সীমাহীন আনন্দই দান করিবে।

মাসিক বসুমতী—শ্রাবণ, ১৩৩১

কোন্ পথ?

১

তরুণ যৌবনের সীমান্তপ্রদেশ অনেক দিন অতিক্রম করিয়াছি। দেহ সম্বন্ধে এ কথা সত্য হইলেও আমার হৃদয়ের তারুণ্য তখনও শুকাইয়া যায় নাই। হৃদঃকুঞ্জের শ্যামশোভা, তৃণহরিৎ মাধুর্য্য এবং বিকসিত পুষ্পসম্ভারের প্রাচুর্য্যের সন্ধান বাহিরের লোক কেমন করিয়া পাইবে? কিন্তু আমার মন তাহা জানিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে আমার কিছু সম্বন্ধ ছিল, এখনকার যুগের তরুণ সম্প্রদায় হয় ত সে কথা জানে না; কিন্তু আমার অনুরক্ত শিষ্যগণ এ কথা জানিত যে, আমি এখনও ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নানুরাগী। আমার শিষ্য?—বিস্ময়ের কথা ভাবিতেছ? কিন্তু তথাপি তাহা মিথ্যা নহে। আমার শিষ্য ছিল এবং এখনও আছে।

বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত ও অভিনয়ের দিকে আমার আসক্তি ছিল। আমাদের পল্লীর সে যুগের প্রবীণ ও তরুণ সকলেই জানিত, আমি সুকণ্ঠ। আমার পিতা কঠোর নীতি-পরায়ণ হইলেও, আমার সঙ্গীত-শিক্ষায় বাধা জন্মান নাই। কারণ, তিনি নিজেও ভাল পাখোয়াজ বাজাইতে পারিতেন; আর কীর্ত্তন-গানেও তাঁহার ওস্তাদী ছিল। আমার মামাকে আমি দেখি নাই—দেখিলেও মনে নাই; অনেক দিন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু মা'র কাছে শুনিয়াছিলাম, সঙ্গীত ও অভিনয়-কলায় তিনি যৌবনে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। পিতৃ ও মাতৃকুলের প্রভাবেই উত্তরাধিকারসূত্রে বোধ হয় আমি ললিত-কলার অনুরাগী হইয়াছিলাম।

পাড়ার সখের থিয়েটারের দলে আমি প্রথম প্রথম লুকাইয়া অভিনয় করিতাম। বাবা বিদেশে চাকরী করিতেন, তথাপি তাঁহার কঠোর নীতিপরায়ণতার ভয়ে আমাকে এইরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু পরে যখন তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, পল্লীর শিক্ষিত ভদ্রসন্তানরা কলাবিদ্যার চর্চ্চার মাঝে মাঝে এইরূপ নির্দ্দোষ আমোদপ্রমোদে লিপ্ত থাকে, তখন তিনি সেটা দোষের না ভাবিয়া আমাকে বরং উৎসাহই দিতেন। সত্য বলিতে কি, আমাদের এই নাট্যসম্প্রদায় সুরুচি, সুনীতি এবং শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। পল্লীর মাতব্বর প্রধান এবং শিক্ষিত ভদ্রমহোদয়গণ ইহার পরিচালক ছিলেন। কাজেই আমাদের মধ্যে কোনরূপ দুর্নীতির প্রসার ঘটিবার সম্ভাবনা ছিল না।

বন্ধুবান্ধবগণ বলিত, অভিনয়ে আমার প্রতিভা আছে। প্রথম হইতেই নাকি তাহার প্রকাশ দেখা গিয়াছিল। মিথ্যা বলিব না, আমি অভিনয়-সংক্রান্ত অনেক গ্রন্থ পড়িয়া ফেলিয়াছিলাম। প্রতীচ্য দেশের খ্যাতনামা অভিনেতা ও অভিনেত্রীদিগের সম্বন্ধে আমি প্রকৃতই অনেক সন্ধান রাখিতাম। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অভিনয়-সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান্ গ্রন্থ কিনিয়াছিলাম।

চাকরী করিব না, এ সঙ্কল্প বাল্যকাল হইতেই আমার মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। বাবা স্বকৃতভঙ্গ ছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূর্ব্বে আমাদের বংশে কেহ কখনও দাসত্ব করেন নাই। সুতরাং বাবাও প্রত্যক্ষভাবে না হউক, পরোক্ষভাবে আমার স্বাধীন মনোবৃত্তিতে অনুকূল বাতাস দিতেন। দাসত্ব করার সুখ তিনি হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন, তাই তাঁহার একমাত্র বংশধরকে দাসত্বের শৃঙ্খলে বন্দী করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না।

আমি কন্ট্রাক্টরি করিতাম, আর গান গাহিয়া, অভিনয় করিয়া অবসরকাল যাপন করিতাম। আমাদের সখের থিয়েটারের অভিনয় দেখিয়া রসজ্ঞ ও সমজদার ব্যক্তিরা বিশেষ প্রশংসা করিতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু কৃতী ছাত্র প্রশংসার ছাড়পত্র লইয়া, আমাদের অবৈতনিক নাট্যসম্প্রদায়ে অভিনয় করিত। আমি ছিলাম সকলের সর্দ্দার। এই বিরাট সহরের নানা স্থানে আমরা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছি। একবার আমার অভিনয় দেখিয়া কোনও প্রসিদ্ধ রঙ্গালয়ের প্রসিদ্ধ অভিনেতা ও পরিচালক আমাকে উচ্চ বেতন দিয়া তাঁহাদের রঙ্গালয়ে অভিনয় করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু মন তখন উচ্চ সুরে বাঁধা ছিল। ললিতকলাচর্চ্চার বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করাকে তখন পাপ বলিয়া মনে করিতাম। বিশেষতঃ পেশাদার রঙ্গালয়ে—অবাঞ্ছিত আবেষ্টনের মধ্যে অভিনয়!—সে যে আত্মহত্যা! ললিতকলা অপমানে শিহরিয়া উঠিবে না? এমনই অনেক

কথা তরুণ যৌবনের অনাবিল হৃদয়ে জাগরূক ছিল। কাজেই সগর্ব্বে তখন সে প্রস্তাব উপেক্ষা করিয়াছিলাম।

আমার যিনি জীবনসঙ্গিনী, তিনিও আমার মত ললিত-কলার অনুরাগিণী ছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া আমার স্বল্পে সন্তুষ্ট চিত্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। আমাকে তিনি এ সকল বিষয়ে অনেক সাহায্য করিতেন। শুধু তাহাই নহে, আমার অভিনয় দর্শনে তাঁহার প্রচণ্ড নেশা ছিল। তিনি কুললক্ষ্মী-রূপে আমাদের গৃহে আসিবার পর আমি সহরের যে যে স্থানে অভিনয় করিয়াছি, মেয়েদের দেখিবার স্বতন্ত্র ব্যবস্থা থাকিলেই তিনি সেখানে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কোন দিন তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই।

তাঁহার নিপুণ শুশ্রূষা, অনাবিল প্রেম, অগাধ স্নেহ ও পরিপূর্ণ সহানুভূতির প্লাবনে আমার জীবনে কোন দৈন্যই ছিল না। যৌবনের পুষ্পগন্ধব্যাকুল দিনগুলি এমনই ভাবে চলিয়া গিয়াছিল।

হঠাৎ ব্যবসায়ে লোকসান দিয়া চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলাম। তখন বড় ছেলেটি টাটার কারখানায় কাজ শিখিতেছে; দুইটি কন্যার বিবাহের সময় আসন্ন; গৃহিণীর কোলে ৩ বৎসরের আর একটি কন্যারত্ন।

বুঝিলাম, ধাকা সামলাইয়া চারিদিক্ বজায় রাখা বড়ই কঠিন। পৈতৃক ভিটা ও ভাড়াটিয়া বাড়ীর আয়ে সংসার কোনরূপে চলিতে পারে বটে; কিন্তু ঋণ ও কলির কন্যাদায়ের হাত হইতে নিষ্কৃতিলাভের উপায় কি ?

গৃহিণী চিরাভ্যস্ত প্রসন্ন হাস্যে অভয় দিলেন—মন খারাপ করিও না। মনটা আমার চির-নবীনতার আলোকে সমুজ্জ্বল। নৈরাশ্যের শুষ্ক দীপ্ত উত্তপ্ত নিশ্বাস কোনও দিন শ্যামলতাকে বিবর্ণ করিতে পারে নাই; কিন্তু সম্মুখে অমাবস্যার ঘনান্ধকার রজনী দৃঢ়পদে অগ্রসর হইতেছে, তাহাকে এড়াইবার উপায় কি ? বড় মেয়েটিকে পাত্রস্থা না করিলেই নয়। ঊর্দ্ধসংখ্যা আর মাস কয়েক কোনও মতে বিলম্ব করা চলিতে পারে। গৃহিণী মুখে আমাকে আশ্বাস দিলেও, কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া তিনিও যে বিশেষ আশ্বস্ত হইতে পারিয়াছিলেন, এমন বুঝিলাম না।

এমন সময় এক অযাচিত প্রস্তাব আসিয়া উপস্থিত হইল। আমারই কয়েক জন উচ্চশিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ধনী বন্ধু এক পেশাদারী রঙ্গালয় স্থাপন করিয়াছেন। অভিনয়ের উচ্চাদর্শ বজায় রাখিয়া ব্যবসায় করাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বাঙ্গালার রঙ্গালয় সম্বন্ধে জনসাধারণের ধারণা খুব উচ্চাঙ্গের ছিল না, তাঁহারা দেখাইতে চাহেন, বৈজ্ঞানিক উপায়ে অভিনয়-কলার পরিপুষ্টিসাধন সম্ভবপর। ভদ্র-সন্তানগণ, উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিরা প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে যোগ দিয়া রঙ্গালয়ের সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্ত্তনে সহায় হউন, ইহাও তাঁহাদের অন্যতম উদ্দেশ্য।

বন্ধুরা ধরিয়া বসিলেন, এই নব-প্রবর্ত্তিত রঙ্গালয়ে আমাকে অভিনয় করিতে হইবে। পরিচালকগণ মোটা পারিশ্রমিক ত দিবেনই, বৎসরশেষে উত্তমরূপে পুরস্কৃতও করিবেন। আমার অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন সন্দেহ ছিল না।

ব্যবসায়ের শোচনীয় দুর্দ্দশা আমাকে হতবুদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছিল; সঞ্চিত অর্থ, এমন কি, স্ত্রীর মূল্যবান্ গহনাগুলি পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণের ঋণ শোধ করিতে পোদ্দারের দোকানে বাঁধা রাখিতে হইয়াছিল। তাহাতেও কুলায় নাই—পৈতৃক বাড়ীও উত্তমর্ণের কাছে গচ্ছিত রাখিয়া ঋণের লাঞ্ছনা হইতে আপাততঃ রক্ষা পাইয়াছিলাম। তাহার পর পঞ্চদশী ও ত্রয়োদশী কন্যাযুগল।

প্রস্তাব লোভনীয়, অভাবের তাড়না প্রখর; কিন্তু শেষে প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে, অবাঞ্ছিত আবেষ্টনের মধ্যে ললিতকলার পরিচর্য্যা ?—আদর্শ জীবনযাত্রা! মন ক্ষোভে, অভিমানে শিহরিয়া উঠিবে না!

যাঁহারা প্রস্তাব করিতেছেন, প্রায় সকলেই সমাজের শীর্ষস্থানে উপবিষ্ট। বিদ্যা, বুদ্ধি, চরিত্র-গর্ব্ব এবং আভিজাত্য কোনও বিষয়ে তাঁহারা ন্যূন নহেন। বিশেষতঃ তাঁহারা আমার হিতকামী। সারা জীবন ধরিয়া যে আর্টের সেবা করিয়াছি, সত্য, শিব ও সুন্দর জ্ঞানে যাঁহার পূজা করিয়াছি, প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে সেই ললিতকলার বিকাশ দেখান আমার কর্ত্তব্য; না করা পাপ।

তাঁহাদের যুক্তিতে অসামঞ্জস্য নাই; এ প্রস্তাবে উপেক্ষা করিবার কোন হেতুও নাই। আবেষ্টনের গণ্ডীর মধ্যে বন্ধনের আশঙ্কা পর্য্যন্ত থাকিবে না। নীতিবিজ্ঞান-সংক্রান্ত ব্যবস্থা-প্রণালী, শৃঙ্খলা মানিয়া চলিলে কোন দিক্ হইতে কিছুই অশোভন হইবে না।

সবই বুঝিলাম; কিন্তু সে দিন বন্ধুগণকে কোনও নিশ্চিত কথা না দিয়া বিদায় করিয়া দিলাম।

২

কিছুই ভাল লাগিতেছিল না। এস্রাজ আমার দীর্ঘকালের প্রিয় সঙ্গী; কিন্তু আজ সে আমার স্পর্শলাভে বঞ্চিত হইয়া গৃহকোণে অভিমানে যেন ম্লানভাবেই দাঁড়াইয়াছিল। ঘরের মধ্যে একাই বসিয়াছিলাম। চৈত্রের আকাশে চাঁদ উঠিয়াছিল, বাতায়ন-পথে তাহার কিরণধারা যেন উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে প্রবেশ করিতেছিল। মনের সঙ্গে বুঝা-পড়া করিবার জন্য আমি তখন এমনই আত্মহারা যে, সত্যই আমার চিরন্তন সৌন্দর্য্য-পিপাসু চিত্ত শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল।

আলোক লইয়া গৃহিণী ঘরের মধ্যে আসিলেন। তাঁহার সদাপ্রসন্ন, স্নিগ্ধ-মাধুর্য্যভরা মুখখানা আমাকে এমন ভাবে বসিয়া থাকিতে দেখিয়া, যেন সহসা বিস্ময়ে কিছু বিবর্ণ হইয়া গেল। পৃথিবীর কোনও ঝঞ্ঝা, বিপদের কোনও আঘাত আমাকে কোনও দিন বিচলিত করিতে পারে নাই, চিরদিন তিনি তাহাই দেখিয়া আসিয়াছেন।

"কি হয়েছে গো? অমন ক'রে ব'সে আছ কেন?"

কোনও দিন জীবনের কোনও কথা তাঁহার কাছে গোপন করি নাই। আমার জীবনে এমন কিছুই ছিল না, যাহা তিনি জানিতেন না। শুধু কাজ নহে, চিন্তা পর্য্যন্ত। আমার কাছে তাঁহারও কিছু গোপন করিবার ছিল না। হয় ত তাঁহার অনেক অভাব আমি মিটাইতে পারি নাই, সম্পূর্ণরূপে সুখী করিবার সামর্থ্য না থাকায় হয় ত তাঁহার অনেক সাধ অপূর্ণ রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু একটা কথা জোর গলায় বলিতে পারি, তাঁহাকে অসুখী করিবার মত কোন কাজ কখনও করি নাই—ব্যথা তাঁহাকে জীবনে দিই নাই।

সব কথাই তাঁহাকে খুলিয়া বলিলাম। বন্ধুদিগের প্রস্তাবিত প্রণালীর কথাও ব্যক্ত করিলাম।

আমার মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন, "তুমি কি ব'লে দিয়েছ?"

"কিছুই বলি নি; বুঝতে পারছি না, কি করব।"

টেবলের উপর লণ্ঠনটা রাখিয়া দিয়া তিনি আমার পাশেই বসিয়া পড়িলেন।

ছোট বোন্‌কে কোলে লইয়া আমার মীনুমা ঘরের মধ্যে আসিল। মাছের ঝোল নামাইয়া রাখিয়া সে জানিতে আসিয়াছে—ডালের জন্য কি ভাজা হইবে। তাহার সুন্দর মুখখানি আগুনের উত্তাপে লাল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গর্ভধারিণীকে সে সংসারের সকল পরিশ্রমজনক কাজ হইতে অব্যাহতি দিবার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিত। অন্নপূর্ণার মত তাহার মুখশ্রী; সেই মুখে ও দেহে পরিপূর্ণতার জোয়ার আসিতেছিল। তাই ত!—তাই ত!

গৃহিণীর অন্তরেও বোধ হয় একই প্রশ্ন জাগিয়া উঠিয়াছিল। মীনুরাণী চলিয়া গেলেই তিনি সহসা বলিয়া উঠিলেন, "এক বছর এই চাকরী করলে কত টাকা পাবে?"

মনে মনে একটা হিসাব করিয়া বলিলাম, "তা মন্দ হবে না। মাসে ৫শ ক'রে হ'লে বছরে ৬ হাজার, তা ছাড়া ট্যাক্সি ভাড়া মাসে এক-শ। বছরের শেষে ২।৩ হাজার পর্য্যন্ত বোনাস্‌ও দেবে বলেছে।"

আমার মুখের দিকে খরদৃষ্টি রাখিয়া গৃহিণী বলিলেন, "৪।৫ হাজার হ'লে মীনুর বে বোধ হয় হ'তে পারে, না?"

যে পাত্রটির প্রতি আমার লক্ষ্য আছে, ৪ হাজার হইলে মীনুমাকে তাহার হস্তে সম্প্রদান করিতে পারিব, সে কথা বলিলাম।

গৃহিণী আমার আরও একটু কাছে সরিয়া বসিলেন।

লণ্ঠনের আলোটা আমার সহ্য হইতেছিল না। বলিলাম, "ঘরে চাঁদের আলো যথেষ্ট আছে, ওটা নিবিয়ে দাও।"

আমার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি লইয়া ক্রীড়া করিতে করিতে গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন, "কাজটা তুমি ছেড় না; কিন্তু—"

ঐ কিন্তুই ত মাটী করিয়াছে! আমার এ অবস্থায় ৫শ ত দূরের কথা, ৫০ টাকা মাহিনা কে দিবে? জীবন-যুদ্ধের কঠোরতা দিন দিন যেরূপ তীব্রতর হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে শত শত উচ্চ-শিক্ষিত এম্ এ, এম্ এস্-সি ডিগ্রীধারী যুবক ৩০ টাকা বেতনের জন্য লালায়িত। এমন অবস্থায় মাসিক ৫ শত টাকা বেতন, ১ শত টাকা গাড়ী-ভাড়া—এ যে দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন! কিন্তু আজীবনের সংস্কার, নীতিনিষ্ঠা—

"দেখ, এক বছর যদি চালাতে পার—"

গৃহিণীর সংশয়শঙ্কিত দৃষ্টির মর্ম্ম আমি বুঝিলাম। বিপৎ-সঙ্কুল, দুস্তর জীবন-সমুদ্রে পাড়ি দিয়া নৌকা তীরের কাছে আসিলে প্রবল ঘূর্ণিপাক ও আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বাভাস দেখিয়া মাঝির চিত্ত যেমন ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাঁহার মনের অবস্থা যে তেমনই হইবে, ইহা ত স্বাভাবিক।

চাঁদের আলো উভয়ের অঙ্গে আসিয়া পড়িয়াছিল।

গৃহিণীর মসৃণ, সুগোল করপ্রকোষ্ঠে লাল শাঁখা—তাহারই পার্শ্বে কিছু দিন আগে সোনার চুড়িগুলি ঝক্‌ঝক্ করিত। এখনও যেন তাহাদের দাগ মিলাইয়া যায় নাই।

চিত্ত ক্ষোভে দুঃখে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আমি কি পুরুষ নহি ? অমূর্ত্ত আশঙ্কা আমার পৌরুষকে নিষ্প্রভ করিতে চায় !

সংকল্প স্থির করিলাম। দৃঢ়কণ্ঠে বলিলাম, "তুমি যদি আমার পাশে থাক, রাণি! আমি সব পারি।"

মৃদুস্বরে গৃহিণী বলিলেন, "আমি ত আছিই।"

"এক বছর—শুধু একটি বছর !—পারব না ?"

মেজ মেয়ে আসিয়া বলিল, "মা, দিদি তোমায় ডাক্‌ছে।"

গৃহিণী উঠিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলাম, 'তোমাকে সুখী করিবার জন্যই আমি এ কাজ করিব।'

৩

পরিণত বয়সে নূতন উদ্যম লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলাম। নূতনের উত্তেজনায় মাসের পর মাস কোথা দিয়া চলিয়া গেল, বুঝিতে পারিলাম না। প্রথম রজনীর অভিনয় হইতেই সাফল্যের মত্ততা আমাকে গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। যে প্রতিভা এত দিন মাঝে মাঝে সখের রঙ্গমঞ্চে নির্দ্দিষ্ট দর্শকগণের চমক লাগাইয়া দিত, প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চে সে পূর্ণ-গৌরবে আপনার প্রভাব বিস্তার করিল। আমাদের সখের দলের আরও কয়েক জন নিপুণ অভিনেতা—আমারই হাতে গড়া শিষ্য—কর্ম্মসঙ্গিরূপে আমার সহায়তা করিতেছিল।

রঙ্গালয়ের পরিচালকবর্গ আমার বন্ধুজন হইলেও আমি চুক্তিনামা[illegible] স্বাক্ষর করি নাই। কারণ, আমার সঙ্কল্প ছিল, মাত্র এক বৎসর অভিনয় করিব। তাহার অধিককাল জীবনযাত্রার এই পথে বিচরণ করিব না। তাঁহারা তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

অভিনয়ের সাফল্য—দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের অভিনবত্ব—বাঙ্গালা ও ইংরাজী দৈনিক, সাপ্তাহিক, সকল প্রকার সংবাদপত্রে বিজয়দুন্দুভি বাজাইতেছিল। পথে, ঘাটে সর্ব্বত্রই আমার অভিনয়-নৈপুণ্যের উচ্চ প্রশংসা। প্রশংসার মাদকতা আছে, অস্বীকার করিব না, আমিও সে মত্ততার নাগপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিলাম না।

পিতার জীবনের আদর্শ হইতে আমি আশৈশব পরিমিতাচারের পক্ষপাতী। ঘড়ীর কাঁটার ন্যায় আমার সকল কাজ বাঁধা-ধরা ছিল। অভিনয়ের পূর্ব্বে কোন নাটকের 'রিহার্সাল' বা মহলা দিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রত্যহ রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইতাম। আমি প্রধান অভিনেতা—নাটকের নায়কের ভূমিকা আমাকে অভিনয় করিতে হইত ; অন্যান্য ভূমিকা বিলি করিবার ভারও আমার উপর ছিল। আমার প্রস্তাবে এবং পরিচালকবর্গের অনুমোদনক্রমে, পুরুষ ও নারী বিভাগ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত ছিল। যখন যে ভূমিকায় যাহার আসিবার কথা, শুধু সে ছাড়া অন্যের আসিবার অধিকার ছিল না। বৈদ্যুতিক ঘণ্টার সঙ্কেত হইবামাত্র অভিনেতা বা অভিনেত্রীর আবির্ভাব হইত। এই শৃঙ্খলারক্ষা সম্বন্ধে আমার কঠোর দৃষ্টি ছিল।

অভিনয়-রজনীতেও অর্দ্ধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে রঙ্গালয়ে উপস্থিত হইতাম। যবনিকা নিক্ষিপ্ত হইবার পরই—শুধু পোষাক খুলিতে ও অনুলেপন ধুইয়া ফেলিতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন, তাহার অতিরিক্ত সময় কখনই তথায় থাকিতাম না। আমার শিষ্যগণের সম্বন্ধেও আমার অনুরূপ সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ, তাহারা আমারই হাতে গড়া শিষ্য, প্রত্যেকেই সুশিক্ষিত ভদ্রসন্তান।

আমার চিরাভ্যস্ত, সহজ, সরল জীবনযাত্রার কিন্তু কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। পূর্ব্বে অনেক সময় আমি সুখ-দুঃখের সঙ্গিনী, জীবনাকাশের ধ্রুবতারা পত্নীর সাহচর্য্যে কাটাইতাম। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে যোগ দিবার পর সে অবসর অনেকটা কমিয়া আসিয়াছিল। প্রভাতে—খুব সকালে উঠা আমার অভ্যাস কোন দিনই ছিল না—প্রায় সাড়ে ৭টায় শয্যা ত্যাগ করিবার পর বৈঠকখানায় আসিয়া দেখিতাম বন্ধু-বান্ধব আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। যাঁহারা আমার অনুরাগী, তাঁহারা জয়গান করিতে আসিয়াছেন, যাঁহারা লেখক, তাঁহাদের রচিত নাটক পড়াইয়া অভিনয়ের জন্য যাহাতে গৃহীত হয়, সে জন্য স্তাবকতা করিতে আসিয়াছেন বিনা দর্শনীতে অভিনয় দেখিবার উমেদারের অভাবও ঘটিত না। সকলকেই সন্তুষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতাম, কাজে আসর বেশ জমিয়া উঠিত। আর একটা কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল, নহিলে সত্যের অপলাপ হইবে, আত্মপ্রশংসা কর্ণপাত করা সঙ্গত না হইলেও সে দুর্ব্বলতাকে [illegible]

করিবার প্রবৃত্তি আমার ছিল না। অনেকেরই তাহা থাকে না।

চা, সিগারেট, তাম্রকূটধূমের সেবায় সকালবেলাটা বেশ কাটিয়া যাইত, লাগিতও ভাল। যাঁহারা দাসত্ব করেন, শীঘ্র শীঘ্র তাঁহারা বিদায় লইতেন; কিন্তু যাঁহাদের প্রচুর অবসর, বেলা দ্বিপ্রহরের পূর্ব্বে তাঁহারা আসর ভাঙ্গিতে দিতেন না। রাত্রিতে ভাল নিদ্রা হইত না বলিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর খানিকটা ঘুমাইয়া কাটাইতাম। তাহার পর আবার রঙ্গালয়ে যাইবার নির্দ্দিষ্ট সময় উপস্থিত হইত। কাজেই রাণীর সহিত পূর্ব্বের মত বিশ্রম্ভালাপের অবসর ঘটিত না। সে জন্য অনেক সময় মনটা বড় বিরস হইয়া পড়িত।

গৃহিণীর সংসারের কাজ বাড়িয়াছিল। অর্থের সচ্ছলতার সঙ্গে সঙ্গে আমার সুখ ও আরামের জন্য তিনি সর্ব্বদাই নানা কাজে ব্যস্ত থাকিতেন। রাত্রি প্রায় ১টায় বাড়ী আসিতাম, তখনও তিনি আমার আহার্য্যের প্রত্যেক জিনিসটি উষ্ণ অবস্থায় পাতে দিতেন। আমার সানুনয় আপত্তি ও নিষেধ সত্ত্বেও তিনি এ বিষয়ে স্বামিদ্রোহিণী ছিলেন। আপত্তি করিতাম বটে, কিন্তু তাঁহার এই নিষ্ঠাভরা আদর, একাগ্রসেবা এবং প্রাণভরা ভালবাসার প্রকাশে আমি পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম।

৪

সে দিন রবিবার। সাড়ে ৫টার সময় অভিনয় আরম্ভ হইবে। একখানি নূতন নাটকের আজ প্রথম অভিনয়-রজনী। অভিনয়ের সাফল্য সম্বন্ধে মনটা চঞ্চল হইয়াছিল। শুধু একার অভিনয়ে কোনও নাটক জমে না। পুরুষ ও নারীর ভূমিকা তুল্যরূপে অভিনীত হইলেই তবে তাহা লোক-রঞ্জনে সমর্থ হয়। এ তত্ত্বটি আমার ভালরূপেই জানা ছিল। এ জন্য প্রধানা নায়িকার ভূমিকায় যে অভিনেত্রী অভিনয় করিত, আমি স্বয়ং শিক্ষা দিয়া তাহাকে তৈয়ার করিয়া লইয়াছিলাম। তাহারও প্রতিভা ছিল। এত অল্পবয়সে এমন অভিনয়-নৈপুণ্য সাধারণতঃ দেখা যায় না। আজিকার অভিনয়ে সে যদি শিক্ষামত কলা-কৌশল দেখাইতে পারে, তবে চিন্তার আর কোন কারণ থাকিবে না। অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে তাহাকে আর একবার বাজাইয়া লইতে হইবে। তাই অন্য দিনের অপেক্ষা অর্দ্ধ-ঘণ্টা পূর্ব্বে বাহির হইয়া পড়িলাম। যাত্রার পূর্ব্বে প্রতিদিন যেমনভাবে গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া আসি, আজও তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিল না।

ট্রামের কাছাকাছি আসিয়া পকেটে হাত পড়িতেই থমকিয়া দাঁড়াইলাম। মণিব্যাগটি টেবলের উপর ফেলিয়া আসিয়াছি! যাতায়াতের জন্য ১ শত টাকা ট্যাক্সি-ভাড়া পাইতাম, কিন্তু কদাচিৎ আমি ট্যাক্সিতে যাইতাম। অর্থের জন্যই দাসত্ব করিতেছি, অর্থকে অকারণ ব্যয় করা সঙ্গত নহে। ট্রামেই যাইতাম। যে দিন ফিরিবার সময় ট্রাম পাইতাম না, ট্যাক্সি করিয়া আসিতাম। অনেক সময় বন্ধু-বান্ধবের মোটরেই বাড়ী ফিরিতাম।

ব্যাগ আনিবার জন্য আবার বাড়ীর দিকে ফিরিলাম। এই অহেতুক বিলম্বে মনটা অপ্রসন্ন হইয়া রহিল। বাড়ীর কাছে আসিয়াই দেখিলাম, একখানি মোটর দাঁড়াইয়া। চিনিলাম, আমার প্রিয়তম সুহৃদ্ রতনের মোটর। সোফার বলিল, রতনের স্ত্রী আসিয়াছেন নিঃশব্দে বাহিরের ঘরের দরজা খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। পার্শ্বের ঘরে স্ত্রী ও রতনের পত্নীর কণ্ঠস্বর শুনিলাম। তাঁহারা আমার প্রত্যাবর্ত্তনের শব্দ পান নাই। রতনের স্ত্রী গৃহিণীর অন্তরঙ্গ সখী। উভয়ের পিত্রালয় একই পল্লীতে—পাশাপাশি বাড়ী। একই বালিকা-বিদ্যালয়ে উভয়ে পড়া-শুনা করিয়াছিলেন। উপন্যাস পাঠের ও অভিনয় দর্শনের উভয়েই একান্ত পক্ষপাতিনী। এ জন্য উভয় সখীর মনের মিলন গাঢ়ভাবেই হইয়াছিল।

ব্যাগটা নিঃশব্দে তুলিয়া লইয়া বাহির হইতে যাইব, একটা কথা কাণে গেল। স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম।

"শীঘ্র চল্ ভাই, আমি একেবারে তৈয়ারী হয়ে এসেছি। আজ ভারী ভীড় হবে। উনি আমাদের জন্য বক্স রিজার্ভ ক'রে রেখেছেন।"

উৎকর্ণ হইয়া শুনিলাম, "না ভাই, আমি ত যাব না। আমায় মাপ কর।"

"কেন বল্ ত? সুধীর বাবুর অভিনয় দেখ্‌বার জন্য আগে তুই যেখানে সেখানে যেতিস্—আর এখন তিনি দেশের প্রধান রঙ্গালয়ে এক জন বিখ্যাত অভিনেতা। তাঁর অভিনয় দেখবার সাধ হয় না তোর?"

নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলাম। কয়েক মুহূর্ত্ত কোন উত্তর শুনিলাম না। গৃহিণী মৃদুস্বরে কি বলিলেন, শুনিতে পাইলাম না। রতনের স্ত্রী একটু চড়া পর্দ্দায় গলা তুলিয়া বলিলেন, "না না, তোর কোন ওজর আমি শুন্‌বো না। আগেও দু'বার তুই আমায় ফিরিয়ে দিয়েছিলি—মাথাধরা, পেটের ব্যথার জন্য না হয় তখন বাধাই পড়েছিল। কিন্তু আজ আমি কোনমতেই ছাড়্‌বো না। বা রে! অমন চমৎকার নাটকের অভিনয়, আর উনি কি না যেতে পারবেন না!"

স্ত্রীর কণ্ঠস্বর এবার বেশ শুনিতে পাইলাম। প্রশান্ত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এখন আর থিয়েটার দেখার বয়স নেই, ভাই! আগে যা করেছি—করেছি। এখন থেকে প্রিয় ফলটির মত ওটা বিশ্বেশ্বরকেই দিয়ে দিয়েছি।"

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঘামিয়া উঠিলাম। চোখের সম্মুখে একটা পর্দ্দা পড়িয়াছিল—সহসা যেন উঠিয়া গেল! সত্যই ত, এই কয় মাসের মধ্যে একবারও রাণী থিয়েটার দেখার নাম পর্য্যন্ত করেন নাই! থিয়েটারের প্রসঙ্গমাত্র আলোচনা করিতেও তাঁহাকে শুনি নাই। অবসর পাইলে আমি অনেক কথাই বলিয়া গিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে এ সম্বন্ধে কোন আলোচনা করিতে দেখি নাই। তবে, তবে কি—

আমি উত্তেজনার আতিশয্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। সমস্ত মনটা যেন তিক্ততায় ভরিয়া গেল।

বৎসর পূর্ণ হইলেই এই পথ হইতে সরিয়া দাঁড়াইব। আমার সহধর্ম্মিণী—আমার সন্তানের জননীকে অসুখী করিয়া ধনবান্ হইতে আমি চাহি না। পুত্র আসিতেছে। আর কয়েক মাস পরেই সে আসিয়া পৌঁছিবে। তাহার শিক্ষা সমাপ্তপ্রায়। আমার এই জীবনযাত্রার কথা সে জানে। পিতাকে সন্তানের আদর্শ হইতে হইবে।

চারিদিকেই আমার প্রশংসার জয়ধ্বনি উঠিতেছে সত্য। নাট্যজগতে অভিনয়-কৌশলে যুগান্তর ঘটাইয়াছি, তাহাও অযথার্থ নহে। দেখা হইলেই পুরাতন বন্ধুগণ স্তুতিবাদ করেন। কিন্তু আগে আমি তাঁহাদের মাঝে যেখানে আসন অধিকার করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক আছে ত?

৫

বৎসর শেষ হইয়া আবার পূজা আসিয়া পড়িয়াছে; কিন্তু রঙ্গালয়ের সম্পর্ক ত্যাগ করিতে পারি নাই। বড় মেয়েটির সুপাত্রে বিবাহ দিয়াছি। বৎসরশেষে ২ হাজার টাকা পুরস্কার মিলিয়াছে। আরও ১ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে। বন্ধুরা পরামর্শ দিলেন, এমন লাভজনক চাকরী ত্যাগ করিয়া যেন নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় না দিই। মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি ও চরিত্র বজায় রাখিয়া যখন ললিতকলার চর্চ্চা চলিতেছে, তখন কোন্ মূর্খ এমন সুযোগ ত্যাগ করিবে?

দোলায়মান চিত্তকে শান্ত করিয়া কর্ম্ম-সমুদ্রে ভাসিয়া চলিলাম।

সে দিন এক স্বল্পভাষী পুরাতন বন্ধুর সহিত দেখা হইল। তিনি বলিলেন, "কি গো সুধীর, বছর শেষ হয়েছে না?"

বৎসর ত অনেক দিন আগেই পুরাতন হইয়া গিয়াছে। নূতন বৎসরও পুরাতনের দাবী লইবার জন্য দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

বলিলাম, "কিন্তু এতগুলো টাকা, কাজ ছেড়ে দিলে কে আমায় দেবে বলুন?"

তিনি সে অভ্রান্ত যুক্তিকে খণ্ডন করিতে পারিলেন না।

আর একখানি নূতন নাটকের মহলা লইয়া বিব্রত ছিলাম। অন্য কোনও বিষয়ে কয় দিন মন দিতে পারি নাই। আরও কয়েকটি প্রতিযোগী রঙ্গালয় উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছিল। অভিনয়ের উৎকর্ষ দেখাইতে না পারিলে অপদস্থ হইতে হইবে।

অভিনয়-রজনীতে দর্শকের অসম্ভব ভীড়। দুই দিন পূর্ব্ব হইতেই টিকিট বিক্রয় বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। আমার সহযোগিনী অভিনেত্রীর অভিনয়চাতুর্য্যে সে দিন আমিও অভিভূত হইলাম। করতালি-শব্দের মাত্রা এবং দর্শকদিগের উত্তেজনার বহর দেখিয়া বুঝিলাম, আমার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের প্রত্যেকেই সাফল্যের সহিত অভিনয় করিয়াছে। পরিচালকগণ অভিনয়শেষে আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন।

প্রভাতে বাড়ী বসিয়া চা-পান করিতেছিলাম—বন্ধুগণ অজস্র প্রশংসাবাদে আমাকে সপ্তম স্বর্গে তুলিয়া দিতেছিলেন। আসর বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল।

জনৈক কবি-বন্ধু বলিয়া উঠিলেন, "কাল একটা ভারী মজা হয়েছিল!"

আমি সোৎসুকে বলিলাম, "কি?"

তিনি বলিলেন, "অভিনয় যখন বেশ জ'মে উঠেছে—তুমি রাজপুত্র সেজে রাজকন্যার সঙ্গে প্রণয়ালাপে বেশ একটা করুণ ও মধুর ভাব জাগিয়ে তুলেছ, দর্শকরা মন্ত্র-মুগ্ধবৎ শুন্‌ছে, এমন সময় পাশের দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলুম, একটি ছোকরা রঙ্গমঞ্চের দিক্ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছে। আমার ভারী বিস্ময় বোধ হ'ল। এমন চমৎকার দৃশ্যটা ছোকরা দেখছে না কেন? আমার বাঁ পাশে হরিহর বসেছিল। তাকে দেখালুম। সে বল্লে কি জান? 'ও কে, চেন না, ও সুধীরের ছেলে অবনী!' তা ভাই, অনেক দিন দেখিনি, তাই তোমার ছেলেকে চিন্‌তে পারিনি। কিন্তু ব্যাপারটার ভেতর বেশ Psychology—মনের খেলা আছে।"

মনের খেলা!—আমার আপাদমস্তক শিহরিয়া উঠিল। চুরুটটা খুব জোরে টানিতে লাগিলাম।

আর এক জন বলিলেন, "তা ভাই, ছেলে ত বটে! বাপ আর এক জন মেয়েমানুষের সঙ্গে প্রণয়ালাপ কর্‌ছে—অভিনয় হ'লেও—"

বাধা দিয়া কবিবন্ধু বলিলেন, "ঐ দেখ, অবনী আস্‌ছে, চুপ কর!"

পুত্র আসিয়া দ্বারপথে থমকিয়া দাঁড়াইল। আমি বলিলাম, "কি চাই, বাবা?"

"আপনার এখানে একখানা বই দেখেছিলুম, 'সংযম-শিক্ষা'—সেখানা—"

বইখানি আলমারীর মধ্যে বন্ধ ছিল, অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিলাম।

এই আমার পুত্র! তাহার মাতার মুখের অবিকল ছাপ তাহার আননে। তেমনই ধীর, তেমনই শান্ত, তেমনই বিনীত। চিরদিনই পিতার প্রতি তাহার অগাধ ভক্তি। এক দিনও উঁচু গলা করিয়া সে কথা বলে নাই। মুখে তাহার কোন বিকারের চিহ্ন নাই। পিতার কৃতিত্বের প্রশংসা তাহার ধৈর্য্যকে ত টলাইতে পারে নাই! যে জয়োল্লাসে আমার চিত্ত অধীর, কৈ, তাহার বিন্দুমাত্র রেখাও ত তাহার আননে নাই। ও কি! তাহার নয়নকোণে—উহা কি কালিমার রেখা!—

ঘড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলাম, "ভাই, কালকের পরিশ্রম ও অনিদ্রায় আমার শরীরটা মোটে ভাল নেই। আজ একটু সকাল সকাল—"

বন্ধুরা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, আমার বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া সকলেই চলিয়া গেলেন। আমি সোফার উপর নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিলাম।

গৃহিণী আসিয়া বলিলেন, "ভাত হয়েছে, নাইবে চল।"

চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার করপ্রকোষ্ঠে আজ আর শুধু শাঁখা নাই; পরিচিত চুড়ীগুলি তাহাদের ঈপ্সিত পুরাতন স্থান অধিকার করিয়াছে। গলদেশে মাতৃদত্ত হার দুলিতেছে। বাড়ী ঋণমুক্ত, পোদ্দারের দোকান হইতে গহনাগুলি আবার গৃহিণীর লোহার সিন্দুকে আশ্রয় লইয়াছে।

প্রাচীরগাত্রে—বিবাহের পর উভয়ের যে আলোকচিত্র তুলিয়াছিলাম, তাহার প্রতি দৃষ্টি পড়িল। মৃদুকণ্ঠে বলিলাম, "এখন ত কাজ বেশী নেই, একটু এখানে ব'স না।"

গৃহিণী বলিলেন, "এখন কি বসবার সময় আছে, দুধ জ্বাল দিতে হবে। তুমি নাইবে এস।"

"আচ্ছা, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।"

তেমনি মন্থর-গমনে তিনি চলিয়া গেলেন।

থাম—থাম আশা! তোমার বংশীধ্বনি—মোহভরা রাগিণীর ঝঙ্কার বন্ধ কর! পিতৃত্বের দাবী, স্বামিত্বের দাবী, গৃহস্থের দাবীকে তুচ্ছ করিবার প্রলোভন দেখাইও না। জীবন-নাট্যের এই অঙ্কে এইখানে পূর্ণচ্ছেদ টানিয়া দিই। আজ, এখনই ইহার শেষ করিতে হইবে।

উঠিয়া বসিলাম—কাগজ-কলম লইয়া পদত্যাগের জন্য এক মাসের নোটিশ লিখিতে বসিলাম।

কি প্রণালীতে আরম্ভ করিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। অন্যমনস্কভাবে দেওয়ালের দিকে চাহিলাম। জনৈক অনুরক্ত ভক্ত আমার সর্ব্বজন-প্রশংসিত ভূমিকার আলোকচিত্র তুলিয়া বাঁধাইয়া ঘরে টাঙ্গাইয়া দিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। অনেক কথাই যুগপৎ মনে পড়িয়া গেল। আজন্মের সাধনার ফলে ললিতকলার সিদ্ধি আজ করতলগত। মা ভারতীর সেবায় জীবন-যৌবন ঢালিয়া দিয়াছিলাম। এখন অপরাহ্নের আলোকে যশের কিরীট মাথায় ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে! কিন্তু এ দেশে অভিনেতার

যশের কতটুকু মূল্য ? রঙ্গালয়ে করতালির বিপুল শব্দ, সংবাদ-পত্রে প্রশংসার দুন্দুভিনিনাদ ! কিন্তু সমাজের স্তরে স্তরে তাহার মর্য্যাদার স্থান কতখানি ? রঙ্গালয়ের আবেষ্টনের প্রভাব নটশিরোমণিরও অক্ষয় যশের মণিমুকুটের পার্শ্বে চির-দিনের জন্য ছায়া বিস্তার করিয়া থাকে না কি ?

আর পারি না !—আর পারি না ! এ কি মোহ ! দেড় বৎসর ধরিয়া যে পথে জীবনের রথ চলিয়াছে, এখন তাহাকে মোড় ফিরাইতে গিয়া বেদনায় সমস্ত অন্তর টন্-টন্ করিয়া উঠিতেছে কেন ? যশঃ, প্রতিপত্তি, অর্থসম্পদ্ ত্যাগ করিতে হইবে, তাই কি দুর্ব্বলতা ? অথবা—

হে মানবের চিরন্তন দুর্ব্বলতা ! আমাকে মুক্তি দাও ! কেশে পাক ধরিয়াছে, চর্ম্ম লোল হইয়া আসিয়াছে, দৃষ্টিশক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে ; এখনও কেন মোহিনী নাগিনীর মত মনটাকে পাকে পাকে জড়াইতেছ ?

পুত্রের ম্লানমুখ, পত্নীর বিকারবিহীন কর্ত্তব্যনিষ্ঠার চিত্র যুগপৎ মনে জাগিয়া উঠিল। কলম তুলিয়া ধরিলাম। আবার —আবার রঙ্গালয়ের শতচিত্র, ভারতীর স্বর্ণবীণার ঝঙ্কার ! প্রশংসার ভেরীনিনাদ !– অসহ্য, অসহ্য !

ক্ষোভে, দুঃখে, নৈরাশ্যে অধীর হইয়া টেবলের উপর মুখ লুকাইয়া বসিলাম।

"বাবা, বাবা ! ভাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, চলুন !"

মধ্যমা কন্যার কোমল অঙ্গুলীর স্নিগ্ধস্পর্শ আমার চুলের মধ্যে যেন শান্তির ধারা প্রবাহিত করিল।

মুখ তুলিয়া চাহিলাম। এই যে আমার আনন্দময়ী জননী সকল দ্বিধা, সকল সঙ্কোচের অবসান করিয়া কন্যারূপে অভয়া-মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া ! চল্ মা, হাত ধরিয়া তোল্ ! তোকে আশ্রয় দিয়া তরঙ্গসঙ্কুল—ক্ষুব্ধ সমস্যার সাগর উত্তীর্ণ হইব !

মাসিক বসুমতী—চৈত্র, ১৩৩১

চন্দ্রালোক

১

"তুমি সুন্দর কর মঙ্গল করে
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে!—"

অন্ধকার ঘরের ভিতর একা ললিতা জানালার ধারে বসিয়াছিল, বাহিরে সন্ধ্যার শরৎ-আকাশে চাঁদের আলো—গাছের পাতায়, লতায়, ফুলে বিচিত্র শোভা। বাগানের পাশে, প্রাচীরের ওপারের ভবন হইতে নারী-কণ্ঠ-সমুথিত গীত-লহরী বাতাসে ভাসিয়া তাহার কাণে প্রবেশ করিতেই সে যেন একটু চকিত হইয়া উঠিল। সে নিজে সুগায়িকা, বহুবার সে স্বয়ং এই প্রসিদ্ধ গানটি নানারূপে গাহিয়া গুণ-গ্রাহী স্তাবক ও প্রণয়ীদিগের নিকট হইতে অজস্র বাহবা ও প্রশংসা পাইয়াছে। কিন্তু ভদ্রপল্লীর নিভৃত কক্ষে বসিয়া, অপরিচিতা নারীর—অন্তঃপুরচারিণী মহিলার লজ্জানম্র মধুর কণ্ঠের গানটি আজ তাহার মর্ম্মতলে যেন একটা নূতন অনুভূতি জাগাইয়া তুলিল, হৃদয়-বীণার একটি গোপন তার যেন নবীন ছন্দে বাজিয়া উঠিল।

কাহারও মঙ্গল করস্পর্শে মলিন, ক্লেদার্দ্র মর্ম্মস্থল কি সত্যই সুন্দর ও পবিত্র হইতে পারে? কবির এই বাণী কি অমোঘ সত্য? সত্যই কি সে আশা সম্ভবপর? না শুধু কথারই ছলনা মাত্র?

কর-পল্লব-যুগল বক্ষোদেশে স্থাপন করিয়া নিমীলিত-নেত্রে ললিতা অপরিচিতা গায়িকার গানের সুধা যেন সমগ্র ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পান করিতে লাগিল। সে নিজে সুরের ইন্দ্রজাল রচনা করিতে পারিত সত্য, কিন্তু এমন ভাবটি ত সে কোনও দিন গানের ছত্রে ছত্রে ফুটাইয়া তুলিতে পারে নাই! নিষ্ঠা, বিশ্বাস ও পবিত্রতার অভাবই কি তাহার কারণ?

সে ভাবিতে লাগিল।

"ঘর অন্ধকার ক'রে ব'সে আছ, মা?"

ললিতার স্বপ্নজাল যেন ছিন্ন হইয়া গেল। সে চমকিয়া উঠিয়া মুহূর্ত্ত স্থিরভাবে রহিল, পরে ক্লিষ্ট স্বরে বলিল, "একটা লণ্ঠন জেলে আন, বিধু।"

ঘরে বিদ্যুতালোক জ্বালিবার সকল ব্যবস্থা সত্ত্বেও কর্ত্রীর এ কি খেয়াল! দাসী আদেশ পালন করিতে চলিয়া গেল।

কিছু দিন হইল, সহরের এক প্রান্তস্থিত সম্ভ্রান্ত ভদ্র-পল্লীর অন্তর্গত এই ক্ষুদ্র সুদৃশ্য বাড়ীটি সে কিনিয়াছে। অবশ্য-প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য্য জিনিস ছাড়া বিলাসের কোনও উপ-করণই সে এখানে রাখে নাই। উদ্দাম ভোগবিলাস, নৃত্যগীত, আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা কিছু দিন হইতে যেন তাহাকে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছিল। মাঝে মাঝে তাহার প্রাণটা যেন হাঁপাইয়া উঠিত, কেন এমন হইত, তাহা ঠিক সে বুঝিতে পারিত না। এক দিন দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেখিয়া সে কোনও প্রবীণ এটর্ণীর সাহায্যে, তাহার স্তাবক ও অনুরাগী—সকলেরই অগোচরে এই বাড়ীটি কিনিয়াছিল। প্রাণটা যখন অবসাদভারে অভিভূত হইত, সেই সময় অক-স্মাৎ কাহাকেও কিছু না বলিয়া, গোপনে সে এখানে চলিয়া আসিত। দাসদাসীদিগকেও পর্য্যন্ত জানিতে দিত না, সে কোথায় যাইতেছে। বিধাতা তাহার দেহে বিচিত্র রূপ, অটুট যৌবন, কণ্ঠে কিন্নরীর স্বর দিয়াছিলেন। অর্থ ও যশঃ তাহার করায়ত্ত, সুতরাং আপনার খেয়াল মিটাইতে তাহার কোন অসুবিধাই হইত না।

ইদানীং সে নৃত্য-গীতকেই প্রধান জীবনোপায়-স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিল। ব্যক্তি-বিশেষের অনুগ্রহ-ভাজন হইয়া থাকা—প্রতি মুহূর্ত্তেই তাহার মনকে যেন বিদ্রোহী করিয়া তুলিত। সঙ্গিনীরা এ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিলে সে স্পষ্ট কোন সন্তোষ-জনক উত্তর দিতে পারিত না। তাহার কৃপা-দৃষ্টি-লাভের জন্য অনেকে সর্ব্বস্ব দিয়াছিল—আরও অনেকে দিবার জন্য প্রস্তুত ছিল; কিন্তু সে আপনার সংকল্পকে অটুট রাখিয়াছিল।

পবিত্র গৃহস্থ-বধূর জীবন-যাত্রা হইতে কর্ম্ম-ভোগের পাকে এ পথে পা দিবার কিছু দিন পরেই রঙ্গালয়ে তাহার প্রতিভার প্রথম পরিচয় সে দিয়াছিল। সেই সময় হইতে পাঠস্পৃহা বাড়িয়াছিল। সঙ্গীত ও অভিনয়-কলার চর্চ্চার জন্য বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত সে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়া লইয়াছিল।

পূর্ব্ব-জীবনের সহিত এইখানেই তাহার সামঞ্জস্য ছিল। রঙ্গালয়-পরিত্যাগের পরও কাব্য, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি ছাড়াও সাময়িক ও দৈনিক পত্রের সে নিয়মিত পাঠিকা। বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন মতবাদ তাহার অন্তরে বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিল কি না, অন্তর্য্যামী ছাড়া কেহই তাহা জানিত না।

ভদ্রপল্লীর নির্জ্জন গৃহে সে সঙ্গোপনে আসিত, অনাড়ম্বরে চলিয়া যাইত। তাহার যাওয়া-আসা সে নিজের দাসদাসী ছাড়া কাহাকেও জানিবার অবকাশ দিত না। এখানে আসিয়া সে এমন সংযতভাবে চলা-ফিরা করিত যে, নব-নিযুক্ত ভৃত্যগণ বুঝিতেই পারিত না, সে কলিকাতার প্রসিদ্ধ গায়িকা—তাহার জীবনের অন্য একটা দিক্ আছে। তাহারা উচ্চহারে বেতন পাইত, বসবাসের স্থান পাইয়াছিল, মিষ্ট মধুর ব্যবহার অপর্য্যাপ্তভাবে পাইত, সুতরাং তাহারা সন্তুষ্ট-চিত্তে বর্ত্তমানকেই অবলম্বন করিয়া ছিল। কর্ত্রীর সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে কিছু কিছু আলোচনা হইলেও বাহিরের কাহারও সহিত শুধু স্বার্থের অনুরোধে নহে, শ্রদ্ধার প্রেরণায়—বিশেষ কিছু চর্চ্চা করিত না; সে সুযোগও সে পল্লীতে তেমন ছিল না। পল্লীর অধিকাংশই অভিজাত সম্প্রদায়ের বাঙ্গালী। এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীর ব্যবধানও সামান্য নহে।

গাড়ীর দ্বার বন্ধ করিয়াই ললিতা একাকিনী যাতায়াত করিত। কাহারও সহিত সে মিশিত না। চিত্রবিদ্যা অথবা পড়াশুনা লইয়াই অবসরটুকু নির্জ্জনে যাপন করিবার চেষ্টা করিত। দ্বারবানের উপর কড়া আদেশ ছিল, কোনও অজুহতে কাহাকেও তাহার বাড়ীতে কখনও প্রবেশ করিতে দিবে না!

বিধু একটা লণ্ঠন জ্বালিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। কর্ত্রীর মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে, সম্ভ্রম-ভরে প্রশ্ন করিল, "ঠাকুর জিজ্ঞাসা করছে, রাত্রে কি খাবেন?"

"তোমাদের জন্য যা হবে, আমাকেও তাই দিতে বলো, বেশী কিছু দরকার নেই।"

২

তখনও পার্শ্বের বাড়ীতে, দ্বিতলে আলো জ্বলিতেছিল। আহার সারিয়া, ভৃত্যদিগকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়া, ললিতা আবার সেই খোলা জানালার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। ঘরের মধ্যের মূর্ত্তিগুলিকে দেখা যাইতেছে, কিন্তু চেনা যায় না। দাম্পত্য-জীবনের ছবি!—কি রমণীয়, লোভনীয় ও পবিত্র এই গার্হস্থ্য জীবন!

স্তব্ধভাবে সে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিল।

বুকের মধ্যে—হৃদয়ের পাতায় পাতায় গাঢ় নৈরাশ্যের মসীছায়া ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছে কি?

কিন্তু অতীতকে টানিয়া আনিয়া কি লাভ? যবনিকার অন্তরালে যাহা চিরদিনের জন্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে, তাহার সন্ধানে ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া বেদনার ক্ষতকে শুধু বাড়াইয়া তোলাই সার হইবে না কি? নন্দন-কানন হইতে সে নির্ব্বাসিতা—স্বেচ্ছায় এই চির-নির্ব্বাসন সে বরণ করিয়া লইয়াছে, এখন সে জন্য অনুশোচনা সম্পূর্ণ নিরর্থক ও নিষ্ফল।

তবু—তবু স্মৃতি জোর করিয়া মনকে কোথায় টানিয়া লইয়া চলিয়াছে?

নির্ম্মল, নীল শরতের আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন-ধারা, জ্যোতির স্নিগ্ধ কিরণোচ্ছ্বাস! পৃথিবীর যাহা কিছু সুন্দর ও মলিন, সবই যেন পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে—পুষ্পের হাস্য-মধুর শ্রী, নর্দ্দমার পূতিগন্ধময় জল—সবই ত অনাবিল চন্দ্র-করধারায় স্নাত, প্রফুল্ল!

বাগানের ওপারের দ্বিতল গৃহের বিদ্যুতের আলো সহসা নিভিয়া গেল; ঘর অন্ধকার হইল। গার্হস্থ্য জীবনের যে মধু-স্মৃতিভরা চিত্র তাহার সমগ্র চিত্তটিকে অধিকার করিয়া একটা স্বপ্ন আবেষ্টন টানিয়া দিতেছিল, সহসা তাহা যেন অন্তর্হিত হইয়া গেল।

ললিতা জানালার পার্শ্বে অবস্থিত শয্যার উপর বসিয়া পড়িল। জ্যোৎস্নার তরঙ্গ শুভ্র কোমল শয্যাকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।

হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে সঞ্চিত নৈরাশ্যভার লইয়া একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া গেল।

সত্যই কি কোন পথ নাই? কিছুই কি সে করিতে পারে না? জীবন-পথের মোড় বাঁকিয়া সে যদি ভিন্ন দিকে চলিতে চায়, পথ কি তাহাকে বাধা দিবে? পথ-যাত্রীরা গম্ভীর-কণ্ঠে হাঁকিয়া বলিবে, এ পথে আসিবার কোন অধিকার তোমার নাই—চলিয়া যাও?

অসংযম, বিলাস ও পাপের পিচ্ছিল পথে পা দিলেই কি অতলস্পর্শ, অন্ধকারময়, যন্ত্রণাভরা, পঙ্কিল গহ্বরেই তাহা

চিরন্তন স্থান ? ফেনিল আবর্ত্ত-তরঙ্গ তাহাকে গ্রাস করিয়া সমাহিত করিবে ?

না, না, মিথ্যা কথা ! শাস্ত্র বলিতেছেন, ভয় নাই, কবির আশ্বাসবাণী উদাত্তকণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে, উঠ, জাগ, আশা আছে। আর এই শারদ চন্দ্রালোকে কাহার অমৃতবাণী উচ্ছ্বসিত আবেগে সমগ্র বিশ্বে ঘোষণা করিতেছে, আমি আছি !

সুপ্তিতে চারিদিক্ মগ্ন হইয়া গিয়াছে। প্রকৃতির সারা অঙ্গে শান্তির ছায়া ঘনীভূত। দূরে কোতোয়ালীতে প্রহরের ঘড়ী বাজিয়া উঠিল। ললিতা তখনও স্তব্ধভাবে বসিয়া রহিল।

৩

মন্দিরের অনতিদূরে আসিয়া গাড়ী থামিতেই অতি সাধারণ বেশে, সর্ব্বাঙ্গ মোটা চাদরে আবৃত করিয়া, ললিতা গাড়ী হইতে নামিল। ভাড়া চুকাইয়া দিয়া সে মন্থর-পদে কালী-বাড়ীর পশ্চাতের দ্বার দিয়া প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। অপরাহ্নে তখনও মায়ের মন্দিরের দ্বার খুলে নাই, তাহা সে জানিত; কিন্তু তথাপি দেবমন্দির প্রদক্ষিণ করিয়া, উদ্দেশে জগজ্জননীকে ভক্তি নিবেদন করিয়া সে যাইবে।

নাটমন্দিরে উঠিয়া সে কয়েক মুহূর্ত্ত যুক্তকরে দাঁড়াইয়া নিমীলিতনেত্রে দেবতাকে মনে মনে অর্চ্চনা করিল। অন্যান্য বিগ্রহগুলি দেখিয়া পুনরায় সে পথে আসিয়া দাঁড়াইল। অন্য আর একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া সে তাহার ত্রয়োদশ বৎসরের অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার রঙ্গস্থলে ফিরিয়া যাইবে। পাছে নির্জ্জন গৃহের সন্ধান পাইয়া কেহ তাহার নিভৃত বিশ্রামের ব্যাঘাত করে, এই জন্যই তাহার এইরূপ সাবধানতা।

মোড়ের কাছে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে দেখিতে পাইল, দক্ষিণদিক্ হইতে শোভা-যাত্রা করিয়া এক দল নারী গান গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। রাজপথের দুই ধারেই জনতা। দুই জন নারী পুরোভাগে একখানি বস্ত্র বিস্তৃত করিয়া তাহার চারিপ্রান্ত ধরিয়া রাখিয়াছে, জনতা ও সন্নিহিত দোকানগুলি হইতে টাকা, পয়সা ও অন্যান্য দ্রব্য তাহাতে নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

জলমগ্ন বাঙ্গালার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, গৃহহীন, নিরাশ্রয় নরনারীর সাহায্য-কল্পে সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাণ সমবেদনায় ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার কথা সে সংবাদপত্রে পড়িয়াছিল। আজ সমাজে উপেক্ষিতা, ঘৃণিতা, পাপ-পথের যাত্রী, তাহারই সমব্যবসায়ী বার-বিলাসিনীর দল দেশের আহ্বানে সাড়া দিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে,—এ দৃশ্য সহসা ললিতাকে অভিভূত করিল। যাহারা বিলাসপঙ্কে আকণ্ঠ নিমগ্ন, ভোগের যূপকাষ্ঠে যাহারা আপনাকে উৎসৃষ্ট করিয়াছে, সমাজের কোনও অনুষ্ঠানে যাহাদের সম্মানজনক কোনও স্থান নাই, তাহারাও তবে মহত্তর ব্রতের অধিকারিণী হইতে পারে ?

কে বলিল, জীবন নিরর্থক ? আছে, কাজ আছে, কাজ ! সমাজের কোন কোন শুভ ও পবিত্র অনুষ্ঠানের দ্বার তাহাদিগের পক্ষে রুদ্ধ হইলেও এমন অনেক কাজ আছে—যেখানে সকলেরই সমান অধিকার। দেশের কাজে, জীবের সেবায় বিরাটপুরুষের আহ্বানবাণী সকলকেই নির্ব্বিচারে ডাকিতেছে।

ললিতার দৃষ্টির সম্মুখ হইতে একখানি যবনিকা যেন সরিয়া গেল। অভিশপ্ত পঙ্কিল জীবন যাত্রা-পথের কর্দ্দমানুলেপনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়াও যাহারা নর-নারীর ব্যথিত, আর্ত্ত চীৎকারে এমন ভাবে সাড়া দিতে পারে, তাহারা ধন্য; ললিতা এত দিন আপনার হৃদয়ের ব্যর্থ হাহা-ধ্বনি শুনিয়া শুধু নৈরাশ্য-ভারেই পীড়িত হইতেছিল; কিন্তু তাহার এই ভগিনীগণ তাহার অপেক্ষা ভাগ্যবতী। তাহাদের প্রাণের জড়তা কর্ম্মের বংশীরবে আগেই দূরীভূত হইয়াছে, নিত্য মানবের সত্যরূপের আভাস অল্পক্ষণের জন্যও ত তাহারা অনুভব করিতেছে !

উদ্বেগ-ব্যাকুল-হৃদয়ে কয়েক মুহূর্ত্ত সে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া অঞ্চলের খুঁট হইতে যাহা কিছু অর্থ ছিল, খুলিয়া বিস্তৃত বস্ত্রাধারে ফেলিয়া দিল। বেশী অলঙ্কার পরিয়া সে আসে নাই; শুধু চুড়ি কয়েকগাছি ও দুইগাছি রুলী হাতে ছিল, তাহাও উন্মোচন করিয়া সঙ্গে সঙ্গে সে অর্পণ করিল।

গায়িকারা একবার তাহার দিকে চাহিয়া, যেমন গান গাহিতেছিল, তেমনই গাহিয়া চলিল। দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিচলিত কবি যে গান রচনা করিয়াছিলেন, ইহা সেই গান। গানের প্রতিচ্ছত্রে দেশের শোচনীয় দুর্দ্দশার কি অকপট বর্ণনা! মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় সে নারীদলের সহিত মিশিয়া

পদব্রজে চলিল। তাহার কোমল চরণ কোন দিন কঙ্কর-কঠিন পথে পতিত হয় নাই। গাড়ী ছাড়া এক পদও সে কোথাও যাইত না। প্রকাশ্য রাজপথে পদব্রজে কোনও দিন তাহাকে নামিতে হয় নাই। শুদ্ধান্তঃপুরের সহিত সম্বন্ধ বহুদিন ঘুচিয়া গেলেও সাধারণ পথচারীরা কোনও দিন তাহার অপূর্ব্ব-রূপ-জ্যোতিঃ দেখিতে পায় নাই। সে আপনাকে চাদরে উত্তমরূপে আবৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল। পার্শ্ববর্ত্তিনী এক জন নবীনা গায়িকা বলিল, "গাইতে জান? গাও না।"

ধরতার মুখে ললিতা তাহার অপ্সরানিন্দিত কণ্ঠ মিলাইয়া দিল। একটা নূতন উত্তেজনার আতিশয্যে তাহার সমগ্র দেহ ও মন যেন পুলকিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার শিক্ষিত কণ্ঠের অননুকরণীয় স্বরলহরী আকাশ-পথে উত্থিত হইল। মুগ্ধ বিস্ময়ে দর্শক ও শ্রোতার দল তাহাকে ভাল করিয়া দেখিতে লাগিল। সঙ্গিনীরাও এই অপরিচিতা নারীর সাহায্যে উৎসাহিতা হইয়া গাহিতে লাগিল।

কালীঘাটের রাস্তা পার হইয়া তাহারা রসা রোডে আসিয়া উপস্থিত হইল। দুই পার্শ্বের দোকান হইতে কাপড়, জামা প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে করিতে গায়িকার দল ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। অপরাহ্নের ম্লান আলো ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকারে মিশিয়া গেল। অর্থ ও বস্ত্রাদির পরিমাণ পর্য্যাপ্তই হইয়াছিল। তথাপি গায়িকাদের বিরাম নাই।

ভবানীপুরের গাড়ীর আড্ডার কাছে আসিয়া নারী-সমিতি গান বন্ধ করিল। ফুটপাতের উপর অসম্ভব জনতা। কৌতূহলীর সংখ্যাই অধিক। শুধু জন-মজুর, দোকানী-পশারী নহে—ভদ্রবেশধারী অনেকেই এতগুলি নারীর সমাবেশ দেখিয়া সেখানে জনতা করিতেছিল। ট্রামের প্রতীক্ষায় যাহারা দাঁড়াইয়াছিল, পুরোবর্ত্তিনী এক জন নারী তাহাদের কাছে গিয়া এক জনকে উদ্দেশ করিয়া করযোড়ে বলিল, "বন্যায় কিছু চাঁদা দিন?"

লোকটি একবার অপাঙ্গে সুন্দরীর দিকে চাহিল, তাহার পর বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলিল, "ভারী জ্বালা ত! বন্যা হোল এক দেশে, আর চাঁদা দিয়ে মরব আমরা? ও সব হবে না।"

রমণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলিল, "দেশের এই অবস্থা, কত লোক না খেয়ে মরতে বসেছে, কিছু দিন না মশায়!"

তিক্ত কণ্ঠে ভদ্রবেশধারী বলিল, "বিরক্ত করো না বলছি, আমি দেব না।"

ললিতা পার্শ্বেই দাঁড়াইয়াছিল। তাহার সমস্ত অন্তরে যেন বিদ্রোহের প্রবল বহ্নি-শিখা জ্বলিয়া উঠিল। দীপ্ত-কণ্ঠে সহসা সে বলিয়া উঠিল, "তা দেবেন কেন? দেশের মা, বোন্, ভাই না খেয়ে মরুক, উচ্ছন্ন যাক্, ক্ষতি কি?—কিন্তু আর একটু অন্ধকার ঘনিয়ে এলেই এই আমাদেরই মত এক জনের পায়ের তলায় সর্ব্বস্ব লুটিয়ে দিতে একটুও দেরী হবে না! ধিক্!"

সেই ধিক্কারে জনতা মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল; তাহার পর চারিদিক্ হইতে ভদ্রবেশী লোকটিকে লক্ষ্য করিয়া টিটকারী উঠিতে লাগিল। ভদ্র লোকটি অত্যন্ত অপ্রতিভ-ভাবে পকেট হইতে দুইটি টাকা লইয়া সন্নিহিত রমণীর হস্তে দিয়া চলন্ত ট্রামে চড়িয়া বসিল।

রমণী মৃদু হাসিয়া ললিতার দিকে ফিরিয়া বলিল, "তোমার নাম কি, ভাই?"

ললিতা বলিল, "নাম অবশ্য একটা আছেই, কিন্তু তা জেনে কোন লাভ ত নেই। ঘর যে দিন ছেড়েছি, সঙ্গে সঙ্গে নামের মহিমাও চ'লে গেছে। এখন যে নাম, সেটা ত মিথ্যাতে ভরা।"

রমণী বুঝিল, ললিতা পরিচয় দিতে অসম্মত। সে আর পীড়াপীড়ি করিল না। এই নারী-সমিতির সেই প্রতিষ্ঠাত্রী। সে বলিল, "থাক্ দিদি—নামে দরকার নেই। কিন্তু কোথায় থাক বল ত? আমি তোমায় এ দিকে কখনো দেখিনি।"

"এ দিকে ত আমার বাসা নয়। উত্তরদিকে থাকি। কিন্তু সে জায়গার নামও আজ—এখন বলতে ইচ্ছে করছে না। আজ যে পবিত্র ব্রত নিয়ে নেবেছ, তার স্মৃতির সঙ্গে জীবনের অপবিত্র কাজের পরিচয়ের আলোচনা—না, ভাই, থাক।"

রমণীরা সত্যই ললিতার কথা শুনিয়া মুহূর্ত্ত স্থির হইয়া রহিল। দলের নায়িকা বলিল, "সেই ভাল।—আমাদের দলে তোমাকে পাব কি? আমরা এখন রোজই কিছু দিন এম্‌নি ভাবে কাজ করব।"

ললিতা বলিল, "সে সৌভাগ্য আমার হবে কি না, জানি না। তবে পারি যদি আমাদের অঞ্চল থেকে আমরাও এম্‌নি চেষ্টা ক'রে দেখব।"

বিদায় লইয়া সে একখানি গাড়ী ভাড়া করিল। নারী-সমিতির সহিত যে কয় জন পুরুষ ছিল, তাহাদের এক জন বলিল, "আপনাকে পৌছে দিয়ে আসব?"

"কোন দরকার নেই" বলিয়া ললিতা গাড়ীতে চড়িয়া বসিল।

গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যেতে হবে?"

জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু স্বরে ললিতা ঠিকানা বলিয়া দিল।

৪

বহুদিনের পরিচারিকা মঙ্গলা ললিতাকে আসিতে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল, "মা গো, মা! কোথায় ছিলে বল ত? জবাব দিতে দিতে আমার গলা শুকিয়ে উঠেছে। কোথায় যাও, ব'লে গেলে ত বুড়ো বয়সে এ ঝক্‌মারী ভুগতে হয় না।"

মঙ্গলা ঠিক সাধারণ দাসী নহে, গৃহিণীর মত দায়িত্ব লইয়া সে ললিতার কাছে অনেক দিন কাটাইয়া দিয়াছে। নিজের কন্যার মত সে তাহাকে স্নেহও করিত। মনিব বলিয়া ভয় করিলেও স্নেহের অধিকারে সে অনেক সময় দুই চারিটা সোজা কথা বলিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

মঙ্গলা সোপান-পথে উঠিতে উঠিতে অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিল। হিতৈষিণী স্নেহপরায়ণা পরিচারিকার অনেক কথা ললিতা হাসিয়া উড়াইয়া দিত; কিন্তু আজ তাহার প্রাণটা এক অভিনব সুরে বাঁধা ছিল, সুতরাং লাভ-লোকসান কেনা-বেচার ঘৃণ্য আলোচনা তাহার অত্যন্ত বিশ্রী বোধ হইতে লাগিল। সে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "তুই থাম্ বাপু। যদি কথা বল্‌তে আরম্ভ কর্‌লি ত যেন পঞ্জাব মেল চলেছে!"

গলার স্বর একটু নামাইয়া মঙ্গলা বলিল, "তোমার ভালর জন্যেই বলি, আজ দু'দিনে গানের যে মুজরো ফিরে গেছে, তাতে কিছু না হোক্ পাঁচশ টাকা লোকসান।"

"তাতে তোর কি? লোকসান হয়ে থাকে, আমার হয়েছে।"

এমন কঠোর স্বরে এই দীর্ঘকালের মধ্যে ললিতা কখনও তাহাকে কোন কথা বলে নাই। মঙ্গলা একবার অপাঙ্গে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "বৈঠকখানা-ঘরে রায় বাহাদুরের ম্যানেজার ব'সে আছে। সোদপুরের বাগানবাড়ীতে কাল ভোজ হবে, সেখানে তোমাকে যেতে হবে—বায়না দিতে এসেছে।"

দ্বিতলে উঠিয়া ললিতা শয়ন-কক্ষের দিকে যাইতেছিল। ফিরিয়া সে নামিয়া বৈঠকখানা-ঘরে প্রবেশ করিল।

অনেকগুলি লোক সেখানে বসিয়াছিল। তাহারা সকলে আনন্দশব্দ করিয়া উঠিল। প্রস্তরের মূর্ত্তির মত, নিরাভরণা সুন্দরীকে গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সহসা তাহাদের কলরব বন্ধ হইয়া গেল। সে যেন কাহাকেও চিনিতে পারে নাই, এমনই ভঙ্গীতে বলিল, "কি চান?"

অর্দ্ধবয়স্ক এক পুরুষ ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিল, "রায় বাহাদুর আমায় পাঠিয়েছেন। কাল দু'বার এসেছিলাম, তোমার দেখা পাইনি। কাল সেখানে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত লোক থাক্‌বেন। তোমার গান হবে।"

প্রশান্তভাবে ললিতা বলিল, "কিন্তু আমায় মাপ কর্‌তে হবে। শরীর আমার ভাল না, আমি পারব না।"

এই রায় বাহাদুরের বাগানে সে পূর্ব্বে অন্ততঃ দশবার গানের মুজরা করিয়া আসিয়াছে।

পুরুষটি বলিল, "তিনি টাকা দিতে কাতর নন। তিনশ' টাকাই দেবেন। কিন্তু যাওয়া চাই।"

ললিতা দ্বারপথ হইতে ফিরিতে ফিরিতে বলিল, "আপনি তাঁকে জানাবেন, পাঁচশ টাকা দিলেও আমি যেতে পারব না।"

সোপান-পথে সে উপরে উঠিতে যাইবে, এমন সময় মোটরের ভেঁপুর শব্দে সে চাহিয়া দেখিল, তাহারই ফটকের সম্মুখে মোটর থামিয়াছে। সে আর সে দিকে না তাকাইয়া উপরে উঠিতে লাগিল। আজ শ্রান্তিভারে তাহার দেহ যেন নুইয়া পড়িতেছিল। সমগ্র চিত্তে দুর্নিবার অবসাদের বোঝা যেন ভারী হইয়া উঠিয়াছিল।

উপরে উঠিয়া সম্মুখের বারান্দায় গিয়া সে দাঁড়াইয়াছে, এমন সময় পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "তোমারই নাম ললিতা?"

বিরক্তি-ভরে ফিরিয়া চাহিতেই সে দুই জন অপরিচিত পুরুষ ও মঙ্গলাকে দেখিতে পাইল। পুরুষ দুই জনই ভদ্রবেশধারী; তন্মধ্যে এক জনকে বিশিষ্ট সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া বোধ হইল।

সে ধীর-কণ্ঠে মঙ্গলার দিকে চাহিয়া বলিল, "এখানে না এনে নীচে বসালেই পারতিস।"

মঙ্গলাকে উত্তর দিবার অবসর না দিয়াই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গী বলিল, "ওর কোন দোষ নেই। ও বলেছিল, কিন্তু বৈঠকখানায় অনেক লোক, এঁকে সেখানে বসান ঠিক নয়, ইনি—কুমার বাহাদুর। তোমার গানের প্রশংসা শুনে নিজেই এসেছেন। বাড়ীতে নিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু হঠাৎ কালই চ'লে যেতে হবে। সময় নেই, তাই রাতটুকু তোমার গান শুনে আনন্দ করতে চান।"

ললিতার মুখ হইতে কয়েক মুহূর্ত্ত কোন বাক্য সরিল না। সে স্তব্ধভাবে ভাবিতেছিল,—অদৃষ্টের কি পরিহাস! কিন্তু ক্রমেই তাহার মুখ কঠোর হইয়া উঠিল। তখনও সেই শুভ্র মোটা চাদরখানা তাহার যৌবন-পুষ্পিত সমগ্র দেহ-লতাকে আবৃত করিয়াছিল। শুধু তাহার অনিন্দ্য মুখখানি অনাবৃত।

কুমার বাহাদুর সেই মুখের অনুপম সৌন্দর্য্য যেন তৃষিত নেত্রে পান করিতেছিলেন। এতক্ষণ তিনি কোন কথা বলেন নাই। ললিতাকে নীরব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "চল তোমার গান শোনাবে।"

তাহার পর সঙ্গীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি মোটর নিয়ে যেতে পার।"

ললিতা সহসা নিদ্রোত্থিতার ন্যায় চকিত হইয়া উঠিল। বারান্দার সম্মুখেই দুইটি ঘর। একটি তাহার শয়ন-কক্ষ, অপরটি বসিবার। এই ঘরে সে শ্রোতাদিগকে গান শুনাইত।

কুমার বাহাদুরের সঙ্গী একতাড়া নোট বাহির করিয়া ললিতার দিকে অগ্রসর হইতেই সে বলিয়া উঠিল, "আমার ভাগ্য ভাল, কুমার বাহাদুর অধীনীর বাড়ীতে পায়ের ধূলো দিয়েছেন। কিন্তু তাঁকে খুসী করতে আমি পারব না—আমায় মাপ করুন।"

"পাঁচ শ টাকা এই তাড়ায় আছে, শোনো বাইজী—"

ততক্ষণ ললিতা তাহার শয়ন-কক্ষের দ্বারে পৌঁছিয়াছিল। ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া বাতায়নের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সে বলিল, "মঙ্গলা, কুমার বাহাদুর আর তাঁর বন্ধুকে ঐ ঘরে বসিয়ে তামাক, পাণ, জলখাবার দিস্। আদর-যত্নের যেন ত্রুটি না হয়।"

বিনয়পূর্ণ-কণ্ঠে কুমার বাহাদুর বলিলেন, "এই কি উচিত হ'ল, বাইজী? এত আশা ক'রে তোমার গান শুনতে এলাম।"

ললিতার বুকের মধ্যে যেন একটা উন্মত্ত ঝটিকার প্রবাহ বহিতেছিল। সে মঙ্গলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল, "দরোয়ানকে গেট বন্ধ ক'রে দিতে বলিস। বাবুরা যতক্ষণ থাকতে চান, বসিয়ে রাখিস্, আর পারিস যদি, তোরা দুটো গান শুনিয়ে দিস্।"

মঙ্গলা ভাবিতেছিল, ললিতার মাথা কি খারাপ হইয়া গিয়াছে?

রুদ্ধ দ্বারে বার কয়েক করাঘাত হইল। ললিতা নিস্পন্দ-ভাবে শয্যায় শুইয়া পড়িল।

৮

কি ঘৃণিত এই সকল পুরুষ! ইহারা অসঙ্কোচে যত কিছু নারকীয় কাজ করিবে, অপরকে টানিয়া খানায় ফেলিবে, অথচ সমাজে সংসারে ইহাদের অতুল সম্মান, প্রতিপত্তি, সম্ভ্রম!

নারীর পক্ষে যাহা মহা পাপ, পুরুষের পক্ষে কি তাহা নহে? তবে সমাজধর্ম্মের অমোঘ দণ্ড নারীর মস্তকে যে পাপের জন্য গুরুতররূপে পতিত হয়, ঠিক অনুরূপ পাপের জন্য পুরুষকে তেমন শাস্তি দেয় না কেন? মুহূর্ত্তের ভ্রমে নারীর পক্ষে সমাজ-সংসারের সকল দ্বার রুদ্ধ, আর পুরুষ? পাপ ত কখনও একা নারীর দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না। ইন্দ্রিয়-বিলাসে, জঘন্য লালসার অগ্নিতে পুরুষ ত সমভাবেই ইন্ধন যোগায়। তবে সমাজ সেই পুরুষকে বুকে করিয়া রাখে, তাহার সকল অপরাধকে ঢাকিয়া লয়, আর নারীকে কুক্কুরের ন্যায় তাড়াইয়া দেয় কেন? প্রধান ও প্রথম রিপুর ভোগে নারীকে উৎসর্গ করিয়া পুরুষ আপনার অধিকৃত স্থানে পূর্ব্ব-গৌরবেই অধিষ্ঠিত হয়। সমাজের অমোঘ দণ্ড সময়ে সময়ে হয় ত শরতের মেঘের মত বার কয়েক গর্জ্জন বা সামান্য বর্ষণ করিয়াই থামিয়া যায়। এ বিধান কি নিরপেক্ষ, করুণাময় বিধাতার সৃষ্টি? এই অসামঞ্জস্য কি তাঁহারই কল্পনা-প্রসূত?

ললিতা গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতে লাগিল। বহুদিনের সুপ্ত মনোবৃত্তিগুলি আজ যেন জাগিয়া উঠিয়া তাহার বুকের মধ্যে বিপ্লবের ঝটিকার ন্যায় শ্বসিয়া বেড়াইতেছিল।

পুরুষের কুৎসিত ইন্দ্রিয়-বিকারের ব্যভিচারের তীব্র বিষ ধারণ করিবার জন্যই তাহাদের মত নারীর সৃষ্টি হয় ত

প্রয়োজনীয়। নহিলে সমাজ, শৃঙ্খলা, শান্তি সবই হয় ত চূর্ণ হইয়া যাইত। কিন্তু এ বিষের তীব্র জ্বালায় দেহ ও মন পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যাইতেছে। মহাবিষ ধারণ করিবার উপযুক্ত পাত্র একমাত্র মহাদেব। তাহার মত ক্ষুদ্র নারী শুধু বিষের জ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া ভস্ম হইয়া যায়।

যদি পঙ্কমলিন হৃদয়ে চেতনার চন্দ্রালোক-ধারা বর্ষণ করিয়াই থাক, তবে হে অনাথনাথ, তাহাকে পথ দেখাইয়া দাও! পথের রেখার আভাস আজিকার নারী-সমিতির কাজে সে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার উৎসাহ দুই চারি দিনে নিভিয়া যাইবে। ঘটনার সাময়িক উৎসাহ স্থায়ী প্রভাব রাখিতে পারে না।

চারিদিকেই শুধু প্রলোভন, চারিদিকেই লোভের নগ্ন মূর্ত্তি। অভ্যস্ত জীবন-যাত্রার পথ আবার তাহাকে আকর্ষণ করিয়া কোথায় টানিয়া লইয়া চলিবে না—না, আর সে তাহা চাহে না। যদি শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়াই থাকে, তবে তাহাকে সে এই উত্তেজনার মুখেই বরণ করিয়া লইবে। অর্থ, বিলাস, মদিরা দীর্ঘকাল ধরিয়া সে পর্য্যাপ্তরূপেই ভোগ করিয়াছে।

যে মহাপুরুষের মহাবাণী সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাণের তারে নূতন ভাবের প্রেরণার সঙ্গীত-তরঙ্গের ঝঙ্কার তুলিয়াছে, তাঁহার অমৃতবাণীই তাহার মূলমন্ত্র। রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতি সে কিছুই বুঝে না, সে এখন বুঝিয়াছে, ভোগের সহিত, লিপ্সার সহিত, ইন্দ্রিয়-লালসার সহিত অসহযোগ না করিলে আত্মার মুক্তি নাই।

গতকল্য রজনীতে চন্দ্রালোকে সেই সত্যের আভাস সে পাইয়াছে।

কালই এটর্ণীর সহিত দেখা করিয়া সব ব্যবস্থা পাকা করিয়া সে এ স্থান ত্যাগ করিবে। তার পর? তার পর?—

নূতন আলোকের সন্ধান পাইয়া সে যেন পুলকিত হইয়া উঠিল। ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িয়া সে বারংবার অলক্ষ্য দেবতাকে প্রণাম করিল।

* * * *

আশ্রম-দ্বারে বর্ষীয়সী মহিলা দাঁড়াইয়াছিলেন।

নবাগতা তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি হিন্দী ভাষায় তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহিলার আনন প্রভাত-প্রসন্ন আকাশের মত মধুর।

নবাগতা আধা-বাঙ্গালা আধা-হিন্দীতে জানাইল, সে বাঙ্গালা দেশ হইতে আসিতেছে।

কি প্রয়োজন?

কাতর-কণ্ঠে নারী তাহার জীবনের সব কথা ধীরে ধীরে প্রকাশ করিল। সে আশ্রয় চায়, মানুষ হইতে চায়। তাহার মত পতিতার পক্ষে এ আশ্রমের দ্বার কি রুদ্ধ?

মহিলা, নবাগতার হাত ধরিয়া গৃহ-মধ্যে লইয়া গেলেন।

সকলেরই এখানে প্রবেশের সমান অধিকার। যাহার আত্মা জাগিয়াছে, তাহার জাগরণকে সার্থক করিবার জন্যই এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠা। ললিতার প্রবেশাধিকার আছে।

মহিলার নয়নে যেন অমৃতময় চন্দ্রালোক-ধারা উছলিয়া পড়িতে লাগিল।

ললিতার দুই নয়ন বহিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল। চন্দ্রালোকের দীপ্তিতে তাহার পঙ্কিল হৃদয়ের সব মালিন্য কি কোন দিন রজত-শুভ্র শোভা ধারণ করিবে?

চালচিত্র, ১৩২৯

সেবার পুরস্কার

১

"শ্মশানে কেন মা গিরিকুমারী—"

মেঘসমাশ্লিষ্ট প্রভাতের আকাশপথে পাগল হারুর গান গ্রামে গ্রামে উঠিয়া শ্মশানের বৈরাগ্যকে যেন মূর্ত্ত করিয়া তুলিতেছিল। এই পবিত্র তীর্থে—মানবদেহের চরম সমাপ্তির মহাশ্মশানে আজ বিশ বৎসর ধরিয়া বহু যাত্রীকে বহন করিয়া আনিয়াছি। পাগল হারু কত কাল ধরিয়া এখানে রহিয়াছে, জানি না, বিশ বৎসর আমিই তাহাকে দেখিতেছি। সে আপন খেয়ালেই সর্ব্বদা মগ্ন থাকিত, যখন খুসী হইত, সে আপন মনে গান গাহিত; কিন্তু কখনও একটা পূরা গান তাহাকে সমাপ্ত করিতে শুনি নাই। ফরমাস করিয়াও কেহ তাহাকে কখনও গান করাইতে পারে নাই।

রাত্রিশেষে এক জন পরপারযাত্রীকে আমরা বহন করিয়া আনিয়াছিলাম। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতালোকদীপ্ত বাঙ্গালী-সমাজে এই আরাম-বিরোধী কাজটা অত্যন্ত অপ্রীতিকর হইলেও, কৈশোর হইতে এই কাজ্যটির ভার কেমন করিয়া যে আমার উপর আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহার কারণ আজিও আবিষ্কার করিতে পারি নাই। আমার একটা পিতৃদত্ত নাম ছিল এবং এখনও আছে; কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধবগণ আমাকে 'চিত্রগুপ্ত' বলিয়াই ডাকিয়া থাকেন। আমি নিজে কখনও হিসাব করিয়া দেখি নাই, তবে যাঁহারা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমার জীবনের খুঁটিনাটি বিষয়েরও সন্ধান রাখেন, তাঁহারা নাকি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, অন্ততঃ সহস্র নর-নারীর পরপারের যাত্রার আমি সাক্ষাৎসম্বন্ধে সাহায্য করিয়াছি এবং সেই কারণেই কল্পলোকবাসী মহাপুরুষের নামটি তাঁহারা আমাকে পুরস্কারস্বরূপ অর্পণ করিয়াছেন।

চিতার অগ্নি নির্ব্বাপিত হইতে তখনও বিলম্ব আছে দেখিয়া আমি সুহৃদ্বর শ্মশান-দারোগার ঘরের বারান্দায় বসিয়া তাঁহার সহিত গল্প করিতেছিলাম; আমার সহযোগী বন্ধুরা চিতার পার্শ্বে ছিলেন, শেষ কর্ত্তব্যগুলি তাঁহারাই সম্পন্ন করিতে পারিবেন বলিয়া আমাকে একটু রেহাই দিয়াছিলেন।

দেশবন্ধুর দেহাবশেষ কয়েক দিন পূর্ব্বে এই মহাশ্মশানেই ভস্মীভূত হইয়াছিল। সেই পুণ্য কথারই আলোচনা চলিতেছিল। জনৈক মার্কিণ ভদ্রলোক দুই দিন পূর্ব্বে এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া, যে স্থানে দেশবন্ধুর চিতা সজ্জিত হইয়াছিল, তাহা দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং সেইখানে টুপী খুলিয়া নতজানু হইয়া ত্যাগী দেশপ্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছিলেন। মন্ত্রমুগ্ধহৃদয়ে সেই গল্প শুনিতেছিলাম, এমন সময় দ্রুতপদে এক জন ভদ্রলোক বারান্দায় উঠিয়া বলিলেন, "মশাই, এখানে রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাওয়া যায়?"

প্রশ্নটার বৈচিত্র্যে আমরা দুই জনই নবাগতের দিকে চাহিলাম।

ভদ্রলোক সম্ভবতঃ আমাদের মুখে বিস্ময়রেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "জন পাঁচ ছয় রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ হলেই চল্‌তে পারে। আপনাদের সন্ধানে আছে কি?"

দারোগাবাবু বলিলেন, "কি দরকার বলুন ত?"

আগন্তুক বলিলেন, "এক জন ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়েছে। তিনি রাঢ়ী, ব্রাহ্মণের শব যা তা ক'রে ত দাহ করা যায় না। তা এতে যা খরচপত্র হবে, সেজন্য ভাবনা নেই। আপনারা যোগাড় ক'রে দিতে পারেন?"

আমি এতক্ষণ চুপ করিয়াছিলাম; এখন আর পারিলাম না। বলিলাম, "এ সব কাজে পয়সা নিয়ে আপনি রাঢ়ীশ্রেণীর ব্রাহ্মণ পাবেন ব'লে ত মনে হয় না।"

আমার দিকে মুখ ফিরাইয়া তিনি বলিলেন, "তাই ত দেখছি। আমি আরও দুই এক জায়গায় একটু আগে প্রস্তাব করেছিলুম। কোন ফল হয়নি। তবেই ত, ভারী মুস্কিল হ'ল দেখছি! ব্রাহ্মণের শব!—বড়ই বিপদ!"

আমি বলিলাম, "লোকটি কে মশাই, বল্‌তে আপত্তি আছে কি?"

তিনি একটু ইতস্ততঃ করিয়া পরে বলিলেন, "লোকটির কোন আত্মীয়স্বজন এ দেশে নেই। কোন ভদ্রঘরে ৪০ বছর ধ'রে রাঁধুনী বামুনের কাজ ক'রে এসেছে শুধু ৮ বছরের

একটি ছোট ছেলে আছে। এখন দাহ করার লোক পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমার কৌতূহল আরও বর্দ্ধিত হইল। ৪০ বৎসর একাদিক্রমে যে বাড়ীতে এই ব্রাহ্মণ সূপকারের কাজ করিয়া আসিয়াছে, তাহার অন্তিমকালের কাজ করিবার জন্য বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ-সমাজে লোক পাওয়া যাইতেছে না!

"দেখুন মশাই, টাকা দিয়ে আপনি লোক পাবেন না। তবে যদি সব কথা প্রকাশ করতে আপনার আপত্তি না থাকে, তা হ'লে হয় ত আমি লোক যোগাড় ক'রে দিতে পারি।"

দারোগাবাবু আমার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি আমার প্রকৃতির পরিচয় ভালরূপেই জানিতেন। নবাগত ভদ্রলোকটিও বিশেষভাবে আমার মুখের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন।

আমি আবার বলিলাম, "স্পষ্ট ক'রে সব কথা খুলে বলুন, আপনি কোথা থেকে আসছেন, আর কার বাড়ীতে এই ব্রাহ্মণসন্তান এত দিন কাজ করেছিলেন?"

ভদ্রলোক যেন একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু যখন বুঝিলেন, সকল কথা না বলিলে লোকের যোগাড় হইবে না, তখন তিনি বলিলেন যে, চৌরঙ্গীর সন্নিহিত কোনও বিশিষ্ট শ্বেতাঙ্গ-পল্লীর নিকটেই বাঙ্গালার এক জমীদারভবনেই এই ব্রাহ্মণ এত দিন চাকরী করিয়াছিল।

নানাকার্য্যের অজুহতে সে পল্লীর এবং নিকটবর্ত্তী স্থানের প্রায় প্রত্যেক বাঙ্গালীর সন্ধান আমি রাখিতাম। ভদ্রলোক যে পল্লীর নাম করিলেন, সেখানে মাত্র একঘর বাঙ্গালীরই বাসভবন আছে। বাড়ীর মালিকদিগের সহিত সাক্ষাৎসম্বন্ধে আমার পরিচয় না থাকিলেও জানিতাম, বাঙ্গালার কোনও বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ-জমীদারবংশকে তাঁহারা অলঙ্কৃত করিয়াছেন। বিস্ময় দমন করিতে না পারিয়া বলিলাম, "বলেন কি, মশাই! আপনি যে পরিচয় দিলেন, তাতে ব্রাহ্মণসমাজের এক্‌জন চূড়ামণির ঘরেই এই মৃত্যু হয়েছে। তাঁরা মস্ত ধনী ও সম্ভ্রান্তলোক। তাঁদের বাড়ীতে শবের সৎকার করার লোক পেলেন না?"

আগন্তুক অত্যন্ত অপ্রস্তুত ও বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি বলিলেন, "লোক তাঁদের ওখানে বেশী নেই। বড়বাবু আর তাঁর ছেলে-মেয়েরা ছাড়া আর কেউ নেই। আমরা কর্ম্মচারীরা আছি বটে, কিন্তু আমরা ত ব্রাহ্মণ নই। বাবু ব'লে দিয়েছেন, খরচ যা লাগে, সব তিনিই দেবেন।"

লোকটি একবার করুণদৃষ্টিতে আমার পানে চাহিল।

২

সংকল্প স্থিরই করিয়াছিলাম, তবে সহকর্ম্মীদিগের মতটা একবার জানা দরকার। ভদ্রলোককে সঙ্গে লইয়া শ্মশান-চত্বরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের চিতার অগ্নি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই, তবে বিলম্বও ছিল না।

মামাকে সব কথা বলিলাম। তিনি আমাদের চাঁই ছিলেন। সত্য কথা বলিতে কি, আমার এই মামার জীবনের আদর্শ হইতেই আমি এই কাজটির জন্য প্রেরণা পাইতাম। মামা প্রথমতঃ সম্মত হইলেন না; কিন্তু যখন ব্যাপারটির গুরুত্ব বুঝাইয়া দিলাম, ব্রাহ্মণের অভাবে, শবদাহের অনুরূপ ব্যবস্থাও যদি ঘটে, তাহাতে জ্ঞানকৃত একটা অনুশোচনা হইতে কি আমরা অব্যাহতি পাইব? বিশেষতঃ কয়দিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী দেশবন্ধুর শববহন ও অনুগমনে যে মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়াছে, এক জন নগণ্য ব্রাহ্মণের শবদেহের সৎকার যদি তাহাদের দুই চারিজনের মনেও কোন সহানুভূতির প্রকাশ না ঘটে, তবে এখন কেহ না জানিলেও পরিণামে ভগবানের দরবারে কোনও সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারিব কি?

সারারজনীর অনিদ্রা ও পরিশ্রমে আমাদের শরীর ক্লান্ত হইলেও কার্য্যটির ভার লইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইলাম। কর্ম্মচারী ভদ্রলোকটিকে সে সংবাদ জানাইলাম। তবে চিতার শেষকাজগুলি সমাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।

ভদ্রলোক, আমাদিগকে সম্মত হইতে দেখিয়া যেন পরম নিশ্চিন্ত হইলেন। তিনি বিনীতভাবে জানাইলেন যে, আমরা যেন গাড়ী করিয়া যাই, তাহাতে শীঘ্র পৌঁছান যাইবেও বটে এবং একবার পথশ্রমের লাঘবও হইবে। আপাততঃ অন্যান্য বিষয় সংগ্রহ ও বন্দোবস্ত করিবার জন্য তিনি এখনই চলিয়া যাইতে চাহিলেন।

ঠিকানা আমার জানা ছিল, সুতরাং তাঁহাকে আমাদের প্রয়োজন ছিল না। ভদ্রলোক পুনঃ পুনঃ আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া সকলের নিকট হইতে বিদায় লইলেন।

আমরা তখন চিতার কাজ শেষ করিবার জন্য পূর্ব্বাপেক্ষা উৎসাহ দেখাইতে লাগিলাম। বেলা ৭টা বাজিয়া গিয়াছে। আর এক জনকে পরপারের ঘাটে পৌঁছাইয়া দিতে হইবে!

চিতা নিভাইয়া দিয়া, গঙ্গার জলে হাতমুখ ধুইয়া, আমরা ছয় মূর্ত্তি যখন শ্মশান হইতে বাহির হইতেছি, সেই সময় পাগ্‌লা হারু গাহিয়া উঠিল—"সংসারে সং সাজা!"

মামা রসিক লোক। তিনি বলিলেন, "পাগ্‌লাটার রসবোধ আছে, যোগেন!"

আমি একটু হাসিলাম। কথাটা মিথ্যা নহে।

বন্ধুবর হরেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "যোগেনের পাল্লায় প'ড়ে আরও কত সং সাজতে হবে, তাই বা কে জানে!"

আমি বলিলাম, "সাজ্‌তে হবে, কি সং সাজা দেখতে হবে, কে বল্‌তে পারে?"

৩

সুদৃশ্য ফটকের ভিতর দিয়া আমাদের গাড়ী যখন নির্দ্দিষ্ট জমীদার-বাটীর প্রাঙ্গণে থামিল, তখন রৌদ্রের আলোকে চারিদিক ঝল্‌মল্ করিতেছিল। নিঃশব্দে আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া অগ্রসর হইলাম।

কতিপয় সুসজ্জিত, ভদ্রবেশধারী যুবক ও অর্দ্ধবয়স্ককে বাড়ীর ইতস্ততঃ গতায়াত করিতে দেখিলাম। তাঁহারা যে সকলেই জমীদারের কর্ম্মচারী, ভাবভঙ্গীতে তাহা বুঝা গেল না। লোকগুলি আমাদিগকে দেখিয়াও যেন দেখিলেন না।

মাতুলমহাশয় রসিক লোক হইলেও সহজেই চটিয়া যান। আমরা এই বাড়ীর কোনও ব্রাহ্মণের শবসৎকারের জন্য উপযাচক হইয়া আসিয়াছি, অথচ লোকগুলি সে সম্বন্ধে আদৌ উৎসাহী নহে, এ দৃশ্যে তাঁহার রক্ত চঞ্চল হইয়া উঠিবারই কথা।

সুপ্রশস্ত ও সুসজ্জিত বারান্দায় আমরা দাঁড়াইবার পর এক জন লোক—ভাবে বোধ হইল, সে এখানকার কোন কর্ম্মচারী—আমাদের কাছে আসিল। আমি সংক্ষেপে সকল কথা বলিবামাত্র সে শবদেহ কোথায় আছে, তাহা দেখাইবার জন্য অগ্রসর হইল। গাড়োয়ান ভাড়ার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, সে তাহার ভাড়া চুকাইয়া দিয়া আসিল।

যে ভদ্রলোক আমাদিগকে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া কর্ম্মচারীকে তাঁহার সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। লোকটি 'আম্‌তা' 'আম্‌তা' করিয়া যাহা বলিল, তাহা হইতে বুঝা গেল, তিনি উপস্থিত নাই, কার্য্যান্তরে গিয়াছেন। তবে শবের সৎকারের জন্য বন্দোবস্তের কোনও ত্রুটি নাই।

সম্মুখের প্রশস্ত বৈঠকখানা-ঘরে কয়েক জন বাবু প্রাভাতিক চা-পানে ব্যস্ত হইতেছিলেন দেখিলাম। কৌতূহল দমন করিতে না পারিয়া কর্ম্মচারীকে তাঁহাদের সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম। বাড়ীর কর্ত্তাবাবু উঁহাদের মধ্যে নাই বটে, তবে বাবুবেশী যুবকগণ সকলেই এই বাড়ীর আত্মীয়—কেহ বা ভাগিনেয়, কেহ বা আর কিছু।

আমাদের পিত্ত যে ক্রমেই জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাহা অস্বীকার করিব না; কিন্তু স্বেচ্ছায় যে কার্য্যের ভার লইয়া আসিয়াছি, তাহাতে বিমুখ হইলে ত মনুষ্যত্ব থাকিবে না।

কর্ম্মচারীর সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিলাম। একটি বড় টেবলের উপর একটি মৃতদেহ পড়িয়া আছে—শবের উপর একখানা শতচ্ছিদ্র মলিন বস্ত্রাবরণ, অদূরে শতগ্রন্থিযুক্ত—বস্ত্র আখ্যা তাহাকে দেওয়া চলে না, তবে কোন সুদূর অতীতে এককালে হয় ত তাহাকে বস্ত্র বলা যাইতে পারিত—একখানি বস্ত্রাংশবিজড়িত এক রোরুদ্যমান বালক মাটীতে বসিয়া আছে। তাহার আননে শঙ্কা ও শোকের এক করুণ চিত্র!

মৃত্যুস্তব্ধ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র আমাদের হৃদযন্ত্রও যেন স্তব্ধ হইয়া আসিল। বালক ব্যাকুলভাবে একবার আমাদের দিকে চাহিল। তাহার দৃষ্টি আমাদের প্রত্যেককেই যেন বিদ্ধ করিল।

আমি কর্ম্মচারীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "এই ব্রাহ্মণ কি এই বাড়ীতে ৪০ বৎসর চাকরী করেছিলেন?"

সে নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া সে কথার যাথার্থ্য স্বীকার করিল। আশে-পাশের ঘরে সঞ্চরণমান যুবক আত্মীয়দিগের পদশব্দ—আমাদের কাণে আসিতেছিল।

গৃহের এক দিকে মলিন, দুর্গন্ধ-পূর্ণ কন্থা, তোষক, বালিস প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। অন্তঃপুর হইতে নারীকণ্ঠের আদেশ কাণে আসিল, "ছোঁড়াটাকে দিয়ে বিছানা-টিছানাগুলো বাইরে ফেলিয়া দেও।"

আট বৎসরের বালক ত্রস্তভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশক্রমে সে একে একে অতিকষ্টে, মৃতের ব্যবহৃত শয্যা তুলিয়া কোনক্রমে রাজপথের পার্শ্বে ফেলিয়া দিতে লাগিল।

স্তব্ধভাবে আমরা ছয় জন সেখানে দাঁড়াইয়া রহিলাম।

৪০ বৎসর ধরিয়া পরিচর্য্যার পুরস্কার বটে।

কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া বলিলাম, "বাড়ীর কর্ত্তাকে একবার সংবাদ দিন, আমরা দেখা ক'রে যেতে চাই।"

লোকটি মাথা নাড়িয়া বলিল, "তাঁর সঙ্গে এখন ত দেখা হবে না। তিনি ঘুমুচ্ছেন।"

"এখনও ঘুমুচ্ছেন! তবু আপনি একবার খবর দিন না।"

"না, মশাই, সে ক্ষমতা আমাদের নেই। বেলা ১০টার আগে তিনি ঘুম থেকে ওঠেন না। তাঁকে ডাকা নিষেধ।"

ধৈর্য্যের মাত্রা সীমা অতিক্রম করিতেছিল, তথাপি কষ্টে কণ্ঠস্বরকে সংযত করিয়া বলিলাম, "বলেন কি? বাড়ীতে মড়া রয়েছে, আজও বেলা ১০টা না বাজলে তাঁর ঘুম ভাঙ্গবে না? আশ্চর্য্য।"

মাতুল মহাশয় যথার্থই চাণক্যের বংশধর। তিনি একটু চড়া গলাতে বলিয়া উঠিলেন, "বড়লোক হ'লে কি হয়, দেখছ না কি রকম চামার! চল, আমরা যে কাজ করতে এসেছি, ক'রে যাই। এখানকার বাতাসেও বিষ আছে।"

হরেন্দ্র বলিল, "সেই ভাল। চামারের সংস্রব থেকে যত শীঘ্র স'রে পড়া যায়, সেটাই মঙ্গল।"

আমাদের এ আলোচনা চা-সেবনরত বাবুবৃন্দের শ্রবণ-বিবরে নিশ্চয় প্রবেশ করিতেছিল। কর্ম্মচারীটি হেঁটমুণ্ডে দাঁড়াইয়া।

শব-বহনের ব্যবস্থা করিয়া কর্ম্মচারীটিকে বুঝাইয়া দিলাম, আমরা শ্মশানে বেশী বিলম্ব করিতে পারিব না। বালক অবশ্যই তাহার পিতার মুখাগ্নি করিবে। তাহাকে ফিরাইয়া আনা ও অন্যান্য কার্য্যের জন্য এখানকার কাহাকেও সঙ্গে যাইতে হইবে।

কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে চলিল।

বাড়ীর বাবুরা সযত্নে আমাদের দৃষ্টিপথ হইতে দূরেই রহিলেন বুঝিলাম।

৪

চিতা জ্বলিয়া উঠিল। রোরুদ্যমান বালক পিতার মুখাগ্নি করিল।

যেমন করিয়াই হউক, বালকের কাহিনী শ্মশানে রটিয়া গিয়াছিল। উপস্থিত সকলেই তাহার অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ করিতেছিল। এমন কি, যে ডোম কাঠ আনিয়া দিতেছিল, সেও বালকের প্রতি সহানুভূতি দেখাইবার জন্য উপযাচকভাবে নানাপ্রকারে সাহায্য করিতেছিল।

চিতা নিভিবার কোনও আশঙ্কা নাই দেখিয়া আমরা শ্মশান ত্যাগ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। কর্ম্মচারীটি তখন সবিনয়ে জানাইল যে, আমরা কিছু জলযোগ করিলে সে কৃতার্থ হইবে। তাহার প্রতি তাহার মনিবের এইরূপ আদেশ আছে।

মাতুল কি বলিতে যাইতেছিলেন, আমি তাঁহাকে বাধা দিয়া কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, এই ব্রাহ্মণের সৎকারের জন্য যে অর্থব্যয় হইতেছে, তাহা ব্রাহ্মণের প্রাপ্য বেতন হইতে বাদ যাইবে কি না।

কর্ম্মচারী তাহার সদুত্তর দিতে পারিল না। তবে সরকারে যে ব্রাহ্মণের বেতন প্রাপ্য আছে, এ কথা অস্বীকার করিতেও পারিল না।

আমি বলিলাম, "আমাদের জলযোগের জন্য আপনি কত টাকা ব্যয় করতে পারেন?"

"তা ঠিক নেই। ৫।৬ টাকাও আমি দিতে পারি।"

"এই বালকের পরনে কি আছে দেখছেন! এর কাপড় কিনবার জন্য আপনার প্রতি আদেশ আছে?"

মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতে করিতে কর্ম্মচারী বলিল, "আজ্ঞে, সে রকম হুকুম আমার উপর নেই!"

"আপনার মনিবকে জানাবেন, আমরা তাঁর মত জমীদার না হ'লেও ভদ্রসন্তান এবং ব্রাহ্মণ। তিনি হিন্দুসমাজের এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং ব্রাহ্মণ-সমাজের শীর্ষস্থানীয়। শুধু ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা রাখবার জন্যই আমরা এ কাজ করেছি। তাঁর অর্থের বা খাবারের আশায় নয়।"

ক্ষোভে ও ক্রোধে সত্যই আমি সংযম হারাইতেছিলাম। আর যাহা বলিবার ছিল, তাহা প্রকাশ করিলাম না।

সঙ্গীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাহার কাছে কি আছে? আমাদের ছয় জনের কাছে যাহা ছিল, তাহা সংগ্রহ করিয়া

দাঁড়াইল ৪ টাকা ১০ আনা। স্থির করিলাম, বালকের 'কাছা' ও উত্তরীয় ক্রয় করিয়া আরও কিছু উদ্বৃত্ত হইবে। বালকের ব্যবহারের জন্য এক জোড়া কাপড় কিনিয়া দিতে হইবে।

পাগ্‌লা হারু যে কখন্ চিতার কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা লক্ষ্য করি নাই। সে ধীরে ধীরে আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়া তাহার কোমরের বস্ত্রবন্ধন খুলিয়া ফেলিল। অঞ্চলের এক কোণ হইতে সে কি খুলিয়া লইয়া আমার হাতে দিল! দেখিলাম, একটি টাকা!

সে আর দাঁড়াইল না, হন্ হন্ করিয়া শ্মশানের বাহিরে চলিয়া গেল। শত আহ্বানেও সে ফিরিয়া চাহিল না।

শ্মশান শুদ্ধ লোক অবাক্-বিস্ময়ে ভিখারী পাগ্‌লা হারুর গতিশীল মূর্ত্তির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রহিল। অমন যে কঠোরহৃদয় মাতুল, দেখিলাম, নিঃশব্দে তিনিও হস্ত দ্বারা চক্ষু মার্জ্জনা করিতেছেন।

আমার বুকের মধ্যে তখন কি হইতেছিল, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিবার মত শক্তি আমার নাই।

জমীদারের কর্ম্মচারীটি অবনত-মস্তকে দাঁড়াইয়া, বোধ হয়, ভূমির বক্ষে ফাটল অনুসন্ধান করিতেছিল।

কর্ম্মচারীর নিকটে গিয়া বলিলাম, "আপনার মনিবকে বল্‌বেন, ৪০ বৎসর তাঁর সেবা ক'রে যে লোকটি চ'লে গেল, তার ছেলেটির প্রতি যেন তিনি একটু কৃপা-দৃষ্টি রাখেন। আমি জানি, তাঁহারই কোন পূর্ব্বপুরুষ, ভাণ্ডারী চাকরের মৃত্যুর পর তার সংসার প্রতিপালনের জন্য ২০ বিঘা নিষ্কর জমী দান করেছিলেন। সেই মহাপুরুষের বংশধর, আজীবন পরিচর্য্যারত ব্রাহ্মণের ছেলেটিকে আজ যেন ভাসিয়ে না দেন।"

লোকটি তেমনই নতদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

দূর হইতে পাগ্‌লা হারুর কণ্ঠধ্বনি শোনা গেল। সে গাহিতেছিল—

"শ্মশান ভাল বাসিস শ্যামা—"

নিরুপমা বর্ষস্মৃতি, ১৩৩২

নিত্যস্রোতে

১

গৃহস্থাশ্রমত্যাগী পরিচিত বামাচরণ রুদ্রাক্ষমালা, গেরুয়াবসন ধারণ করিয়া বহুকাল পরে যে দিন হরিদ্বার হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল, সেই দিন মধ্যাহ্নে গৌরীপদ তাহার অগ্রজকে জানাইল যে, সে আর সংসারে থাকিবে না। বাহিরের ডাক আসিয়াছে, প্রাচীরঘেরা সংসারের দৃঢ়বন্ধন স্বীকার করিয়া চলা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

কনিষ্ঠ সহোদরকে অমরাপতি বাল্যকাল হইতে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়াছিলেন, পিতৃতুল্য অপরিসীম স্নেহে সংসারের নানাপ্রকার বাধা-বিঘ্ন, বিপদ-আপদ হইতে তাহাকে রক্ষা করিয়া সন্তানের ন্যায় লালন-পালন করিয়াছিলেন। ভাই বলিতে অমরাপতির কণ্ঠ স্নেহ-রসে আপ্লুত হইত, এক দিন তাহাকে দেখিতে না পাইলে, তিনি অপরিসীম বেদনা অনুভব করিতেন। নিজের একমাত্র সন্তান উষারাণীকে বরং তিনি নয়নান্তরালে রাখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন; কিন্তু গৌরীপদের অদর্শন সহ্য করা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন ছিল।

মধ্যাহ্ন-আহার শেষ করিয়া আচমনের জন্য যখন অমরাপতি প্রাঙ্গণে নামিয়াছেন, এমনই সময়ে কনিষ্ঠের এই নিষ্ঠুর নির্ম্মম বাণী তাঁহার কর্ণগোচর হইল। অমরাপতি ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "না—ঘরে বসিয়া ভগবানের আরাধনা কর, কিন্তু অন্য কোথাও তোমায় যেতে দেব না।"

উভয় ভ্রাতাই একই গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। তাঁহাদের গুরুদেব স্বয়ং কোন ধর্ম্মমতের প্রচারক হইলেও, তিনি গৃহস্থাশ্রমের পক্ষপাতী ছিলেন। স্ত্রী-পুত্রকন্যা-পরিবৃত থাকিয়াও নির্লিপ্তভাবে সাধন-ভজন করিতেন। শিষ্য-বৃন্দকে গৃহে থাকিয়া অনাসক্তভাবে ধর্ম্মচর্চ্চা করিবার উপদেশই তিনি অকুণ্ঠিতভাবে প্রদান করিতেন। কিন্তু জন্মবৈরাগী গৌরীপদ মাঝে মাঝে বন্ধন ছিন্ন করিয়া অরণ্যচারী পক্ষীর ন্যায় স্বাধীন মুক্ত আকাশে বিচরণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিত। তরুণী পত্নীর অনাবিল প্রেম, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপরিসীম স্নেহ, ভ্রাতৃবধূর মাতৃবৎ ব্যবহার, ভগিনীদিগের অযাচিত স্নেহ তাহাকে সমধিকভাবে আকৃষ্ট করিতে পারিত না।

কিন্তু তথাপি অগ্রজের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা-ভক্তি গৌরীপদের সঙ্কল্পে বাধাস্বরূপ উপস্থিত হইত। তাই বোধ হয়, সে যাই যাই করিয়াও এত দিন বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাহাকে উচ্চ শিক্ষা দান করিয়াছিল। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতা ও বিলাসিতার প্রচণ্ড প্রবাহবেগের তরঙ্গ তাহাকে কিন্তু বস্তুতান্ত্রিকতার মোহে অভিভূত করিতে পারে নাই। বন্যা বহিয়া চলিয়াছে, কিন্তু গৌরীপদ, জ্যেষ্ঠের ন্যায় দূরে দাঁড়াইয়া তাহার উদ্দাম নৃত্য-চপল গতিভঙ্গি উদাসীনভাবে লক্ষ্য করিয়াছে।

অমরাপতি শিক্ষকতাকে জীবনের চরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দেশভক্তির অভাব ছিল না। জননী জন্মভূমিকে তিনি গভীর শ্রদ্ধাসহকারে ভক্তি করিতেন। সাহিত্যসম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত আনন্দমঠের মাতৃমূর্ত্তি অনুক্ষণ তাঁহার হৃদয়কে প্রভাবিত করিত; কিন্তু দেশজননীর প্রতি যে ভক্তিপ্রবাহ বহিয়া চলিত, তাহা ফল্গুর অন্তঃসলিলা ধারার সহিত উপমিত হইতে পারে। কোন সভাসমিতির কোলাহল, কোন আনুষ্ঠানিক ব্যাপারের উত্তেজনা তিনি পরিপাক করিতে পারিতেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল,, মানুষ গড়িয়া তোলা। তাই তিনি সারাজীবন ধরিয়া শিক্ষকতা করিবার সুযোগ ত্যাগ করেন নাই। সুপণ্ডিত কনিষ্ঠকেও তিনি এ বিষয়ে তাঁহার সহকর্ম্মী করিয়া লইয়াছিলেন। একই বিদ্যালয়ে উভয়ে শিক্ষকতা করিতেন, এজন্য সকল সময়েই অমরাপতি কনিষ্ঠকে কাছে কাছে পাইতেন।

প্রাণাধিক ভ্রাতার সংসারত্যাগের কথা শুনিবামাত্র অমরাপতির দেহ থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। তিনি দৃঢ়তা সহকারে ভ্রাতার সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, গুরুদেবের উপদেশ-বাণীর কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। কিন্তু গৌরপদ যখন অবিচলিত-কণ্ঠে বলিল যে, সে যাইবেই, সন্ন্যাসী বামাচরণের সহিত আগামী কল্যই গৃহত্যাগ করিবে, তখন অমরাপতি এমন বিচলিত হইয়া পড়িলেন—তাঁহার স্নেহাপ্লুত কোমল হৃদয়ে এমন আঘাত লাগিল যে, পিচ্ছিল প্রাঙ্গণ-পথ অতিক্রম করিবার সময় তাঁহার শিথিল

চরণ-যুগল তাঁহার দেহভার বহন করিতে পারিল না। অমরাপতি সশব্দে ধরাশয্যা গ্রহণ করিলেন, চৈতন্য বিলুপ্ত হইল।

গৌরীপদ এক লম্ফে দাদার কাছে ছুটিয়া আসিল। তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের সাহায্যে সন্তর্পণে জ্যেষ্ঠসহোদরের সংজ্ঞাশূন্য দেহ বহন করিয়া সে শয়নগৃহে লইয়া গেল। তাহার আননে তখন যে উদ্বেগ, ভীতির চিহ্ন প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইল না।

সাধারণের উপকারের জন্য গৌরীপদ হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাশাস্ত্র আয়ত্ত করিয়াছিল। পল্লীর মধ্যে সুচিকিৎসক বলিয়া বিশেষ খ্যাতিও ছিল। দাদার চৈতন্যসম্পাদনের জন্য সে তখন ঔষধের নানাপ্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্যগ্রহণ করিল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর অমরাপতির চেতনা ফিরিয়া আসিল। নেত্র উন্মীলন করিয়াই তিনি ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, "গোরা—গোরা ভাই!"

সেই ব্যথিত আর্ত্তস্বরে পার্শ্বে উপবিষ্টা পত্নী কমলিনীর নেত্রপল্লব অশ্রুভারে সিক্ত হইল—কয়েক বিন্দু মুক্তা ঝর ঝর করিয়া উপধানের উপর ঝরিয়া পড়িল।

বৈরাগী গৌরীপদও অধীর হইয়া উঠিল। সে বলিল, "এই যে দাদা, আমি!"

কনিষ্ঠের দক্ষিণ হস্ত স্বীয় করপুটে ধারণ করিয়া অমরাপতি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন—তাঁহার নয়ন-যুগল আবার নিমীলিত হইল।

গৌরীপদ অনুতাপক্ষুণ্ণ স্বরে বলিয়া উঠিল, "দাদা, ক্ষমা কর। আমি কোথাও যাব না।"

অমরাপতি নিমীলিত-নেত্রে, তদবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "আ!"

সেই দিন রাত্রিযোগে গৌরীপদের তরুণী পত্নী স্বামীকে বলিল, "তুমি বড় নিষ্ঠুর! এমন দাদার মনে কষ্ট দিয়ে তুমি কোন্ ধর্ম্ম সঞ্চয় করতে চাও? আমার কথা নাই বা ধরলে!"

গৌরীপদ স্তব্ধভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল। তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "বুঝতে পাচ্ছি না, আমার কর্ত্তব্য কি! কিন্তু সত্যি কি আমি দায়িত্ব-জ্ঞানশূন্য?"

তরুণী পত্নী এই উত্তরে সন্তুষ্ট হইল কি না, বুঝা গেল না।

২

কালপ্রবাহে আরও কয়েক বৎসর ভাসিয়া গেল। গৌরীপদ পূর্ব্বের মতই সাধন-ভজনের সঙ্গে গৃহধর্ম্ম পালন করিয়া তাহার বৈরাগী হৃদয়কে নির্লিপ্তভাবে রাখিবার চেষ্টা করিল।

অকস্মাৎ এক দিন সংসারের একটা দৃঢ়বন্ধন খসিয়া গেল। এক সপ্তাহের রোগে সন্তানহীনা নারী—গৌরীপদের পত্নী মহাপ্রস্থান করিল। অমরাপতি ও তাঁহার পত্নী দেখিলেন, গৌরীপদ মুখে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল না বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে বিচ্ছেদের আঘাত-জনিত বেদনার রেখা সমগ্র আননে ব্যাপ্ত হইয়াছে। বুঝা গেল, বৈরাগ্যপূর্ণ অন্তরের কোনও স্থানে স্নেহ ও প্রেমের আসন শূন্য ছিল না।

মনুষ্য-চরিত্র, মানব-মনের জটিলতম অবস্থা সম্যক্‌রূপে বিশ্লেষণ করিবার মত পৃথিবীর কোনও দর্শনশাস্ত্র রচিত হইয়াছে কি? সসীম মানবের বিদ্যাবুদ্ধি বিশ্বস্রষ্টার অনন্ত রচনালীলার মহিমা কোন দিনই সম্যক্‌ভাবে বিশ্লেষণ করিতে পারিবে না। সুতরাং গৌরীপদের মনের অবস্থা অমরাপতি বা তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি যে নিশ্চিতভাবে অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না।

গৌরীপদ পত্নীবিয়োগের পর সহসা দাদার সাহায্যকল্পে বদ্ধপরিকর হইল দেখিয়া অমরাপতি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী কিছু বিস্মিত হইলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, সংসারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ অন্তর্হিত হওয়ায় গৌরীপদ হয় ত হিমারণ্যের অভিমুখে প্রস্থান করিবে। কিন্তু সে বিষয়ে যখন কোন প্রকার আভাস তাহার কার্য্যে প্রকাশ পাইল না, তখন সকলেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

তবে দেখা গেল, গৌরীপদ অত্যন্ত গম্ভীর এবং প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া ধর্ম্ম-গ্রন্থাদি পাঠে অবহিত হইয়াছে। অমরাপতি চিরদিনই স্বল্পভাষী। তিনি ভ্রাতার শয়ন-কক্ষে নিজের শয্যা বিছাইবার ব্যবস্থা করিলেন। সংসারের প্রয়োজনীয় অর্থ-সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে অপর্য্যাপ্ত পরিশ্রম করিতে হইত—উদয়াস্ত তিনি গৃহের বাহিরেই যাপন করিতেন।

দাদাকে তাহার গৃহে শয়ন করিতে দেখিয়া গৌরীপদ আপত্তি করিল। কিন্তু অমরাপতি তাহার আপত্তি হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। গৌরীপদ যখন মধ্য-রাত্রিতে ক্লান্তিভারে উপধানে মস্তক রক্ষা করিয়া গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত

হইত, তখন সে জানিতে পারিত না, জ্যেষ্ঠের হস্ত ধীরে ধীরে তাহার কেশরাজির মধ্যে সন্তর্পণে সঞ্চালিত হইত, একজোড়া চক্ষু অনেক সময় নিশ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের উপর ন্যস্ত থাকিত, কখনও বা পাখার বাতাসে তাহার ললাটের স্বেদবিন্দু অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

কয়েক মাস পরে অমরাপতি দেখিতে পাইলেন, অতিরিক্ত শ্রমভারে তাঁহার প্রাণাধিক প্রিয়তম সহোদরের স্বাস্থ্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছে। তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী কমলিনীও স্বামীর কাছে তাঁহার মনের উদ্বেগ প্রকাশ করিলেন।

অমরাপতির কন্যা উমারাণী তখন দেওঘরে বায়ুপরিবর্ত্তন উপলক্ষে বাস করিতেছিল। সে অনেক দিন হইতেই সকলকে তাহাদের ওখানে যাইবার জন্য পত্র লিখিতেছিল। বিশেষতঃ তাহার স্নেহময়ী কাকীমার মৃত্যুর পর কাকাবাবুর মানসিক অবস্থা কল্পনা করিয়া, সে তাহাকে পাঠাইয়া দিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেছিল।

দম্পতির পরামর্শ স্থির হইল। অমরাপতির পক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া কিছু দিন অবস্থান করা অসম্ভব। সহায়সম্পত্তিহীনা ভগিনীযুগল ও তাহাদের পিতৃমাতৃহীন সন্তানদিগের প্রতিপালনের ভার অমরাপতিকে স্কন্ধে তুলিয়া লইতে হইয়াছিল। শিক্ষকতা এবং বাড়ী বাড়ী ছাত্র পড়ান ত্যাগ করিয়া গেলে সংসার চলিবে না। সুতরাং স্থির হইল, কমলিনী গৌরীপদকে লইয়া কন্যার গৃহে মাস দুই বাস করিয়া আসিবেন। স্থান ও বায়ু-পরিবর্ত্তনে শারীরিক ও মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। বিচিত্র দৃশ্যের আকর্ষণে বৈরাগীর অন্তরও শান্ত হইবার সম্ভাবনা।

বিগত ৪০ বৎসরের মধ্যে গৌরীপদকে ছাড়িয়া অমরাপতি এক দিনও অন্যত্র বাস করেন নাই। দুই মাস তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে হইবে। অমরাপতি দৃঢ়বলে হৃদয়কে বাঁধিলেন। ভ্রাতা ও স্ত্রীকে অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন, প্রত্যহ তাহারা তাঁহাকে একখানি করিয়া পত্র লিখিবে। ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া তিনি পোষ্টকার্ড ও খাম কিনিয়া আনিয়া উপরের ঠিকানা পর্য্যন্ত লিখিয়া রাখিলেন—ডাকঘরে গিয়া খাম বা পোষ্টকার্ড কিনিবার প্রয়োজন যাহাতে না হয়, তাহার ব্যবস্থা করিয়া অত্যন্ত উৎসাহের সহিত অমরাপতি যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

শুধু যদি কেহ রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর অমরাপতির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবার সুযোগ পাইত, যদি অন্ধকারেও দেখিবার মত দৃষ্টি-শক্তি-সম্পন্ন হইত, তাহা হইলে সে দেখিতে পাইত, অশ্রু-সংবরণের জন্য অমরাপতির কি প্রচণ্ড প্রয়াস, আসন্ন বিচ্ছেদশঙ্কাবশতঃ বিপুল বক্ষের কি প্রচণ্ড স্পন্দন তিনি উভয় করপুটের সাহায্যে সংযত করিবার জন্য ব্যর্থ-প্রয়াস পাইতেছেন!

না, এ দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইলে, তাঁহার সহোদর কখনই দেবগৃহে যাইবে না। তাঁহাকে বীরের ন্যায় স্নেহ-দুর্ব্বল হৃদয়কে শান্ত করিতে হইবে, বাহিরে প্রসন্নতা ও উপেক্ষার অভিনয় করিতে হইবে। পনের বৎসর বয়সে শিশু ভ্রাতাকে কোলে তুলিয়া লইয়া জননীর ন্যায় স্নেহে পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, সদ্যোমাতৃ-হারাকে জননীর অভাব বুঝিবার অবকাশ কখনও দেন নাই, কয়েক বৎসর পরে পিতৃহীন হইয়া বালক সহোদরকে কোলের কাছে রাখিয়া কত রাত্রি বিনিদ্র অবস্থায় যাপন করিয়াছেন। সে সকল কথা বিদায়-দিনের পূর্ব্ব-রজনীতে অমরাপতির অন্তরের বেলাভূমিতে সহস্র তরঙ্গের আঘাতে আছাড় খাইতে লাগিল।

৩

দরজার কড়া ধরিয়া কেহ শব্দ করিতেছে না? দ্রুতপদে স্থূলদেহ লইয়া প্রৌঢ় অমরাপতি নীচে নামিয়া আসিলেন। না, ডাকপিয়ন নহে। নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অমরাপতি শ্লথচরণে বসিবার কক্ষে ফিরিয়া আসিলেন। আজ এক মাস ভ্রাতা ও পত্নী দেওঘরে গিয়াছে। প্রত্যহই তিনি নিয়মিত পত্র পাইয়া আসিতেছেন। গত কল্য কোন পত্র আসে নাই। তাহার পূর্ব্বদিন যে চিঠি আসিয়াছিল, তাহাতে গৌরীপদ লিখিয়াছিল, তাহার সামান্য সর্দ্দিজ্বর হইয়াছে—চিন্তার কোন কারণ নাই। কিন্তু অমরাপতি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। সতর্কতা অবলম্বন করিবার জন্য জামাতা, পত্নী, কন্যা ও ভ্রাতাকে স্বতন্ত্রভাবে পত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, দেওঘরে অর্থাভাবের

কোন সম্ভাবনা ছিল না, তথাপি তারযোগে ৫০ টাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

কিন্তু কাল আর কোন সংবাদ আসে নাই। আজ রবিবার, কোথাও বাহির হইবার প্রয়োজন ছিল না। প্রতিমুহূর্ত্তে অমরাপতি দেওঘরের পত্রের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। রবিবার বলিয়া হয় ত যথাসময়ে ডাক বিলির বিলম্ব হইতেছে। অমরাপতি মধ্যাহ্নে ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলেন না। বাড়ীতে প্রাচীনা পরিচারিকা শিবুর মা এবং পাচক 'নারাণ' ঠাকুর কর্ত্তার ক্ষুধামান্দ্য দেখিয়া বিস্মিত হইল।

বেলা গড়াইয়া অপরাহ্ণ এবং ক্রমে সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইয়া সহরের বুকে নামিয়া আসিল। গ্যাসের আলো, বিদ্যুতের শিখা পথে ও ঘরে জ্বলিয়া উঠিয়া অন্ধকারকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল; কিন্তু অমরাপতির অন্তরের অন্ধকার দূরীভূত করিবার জন্য কোনও সংবাদ আসিল না। দ্বিগুণ মাশুল দিয়া অপরাহ্ণে তিনি 'তার' করিয়া দিয়াছেন, উত্তর আসিবার মাশুলও দিয়াছেন; কিন্তু এখন রাত্রি ১০টা বাজিয়া গেল, কোন উত্তর আসিল না কেন?

ঘর ও বাহির করিতে করিতে অমরাপতির চরণ ক্লান্ত হইয়া আসিল. কিন্তু প্রৌঢ়ের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাঁহার চিত্ত অধীর হইয়া উঠিল। কিন্তু উপায় কি? পরের কাছে যাহাদের মস্তক বিক্রীত হইয়া আছে, তাহাদের অনুমতি না লইয়া ত তিনি এখনই দেওঘরে যাইতে পারেন না। তাহা ছাড়া, যাইবার গাড়ীও ত নাই!

শিবুর মা আসিয়া বলিল, "বাবা, অনেক রাত হয়েছে, এবার খেতে বসুন।"

অমরাপতি মনের বিক্ষোভের কথা কাহারও কাছে প্রকাশ করেন নাই। চাপা মানুষ বলিয়া বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে জানিত। এক পত্নী কমলিনী স্বামীকে চিনিয়াছিলেন; কিন্তু তিনিও ত এখানে নাই। দাসী ও পাচক কর্ত্তার মানসিক দুশ্চিন্তার কোন সন্ধান জানিত না। কিন্তু তাহারাও আজ বুঝিয়াছিল, অমরাপতি অত্যন্ত চঞ্চল হইয়াছেন। কিন্তু কেন?

স্বাভাবিকভাবে অমরাপতি আহার্য্য আনিতে আদেশ করিলেন; আসনে উপবেশনও করিলেন; কিন্তু বিস্মিত ঠাকুর ও দাসী দেখিল যে, তাহাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন মনিব একখানিরও অধিক রুটী খাইতে পারিলেন না।

রন্ধন কি ভাল হয় নাই? না, সে জন্য নহে; ক্ষুধার তাড়না নাই।

দাসী ও ঠাকুর ঠিক বুঝিল কি না, তাহা প্রকাশ পাইল না। অমরাপতি শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

দীপ নির্ব্বাপিত হইল। অন্ধকার কক্ষ, দ্বিতীয় মনুষ্যের নিশ্বাসের শব্দে গভীর নীরবতাকেও চঞ্চল করিবার সুযোগ নাই। অদূরে রাজপথের আলোগুলি নিস্তব্ধ প্রহরীর মত দাঁড়াইয়া কি যেন ইঙ্গিত করিতেছে। আকাশে কোটি কোটি নক্ষত্রের দীপ্তির মধ্য হইতে অশরীরী বাণী কি ধরাবক্ষে আশা ও নিরাশার স্রোতোধারার মত নামিয়া আসিতেছে?

বাতায়নসন্নিধানে বসিয়া বসিয়া অমরাপতি অস্থির হৃদয়কে সংযত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই নীরবতার অর্থ কি? সর্দ্দিজ্বর কি শেষে কঠিন ব্যাধিতে পরিণত হইল?

"গোরা!—গোরা ভাই!"—

অমরাপতির নয়নে অশ্রুবন্যা প্রবাহিত হইল। শয্যায় দেহরক্ষার মত প্রবৃত্তি একবারও হইল না। তিনি কক্ষমধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্ত বিরাম নাই—অক্লান্ত চরণযুগলের শব্দ সমস্ত রাত্রি ধরিয়া কক্ষমধ্যে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।

উষার আলোক প্রাচী-ললাটে উজ্জ্বল হইয়া উঠিবামাত্র বস্ত্র ত্যাগ করিয়া বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদে অমরাপতি কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

স্কুলের সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিয়া অমরাপতি এক সপ্তাহের ছুটী লইলেন। ছাত্রদিগের বাড়ীতে গিয়া জানাইয়া আসিলেন যে, সাত দিন তিনি কলিকাতায় থাকিবেন না।

সে দিনও দেওঘরের কোন পত্র আসিল না। তারের সংবাদও নাই।

স্বপ্নাবিষ্টের মত সারাদিন যাপন করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে অমরাপতি হাওড়া ষ্টেশনে গমন করিলেন।

৪

ট্রেণের প্রতীক্ষায় না থাকিয়া ভোর হইবামাত্র গাড়ী ভাড়া করিয়া যশিদী হইতে অমরাপতি দেওঘর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। অনিশ্চিত আশঙ্কায় মুহুর্মুহুঃ বক্ষঃ স্পন্দিত হইতেছিল।

পুরনদহে পৌঁছিয়া বাসা খুঁজিয়া লইতে বিশেষ কষ্ট হইল না।

প্রভাতের সূর্য্য তখন বৃক্ষপত্রে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল। গেটের নিকট গাড়ী থামাইয়া কঙ্করমণ্ডিত পথের উপর দিয়া সম্মুখের বারান্দায় উঠিতেই অমরাপতি চমকিয়া উঠিলেন।

"কে—বাবা ?"

সম্মুখে বিস্ময়পুলকিতা কন্যাকে দেখিয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

না, ইহার মুখে শঙ্কা বা উদ্বেগের কোন চিহ্ন ত নাই; শুধু বিস্ময় ও আনন্দের হাসি!

জামাতা বিমানবিহারী "আপনি ?" বলিয়া তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিল। ছোট ছোট নাতি ও নাতিনীরা "দাদা, দাদু" বলিতে বলিতে ছুটিয়া আসিল।

অমরাপতির ব্যাকুল দৃষ্টি কিন্তু চারিদিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

কলরবে আকৃষ্ট হইয়া পাশের ঘর হইতে কমলিনী তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিলেন। স্বামীর আকস্মিক আগমনের হেতু কি তাঁহার নিকট অপ্রকাশ্য রহিয়া গেল ?

স্থির-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে তিনি চাহিলেন। সেই স্বভাবগম্ভীর মানুষটির আননে গত কয়দিনের দুশ্চিন্তার চিহ্ন গোপন করিবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁহার অভিজ্ঞ দৃষ্টির নিকট গোপন রহিল না।

অমরাপতি জামাতাকে বলিলেন, "আমার 'তার' পেয়েছিলে ?"

"আজ্ঞে হাঁ, কাল রাত্রিতে এখানে ফিরে আস্‌বার পর চিঠি ও 'তার' সবই পেয়েছি। আমরা গত ৫ দিন এখানে ছিলাম না।"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে অমরাপতি সকলের দিকে এক একবার দৃষ্টি-নিক্ষেপ করিলেন।

মৃদু হাসিয়া কমলিনী বলিলেন, "আমরা গিরিডিতে উশ্রী প্রপাত দেখতে গিয়েছিলুম। সেখানে বিমানের বন্ধুর বাড়ী আছে।"

"গোরা—গোরা ভাই ?"

বিমানবিহারী মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কাকাবাবুও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁর জন্যই তাড়াতাড়ি যাওয়া।"

আঃ! তবে গৌরীপদ ভালই আছে। ভগবান্, তোমার চরণে সহস্র প্রণাম। দয়াময়, তোমার অসীম দয়া!

"সে কোথায় ?"

উষারাণী অস্ফুটস্বরে বলিল, "কাকাবাবু এখনও ঘুম থেকে ওঠেন নি। কাল খুব পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন।"

কমলিনী স্বামীকে ডাকিয়া লইয়া অপর পার্শ্বের কক্ষের দিকে অগ্রসর হইলেন।

নেওয়ারের খাটিয়ার উপর গৌরীপদ তখনও সুখসুপ্ত।

অমরাপতি সন্নিহিত একখানি বাঁশের চেয়ারের উপর বসিয়া সন্তর্পণে কনিষ্ঠের ললাটস্থিত কেশরাজি সরাইয়া দিলেন।

সস্নেহ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া কমলিনী মৃদুস্বরে বলিলেন, "ঠাকুরপোকে ঘুমুতে দাও। তুমি কাপড়-চোপড় ছাড়বে এসো। আজ দু'তিন রাত তুমি ঘুমোওনি—পেট ভরেও খাওনি।"

পত্নীর মুখের দিকে চাহিয়া অমরাপতি বলিলেন, "তুমি কি অন্তর্য্যামী ?"

তাঁহার ওষ্ঠপ্রান্তে তৃপ্তির হাস্যরেখা কয় দিন পরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

কমলিনী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "অন্তের সম্বন্ধে নয় বটে। তবে তোমার বিষয়ে একটুও মিথ্যে নয়।"

গভীর শ্রদ্ধার আনন্দে প্রৌঢ়ের নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল

৫

পাঁচ বৎসর পরে। বিধবা ভগিনী দুইটি অমরাপতির গৃহে সন্তানগণসহ আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল। শ্বশুরালয়ের ভিটায় তাহাদের স্থানাভাব ঘটিয়াছিল।

অমরাপতির ষষ্টিবর্ষের পুরাতন দেহ সে ভার অবশ্যই বহন করিবে। যাহারা নিরুপায়, তাহাদিগকে নির্ম্মম সংসারের কঠোর নিষ্পেষণ হইতে রক্ষা করা কি তাঁহার ধর্ম্ম নহে? আবিল আবর্ত্তে পড়িয়া ইহারা কোথায় তলাইয়া যাইবে যে?

সঙ্গে সঙ্গে গৌরীপদকেও দাদার সাহায্যে অগ্রসর হইতে হইল।

কিন্তু সংসারের সকল দিকের বন্ধন যাহার শিথিল, তাহার পক্ষে প্রৌঢ়বয়সে এ সকল হাঙ্গামা সহ্য করা প্রীতিপ্রদ হইতে পারে কি? অল্পদিনেই গৌরীপদ হাঁপাইয়া উঠিল।

বৈরাগ্যের আহ্বান যাহাকে বিশ বৎসর পূর্ব্বে প্রলুব্ধ করিয়াছিল, তাহাকে নবোদ্যমে পুনঃ পুনঃ কর্ত্তব্যের শাসন উপেক্ষা করিয়া হাতছানি দিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

শুভ্রকেশ, সদা-প্রসন্ন অমরাপতি বৃদ্ধবয়সেও পূর্ণোৎসাহে যখন কর্ম্মরথে আরোহণ করিয়া শুধু উদয়াস্ত নহে, রজনীর প্রায় প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত বিপুল বেগে ধাবিত, সেই সময় এক দিন গৌরীপদ আসিয়া দাদাকে দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি চললুম, দাদা। বাঙ্গালাদেশে আর নয়। তোমরা এবার বাধা দিয়ে আমাকে রাখবার চেষ্টা করো না।"

অমরাপতির মুখ হইতে এবার কিন্তু কোন প্রতিবাদবাক্য উত্থিত হইল না। কিছু কাল হইতে তিনি লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার স্কন্ধে কর্ত্তব্যের বোঝা, দায়িত্ব প্রচণ্ডভাবে অর্পিত হওয়ার পর তাঁহার কনিষ্ঠের আননে প্রসন্নতা অন্তর্হিত হইয়াছিল।

সংসারে যাহার স্ত্রী, পুত্র, কন্যা নাই—বন্ধন ও আকর্ষণ যাহার নাই বলিলেই চলে, তাহার পক্ষে বস্তু-তান্ত্রিক সংসারের বোঝা বহিবার প্রবৃত্তি হ্রাস পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। একই মনোবৃত্তির দ্বারা চালিত হইয়া সেরূপ ক্ষেত্রে কেহ প্রসন্ন-মনে কর্ত্তব্যকে বরণ করিতে না পারিলে, তাহাকে দোষ দেওয়া কি সঙ্গত? যাহা তিনি কর্ত্তব্যবোধে পালন করিবার জন্য উৎসুক, তাঁহার সহোদরের যদি তাহাতে উৎসাহ, ঔৎসুক্য ও আগ্রহ না জন্মে, সে যদি তাহাকে দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করে, তবে তাহাকে অব্যাহতি দেওয়াই ত জ্যেষ্ঠের ধর্ম্ম।

অমরাপতি হাঁ অথবা না, কিছুই উচ্চারণ করিতে পারিলেন না। নীরবে, নতশীর্ষে তিনি বসিয়া রহিলেন।

গৌরীপদ বলিল যে, সুদূর-পশ্চিমাঞ্চলে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে সে সামান্য বেতনের শিক্ষকতা যোগাড় করিয়াছে। তাহাতে তাহার ভরণ-পোষণ কায়ক্লেশে চলিতে পারিবে। তাহার অধিকও তাহার প্রয়োজন নাই। অধিকন্তু তাহার জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ম্মস্থল গুরুর আশ্রম অতি নিকটে। সুতরাং সে আগামী কল্য চলিয়া যাইতেছে।

ষাট বৎসরের জীর্ণ, পুরাতন দেহ কিন্তু এবার একবারও টলিল না। অমরাপতি নীরবে ভ্রাতার মস্তকে হাত রাখিয়া নিঃশব্দে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

পরদিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে গৌরীপদ কর্ত্তব্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া ধর্ম্মের সন্ধানে যাত্রা করিল।

* * * *

গভীর রজনীর প্রগাঢ় নীরবতা ভেদ করিয়া শয়নকক্ষের এক প্রান্ত হইতে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস উত্থিত হইল। বৃদ্ধ অমরাপতি চমকিতভাবে সেই দিকে চাহিলেন। দেখিলেন, বাতায়ন-সমীপে প্রৌঢ়া কমলিনী বসিয়া আছেন।

উদাসভাবে অমরাপতি বাতায়নের পথে দৃষ্টি প্রসারিত করিলেন।

ধীরে ধীরে কমলিনী স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ধীরে ধীরে দয়িতের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া ক্লিষ্টকণ্ঠে বলিলেন, "বুড়োবয়সে শ্রান্ত হয়ে যখন তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন, তখনই দায়িত্ব চাপিয়ে চ'লে গেছে ব'লে দুঃখ করো না। গুরুদেবের কথাটা ভুলে যেয়ো না। ঠাকুরপো ভুলেছে, আমি ত বলি, শুধু তার দুর্ভাগ্য নয়, ঘোর দুর্ব্বলতা।"

অশ্রুর প্রবাহধারায় সতীর নয়ন, আনন প্লাবিত হইল।

অমরাপতির নয়ন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এমনি আশ্বাসবাণী আমাকে শুনিও। দোষ আমি কাকেও দেব না; কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমি একাই পালন করবো। কাপুরুষ যেন না হই।"

পঞ্চপুষ্প, কার্ত্তিক, ১৩৩৭

নেভা

১

পত্নীর ব্যগ্র প্রশ্নপূর্ণ নেত্রের দিকে চাহিয়া নৈরাশ্য-ম্লানকণ্ঠে হীরালাল বলিলেন, "আর পারা যায় না!"

স্বামীর স্বভাব-প্রসন্ন আননে বিরক্তি, অবসাদ ও নিরানন্দের নিবিড় ছায়া দেখিয়া চপলার চিত্ত ব্যথায় ভরিয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "কিছু সুবিধা হলো না?"

চাদর ও জামা আল্‌নায় রাখিয়া দিয়া হীরালাল বলিলেন, "না, চাকরীর চেষ্টাও আজ থেকে ছেড়ে দিয়েছি। ও পথে আর যাব না। চার বছর চেষ্টা ক'রেও একটা স্থায়ী কাজ যখন পেলাম না, তখন দাসত্বের রাজটীকার উপর আমার আর লোভ নেই; কোন দিন ছিলও না। খালি—ওঁরা গুরুজন, কথা না শুন্‌লে দুঃখ পাবেন, তাই চেষ্টা করেছিলাম। আজ থেকে খতম্‌।"

চপলা পাখা লইয়া স্বামীকে বাতাস করিতে লাগিল। তাহার মুখে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল! স্বামীর ব্যর্থতা তাহার মনকে পীড়িত করিতেছিল কি?

হীরালাল পত্নীর দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া বলিল, "মনে দুঃখ করো না, চপলা! চাকরী না ক'রেও লোক স্ত্রী-পুত্রের ভরণ-পোষণ ক'রে থাকে। আমি এত দিন মরীচিকার পশ্চাতে ছুটেছিলাম, তাই তোমাদের ভার সম্পূর্ণ নিতে পারিনি। কিন্তু এমন ভাবে বেশী দিন নিজেকে ও তোমাদের অন্যের গলগ্রহ ক'রে থাক্‌তে দেব না। কর্ত্তব্য স্থির হয়ে গেছে।"

চকিতে চপলা স্বামীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "আমি সে কথা ত একবারও মনে করি নি। তোমার উপার্জ্জন নেই ব'লে আমার ক্ষোভ যে বেশী, তা নয়। তবে বাপের বাড়ী থাকাটা গৌরবের নয় বলেই যা দুঃখ।"

খোলা জানালা দিয়া অস্তগামী সূর্য্যের রক্ত আভাটুকু চপলার মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল। হীরালাল দেখিলেন, দুই বিন্দু মুক্তা পত্নীর নয়নপল্লবে টল্‌-টল্‌ করিতেছে। তাহার বাম করখানি দক্ষিণ হস্তে তুলিয়া লইয়া হীরালাল বলিলেন, "একটা সু-খবর আছে। তোমার বাবা আমার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন। তিনি একটা ছাপাখানার জন্য দেড় হাজার টাকা আমায় দেবেন বলেছেন। অবশ্য সেটা ঠিক দান নয়। তাঁর কতকগুলি বই আছে, সেগুলি আমি ছাপিয়ে দেব, তার জন্য কাগজ ও দপ্তরীর খরচমাত্র তিনি দেবেন। তাতে তাঁরও লাভ, সঙ্গে সঙ্গে আমারও একটা উপায় হবে। আমি এই সর্ত্তে রাজি হয়েছি। এখানেই বাজারের নিকট একটা ঘর ভাড়া নিয়ে প্রেস রাখা যাবে। তা ছাড়া একখানি সাপ্তাহিক খবরের কাগজও বার করবো, ঠিক হয়েছে।"

চপলা চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর ক্লান্তমুখে ক্রমেই একটা উৎসাহের দীপ্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। প্রস্তাবটি তাহারও মনোমত হইয়াছিল। সে জানিত, তাহার স্বামী চিরদিনই স্বাধীন প্রকৃতির। সাহিত্য-সেবায় তাঁহার কি প্রগাঢ় অনুরাগ, তাহাও তাহার অবিদিত ছিল না। কলিকাতার কোনও ইংরাজী সংবাদপত্রের তিনি যে মফঃস্বলস্থ সংবাদদাতা ছিলেন এবং প্রায়ই তাঁহার রচিত প্রবন্ধ ইংরাজী কাগজে মুদ্রিত হইত, সে ইতিহাসও সে ভালরূপই জানিত। এত দিন পরে পিতা যে তাহার স্বামীর জন্য এরূপ ব্যবস্থায় অনুমোদন করিয়াছেন, ইহাতে তাহার হৃদয়েও আনন্দের উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "এখন তবে তুমি সম্পাদক হ'তে চল্‌লে দেখছি!"

"সেটা কি ভাল হবে না, চপল? চাক্‌রীর সুখ কি, তা এই কয় বছরে বেশ বুঝেছি। তোমার বাবা অবসরপ্রাপ্ত সদরআলা হয়েও যখন এত দিনেও আমার জন্য একটা পাকা চাকরীর যোগাড় ক'রে দিতে পারলেন না, তখন সে দিকে আর কোন আশা নেই। তার পর মাঝে মাঝে অস্থায়িভাবে কাজ করেও ত দেখেছি, দুহাতে সেলাম আর বড় বাবুদের চরণে তৈল দান করতে না পারলে, 'জল উঁচু' ব'লে মন যোগাতে না পার্‌লে, গোলামীটুকু খ'সে যায়।"

প্রসন্নহাস্যে চপলা বলিল, "চাকরীর টাকায় আমার দরকার নেই, বাবু। তুমি যাতে সুখী হও, তাই কর। তোমার সম্মানের বিনিময়ে আমি কুবেরের ভাণ্ডারও চাই না।"

হীরালাল অন্যমনস্কভাবে বলিলেন, "কিন্তু এখনও কয়েক

মাস বাপের বাড়ীর আশ্রয়ে তোমায় থাকতে হবে। পারবে ত?"

উত্তরে চপলা মৃদুহাস্য করিল।

২

ছাপাখানার কার্য্য চলিতে লাগিল। "সময়"ও প্রতি সপ্তাহে নিয়মিতভাবে বাহির হইয়া পল্লী-সহরের অধিবাসিবর্গের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিতেছিল। হীরালাল দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে নামিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার কয়েকটি বেড়া ডিঙ্গাইয়া তিনি বীণাপাণির সেবায় জীবনযাপন করিবেন বলিয়া প্রথমতঃ সংকল্প করিয়াছিলেন; কিন্তু অসময়ে পিতৃমাতৃবিয়োগ ও সেই সঙ্গে পৈতৃক ধনসম্পত্তির অভাববশতঃ অনন্যোপায় হইয়া তাঁহাকে অর্থশালী শ্বশুরের সহায়তা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। কন্যা-জামাতা অবশ্য শ্বশুর ও শাশুড়ীর নিকট পর্য্যাপ্ত সমাদর পাইত, সে বিষয়ে কাহারও আক্ষেপ করিবার কোন কারণ ছিল না। কিন্তু বি, এ, ডিগ্রী না থাকায় চাকরীর বাজারে হীরালাল শ্বশুরের চেষ্টাসত্ত্বেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। তাহার প্রধান কারণ, তিনি তৈলমর্দ্দনরূপ শ্রেষ্ঠ-প্রসূ প্রক্রিয়াটির সহিত সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে গিয়া উপরওয়ালার অসন্তোষভাজন হওয়ায় কোনও স্থলেই তাঁহার পাকা চাকরী জুটে নাই।

মনের মত কাজ পাইয়া হীরালাল কায়মনোবাক্যে দেশের ও দশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনার শক্তি ছিল, হৃদয়ে দৃঢ়তা ও মনে সাহস ছিল। মফঃস্বলে, সহরে পল্লীর সুখ-দুঃখ, অভাব-অভিযোগের কথা নিপুণভাবে তিনি কর্ত্তৃপক্ষ ও দেশের গোচর করিতে লাগিলেন। শীঘ্রই "সময়" সকলের প্রিয় হইয়া উঠিল। জেলার বাঙ্গালী জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট এই নবপ্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালা সাপ্তাহিকখানিকে প্রীতির দৃষ্টিতে দর্শন করিতে লাগিলেন। জজ-আদালতের নীলামের ইস্তাহার "সময়ে" প্রকাশিত হইয়া হীরালালের ধনাগমের পন্থাও সহজ করিয়া দিল।

হীরালাল ছাপাখানার সন্নিকটে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তথায় স্বাধীনভাবে থাকিবার কল্পনা করিতে লাগিলেন।

তখন বাঙ্গালী-কবি জজ—জেলার বিচারাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। হীরালালকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতেন। এই নবীন সম্পাদকের সত্য-নিষ্ঠা, তেজস্বিতা ও সাহিত্যরসজ্ঞতা তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। অবসরপ্রাপ্ত সদরআলা, হীরালালের শ্বশুর কৃষ্ণকান্তের সহিতও তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল। সুতরাং উভয় পরিবারের মধ্যে আত্মীয়তাও বর্দ্ধিত হইতেছিল। হীরালাল মধ্যে মধ্যে জেলার জজ বাহাদুরের বাংলোয় গিয়া সাহিত্য-আলোচনায় যোগ দিতেন। বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেটও হীরালালকে নানা বিষয়ে সহায়তা করিতেন। দিন বেশ স্বচ্ছন্দে চলিয়া যাইতেছিল।

৩

আরাম-কেদারায় হেলান দিয়া জেলার প্রধান উকীল, তদানীন্তন কংগ্রেসের অন্যতম পাণ্ডা শ্যামাচরণ আরাম করিয়া ধূমপান করিতেছিলেন।

হীরালাল সেখানে প্রবেশ করিবামাত্র শ্যামাচরণ সহাস্যে তাঁহাকে পার্শ্বস্থ সুখসেব্য আসনে বসিতে অনুরোধ করিলেন। হীরালাল শ্যামাচরণকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। একে তিনি পূজনীয় শ্বশুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু, দ্বিতীয়তঃ তিনি দেশের অন্যতম নেতা, সুপণ্ডিত, বাগ্মী ও ধনশালী ব্যবহারাজীব।

শ্যামাচরণ বাবুর শ্মশ্রুল মুখমণ্ডলের অন্তরাল হইতে হাস্য করিবার সময় দুই একটি দন্তবিকাশ অতিকষ্টেই দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। হীরালাল উহা লক্ষ্য করিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "আপনি আমায় ডেকেছেন?"

শ্যামাচরণ একরাশি কুণ্ডলীকৃত ধূমবাষ্প শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করিয়া বলিলেন, "হাঁ, তোমার সঙ্গে একটা বিশেষ পরামর্শ আছে; বল্‌ছি।"

হীরালালের কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। এই প্রবীণ নেতা চিরদিন তাঁহাকে উপদেশাদিই দান করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কোনও সময়েই পরামর্শের জন্য তাঁহাকে আহ্বান করেন নাই। ব্যাপারটা কি জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহলের মাত্রা আরও বর্দ্ধিত হইল।

কিয়ৎকাল অভিনিবেশ সহকারে ধূমপান করিবার পর শ্যামাচরণ বাবু হীরালালের দিকে ফিরিয়া মৃদুস্বরে

বলিলেন, "আমাদের জজ-আদালতের সকল সংবাদ তুমি রাখ ?"

হীরালাল বিনীতভাবে বলিলেন, "কিছু কিছু রাখি বৈ কি।"

গম্ভীরভাবে মাথা নাড়িয়া শ্যামাচরণ বাবু বলিলেন, "না, সব সংবাদ বোধ হয় তোমার জানা নাই। ওখানে অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতার মাত্রা বড় বেড়ে উঠেছে। জজের সেরেস্তাদারের আত্মীয়বন্ধুতে সেরেস্তা ভরা; সেখানে অন্য কোন যোগ্য বাহিরের লোকেরও প্রবেশাধিকার নাই— এ সংবাদ রাখ কি ?"

কুণ্ঠিতভাবে হীরালাল বলিলেন, "সেরেস্তাদার বাবুর আত্মীয়-স্বজন সকলেই ওখানে নিযুক্ত আছেন, সেটা জানি বটে। তবে সর্ব্বত্রই প্রায় ব্যবস্থা ঐ প্রকার, এ জন্য অন্যায় হলেও ও ব্যাপারটার প্রতি তেমন—"

বাধা দিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "না, না, ওটা ঠিক নয়। যা অন্যায়, তার প্রতিবাদ—তীব্র প্রতিবাদ চাই। কেন এমন হবে ? এক জন সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে প্রভুত্ব করবে, বিংশ-শতাব্দীর সভ্যসমাজে তা চলবে না। এ সম্বন্ধে তোমার কাগজে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত কর। কপটতা, অত্যাচার, অনাচার, একদেশদর্শিতার প্রশ্রয় দেওয়াও মহাপাপ।" বলিতে বলিতে সহসা কণ্ঠস্বরকে আরও মৃদু করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ, এ সম্বন্ধে আমি বাঙ্গালায় এই প্রবন্ধটা লিখেছি। 'সময়ে' ওটা বের ক'রে দিও। সম্পাদকীয় স্তম্ভেই ছাপিও। আমার নামটা নিশ্চয় তুমি ছাপ্‌বে না। কারণ, সেটা সম্পাদকীয় দায়িত্বেরই অন্তর্গত। বুঝেছ আমার কথা ?"

হীরালাল হাত পাতিয়া প্রবন্ধটি লইলেন। মাতৃভূমির সুসন্তান, ভারত মহাসমিতির অন্যতম নেতা শ্যামাচরণের স্বহস্ত-লিখিত বাঙ্গালা প্রবন্ধ "সময়ের" পৃষ্ঠ অলঙ্কৃত করিবে, ইহা নবীন সম্পাদকের পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের বিষয়, সন্দেহ নাই। তিনি দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "আপনি দশের মঙ্গলের জন্য যে কাজে হাত দিচ্ছেন, তাহা অত্যন্ত পবিত্র। আমার সহস্র ক্ষতি হইলেও আমি সে কার্য্যে পশ্চাৎপদ হ'তে পারি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, প্রবন্ধের রচয়িতার নাম তৃতীয় ব্যক্তি জান্‌তে পারবে না।"

প্রস্থানোদ্যত নবীন সম্পাদকের করগ্রহণ করিয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "তুমি দুশ্চিন্তা ক'রো না, আমি সকল সময়েই তোমার সাহায্য কর্‌বো। ভাল কথা, তোমার শ্বশুরকেও যেন বলো না যে, প্রবন্ধটা আমারই লেখা, বুঝেছ ?"

হীরালাল মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।"

নবীন সম্পাদকের মূর্ত্তি উদ্যান-তোরণের অন্তরালে চলিয়া গেলে, শ্যামাচরণ ডাকিলেন, "হরিহর !"

যাহাকে আহ্বান করিয়াছিলেন, সে শ্যামাচরণের শ্যালক-পুত্র। সে সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে প্রবীণ ব্যবহারাজীব তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বরদা সেরেস্তাদারের দম্ভটা এবার কেমন ক'রে চূর্ণ হয়, তা দেখিয়ে দেব। এবার তোমার চাকরী নিশ্চয় পাকা হয়ে যাবে। কিন্তু কোন লোকের সঙ্গে এ সব বিষয়ে আলোচনা করো না। বুঝেছ ?"

যুবক "যে আজ্ঞা" বলিয়া দ্রুত প্রস্থান করিল।

সেই সপ্তাহের "সময়" পড়িয়া শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত জামাতা হীরালালকে ডাকিয়া শঙ্কাকম্পিতকণ্ঠে বলিলেন, "এ কি প্রবন্ধ লিখেছ ? এতে জজ সাহেব যে তোমার উপর ভয়ানক চ'টে যাবেন !"

বিনীতভাবে হীরালাল বলিলেন, "কিন্তু ব্যাপারটা সত্য। এমন ভাবে সরকারী আদালতে আত্মীয়-পোষণ-নীতির সমর্থন করা যায় কি ?"

বিরক্তিভরে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "তা ত যায় না; কিন্তু সর্ব্বত্রই ত ঐ নীতিই চলেছে। তুমি মফঃস্বল-সহরের এক প্রান্তে ব'সে এত বড় বিরাট ব্যাপারটার কি প্রতীকার কর্‌তে পার ?"

"আজ্ঞে, আমাদের এই জেলা-আদালতের এই নিন্দনীয় ব্যবস্থাটা যদি বদলে যায়, তাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

কৃষ্ণকান্ত অসন্তোষভরে বলিলেন, "কিছুই হবে না। মাঝখান থেকে নিজের দুর্বুদ্ধিতে তুমি জজসাহেবের ভালবাসা হারাতে বসেছ, আর সঙ্গে সঙ্গে নীলাম ইস্তাহারও তোমার কাগজে আর ছাপা হবে না। কে তোমাকে এমন বুদ্ধি দিলে ? কাজটা তুমি ভাল করনি।"

হীরালাল নিষ্ফল তর্ক ছাড়িয়া দিয়া ছাপাখানার দিকে চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখিলেন, তাঁহার অনুরক্ত কয়েক জন বন্ধু তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহারা উত্তেজিত-ভাবে বলিলেন যে, হীরালাল বাবুর "আত্মীয়-পোষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি অতি চমৎকার হইয়াছে। এমন ওজস্বিনী ভাষায়

ইতিপূর্ব্বে আর কোনও প্রবন্ধ বাহির হয় নাই। তবে এ ব্যাপারে আগুন জ্বলিয়া উঠিবে। জজ সাহেব নিশ্চয়ই ক্ষেপিয়া উঠিবেন। সেরেস্তাদারও তাঁহাকে ভাল করিয়াই বুঝাইয়া দিবে। হীরালালের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা যে নাই, তাহা নহে। তবে দেশের ও দশের কাজ করিতে গেলে বিপদকে বরণ করিয়া লইতে হয়।

হীরালাল মৃদু হাসিয়া বন্ধুবর্গের মন্তব্য শ্রবণ করিলেন। কিন্তু কোন প্রকার আলোচনায় যোগ দিলেন না। কর্ত্তব্য বুঝিয়া যাহাকে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন, তাহাকে পথের মাঝখানে নামাইয়া দিয়া আরাম-লাভের প্রবৃত্তি কোনও দিন তাঁহাকে অভিভূত করিতে পারে নাই।

হীরালাল বুঝিলেন, একটা প্রবল ঝটিকা আসিতেছে। তিনি জানিতেন, উহা অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য তিনি প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

সেই দিন অপরাহ্নে শ্যামাচরণ বাবু স্বয়ং পদধূলিদানে হীরালালের ছাপাখানাকে পবিত্র করিয়া গেলেন। যাইবার সময় তিনি বুঝিয়া গেলেন, তাঁহার নাম প্রকাশ পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। সম্পাদক প্রবন্ধটির পাণ্ডুলিপি পুড়াইয়া ফেলিয়াছেন।

হাস্যপ্রফুল্লমুখে উৎসাহ দিয়া তিনি হীরালালকে বলিলেন, ভগবান্ যে ধাতুতে তাঁহাকে গঠিত করিয়াছেন, তাহাতে দেশের কাজে হীরালাল অশেষ যশঃ উপার্জ্জন করিতে পারিবেন। পৃষ্ঠদেশ চাপড়াইয়া, ভরসা দিয়া,—নেতা শ্যামাচরণ সান্ধ্যভ্রমণশেষে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।

৪

আসন্নঝটিকা প্রবাহিত হইল। "আত্মীয়-পোষণ" শীর্ষক প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ায় সমগ্র সহরে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হইল। চারিদিক্ হইতে বরদা সেরেস্তাদারের সম্বন্ধে নানাপ্রকার অপ্রিয় সমালোচনার তরঙ্গ উঠিতে লাগিল। জজ সাহেবও যে উক্ত ব্যক্তির কৌশলে মুগ্ধ হইয়া অন্যের সম্বন্ধে অবিচার করিয়া থাকেন, অনেকে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ইতস্ততঃ করিল না।

সেরেস্তাদারের সমস্ত আক্রোশ হীরালালের স্কন্ধে গিয়া পড়িল। জজ সাহেবের মন যাহাতে এই নবীন সম্পাদকের উপর বিরূপ হইয়া পড়ে, সে বিষয়ে চেষ্টার কোনও ত্রুটি হইল না।

হীরালালের কল্যাণকামী বন্ধুগণ তাঁহাকে চক্রান্তের সংবাদ জানাইয়া যাইতেন। যাহাতে জজ আদালতের কোন প্রকার ছাপার কার্য্য 'সময়'প্রেসে মুদ্রিত না হয়, নীলাম ইস্তাহার উহাতে প্রকাশার্থ না দেওয়া হয়, তাহার জন্য প্রবল পক্ষ বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিল। আর একখানি সাপ্তাহিক পত্র ও মুদ্রাযন্ত্র সে নগরে বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। "সময়ে"র আবির্ভাবে তথাকথিত সংবাদপত্রখানি ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিয়াছিল। হীরালাল দেখিলেন, তাহার আকার বর্দ্ধিত হইয়াছে। নীলাম ইস্তাহার তাহারই অঙ্গে পুনরায় বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে। তিনি জজ সাহেবের নিকট আবেদন করিলেন, কোন ফল হইল না।

স্বয়ং তিনি জজ সাহেবের কুঠীতে উপস্থিত হইলেন। পূর্ব্বে যিনি যত্ন করিয়া হীরালালের সহিত নানাপ্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন, তাঁহার প্রকৃতিতে ও ব্যবহারে বহু পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল। হীরালাল জজ বাহাদুরকে জানাইলেন, "তাঁহার প্রতি অকস্মাৎ অবিচার করা হইতেছে কেন? তিনি প্রতীকার প্রার্থনা করেন।"

জজ সাহেব গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার কাগজে আজকাল খালি লোকের কুৎসা-মন্দ বাহির হইতেছে। দেশের প্রধান লোকরা তোমার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে দিন ম্যাজিষ্ট্রেটও বলিতেছিলেন, তুমি ইদানীং তাঁহারও কার্য্যের অপ্রিয় সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছ। শ্যামাচরণ বাবুও বলিতেছিলেন, তুমি বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছ। কাজেই আমি তোমার সম্বন্ধে এখন কোন বিবেচনা করিতে পারি না।"

ইতিমধ্যে হীরালাল প্রকৃতই পুলিসের কয়েকটি কু-কার্য্য সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন। জজের সেরেস্তাদারের কার্য্য-শৈথিল্য-সম্বন্ধেও অনেকগুলি প্রবন্ধ ধারাবাহিকরূপে "সময়ে" বাহির হইয়াছিল।

অভিমানী হীরালাল দ্বিতীয়বার আর কোন অনুরোধ করিলেন না। কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুও তাঁহার বিরুদ্ধে জজ সাহেবের নিকট বলিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া হীরালালের মন বিস্ময়বিমূঢ় হইল। কথাটা তাঁহার বিশ্বাস হইল না। তিনি

বলিলেন, "শ্যামাচরণ বাবু আমার বিরুদ্ধে কি বলিয়াছেন, জানিতে পারি কি?"

"তিনি বলিয়াছেন, কাগজের সম্পাদক হইয়া তোমার বুদ্ধি লোপ পাইয়াছে। দম্ভ বেশী হইয়াছে। তিনি তোমার ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন।"

হীরালালের ওষ্ঠাগ্রে কথাটা আসিয়া পড়িয়াছিল; কিন্তু তিনি অতি কষ্টে আপনাকে সংবরণ করিলেন। সমস্ত হৃদয় বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। ক্রোধ ও ক্ষোভে অধীর হইয়া হীরালাল জজ সাহেবের কুঠী পরিত্যাগ করিলেন।

হীরালালের জনৈক বন্ধু যথাসময়ে সংবাদ আনিয়া দিলেন যে, শ্যামাচরণ বাবুর শ্যালকপুত্র হরিহর জজ-আদালতে পঁচিশ টাকা মাহিনার একটি চাকরী পাইয়াছে।

৫

মানুষ যখন সাধু উদ্দেশ্যের বিনিময়ে চারিদিক হইতে কেবলই আঘাত পাইতে থাকে, তখন অনেক সময়ই সে মোরিয়া হইয়া উঠে। হীরালালের অবস্থা অনেকটা সেইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। দশের ও দেশের মঙ্গল হইবে বলিয়া তিনি যে সকল বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, ক্রমে দেখিতে পাইলেন, তাহার ফলে তাঁহার ব্যক্তিগত অপকার ত হইতেছেই, অধিকন্তু যাহাদের জন্য তিনি চুরি করিতেছিলেন, তাহারাই তাঁহাকে চোর বলিতেছিল! মানুষের এই কৃতঘ্নতা-দর্শনে তাঁহার চিত্ত আহত ও ব্যথিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তিনি তথাপি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইলেন না। বরং চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে চাপিয়া মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা হইতেছে দেখিয়া তিনি দৃঢ়ভাবে, অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার যেখানে হইতেছিল, তাহার প্রতীকারের জন্য তীব্র আন্দোলন করিতে লাগিলেন। ইঙ্গিতে তিনি মানুষের নীচতা, হীনতা ও শঠতার উল্লেখ করিতে বিরত হইলেন না।

জেলা আদালত-সমূহের বহুবিধ ছাপার কার্য্য তিনি পূর্ব্বে পাইতেন; কিন্তু রাজ-কর্ম্মচারীদিগের অন্যায় ত্রুটি প্রদর্শন করার পর হইতে সে সকল কার্য্য আর তাঁহার ছাপাখানায় যাইত না। সংবাদপত্রের গ্রাহক-সংখ্যাও ক্রমে ক্রমে কমিতেছিল। উপার্জ্জনও ক্রমে অসম্ভবরূপে হ্রাস পাইতে লাগিল। হীরালালের তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। তিনি তখন আত্মবিস্মৃতের মত শুধু দশের জন্য লেখনী চালাইতে লাগিলেন।

এত দিন তিনি স্বার্থহানির আশঙ্কায় যে সকল অন্যায় ও অত্যাচারসম্বন্ধে হয় ত বা উদাসীন থাকিতেন, অথবা অত্যন্ত ধীরভাবে ইঙ্গিতে আলোচনা করিতেন, এখন আর সে পদ্ধতিকে তিনি অবলম্বনযোগ্য মনে করিলেন না। বিচারক যেমন নিপুণভাবে মোকদ্দমার জটিল তত্ত্বগুলির মীমাংসা করিয়া রায় প্রদান করেন, হীরালালও ঠিক্ তেমনই নিপুণতা-সহকারে রাজকর্ম্মচারীদিগের কার্য্যশৈথিল্য অথবা কর্ত্তব্য-ত্রুটির পরিচয় দিয়া সে সমুদয়ের বিস্তৃত সমালোচনা করিতে লাগিলেন। সমালোচনায় তীব্রতা থাকিত, কিন্তু অশিষ্টতা-বর্জ্জিত।

হীরালাল অত্যন্ত সাবধানে দুর্গমপথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পল্লী-সহরে—যেখানে বাঙ্গালী জজ, বাঙ্গালী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং বাঙ্গালী সিভিলসার্জ্জনের সমাবেশ, সেখানে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তাঁহাদের তরফ হইতে বোধ হয়, একটু অসংযম অনিবার্য্যরূপে প্রকাশ পায়। ম্যাজিষ্ট্রেট-পত্নীর টেনিসক্রীড়া শিক্ষা করিতে যাওয়া প্রভৃতি বিষয় উপলক্ষ করিয়া একটা জনরব মাথা তুলিতেছিল।

হীরালাল বাঙ্গালী শিক্ষিতা নারীদিগের অশোভন উচ্ছৃঙ্খলতাসম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতে জেলার হাকিম-পত্নীর ব্যবহারের প্রতিও প্রচ্ছন্ন কশাঘাত ছিল। অবশ্য নাম করিয়া নহে। তবে ইঙ্গিতটা ঝাঁঝাল রকমের, কিন্তু অশিষ্টতাবর্জ্জিত।

৬

অগ্নি প্রচণ্ডতেজে জ্বলিয়া উঠিল।

হীরালালের শ্যালক নবীন উকীল ননীগোপাল ঝড়ের ন্যায় বেগে প্রেসঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনি এ সব কি আরম্ভ করেছেন?"

বিস্মিতভাবে সম্পাদক বলিলেন, "কি হয়েছে?"

"কি হয়েছে! আপনার সাহস ত কম নয়? জেলার হাকিমের সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁর স্ত্রীর সম্পর্কে এইরূপ ইঙ্গিত! বড় ভয়ানক কথা!"

মৃদুহাস্যে হীরালাল বলিলেন, "কোন অন্যায় বা অশিষ্ট কথা লেখা হয় নি। বিশেষতঃ কাহারও নামও নেই। এতে ভয় কিসের?"

"তা না থাক্, পড়্‌লে সকলেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। আপনার না হয় ভয় নেই! চালচুলো থাক্‌লে সেটা হ'ত। কিন্তু ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের দশা ত আর ঠিক আপনার মত নয়। জেলার হাকিমের সঙ্গে বিবাদ হ'লে, তিনি ইচ্ছা কর্‌লে ঘরে আগুন দিয়ে সর্ব্বনাশ কর্‌তে পারেন; তা খবর রাখেন?"

শ্যালকের কঠোরবাক্যে হীরালালের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তিনি কি বলিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, শ্বশুর কৃষ্ণকান্ত তাঁহাকে সেলাম পাঠাইয়াছেন।

রুদ্ধ ক্রোধকে সংযত করিয়া বারিবিদ্যুৎপূর্ণ বৈশাখী মেঘের মত হীরালাল বাসার অভিমুখে চলিলেন।

পথিমধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধু যোগেশ বাবুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি হীরালাল বাবুকে বুঝাইয়া দিলেন যে, "সময়"কে বর্জ্জন করিবার জন্য শ্যামাচরণ বাবুর বাড়ীতে বৈঠক বসিয়াছিল। "সময়" অত্যন্ত দুর্ব্বিনীত হইয়া উঠিয়াছে, উহার সহিত সহরের কেহই কোন সম্পর্ক রাখিতে পারিবেন না বলিয়া শ্যামাচরণ বাবু নিজেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। শুধু কয়েক জন স্বাধীনচেতা উকীল ও স্কুলের মাষ্টার সে প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নাই।

হীরালাল নীরবে সকল কথা শুনিলেন। তার পর দৃঢ়-চরণে রাজপথ অতিক্রম পূর্ব্বক উন্নতশীর্ষে শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

৭

কৃষ্ণকান্তের ছায়া-নিবিড় আনত মুখের ভাব দেখিয়াই হীরালাল বুঝিলেন, নিদাঘ-ঝটিকা এখনই প্রবাহিত হইবে।

"আপনি আমায় ডাকিয়েছেন?"

মুখ তুলিয়া জামাতাকে দেখিবামাত্র তিনি বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ, তুমি যে রকম ব্যাপার ক'রে তুলেছ, তাতে বাপু, আমি আর সাম্‌লাতে পাচ্ছি না। অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘর করি। জেলার হাকিমের সঙ্গে বিবাদ ক'রে তুমি হয় ত আত্মরক্ষা কর্‌তে পার; কিন্তু আমাদের মত দুর্ব্বল লোকের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়।"

কৃষ্ণকান্তের শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠস্বরে হীরালালের সর্ব্বদেহ এক-বার শিহরিয়া উঠিল ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া তিনি উত্থিতপ্রায় উত্তরকে পিষিয়া ফেলিলেন।

একটু থামিয়া কৃষ্ণকান্ত বলিতে লাগিলেন, "সকলেই এই কথা বল্‌ছেন যে, আমার প্রশ্রয়েই তুমি এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে তুলেছ। শ্যামাচরণ সে দিনও বল্‌ছিলেন যে, সকলেরই ধারণা—আমার জন্যই তুমি এতটা অসম-সাহসের কাজ কর্‌ছো। হয় ত জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবেরও এই রকম ধারণা। এ অবস্থায় বাপু তোমার এখানে থাকা—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়াই হীরালাল প্রসন্নমুখে বলিলেন, "যে আজ্ঞা, আমি এখনই অন্যত্র যাচ্ছি। আপনার কোন বিপদ্ ঘটে, ইহা আমার অভিপ্রেত নয়। কোন চিন্তা কর্‌বেন না, আপনার মেয়েকেও এখানে রাখছি না। যাতে আমার সংস্পর্শ আছে, এমন কোন বিষয়ের জন্য আপনার দুর্ভাবনা যাতে না থাকে, সে ব্যবস্থা আমি এখনই কর্‌ছি।"

মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে কৃষ্ণকান্ত বলিলেন, "কিন্তু এদের নিয়ে কোথায় যাবে? একটা স্থান ত চাই।"

মৃদু-প্রশান্ত-হাস্যে হীরালাল বলিলেন, "এত বড় ব্রহ্মাণ্ডে কি আমাদের এই কয়টি প্রাণীর স্থান হবে না? আপনি কোন চিন্তা কর্‌বেন না।"

হীরালাল মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়াই অন্তঃপুরের দিকে চলিলেন। পত্নীকে এই আকস্মিক অবস্থার কথা কিরূপে জানাইবেন, সেই চিন্তায় তিনি যেন একটু বিব্রত হইয়াছিলেন।

শয়নকক্ষে প্রবেশমাত্র তিনি দেখিলেন, বিছানা-ট্রাঙ্ক সমস্তই গৃহতলে রক্ষিত, যেন প্রবাসযাত্রার জন্য সকলই প্রস্তুত। চপলা দুই বৎসরের শিশু-পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া খাটের উপর উপবিষ্ট।

স্বামীকে দেখিবামাত্র চপলা প্রশান্তস্বরে বলিল, "গাড়ী এনেছ?"

পত্নীর ব্যবহারে হীরালাল একটু বিস্মিত হইয়াছিলেন। সে কি ইতিমধ্যেই তাঁহার মনের ভাব বুঝিয়া প্রস্তুত হইয়া আছে? যাহা হউক, অপ্রীতিকর বিষয়ের আলোচনার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তথাপি জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোথায় যাবে?"

"কেন? ছাপাখানার এক কোণে কি আমাদের স্থান হবে না? আমরা তিনটি প্রাণী। আপাততঃ আপিস-ঘরেই একটা ব্যবস্থা ক'রে নেওয়া যাবে।"

হীরালালের হৃদয়ের কোনও প্রান্তে যেন একটা কাঁটা খচ-খচ করিয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "স্বর্গ হ'তে রসাতলে দারুণ পতন সহ্য করতে পারবে?"

চপলা দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "স্বর্গ যদি কোথাও থাকে, তবে তা স্বামীর সঙ্গে গাছতলাতেই সম্ভব। আর দেরী করো না।" এই বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আমি গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি। এতক্ষণে বোধ হয় এসেছে।"

চপলার নির্দেশে ভৃত্যগণ দ্রব্যাদি বাহিরে লইয়া গেল।

অবগুণ্ঠনাবৃত চপলা স্বামীর পশ্চাতে বাহিরে চলিল।

চপলার জননী সাশ্রুনেত্রে সম্মুখে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন, "মা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি সুখী হও।" জামাতার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "বাবা, কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করছি, তোমার জয় হবে।"

প্রণামান্তে উভয়ে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেল।

৮

সে দিন ষষ্ঠীর প্রভাত। জগন্মাতার আগমনীর শুভরোল প্রভাত-পবনে নৃত্য করিতেছিল। পার্শ্বের বাড়ীতে বোধনের বাদ্য বাজিতেছিল।

পত্নীকে গাড়ীতে তুলিয়া দিয়া হীরালাল শ্বশুরকে প্রণাম করিতে গেলেন। কৃষ্ণকান্তের পার্শ্বে বাঙ্গালার দেশপ্রসিদ্ধ অন্যতম নেতা শ্যামাচরণ দাঁড়াইয়াছিলেন।

হীরালালকে থমকিয়া দাঁড়াইতে দেখিয়া শ্যামাচরণ বিজ্ঞভাবে বলিলেন, "বাবাজী, কাজটা যেন ভাল করলে না। একবার জজসাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেটসাহেবের কাছে ক্ষমা চাইলে সব গোলমাল মিটে যেত। তাঁদের পেছনে লাগা তোমার মত দুর্ব্বল লোকের—"

যুক্তপাণি হইয়া হীরালাল বলিলেন, "মাপ করবেন, মহাশয়! যদি অপরাধ হ'ত, অবশ্য মার্জ্জনা চাইতাম। কিন্তু দোষ যখন করি নাই, তখন ক্ষমা চাইবো কেন? তবে যাঁরা দেশের নেতা, তাঁদের ব্যবহার দেখে কিছু বিস্মিত হয়েছি। জজ-ম্যাজিষ্ট্রেটের বিরাগভাজন হ'লে দৈনিক দুই শত টাকা কি মারা যেতে পারে, এমন আশঙ্কা যাঁদের,—তাঁরা শিখণ্ডীর আড়ালে দাঁড়িয়ে বাণ নিক্ষেপ ক'রেই থাকেন, এ তত্ত্বটা কংগ্রেসের বড় বড় পাণ্ডাদের ব্যবহার দেখে আবিষ্কার করতে হবে, আগে জানা ছিল না। নমস্কার!"

পক্বশ্মশ্রু দোলাইয়া শ্যামাচরণ বলিলেন, "দেশের কাজ কি ক'রে কত্তে হয়, তোমার মত অপরিণতবুদ্ধি যুবক তা জানবে কেমন ক'রে?"

হীরালাল বিদ্রূপভরে বলিলেন, "দোহাই আপনার! সে শিক্ষাটা মহাশয়ের মত নেতার কাছ থেকে না হয় এ যাত্রা নাই নিলাম!"

দ্রুতপদে তিনি গাড়ীতে আরোহণ করিলেন।

বাহিরে বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছিল,—

"গা তোল, গা তোল, বাঁধ মা কুন্তল
ঐ বুঝি এলো তোর পাষাণী ঈশানী।"

কৃষ্ণকান্তের সর্ব্বশরীর তাড়িতস্পৃষ্টের ন্যায় একবার কাঁপিয়া উঠিল। তিনি মুহূর্ত্ত চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

* * * *

ছাপাখানার ঘরে পৌঁছিয়া হীরালাল দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাশী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। সে সেলাম করিয়া একখানি পত্র তাঁহার হস্তে অর্পণ করিল। উপরে লেখা—"গোপনীয়, ব্যক্তিগত।"

ক্ষিপ্রহস্তে খুলিয়া তিনি পড়িলেন, বাঙ্গালায় লেখা আছে:—

"বন্ধু, হাঁ, তোমাকে বন্ধু বলিয়াই অভিনন্দন করিতেছি। আমার কনিষ্ঠের সতীর্থ হইলেও তোমাকে আজ শ্রেষ্ঠ বন্ধুর আসনে স্থান দিলাম। এত দিন ভ্রমে পড়িয়া তোমার উপর অবিচার করিয়াছি। আমি শীঘ্রই কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্‌ সোসাইটীর রেজিষ্ট্রার হইয়া যাইতেছি। সেই বিভাগের যাবতীয় ফারম এখন হইতে তোমার কাছেই ছাপাইতে পাঠাইব। আশা করি, আমার ত্রুটিতে তোমার যে আর্থিক ক্ষতি হইয়াছে, ইহাতে তাহার কিছু পূর্ণ হইবে। বিদায়ের পূর্ব্বে সাক্ষাৎ করিও। ইতি—"

ম্যাজিষ্ট্রেটের স্বাক্ষর পড়িয়া হীরালাল মুহূর্ত্ত ঊর্দ্ধপানে চাহিলেন। পরে স্ত্রীর হাতে পত্রখানি দিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বসুমতী, ১৩২৪

আলোক-রেখা

প্রথম

তখন ট্রেণ ছাড়িতে বেশী বিলম্ব ছিল না; টিপ্-টিপ্ করিয়া বৃষ্টিও পড়িতেছিল। ট্রেণের পশ্চাতের দিকের একটা মধ্যম শ্রেণীর কামরায় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম। বোধ হয়, দুর্য্যোগের জন্যই যাত্রীর তেমন ভিড় দেখিলাম না। আজ দুই দিন ধরিয়া ঝড়-বৃষ্টি হইতেছে। কোনও কামরাতেই যাত্রীর অত্যধিক সমাবেশ নাই।

আমার সঙ্গে শুধু একটা ব্যাগ। কন্যাকে জামাতার নিকট পৌঁছাইয়া দিতে এলাহাবাদে আসিয়াছিলাম। আকাশের অবস্থা দেখিয়া কন্যা-জামাতা কেহই আমাকে ছাড়িয়া দিতে চাহে নাই; কিন্তু আমার আর বিলম্ব করিবার কোনও উপায়ই ছিল না, তাই তাহাদের সকল প্রকার যুক্তি, অনুরোধ ও আব্দার উপেক্ষা করিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলাম। শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশ এবং আসন্ন ঝটিকার আশঙ্কা আমাকে বাধা দিতে পারিল না।

কামরায় প্রবেশ করিবামাত্রই গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ব্যাগটা সম্মুখের আসনে রাখিয়া বসিয়া পড়িলাম। রুমাল দিয়া মাথার ও মুখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলাম। সে কামরায় আমি ছাড়া আরও দুই জন যাত্রীকে দেখিলাম—এক জন পুরুষ, অপর নারী।

কিন্তু কি চমৎকার তাহাদের রূপ, অবয়ব ও স্বাস্থ্য! সত্যই আমি প্রথম দর্শনে দৃষ্টি ফিরাইয়া লইতে পারিলাম না। মেয়েটির বয়স সতের কি আঠার হইবে। এরূপ গৌরী আমি অনেক দেখিয়াছি; কিন্তু এমন স্বাস্থ্য ইদানীং আমি কোনও বাঙ্গালী মেয়ের দেহে দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের মিলনে সে এমনই সুদর্শনা যে, তাহাকে দেখিয়াই মহাকবি কালিদাসের কথা মনে পড়ে। তাহার বসিবার ভঙ্গী, প্রশান্ত ও প্রসন্ন মুখের স্থির, সৌম্য ভাব, বিশাল নয়ন-যুগলের স্থিরোজ্জ্বল নম্র দৃষ্টি সত্যই আমার চিত্তকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ব্যবহারে বিন্দুমাত্র অনাবশ্যক সঙ্কোচের আড়ম্বর নাই, অথচ আত্মস্থা। এই গৌরীকে দেখিলেই প্রাণ যেন মা বলিয়া ডাকিবার জন্য আকুল হইয়া উঠে। আমার তৃতীয়া কন্যার সে সমবয়স্কা হইতে পারে।

তাহার সঙ্গী যুবকের দিকে চাহিলাম। সম্ভবতঃ তাহার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশ হইতে পারে। সে কি একখানা বই মনোযোগ দিয়া পড়িতেছিল। তাহার সুঠাম, সুডোল এবং সুন্দর অবয়ব দর্শনীয়। তাহাদের উভয়ের কি সম্বন্ধ, জানি না, তবে মনে হইল, উহারা স্বামি-স্ত্রী। যুবক বই পড়িতে ব্যস্ত; যুবতী বাতায়ন-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া ছিল। আমাকে কামরায় প্রবেশ করিতে দেখিয়া উভয়েরই দৃষ্টি একবার আমার প্রতি নিক্ষিপ্ত হইল—মুহূর্ত্তের জন্য;—তাহার পর যুবক আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিল; গৌরী বাহিরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

লুকারগঞ্জ হইতে ষ্টেশনে আসা পর্য্যন্ত ধূমপান হয় নাই। ট্রেণে সিগারই ভরসা। একটা ধরাইয়া লইয়া বাদল-ঝরা বাহিরের আকাশের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ট্রেণ তখন রুদ্ধ-শ্বাসে ছুটিতেছিল।

একস্প্রেস্ ট্রেণ সকল ষ্টেশনে থামিতেছিল না। বাদলা-হাওয়া গবাক্ষ-পথে হু হু শব্দে প্রবেশ করিতেছিল। আমার মনটাও ট্রেণের গতির অপেক্ষা দ্রুততর বেগে কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় অভিসার করিতেছিল যে, তাহা নিজেই স্থির করিতে পারিলাম না।

যাত্রী দুইটি তেমনই নিঃশব্দভাবে যে যাহার স্থানে বসিয়া ছিল।

নিঃশেষপীত সিগারটা ফেলিয়া দিয়া সোজা হইয়া বসিলাম। চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে আমার কখনও কষ্টবোধ হয় না। নির্জ্জনতার কঠোরতা জীবনে কখনও অনুভব করিতে পারি নাই; কিন্তু আজ এই বাদল দিনের স্তব্ধতা যেন দুঃসহ বোধ হইতেছিল। আবার কোণের দিকে সরিয়া বসিলাম।

বোধ হয়, অনেকক্ষণ ধরিয়া নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছিল। সহসা গাড়ী থামিবার সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রাঘোর কাটিয়া গেল। গাড়ী একটা ষ্টেশনে দাঁড়াইয়াছে। তখন কামরার মধ্যে আলোক জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। সন্ধ্যা ঠিক ঘনাইয়া না আসিলেও মেঘমেদুর আকাশের অন্ধকারে যেন সন্ধ্যা হইয়াছে বলিয়াই বোধ হইল। টিপ্-টিপ্ নহে—ঝম্-ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছিল। প্লাটফরমে যাত্রীর সংখ্যা খুব অধিক নহে। কয়েক জন লোক কোন্ গাড়ীতে উঠিবে, যেন তাহাই দেখিয়া বেড়াইতেছিল।

গার্ডের বাঁশী বাজিয়া উঠিল—ট্রেণের মৃদুবেগ অনুভূত হইল। ঠিক এমনই সময় কয়েক ব্যক্তি আমাদের কামরারই দরজা খুলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল। সংখ্যায় তাহারা ৭ জন।

তাহাদিগকে আসিতে দেখিয়া আমার মনটা ঠিক প্রসন্ন হইল না। আমি ব্যাগটা তুলিয়া লইয়া সে আসন হইতে, যুবক ও যুবতী যে দিকের বেঞ্চে বসিয়াছিল, তাহারই সম্মুখস্থ আসন অধিকার করিলাম। নবাগতগণ আমার পরিত্যক্ত বেঞ্চ অধিকার করিল।

যুবককে সম্বোধন করিয়া বলিলাম, "এখানে বসায় আপনাদের কোন অসুবিধা হ'ল না ত?"

মৃদু হাসিয়া যুবক বলিল, "ঠিকই হয়েছে। আপনি ওখানেই বসুন।"

আগন্তুকগণের বেশভূষা ভদ্রজনোচিত—পরিচ্ছন্ন হইলেও, তাহাদের ভাবভঙ্গী আদৌ ভদ্রতাসূচক বলিয়া আমার বোধ হইল না। দলের মধ্যে মুণ্ডিত আনন এবং শ্মশ্রুগুম্ফ-শোভিত উভয় প্রকার লোকই দেখিলাম। তবে তাহারা কি জাতি এবং তাহাদের বসতিই বা কোথায়, তাহা জানিবার উপায় ছিল না।

যুবক ও যুবতী যেমন বসিয়া ছিল, ঠিক তেমনই ভাবে বসিয়া রহিল। গাড়ীর আলোকে যুবক স্বচ্ছন্দে বই পড়িয়া যাইতে লাগিল। যুবতীর দৃষ্টি বাহিরের দিকে। আমি উৎসুক-নেত্রে নবাগতদিগের প্রতি চাহিয়া রহিলাম।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে আগন্তুকরা যে সুন্দরীকে লক্ষ্য করিতেছিল, তাহা বুঝিবার জন্য কোনই কষ্ট করিতে হয় না। দলের মধ্যে দীর্ঘাকার, ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ, ভীমদর্শন লোকটার দৃষ্টিতে যেন হিংস্র পশুর ক্ষুধা জাগিয়া উঠিতেছিল বলিয়া আমার অনুমান হইল। সত্য বলিতে কি, ইহাদিগকে কামরায় উঠিতে দেখিয়াই আমার মনটা অত্যন্ত অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল।

পার্শ্ববর্ত্তী খর্ব্বাকার লোকটা ধূমপানের আয়োজন করিতে লাগিল। কলিকার আয়তন দেখিয়াই বুঝিলাম, তাম্রকূটের বড় দাদা উহাতে অধিষ্ঠিত হইবেন।

অগ্নিশীর্ষ কলিকাটি হাতে হাতে ফিরিতে লাগিল। ধূমে ধূমে কামরার বাতাস ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল—উৎকট গন্ধে ব্রহ্মতালু পর্য্যন্ত যেন ফাটিয়া যাইবে! বিরক্তিতে মন এমনই বিদ্রোহী হইয়া উঠিল যে, নীরবে থাকা অসম্ভব।

আমস্থা যুবতীও যেন বিব্রতভাবে বাতায়ন-পথে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের মুক্ত বায়ু গ্রহণ করিবার জন্য একটু ঘুরিয়া বসিল। যুবক এতক্ষণ কিছুই লক্ষ্য করে নাই। এইবার সে বইখানি মুড়িয়া রাখিয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আগন্তুকগণকে দেখিতে লাগিল। তাহার সুন্দর আননেও বিরক্তির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

ভীমদর্শন, দীর্ঘাকার লোকটা কলিকাটি হাতে লইয়া, আমি যে আসনে বসিয়াছিলাম, তথায় আসিল। বেঞ্চের অপরপ্রান্তে, যুবকের সম্মুখে বসিয়া সে আরাম করিয়া কলিকায় টান দিতে লাগিল। শুধু তাহাই নহে, সে এমনই ভাবে কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল যে, তাহার এই অশিষ্ট আচরণ সহ্য করা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে।

আমি প্রতিবাদ করার পূর্ব্বেই যুবক ধীর, প্রশান্তকণ্ঠে, পরিষ্কার উর্দ্দুতে লোকটিকে অনুরোধ করিল যে, সে যেন অন্যের বিরক্তি উৎপাদন না করে; রেলের আইন বড় কড়া। সে আগে যেখানে ছিল, সেখানেই বসিয়া ধূমপান করিতে পারে।

লোকটা তখন অন্য বন্ধুর হস্তে কলিকাটি দিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বিদ্রূপভরে, বিকট মুখভঙ্গী করিয়া অশ্লীল ভাষায় সে যে কথাটা উচ্চারণ করিল, তাহাতে তাহার সঙ্গীরা অট্টহাস্য করিয়া উঠিল।

স্বামীর কথা দূরে থাকুক, কোনও পুরুষ কোনও নারীর সম্বন্ধে এমন সম্মানহীন উক্তি শুনিয়া নীরব থাকিতে পারে না। মৃতদেহও সেরূপ কথা শুনিয়া লাফাইয়া উঠে। প্রৌঢ় আমি, সে কথা শুনিয়া আমার শীতল শোণিতও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। লম্ফ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তাহারা যে ৭ জন, আমরা মাত্র দুই জন, কোন কথাই তখন মনে রহিল না।

যুবক আমাকে ইঙ্গিতে বসিতে বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী হেলাইয়া আদেশের স্বরে বলিল যে, দ্বিতীয় কথা উচ্চারণ না করিয়া সে যেন পশ্চাতের আসনে গিয়া বসিয়া থাকে।

লোকটা আবার মুখভঙ্গী করিয়া যুবতীকে লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিতে গেল। যুবকের দক্ষিণ পদ বিদ্যুতের মত উত্থিত হইয়া তাহার বিপুল উদরে নিপতিত হইল। 'বাপ্!' বলিয়া একটা শব্দ হইল। লোকটার ভীমকান্ত দেহ তাহার বন্ধু-বর্গের সম্মুখে নিক্ষিপ্ত হইল। সে আর উঠিতে পারিল না।

তাহার বন্ধুরা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। কয়েক জন যুবকের দিকে ধাবিত হইল। উন্মত্তের মত আমিও ছুটিয়া আসিতেছিলাম। যুবক দ্রুত বলিয়া উঠিল, "আপনি ব'সে থাকুন, কোন ভাবনা নেই, আমি ঠাণ্ডা ক'রে দিচ্ছি।"

চাহিয়া দেখিলাম—আমার সম্মুখে সেই কমনীয়-বপু যুবক দাঁড়াইয়া নাই। স্যাণ্ডোর বীরবপু দেখিয়াছি, ভীমের ভীম-কান্ত মূর্ত্তির বর্ণনা পড়িয়াছি। হারকুলিসের চিত্র—গ্রীক-ভাস্করের রচিত শিল্পজাত বলদীপ্ত মূর্ত্তি দেখিয়াছি। এই তিনের সমবায়ে যে বীরবপু গঠিত হইতে পারে, আমার সম্মুখে তাহার জীবন্ত মূর্ত্তি দেখিলাম!

যুবক কখন্ জামা খুলিয়া ফেলিয়াছিল, লক্ষ্য করি নাই। যুবতী তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিল। মুহূর্ত্ত দৃষ্টিপাতে দেখিলাম, তাহার আনন ঈষৎ আরক্ত; কিন্তু শঙ্কার লেশমাত্র সে আননে ছায়া বিস্তার করে নাই; তাহার অকম্পিত দক্ষিণ হস্তে একটি ক্ষুদ্র রিভলভার। যুবক বলিল, "যদি দরকার হয়, তখন গুলী ছুড়তে হবে, বুঝেছ?"

আনন্দে, বিস্ময়ে, গর্ব্বে আমার অন্তর যেন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। এমন আত্মস্থা বীর নারী বাঙ্গালীর ঘরে আছে? চাহিয়া দেখিলাম, দুর্ব্বৃত্তগণ যুবকের সেই ভীম-কান্ত মূর্ত্তি এবং কোমলা, উচ্ছ্বসিতযৌবনা সুন্দরীর হস্তে অস্ত্রেমাত্র দেখিয়া স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে।

বুঝিলাম, ইচ্ছা করিলে এই যুবক ৭ জন দুর্ব্বৃত্তকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতে পারে। তাহার স্ফীত মাংসপেশী-বহুল বাহুযুগল, কপাট-বক্ষ অতুল বলের আধার! চিরদিনই আমি বীরের ভক্ত, যে শক্তিমান, সে আমার নমস্য। আমার অতিপ্রিয় বাঙ্গালী জাতিকে আমি এমনই শক্তিশালী দেখিবার স্বপ্ন দেখিয়া থাকি।

পদাঘাতে যে দুর্ব্বৃত্ত মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল, যুবক ধীরে ধীরে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। তাহার বন্ধুরা তখন তাহার চৈতন্ত-সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছিল। যুবক কুঁজা হইতে এক গেলাস জল গড়াইয়া লইয়াছিল। অচেতন দেহের সমীপবর্ত্তী হইলে লোকগুলি সরিয়া দাঁড়াইল। অকুণ্ঠিতভাবে যুবক তাহার সম্মুখে নত হইয়া চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিতে লাগিল।

অল্প চেষ্টায় লোকটার সংজ্ঞা হইল। সে উঠিয়া বসিল। তাহার দৃষ্টিতে পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ক্রোধ ফুটিয়া উঠিতেছিল; কিন্তু যুবকের অনাবৃত বক্ষ ও বাহুযুগলের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় সে স্থির হইয়া রহিল।

যুবক তখন গম্ভীরস্বরে সকলকে বুঝাইয়া দিল যে, পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তাহারা যদি নামিয়া না যায়, তবে লাথি মারিয়া কুকুরের ন্যায় তাহাদিগকে সে নামাইয়া দিবে। তাহার কার্য্য ও কথায় যে বিন্দুমাত্র প্রভেদ ঘটিবে না, বোধ হয়, তাহারা তাহা স্থির করিয়াই ফেলিয়াছিল।

পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিবামাত্র লোকগুলি প্রকৃতই নামিয়া গেল। বিরাটবপু লোকটাই সকলের আগে পথ দেখাইল।

গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে আমি বলিলাম, "লোক-গুলাকে রেলওয়ে পুলিসের হাতে দিলে বোধ হয় ভাল হ'ত।" যুবক জামা পরিতে পরিতে বলিয়া উঠিল, "পুলিস?—কেন? আমি কি কাপুরুষ? মানুষের নিজের ধর্ম্ম, নিজের ইজ্জৎ নিজের কাছে। বাঙ্গালী কথায় কথায় পরের উপর নির্ভর করে বলেই তাকে সকলের কাছে লাঞ্ছনা, নির্য্যাতন ভোগ করতে হয়। ও সব আমি বুঝিনে। নিজের মান নিজেকেই রাখতে হবে। পুলিসে দিলে ওদের না হয় জেল হ'ত; কিন্তু তাতে কি লাভ? আপনি ঠিক জানবেন, ওরা আর হঠাৎ কোন নারীর প্রতি অসম্মান দেখাতে সাহস করবে না।"

যুবকের কথাগুলি আমার বড় ভাল লাগিল। তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মন পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। আমি বলি-লাম, "আপনার মত শক্তিমান পুরুষ কবে বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে দেখব!"

যুবক একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "আমার জাত-ভাইদের এই দুর্ব্বলতা আমায় বড় আঘাত করে! কাগজে প্রায়ই নারীর প্রতি অত্যাচারের কথা পড়ি। বোধ হয়, বাঙ্গালা দেশ ছাড়া আর কোন স্থানে নারীর প্রতি এত অত্যাচার হয় না। বাঙ্গালী যদি শক্তিচর্চ্চা করত, আত্মরক্ষা, ইজ্জৎরক্ষার জন্য নিজের হাতে ভার নিত, তবে দেখতেন, এ সব পাপ এমন ভাবে কখনই থাকৃত না। মেয়েদেরও ব্যায়াম ক'রে বলসঞ্চয় করা দরকার হয়ে পড়েছে।"

যুবক এই বলিয়া সহাস্যে একবার তাহার পত্নীর দিকে চাহিল। আমারও দৃষ্টি সেই দিকে ফিরিল। তরুণীর স্নিগ্ধ আননে যেন এক ঝলক রক্তরাগ ফুটিয়া উঠিল।

যুবক সরল সহজভাবে বলিল, "আমার স্ত্রীকেও আমি ব্যায়াম-শিক্ষা দিয়েছি। হঠাৎ কোন পুরুষ তার উপর অত্যাচার করতে পারবে না, এটা ঠিক।"

যুবকের কথায় আমার চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইহা যে আমার চিরদিনের কামনা! আমার মায়ের জাতি দেহ ও হৃদয়ের শক্তিতে শক্তিময়ী হইয়া উঠুক—মাতৃজাতিকে আমরা পূর্ব্বের মত সম্ভ্রমে ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে পারি, এমন অবস্থা আবার জাতির মধ্যে ফিরিয়া আসুক, বাঙ্গালী আবার মাতৃ-নাম গান করিতে শিখুক, এই চিন্তা জীবনের অপরাহ্নেও সমানভাবে আমার সমগ্র চিত্তকে অধিকার করিয়া আছে।

প্রশংসমান দৃষ্টিতে আবার আমার এই নবপরিচিতা মায়ের দিকে চাহিলাম। সলজ্জভাবে তরুণী নিজের চরণে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

আমি উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে বলিলাম, "আপনার নাম ও ধাম জানিতে পারি কি?"

যুবক অকুণ্ঠিতভাবে আত্মপরিচয় দিল। রাজপুতানায় কোনও রাজ-সরকারে তাহার পিতা দেওয়ান। ভারত সরকারের দরবারে তাঁহার অসাধারণ প্রতিপত্তি। তাই সারা ভারতবর্ষের মধ্যে পিস্তল ও বন্দুকের পাশ তাহার আছে। যুবক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী হইয়াও দাস-জীবনের ঘোর বিরোধী। এ কারণ সে স্বাধীনভাবে ঐ রাজ্যেই ব্যবসায় করিতেছে। কলিকাতায় একটা শাখা স্থাপন করিবার তাহার বাসনা আছে।

যুবকের পিতার অন্যান্য পরিচয় পাইবার পর তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। যুবক যে নাম উচ্চারণ করিল, তাহাতে আমার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া উঠিল। বলিলাম—"দেশ কোথায়?"

উত্তরে সে যাহা বলিল, তাহাতে আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। যুবককে সাগ্রহে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম, "তুমি—র ছেলে? এতক্ষণ বলতে হয়!"

যুবক অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল। আমি বলিলাম, তাহার পিতা, আমি ও সত্যেন্দ্র একই দেশের লোক। তিন জন সতীর্থ ছিলাম। একসঙ্গে তিন জন কলিকাতার একই পল্লীতে থাকিয়া খেলা ও লেখাপড়ায় কৈশোর ও যৌবন অতিবাহিত করিয়াছি; আমাদের তিন বন্ধুর প্রগাঢ় প্রণয় ও সর্ব্বদা একত্র সমাবেশ দেখিয়া সমবয়স্ক অন্য বন্ধুজন পরিহাস করিত; আমাদের কাব্য-সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ এবং কবিতা-রচনার পরিচয় পাইয়া সকলে আমাদিগকে 'Lake Poet's বলিয়া বিদ্রূপও করিত। যুবক সসম্ভ্রমে আমার পদধূলি লইল।

বাল্য ও যৌবনের মধুর স্মৃতি-কথার আলোচনায় আমি যেন নব-যৌবনের আবেগ ও উত্তেজনার সঞ্চার অনুভব করিতে লাগিলাম। আজ ২৫ বৎসর আমরা সংসার-চক্রে পড়িয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছি। কে কোথায় আছে, তাহা পর্য্যন্ত জানিবার অবকাশ ছিল না। শুধু জানিতাম, আমার বন্ধুযুগলের এক জন রাজপুতানার কোন রাজ্যে বড় কাজ করে, আর অপর জন বোম্বাই প্রদেশের কোনও কলেজের অধ্যাপক।

যুবক বলিল যে, পিতার নিকট সে আমার অনেক কথাই শুনিয়াছে। আমি যে এক জন লেখক, তাহাও সে সংবাদ রাখে। সুদূর-প্রবাসে থাকিয়াও বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা দেশের সকল সন্ধান সে একা নহে, তাহাদের পরিবারের সকলেই রাখিয়া থাকেন। তাহার পর সে সলজ্জ-কণ্ঠে পত্নীর দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল যে, আমাদের বন্ধু সত্যেন্দ্র বাবুর কন্যাকেই সে বিবাহ করিয়াছে।

অপ্রত্যাশিতভাবে আমার প্রবাসী বন্ধুযুগলের সন্তান-দিগকে দেখিতে পাইয়া আমার চিত্ত আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল।

তরুণী নত হইয়া আমাকে প্রণাম করিল।

তিন বন্ধুর মধ্যে বয়সে আমি কিছু বড় ছিলাম, এজন্য তরুণ ও তরুণী উভয়েই আমাকে জ্যেঠামহাশয় বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল। রাত্রির অন্ধকার, ট্রেণের বৈচিত্র্যহীন গতি আমাদিগের আলাপে বাধা দিতে পারিল না।

বাঁকিপুরে ট্রেণ থামিল। এইবার আমাকে বিদায় লইতে হইবে। এখানে কয়েকটা জরুরী কাজ ছিল। দম্পতি-যুগল বার বার অনুরোধ করিল, কলিকাতায় অথবা দেশের বাড়ীতে গেলে যেন আমি তাহাদিগকে দর্শন দিয়া আসি। বেশী দিন তাহারা বিদেশে আর থাকিবে না। বাঙ্গালার সন্তান বাঙ্গালাতেই ফিরিয়া আসিবে। ঠিকানা লইয়া আমি নামিয়া পড়িলাম।

(শেষ)

চারি বৎসর পরে—ছোট মেয়ের বিবাহ দিয়াছি। সংসারের দেনা-পাওনা কখনও মেটে না, তবু যথাসম্ভব মিটিয়াছে মনে করিয়া স্ত্রী বলিলেন, "আর কেন, চল দিন-কতক কাশীবাস ক'রে আসি।" আমারও তাহাতে অনিচ্ছা ছিল না। কিন্তু মায়ার বন্ধনের টান বড়ই বেশী। ত্যাগের তীর্থে যাইবার পূর্ব্বে একবার জন্মভূমি—পিতৃপিতামহের কীর্ত্তির তীর্থ দেখিয়া আসিব না? গ্রামের প্রত্যেক বৃক্ষ, খোলা মাঠের উদার বুকে, নদীর জলে বাল্যের অনেক স্মৃতি জড়িত। তাহার আকর্ষণ কত তীব্র, জীবন-সায়াহ্নে উহা বুঝিতেছি। পত্নী অমত করিলেন না।

সব গুছাইয়া লইয়া যাত্রা করিলাম। রেল হইতে নামিয়া একবেলার পথ নদীবক্ষে—নৌকায় যাইতে হয়। অনেক দিন এ দিকে আসি নাই। মনের মধ্যে একটা অপূর্ব্ব, অব্যক্ত বেদনার আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম। কোন কোন ব্যথার মধ্যেও যে আনন্দরস জড়িত থাকে, তাহা প্রবীণত্বের কোঠায় পৌঁছিলে ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায়।

চঞ্চলা নদীর বিশাল বুকে রৌদ্রদীপ্ত নীল আকাশের ছায়া নাচিয়া নাচিয়া উঠিতেছিল। নদীর বুকের উপর তরঙ্গের কণাগুলি ঝরিয়া পড়িতেছিল। পাল তুলিয়া নৌকা চলিয়াছে। গৃহিণী পার্শ্বে নিদ্রাগতা। নিদ্রাহীন আমি সবিস্ময়ে তীরে বাঙ্গালা মায়ের হরিৎ-শ্যামল অঞ্চলের শোভা, নদীর বুকের উপর তরঙ্গের বিচিত্র লীলা দেখিতেছিলাম। একটা অনাহত বাণী, একটা উদাস-করা রাগিণীর ঝঙ্কার যেন কোথা হইতে উঠিতেছে। আমারই অন্তর হইতে কি? মুগ্ধভাবে কল্পনার রাজ্যে আপনাকে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলাম।

সহসা মাঝির উত্তেজনা-পূর্ণ কণ্ঠস্বরে আমার বাহ্য-চেতনা ফিরিয়া আসিল। দেখিলাম, আকাশ মেঘে কালো হইয়া গিয়াছে। বাতাস স্তব্ধ, নদীর জল স্থির—গাঢ় মসীবর্ণ।

দুরন্ত নদীতে এমন অবস্থায় নৌকায় থাকা নিরাপদ নহে। সম্মুখে একটা 'খোলে'র মত দেখিয়া মাঝি তাহার মধ্যে নৌকা চালাইয়া দিল। সন্ধ্যার বিলম্ব নাই, ঝটিকাও আসন্ন। নির্জ্জন নদীতীরে ঝটিকার সময় চুপ করিয়া থাকা সঙ্গত হইবে না। 'খোলে'র মধ্যেও নিরাপদ নহে। মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখান হইতে আমাদের গ্রামে পৌঁছিতে এখনও ৩।৪ ঘণ্টা লাগিবে। সঙ্গে পাচক ও পুরাতন ভৃত্য গোবর্দ্ধন ছিল। গোবর্দ্ধন আমার গ্রামেরই প্রজা। সে আজন্ম আমার কাছেই লালিত-পালিত। সংসারে শুধু এক পত্নী ছিল, কয়েক বৎসর হইল, তাহাকে হারাইয়া তাহার মায়ার বন্ধন শুধু আমাদের উপরেই দৃঢ় হইয়াছিল।

সে বলিল, "বাবু, এখানে সারারাত প'ড়ে না থেকে ডাঙ্গা-পথে গেলে হ'ত না?" কিন্তু পরক্ষণেই আমার গৃহিণীর কথা স্মরণ হওয়ায় সে জিহ্বা দংশন করিয়া চুপ করিল।

আকাশের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কা জন্মিল। হয় ত সারা রজনী ঝড় ও জলের সম্ভাবনা। অক্টোবর মাসের আকাশে এমন মেঘের সঞ্চার—একটা অনর্থ না বাধাইয়া ছাড়িবে না। মাঝি ও গোবর্দ্ধন উভয়ের সঙ্গে আলোচনা করিয়া জানিতে পারিলাম, মাঠের মধ্য দিয়া মাইল দুই পথ অতিক্রম করিতে পারিলে আমরা রায়না গ্রামে পৌঁছিতে পারিব। সেখানে বাবুদের অতিথিশালার দ্বার সর্ব্বদাই মুক্ত, কোন কষ্ট হইবে না।

রায়না!—রায়নার বসু চৌধুরীদের কোন্ কাহিনী আমার অগোচর? বহু দিন দেশ-ছাড়া সত্য, কিন্তু—

অনেক কথাই মনে পড়িতে লাগিল। স্মৃতির দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া গৃহিণীকে জানাইলাম, এমন অবস্থায়, এই দুরন্ত সন্ধ্যায়, নদীর বুকে থাকা সঙ্গত নহে। বরং মাঠের মধ্যে রাত্রিবাসও শ্রেয়ঃ।

পাচককে নৌকায় রাখিয়া, গোবর্দ্ধনকে লইয়া উভয়ে তীরে উঠিলাম। মাঝিকে বলিয়া দিলাম, 'তুফান' থামিয়া গেলে জিনিসপত্র সব যেন বাড়ী পৌঁছাইয়া দেয়। আমরা ডাঙ্গা-পথে যে কোন উপায়ে বাড়ী যাইব। গৃহিণী ঝড়কে বড়ই ভয় করিতেন। নৌকা ছাড়িয়া তিনি স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলেন। স্থল-পথের কষ্টকেও গ্রাহ্য করিবেন না বলিয়া আমাকে আশ্বাস দিলেন।

গোবর্দ্ধন আমাদের পথিপ্রদর্শক। ক্রমেই বাতাসের বেগ বাড়িতে লাগিল। মাঠের অর্দ্ধেক পথ ছাড়াইবার পূর্ব্বে অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আকাশে দৈত্যের দল নাচিতেছে।

সঙ্গে একটা লণ্ঠন ছিল। তাহারই আলোকে কোনও মতে আমরা গ্রামের সীমায় প্রবেশ করিলাম। বৃষ্টি-ধারা প্রবল বেগে নামিয়া আসিল। গৃহিণীর অবস্থা দেখিয়া মনে বড় ব্যথা ও উদ্বেগ অনুভব করিলাম। তিনি অত্যন্ত

আলোকেও আমার মনের ভাব বুঝিয়া হাসিয়া বলিলেন, "নদীতে থাকিলে হয় ত ডুবিয়া মরিতে হইত। একটু বৃষ্টিতে ভিজিলে বেশী আর কি হইবে?" কিন্তু পুরুষের মন কি তাহাতে সান্ত্বনা লাভ করে?"

সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড অট্টালিকা—উজ্জ্বল আলোক-রেখা দুর্য্যোগের মধ্যেও বেশ দেখা যাইতেছে। গোবর্দ্ধন বলিল; উহা জমীদারের বসতবাটী। আরও একটু দূরে অতিথিশালা। অতিথিশালা থাকুক, জমীদারের গৃহেই আগে বিশ্রাম লওয়া যাক। গৃহিণীর হাত ধরিয়া দেউড়ীর দিকে চলিলাম। দ্বারবান্ উঠিয়া পথ ছাড়িয়া দিল। সিক্ত বেশ হইলেও আমরা ঠিক ভিখারীর মত নহি বলিয়াই কি এই সম্মান? অথবা, ভোজপুরী হইলেও ভদ্র-মহিলার প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার শিক্ষা সে পাইয়াছে?

দরোয়ানের কাছে গোবর্দ্ধন আমার পরিচয় দিতে যাইতেছিল; আমি ইঙ্গিত করিতেই সে থামিয়া গেল। প্রশ্ন করিলাম, "জমীদার বাবু ত এখানে থাকেন না। বাড়ীতে এখন কে আছেন?"

উত্তর পাইবার পূর্ব্বেই সম্মুখের আলোকিত কক্ষ হইতে এক জন যুবক আমাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। দেউড়ীর উজ্জ্বল আলোক-রেখা তাহার বিশাল বক্ষে পড়িয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

মুহূর্ত্তমাত্র সবিস্ময়ে আমার দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "জ্যেঠামশাই!"

আমিও তাহাকে চিনিয়াছিলাম। সে বীর-মূর্ত্তি আমার মানসপটে চির-অঙ্কিত হইয়া আছে। আমার পরম প্রীতি-ভাজন বন্ধু রায়না গ্রামের গৌরব রায় বাহাদুর—র পুত্রকে যে এ সময়ে যে গ্রামে দেখিব, সে আশা আমার পূর্ব্বে মনেও হয় নাই।

আমার স্ত্রীর দিকে চাহিয়া সে বলিয়া উঠিল, "জ্যেঠাইমা?"

উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই সে সম্মুখে আসিয়া আমাদের পদধূলি লইল। এমন অবস্থায় আমরা এ সময়ে কোথা হইতে আসিলাম, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াই সে আমাদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া গেল।

আমার গৌরী-মা অপ্রত্যাশিতভাবে আমাদিগকে পাইয়া আনন্দ গোপন করিতে পারিতেছিল না। সিক্ত বস্ত্র ছাড়াইয়া উভয়ে আমাদের পরিচর্য্যার জন্য এমন ব্যস্ত হইয়া পড়িল যে, আমরাই বিব্রত হইয়া পড়িলাম।

নানা কথাবার্ত্তায় পথের কষ্ট ভুলিলাম।

সুধীরচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিল, "জ্যেঠামশাই, আপনারা যখন এসে পড়েছেন, পায়ের ধূলো দিয়েছেন, তখন ২।৪ দিন যেতে দেব না। সকালেই আমি লোক পাঠিয়ে আপনার বাড়ীতে খবর দেব। আর কা'ল সকালে আপনাকে একটা জিনিস দেখাব।"

যুবক হাসিতে হাসিতে পত্নীর দিকে একবার চাহিল। তরুণীর মধুর আননে প্রথম পরিচয়-দিনের মতই লজ্জারুণ আভা দেখিতে পাইলাম।

* * * *

"জ্যেঠাইমা, জ্যেঠামশাই, দেখবেন চলুন।"

ভীমের ন্যায় শক্তিধর অথচ শিশুর ন্যায় সরল এই যুবক আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। এমন কঠোর দেহের অন্তরালে এমন কোমল অন্তরের সমাবেশ বিস্ময়কর নহে কি?

সকালে দুর্য্যোগের কোন চিহ্ন ছিল না। মুক্ত প্রকৃতি অরুণালোকে হাসিতেছিল। তরুণ ও তরুণী অগ্রে চলিতে-ছিল, আমরা পশ্চাতে। প্রকাণ্ড জমীদার-ভবনের একাংশ-সংলগ্ন অনেকগুলি ঘর। প্রত্যেক কক্ষ সুপরিচ্ছন্ন, সুসজ্জিত। দেখিলাম, একটি ঘরে কয়েক জন বালিকা চরকায় সূতা কাটিতেছে, আর একটি ঘরে কয়েক জন বেত চিরিয়া ধামা প্রভৃতি বুনিতেছে। পদবিহীনা এক নারী এক ঘরে বসিয়া তূলা পিঁজিতেছে। তাহার সম্মুখে একটা চরকা। এমনই অনেকগুলি ঘর, প্রত্যেক ঘরের মধ্যে প্রবীণা, নবীনা ও বালিকার সমাবেশ।

সুধীরচন্দ্র বলিল, "আমার স্ত্রী এই গ্রামে আজ ২ বৎসর আছে। সে আর কোথাও যেতে চায় না। আপনি জানেন, আজ ৩ বৎসর হ'ল বাবা মারা গেছেন!"

বন্ধুবিয়োগের সংবাদ আমি সংবাদপত্রে দেখিয়াছিলাম। সুধীরচন্দ্রকে সে সময় পত্রও লিখিয়াছিলাম। এখানে আসি-বার সময় সেই দুঃখের স্মৃতি আমাকে বিমনাও করিয়াছিল।

আমি বলিলাম, "আমার গৌরীমারই এই কীর্ত্তি বুঝি?"

তরুণী আরক্ত আননে মাথা নত করিল।

সুধীর বলিল, "আপনার একখানা বই প'ড়ে ওর মনে

এই সঙ্কল্প হয়েছিল যে, দেশ ছেড়ে আর কোথাও যাবে না। আর যেখানে অভাবগ্রস্ত নারীকে দেখতে পাবে, এখানে এনে তাদের সকল রকমে কাজের উপযুক্ত ক'রে তুলবে। আমি তাতে বাধা দেই নি। সেই ত দেশের যথার্থ কাজ।"

গৃহিণী, তরুণীর চিবুক তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "মা যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা!"

আমি বলিলাম, "শুধু তাই নন, আমার গৌরী-মা, আবার অসুরনাশিনী মূর্ত্তিও ধরতে পারেন।"

সুধীর হাসিতে হাসিতে বলিল, "এই গ্রামের অনেকগুলি ছোট মেয়েকে রোজ ব্যায়াম শেখান হয়ে থাকে। আমি বছরের মধ্যে ৪।৫ বার এখানে আসি। ব্যবসার সব কাজ এখন কল্‌কাতায় তুলে এনেছি, তবু বেশী দিন এখানে থাক্‌তে পারিনে।"

এমন সময় ৩।৪টি দশ এগার বৎসরের বালিকা আমাদের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের কৃষ্ণবর্ণ দেহে উজ্জ্বল আভা দেখিয়া নয়ন তৃপ্ত হইল।

"দেখবেন, জ্যেঠামশাই, আর কয়েক বছরের মধ্যে আমাদের গ্রামের কোন মেয়ের আর পিলে রোগ থাক্‌বে না। রীতিমত কাজ ও ব্যায়াম-চর্চ্চায় তাদের মানুষ ক'রে তুলব, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন।"

আমার কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিয়াছিল। কষ্টে আত্ম-সংবরণ করিয়া তরুণীর মস্তকে হাত রাখিয়া বলিলাম, "মা, তোমার মত মেয়ে বাঙ্গালা দেশে হাজারকরা এক জনও যদি জন্মে, তা হ'লে দেশের চেহারা ফিরে যাবে। আর বাবা সুধীর, তোমাকে আশীর্ব্বাদ করবার ভাষা আমার খুঁজিতে নেই।"

শরতের ফুল—ভাদ্র, ১৩৩২।

বৈশাখী

১

"শীঘ্র এস"—সংক্ষিপ্ত টেলিগ্রামখানা পুনঃ পুনঃ পড়িয়াও অর্থ উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। গৃহিণী যে তার করিয়াছেন, তাহা নিম্নের নাম হইতেই বুঝিতে পারিতেছি; কিন্তু জরুরী তার করিবার এমন কি প্রয়োজন ঘটিল? তিনি ত জানেন, আমার ছুটী মঞ্জুর হইয়াছে, শীঘ্রই কলিকাতার নবনির্ম্মিত বাড়ীতে চারি মাস বিশ্রামলাভের জন্ম যাইতেছি!

ক্ষুদ্র সংবাদ—বিস্তৃত বিবরণহীন সংক্ষিপ্ত সংবাদ মানুষের মনকে নানা অনিশ্চিত আশঙ্কায় বিচলিত ও উৎকণ্ঠিত করিয়া তুলে—বিশেষতঃ যদি শীঘ্র আসিবার আহ্বান তাহাতে থাকে। আগামী কল্য হইতেই আমার অবকাশ। চার্জ্জ বুঝাইয়া দিয়া আসিয়াছি, সুতরাং আজ রাত্রির গাড়ীতেই রওনা হইব।

আদালতের পোষাক ছাড়িয়া আবার টেলিগ্রামখানির উপর দৃষ্টি বুলাইয়া লইলাম।

না—কাহারও পীড়া হইয়া থাকিলে সে সংবাদ এমনভাবে আসিত না। লেক রোডের ধারে ফাঁকা জমীর উপর নূতন অট্টালিকায় আজ এক মাস তাঁহারা বাস করিতেছেন। পূর্ব্বে যে সকল পত্র পাইয়াছি, তাহাতে সকলেই পরমানন্দে নূতন ভবনে শান্তিভোগ করিতেছেন জানাইয়াছেন। আমি সেখানে গেলে গৃহপ্রবেশ উপলক্ষে আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবকে উৎসব-ভোজে নিমন্ত্রণ করিব, এইরূপ ব্যবস্থাই আছে। গৃহিণীকে আজ দুই দিন হইল লিখিয়া দিয়াছি, ছুটী মঞ্জুর, শীঘ্র যাইতেছি। সে পত্র তিনি নিশ্চয়ই পাইয়াছেন। তবে এই রহস্তময় জরুরী আহ্বান কেন?

কল্পনা উর্ণনাভের সূক্ষ্মতন্তুজালের মধ্য দিয়া মনকে টানিয়া লইয়া চলিল। পল্লীসহরের ভারপ্রাপ্ত সরকারী হাকিম-রূপে শত সহস্র লোকের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াও দুশ্চিন্তার ঘূর্ণিপাক হইতে অব্যাহতি নাই। আশ্চর্য্য বিধিলিপি বটে!

দেরাজটা খুলিয়া ফেলিয়া শ্রান্তিহারিণীর শরণাপন্ন হইবার বাসনা জন্মিল। অনেক দিন হইতেই এ অভ্যাসকে অঙ্গের ভূষণ করিয়া লইয়াছিলাম। গৃহিণীর সাক্ষাতে উহা চলিবার উপায় ছিল না। সহকর্ম্মীদিগের বাসায় পরিমিত মাত্রায় সে অভ্যাসের সার্থকতা সম্পাদন করিতে হইত। কিন্তু তিনি সরেজমিনে হাজির ছিলেন না, কাজেই নিরাপদে নিজের বাসাতেই শ্রান্তিহারিণীর অর্চ্চনা চলিত।

তারের সংবাদটি বোমার মত মনের রাজ্যে একটা বিকট বিভীষিকার সৃষ্টি করিয়াছিল। অন্ততঃ যুগল "পেগ" প্রযুক্ত না হইলে শৃঙ্খলা রক্ষিত হইবে না।

দেরাজ খুলিয়া দেখিলাম, আধারটি পরম নিশ্চিন্তভাবে শূন্যগর্ভ হইয়া বিরাজিত। গতকল্য বন্ধুসহবাসে নৃত্যচঞ্চলা তরলা যে কাচের আধার ত্যাগ করিয়া প্রাণময় আধারে আধারে নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন, সে কথাটা এতক্ষণ মনে ছিল না।

"রহমন্!"

"জী, হুজুর!"—আর্দ্দালী শশব্যস্তে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সপুত্র-কন্যা গৃহিণীর কলিকাতা প্রস্থানের পর হইতেই রহমন্ আমার যাবতীয় ব্যবস্থার ভার লইয়াছিল।

শূন্যগর্ভ বোতলটির প্রতি ইঙ্গিত করিবামাত্র, বুদ্ধিমান্ আর্দ্দালী টেবলের উপর রক্ষিত ১০ টাকার নোটখানি তুলিয়া লইয়া দ্রুত বাহির হইয়া গেল।

আরাম-কেদারায় শয়ন করিয়া কক্ষটির চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। গৃহিণীর সহিত অন্যান্য দ্রব্য পাঠাইয়া দিয়াছি। নিজের প্রয়োজনীয় সামান্য দ্রব্যগুলি এখন গুছাইয়া লইতে পারিলেই হয়। চেয়ার-টেবলগুলি যিনি কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার কাছেই আপাততঃ থাকিবে।

সারাদিন বড় পরিশ্রমই গিয়াছে। এখন একটু ধাতুস্থ না হইতে পারিলেও চলিতেছে না। রহমন্ এখনও আসি-তেছে না কেন? বাতায়নপথে বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, পাঁচটার সময় প্রখর বৈশাখের রৌদ্র এখনও রাজপথের বক্ষো-দেশ হইতে বৃক্ষশিরে আশ্রয় গ্রহণ করে নাই।

"হুজুর!—"

শূন্য হস্তে রহমনকে কুণ্ঠিতভাবে প্রবেশ করিতে দেখিয়া আমি বিস্মিত হইলাম।

ব্যাপার কি? রহমন্ সংক্ষেপে জানাইল, সে দোকানে প্রবেশ করিতে পারে নাই। দোকান বন্ধ ছিল? না, খোলাই আছে, কিন্তু—কিন্তু—

প্রশ্ন করিয়া বুঝিলাম, দোকানের সম্মুখে 'পিকেটিং' চলিতেছে। পল্লীসহরের অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা কর-যোড়ে সকলকে সুরাক্রয়ে বিরত থাকিবার জন্য অনুরোধ করিতেছেন। রহমন্ তাই লজ্জায় আর দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই।

ক্রোধে সর্ব্বশরীর জ্বলিয়া উঠিল। হাকিমী রক্ত এই অনধিকারচর্চ্চার বিবরণে ধমনীর মধ্যে উদ্দাম তালে নৃত্য করিয়া উঠিল। হ্যাঁ, এই পল্লীসহরে অর্দ্ধনগ্ন গন্ধীজীর প্রবর্ত্তিত লবণ-আইন অমান্য ব্যাপার লইয়া কয় দিন হইতে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা চলিতেছে। গতকল্য এ জন্য পুলিস কয় জনকে চালান দিয়াছিল। এই সকল নির্ব্বোধ কাণ্ডজ্ঞানহীনকে হাজতে পাঠাইয়াছি। এখন দেখিতেছি, লবণ-আইন অমান্যের সঙ্গে সঙ্গে সুরা-বর্জ্জনের ব্যাপারও আরম্ভ হইল। আবার সম্ভ্রান্তঘরের মহিলারাও এ কার্য্যে অগ্রসর!

ক্ষিপ্তপ্রায় অবস্থায় ভ্রমণযষ্টি লইয়া রাজপথে বাহির হইয়া পড়িলাম। রহমন্ সঙ্গে আসিবে কি না, জিজ্ঞাসা করায় তাহাকে নিষেধ করিলাম। আজ রাত্রির গাড়ীতেই যাত্রা করিতে হইবে; সুতরাং প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া একাই দোকানের দিকে চলিলাম।

উপরওয়ালার ভ্রূভঙ্গী ব্যতীত আজ পর্য্যন্ত সাধারণ কোন মানুষকেই গ্রাহ্য করি নাই। লজ্জা, সঙ্কোচ, ভয় করিবার মত সহরে কেহই ছিল না। এ অঞ্চলে ২ বৎসরকাল অপ্রতি-হতপ্রভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছি। ধনি-নির্ধন, ইতর-ভদ্র সকলেই আমার প্রসাদপ্রার্থী ছিলেন। উদ্ধত গর্ব্বের সহিত দোকানের দিকে অগ্রসর হইলাম।

মথুর শাহার দোকানের সম্মুখে সত্যই রীতিমত জনতা হইয়াছে। পুলিস কি করিতেছে? অবৈধ জনতা ভাঙ্গিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য নহে কি? বেলা ২টার পর মহকুমার চার্জ্জ রমেশ বাবুকে বুঝাইয়া দিয়াছি। বর্ত্তমান ব্যবস্থার মালিক তিনি। কিন্তু তিনি নীরব কেন?

অপ্রসন্ন-চিত্তে অগ্রসর হইলাম। কয়েক জন পুলিস-প্রহরী জনতা হইতে কিছু দূরে দীর্ঘ যষ্টি হস্তে নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়-মান। তাহারা আমাকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে সেলাম করিল। অতি কষ্টে মনের ভাব দমন করিয়া দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, প্রায় ৬।৭ জন খদ্দরধারিণী পুরমহিলা দোকানের প্রবেশপথে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাদের সীমন্তে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু, মুখে প্রসন্ন স্নিগ্ধ হাস্য!

উন্নতশিরে আমি দোকানের প্রবেশপথের দিকে চলিলাম। দেখিলাম, মথুর শাহা স্তব্ধভাবে দ্বারপথে দাঁড়াইয়া আছে। মহিলারা আমাকে দেখিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন না; সহজভাবেই দাঁড়াইয়া রহিলেন। এক জন মধুর অথচ সুস্পষ্ট ভাষায় করযোড়ে বলিলেন, "সুরা অস্পৃশ্য, আপনি ভদ্রসন্তান, আশা করি, আপনি উহা কিনি-বেন না।"

ভাবিয়াছিলাম, আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সরিয়া দাঁড়াইবেন—লজ্জা ও সঙ্কোচে অন্ততঃ আমাকে কোনরূপ অনুরোধ করিবেন না। কিন্তু—

মিথ্যা বলিব না, এই পুরকামিনীদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া সত্যই আমারও উৎসাহ অন্তর্হিত হইয়াছিল। মানসিক দুর্ব্বলতার জন্য অন্তরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলাম।

কঠোরস্বরে বলিলাম, "এ আপনাদের অন্যায়; জানেন, দেশের আইন-বহির্ভূত কাজ আপনারা কচ্ছেন?"

অপেক্ষাকৃত তরুণবয়স্কা এক জন মহিলা স্নিগ্ধস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "জানি; কিন্তু আমরা ব্রত পালন করবার জন্য সহস্র বিপদকে বরণ করতে প্রস্তুত। আপনি পিতৃতুল্য, কন্যার প্রার্থনা মঞ্জুর করুন। ঘরে ফিরে যান।"

বিস্ময়ে মুহূর্ত্তমাত্র স্তব্ধভাবে দাঁড়াইলাম। না—মাতৃ-জাতীয়াদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দোকানের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি আমার নাই। কি দুর্ব্বল আমি!

কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লইয়া বলিলাম, "আচ্ছা, আপনাদের জন্য আজ বন্ধ রাখলাম।"

তরুণী পূর্ব্ববৎ অকুণ্ঠিত স্বরে বলিলেন, "আমাদের জন্য নয়, দেশের জন্য, জন্মভূমির জন্য বলুন। আর শুধু আজ নয়—চিরদিনের জন্য। আমি আপনাকে চিনি। আপনার মেয়ে অরুণার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব আছে।"

কে যেন আমার পৃষ্ঠে চাবুক মারিল। মুহূর্ত্তমাত্র সেই কল্যাণীর অমলিন মুখের দিকে চাহিয়া মাথা আপনা হইতে নত হইয়া পড়িল। তার পর দ্রুতপদে বাসার দিকে ফিরিলাম। পশ্চাতে শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "বন্দে মাতরম্! মহাত্মা গন্ধীজীকি জয়!"

২

মহাত্মা গন্ধীর জীবনচরিত সম্বন্ধে আমার মোটামুটি একটা জ্ঞান ছিল না, এ কথা অস্বীকার করিব না। কিন্তু আমি তাঁহার অহিংসনীতির মর্ম্ম কখনও বুঝি নাই, তাঁহার কার্য্যপ্রণালীর সহিতও আমার সহানুভূতি ছিল না। যাঁহারা রাজসরকারে কাজ করেন—দেশের শাসন-ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদের পক্ষে গন্ধীজীর নীতি মনে-প্রাণে ও ব্যবহারে মানিয়া চলিবার প্রবৃত্তি নাই, উপায়ও নাই। বিশেষতঃ শাসনব্যাপারে যাঁহারা ব্যুরোক্রেশীর অঙ্গস্বরূপ, তাঁহারা এই নীতিকে এবং কার্য্যপ্রণালীকে দেশের কল্যাণকর বলিয়া ভাবিবার সুযোগ ও সুবিধা পান নাই।

রাজপথে দ্রুতপদবিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে এই কথাই ভাবিতেছিলাম। একটা পাণের দোকান দেখিয়া বেহারী পাণওয়ালাকে বলিলাম, "এক প্যাকেট কাঁচিমার্কা সিগারেট ?"

ললাটে যুক্তকর ঠেকাইয়া লোকটা বলিয়া উঠিল, "হুজুর! এক বাণ্ডিল বিড়ি লিজিয়ে।"

রক্ত গরম হইয়া উঠিল। কঠোর কণ্ঠে বলিলাম, "হাম্ যো চিজ্ মাঙ্গতা, উহি দেও।"

পাণওয়ালা নরমসুরে বলিল, "বিলকুল নেহি, হুজুর! গন্ধীরাজকা হুকুম, সিগারেট আউর বেচেগা নেহি, হুজুর!"

বাঃ! গন্ধীরাজ আরম্ভ হইল দেখিতেছি!

এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া, উদ্যত ক্রোধ সংবরণ করিয়া বলিলাম, আমি যাহা চাহিতেছি, সে যদি তাহা না বিক্রয় করে, তবে আমি তাহাকে পুলিসে চালান দিব। অবশ্য আমি মনে মনে জানিতাম যে, কোনও জিনিস বিক্রয় না করার অপরাধে কাহাকেও শাস্তি দিবার বিধান সভ্য-সমাজে নাই। কিন্তু দীর্ঘকালের হাকিমী মেজাজ একটা সামান্ত পাণওয়ালার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহাকে ভীতিপ্রদর্শন করা সত্ত্বেও লোকটা অবিচলিত নম্রতার সহিত পুনঃ পুনঃ তাহার দক্ষিণকর ললাটে স্পর্শ করিতে লাগিল। আমার পরিচয় তাহার জানা ছিল কি না, বুঝিলাম না; কিন্তু সে যে বিন্দুমাত্র ভীত হয় নাই, তাহা বুঝিলাম। আমাকে তদবস্থায় দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া সে এক বাণ্ডিল বিড়ি আমার সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "বহুৎ মিঠা বিড়ি, হুজুর!" সঙ্গে সঙ্গে সে বুঝাইয়া দিল—মাত্র তিনটি পয়সা দিলেই এ গোলাপী বিড়িগুলি আমি পাইতে পারিব।

কয়েক জন লোক বোধ হয় আমাদের কথোপকথন শুনিতে পাইয়াছিল। তাহারা একে একে দোকানের কাছে আসিতে লাগিল। বিরক্ত হইয়া আমি নিষ্ফল ক্রোধে বাসার দিকে দ্রুত চলিলাম।

উপর্য্যুপরি দুইটি প্রিয় নেশার বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া মনে যে ক্ষোভ, ক্রোধ ও উত্তেজনা জন্মিয়াছিল, সন্ধ্যার স্নিগ্ধ বাতাসে ক্রমে যেন তাহা অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কাণের মধ্যে তরুণীর স্নিগ্ধ কণ্ঠের মধুর অথচ স্পষ্ট কথা কয়টি পুনঃ পুনঃ জটলা করিতে লাগিল—"আমাদের জন্য নয়, দেশের জন্য—জন্মভূমির জন্য বলুন!"

আমার দেশকে, আমার দেশবাসীকে জ্ঞানসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই দেখিয়া আসিতেছি। বাঙ্গালী জাতিকে ভাল করিয়া বুঝিবার অবকাশ কি এত দিনে পাই নাই? আমার পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে—একবিংশ বর্ষের হাকিমী জীবনের অভিজ্ঞতায়, বাঙ্গালার শত সহস্র মানুষের সহিত নানাভাবে পরিচয় ঘটিয়াছে। স্বার্থপরতা যাহাদের অস্থিমজ্জাগত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, বিলাসভোগের স্পৃহা যাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিয়াছে, কবির ভাষায় যাহাদের স্বরূপ চিত্র জগতের সমক্ষে সমুজ্জ্বলভাবে পরিস্ফুট, সেই বাঙ্গালী জাতি কি সত্য সত্যই দুঃসাহসিক কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিতে উদ্যত? অসূর্য্যম্পশ্যা হিন্দু-ঘরের কুল-মহিলারা মদের দোকানে পিকেটিং করিতেছেন! কলিকাতার সংবাদপত্রে এমন অনেক বিবরণ ইদানীং মুদ্রিত হইতেছে সত্য, কিন্তু বঙ্গের পল্লীসহরে—এ যে অভাবনীয় ব্যাপার!

চিন্তিত-মনে বাসায় ফিরিয়া রমেশ বাবুর দেখা পাইলাম। রহমনের কাছে আজই আমার কলিকাতা-যাত্রার সংবাদ পাইয়া তিনি দেখা করিতে আসিয়াছেন।

আমার উত্তেজিত মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "ব্যাপার কি, জগদীশ বাবু?"

সংক্ষেপে তাঁহাকে সকল ঘটনার কথা বলিলাম।

রমেশ বাবু চিন্তিতভাবে বলিলেন, "সমস্যা কঠিন সন্দেহ নাই। এ সময়ে আপনি ছুটীতে যাচ্ছেন, এ জন্য—এক একবার আমার হিংসা হচ্ছে।"

বার কয়েক হলঘরে পরিক্রমণ করিয়া আমি বলিলাম, "মহকুমার ভার নিয়েছেন, খুব হুঁসিয়ার হয়ে চল্‌তে হবে। অনাচারের প্রশ্রয় দেওয়া চল্‌বে না, রমেশ বাবু।"

"তা জানি। যথাসাধ্য কর্ত্তব্যপালন করেই যাব। আপনি আজই যাচ্ছেন ত?"

"জরুরী তার পেয়েছি। জানি নে, কলকাতায় সব কেমন আছে।"

তার পর রমেশ বাবুর সঙ্গে কি ভাবে তিনি কাজ করিবেন, সে বিষয়ে কিছু গোপন পরামর্শ দিলাম। তিনি এ দেশে নূতন মানুষ—শাসনযন্ত্রের আইনকানুনগুলা সুপ্রযুক্ত না হইলে বিপদের সম্ভাবনা—অন্ততঃ চাকুরী সম্বন্ধে ত বটেই!

রমেশ বাবু এ অঞ্চলে নূতন হইলেও সরকারের কাজে চুল পাকাইয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দ্বারা উপযুক্ত ব্যবস্থা হইতে পারিবে।

নিশ্চিন্ত-মনে যাত্রার আয়োজনে তখন মন দিলাম।

৩

"ব্যাপার কি? জরুরী তার করেছিলে কেন?"

এতক্ষণ গৃহিণীর মুখের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। তাঁহার অঙ্গের দিকে চাহিতেই চমকিয়া উঠিলাম। এ কি? আমার সহধর্ম্মিণীর অঙ্গে ও কি দেখা যাইতেছে?

চশমাটা খুলিয়া লইয়া রুমালে মুছিয়া ফেলিলাম।

না, দৃষ্টিবিভ্রম নহে। মোটা খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউজে তাঁহার গৌর তনু সমাচ্ছাদিত। যে অঙ্গে সর্ব্বক্ষণের জন্য অর্গাণ্ডির ব্লাউজ ও অতি সূক্ষ্ম বৈদেশিক সূতা-নির্ম্মিত শাড়ীর শোভা দেখিতাম—সূক্ষ্মবস্ত্র নহিলে যাঁহার মাথা গরম হইয়া উঠিত, নিশ্বাসরোধের উপক্রম হইত, তাঁহার মেদস্ফীত দেহে খদ্দর?

অদূরে অরুণা দাঁড়াইয়াছিল। তাহার মুখে ক্লিষ্টভাবের রেখা। তাহারও অঙ্গে অনুরূপ খদ্দরের পরিচ্ছদ।

বিস্ময়ে আমি হতবাক্ হইয়া সম্মুখের চেয়ারে বসিয়া পড়িলাম। বসিবার ঘরের চারিদিকে চাহিয়া মনে হইল, এ যেন আমার ঘর নহে—মহকুমার ভারপ্রাপ্ত হাকিম শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র চৌধুরীর ড্রয়িং-রুম নহে। টেবল, চেয়ার, আলমারী সবই আছে বটে, দেওয়ালে চিত্রের অভাব নাই; কিন্তু অধিকাংশই খদ্দরমণ্ডিত—চিত্রগুলির মধ্যে বিবেকানন্দ, মহাত্মা গন্ধী, দেশবন্ধু, লালা লজপৎ রায় প্রভৃতির চিত্রই সমগ্র প্রাচীর আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে।

গৃহিণী সম্ভবতঃ আমার মনের অবস্থা বুঝিয়াছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে আমার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন। স্বহস্তে আমার কোট, টুপী, জামা পূর্ব্ব-অভ্যাসমত খুলিয়া লইয়া বলিলেন, "আগে হাত-মুখ ধুয়ে চা খাও, তার পর সব বলব।"

বুঝিলাম, কি একটা রহস্য যেন আত্মপ্রকাশের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। খদ্দরের প্রাচুর্য্য এবং সমগ্র আবেষ্টনের পরিবর্ত্তনে আমি যে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইয়াছিলাম, তাহা অস্বীকার করিব না। কিন্তু গৃহিণীকে আমি চিনিতাম। তাঁহাকে যে আমি সত্যই একটু সমীহ—শুধু সমীহ নহে, একটু ভয় করিয়াই চলিতাম, তাহা অস্বীকার করিব না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাইয়া আমার গৃহকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, আমার ঘরে আসিবার সময় তিনি ৫০ হাজার টাকা নগদ ও বার্ষিক ৩ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি ধনী পিতার নিকট হইতে লইয়া আসিয়াছিলেন। তাহা ছাড়া এই লেক্ রোডের নব-নির্ম্মিত অট্টালিকা তাঁহার বৃদ্ধ পিতারই দান।

অরুণা তাহার জননীর ইঙ্গিতে চা তৈয়ার করিবার জন্য গৃহান্তরে গেল বুঝিলাম। মেয়েটি তাহার জননীরই মত স্বল্পভাষিণী এবং বুদ্ধিমতী। ১৭ বৎসর বয়স হইলেও এখনও তাহাকে পাত্রস্থ করিতে পারি নাই।

সে এবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়াছে। প্রস্তাবিত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার অভিপ্রায়েই আমার এই দীর্ঘ অবকাশ গ্রহণের প্রধান কারণ।

চারিদিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলাম, "প্রভাতকে দেখছি না যে? সে কোথায় গেল? তার দাদুর ওখানে না কি?"

"বলছি" বলিয়া গৃহিণী ভৃত্যগণকে আমার আনীত দ্রব্যাদি গুছাইয়া রাখিবার আদেশ দিতে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

জানি না, কেন অন্তরে একটা বিরাট পাষাণ-চাপ অনুভব করিতেছি।

এক ডিশ লুচি, তরকারী ও এক পেয়ালা চা লইয়া অরুণা লঘু-মন্থর-চরণে ঘরে প্রবেশ করিল। দাসদাসী সত্ত্বেও আমার এই জননীরূপিণী মেয়েটি বাল্যাবধি পিতার পরিচর্য্যার অনুরাগিণী। সে বেশী কথা বলিত না, কিন্তু তাহার স্নেহ-কোমল হৃদয় যে জনক-জননীর সেবার জন্য ব্যাকুল, সহস্র ব্যাপারে প্রত্যহ তাহার নিদর্শন পাইয়াছি। পুত্র প্রভাতও

একান্ত পিতৃমাতৃভক্ত। আজ পর্য্যন্ত সে কখনও আমার অনভিমতে কোন কার্য্যই করে নাই। সন্তানভাগ্যের জন্য আমি ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ। প্রভাত আই, এ পরীক্ষাতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বৃত্তি পাইতেছিল।

মুখপ্রক্ষালনের পর মায়ের আনীত দ্রব্যের সদ্ব্যবহারে মন দিলাম। অরুণার শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া মনে করিলাম, আষাঢ়ের প্রথমেই মা-লক্ষ্মীকে পাত্রস্থা করিবই। কিন্তু মনের মধ্যে অমূর্ত্ত আশঙ্কার—অস্বস্তির কম্পন এখনও থামিতেছে না কেন? বাড়ীর বাতাস এত ভারী মনে হইতেছে কেন?

গৃহিণী ফিরিয়া আসিলেন। শান্তকণ্ঠে বলিলাম, "তোমাদের সব হয়েছে কি? সবাই খদ্দর প'রে মস্ত দেশভক্ত হয়ে পড়েছ দেখছি। কিন্তু তুমি ত জান, আমি এ সব পছন্দ করি না।"

বিশেষ সতর্কতা সহকারে বলিলেও বুঝিলাম, অস্বস্তি, পুঞ্জীভূত ক্রোধ এবং অনিশ্চিত আশঙ্কার প্রভাবে কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা প্রকাশ পাইল।

গৃহিণী মুহূর্ত্তমাত্র স্থির-দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন। তার পর সহসা বলিয়া উঠিলেন, "ছেলে কোথায় আছে, শুন্‌তে চাও?"

ইহা আমার প্রশ্নের উত্তর নহে। সুতরাং সত্যই চমকিয়া উঠিলাম। আসন্ন ঝটিকার পূর্ব্বে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ মেঘমূর্চ্ছিত আকাশের যেরূপ অবস্থা হয়, তাঁহার আননে যেন তাহারই আভাস দেখিতে পাইতেছি।

অরুণা মুখ ফিরাইয়া বাতায়ন-পথে নিবিষ্ট-মনে কি যেন দেখিবার অভিনয় করিতেছিল।

লুচির পাত্র খালি করিয়া সবে তখন চায়ের পেয়ালাটা তুলিয়া লইয়াছিলাম; সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "কেন? কি হয়েছে তার?"

"তোমার ছেলে সেন্‌ট্রাল জেলে।"

সেন্‌ট্রাল জেলে?—কারাগারে? বংশের দুলাল, জীবনের ধ্রুবতারা, জগদীশ চৌধুরীর একমাত্র পুত্র নিকৃষ্ট অপরাধীর ন্যায় কারাকক্ষের পাষাণ-প্রাচীরে আবদ্ধ?

হস্তচ্যুত পেয়ালা কখন্ ভূমিতলে সহস্র খণ্ডে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সে খেয়াল ছিল না। কন্যা ও গৃহিণীর দিক্ হইতে শূন্যদৃষ্টি কক্ষতলে নিবদ্ধ হইল। আমি স্বপ্ন দেখিতেছি না ত?

কম্পিত চরণদ্বয়কে প্রচণ্ড বলে অনায়াসে সংযত করিয়া গৃহিণীর পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দক্ষিণ হস্ত গৃহিণীর স্কন্ধদেশে রক্ষা করিয়া ঝাঁকানি দিয়া বলিলাম, "কি বলছ তুমি?"

আননে কি পাণ্ডুরতার ছায়া? দীর্ঘায়ত নয়নে ও কি! অশ্রুবিন্দু? না, না, হয় ত আমারই দৃষ্টির ভ্রম।

চির-স্থৈর্য্যময়ী স্বভাবগম্ভীরকণ্ঠে বলিলেন, "যা বলেছি, সব সত্য। তাই তোমাকে তার করেছিলাম।"

"কিন্তু কেন?"

"নিষিদ্ধ নুণ বিক্রী করার অপরাধে।"

অসহযোগ?—সত্যাগ্রহ? এ সংবাদ শুনিবার পূর্ব্বে আমার মস্তকে বজ্রাঘাতও প্রার্থনীয় ছিল। সরকারের নিমকভোগী, কর্ত্তৃপক্ষের পরম বিশ্বাসভাজন, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ভক্ত জগদীশ চৌধুরীর পুত্র প্রচলিত আইন অমান্য করিয়া কারা-বরণ করিয়াছে? এ সংবাদ যখন ভাগ্যবিধাতাদিগের কর্ণগোচর হইবে—এত দিনে কি তাহা বাকী আছে?—তখন কি আর মার্জ্জনা মিলিবে? হায়! হায়! এ কি ভীষণ সর্ব্বনাশ ঘটিল? জেলার হাকিম হইবার আসন্ন সুযোগ, রায় বাহাদুর পদবী লাভের আশু সম্ভাবনা—সবই ত বঙ্গোপ-সাগরের অতল সলিলগর্ভে সমাধি লাভ করিল!

দীর্ঘকাল প্রাণপণ যত্নে পত্নী-পুত্রকন্যাকে নিষ্ঠুর সংক্রামক ব্যাধির কবল হইতে রক্ষা করিয়া আসিয়াছি, স্বদেশজাত কোনও দ্রব্য আমার গৃহের চতুঃসীমানার মধ্যে প্রবেশাধিকার পায় নাই—আন্দোলন ত দূরের কথা। সেই আমার গৃহে এ কি উৎপাত? আমার স্ত্রী-কন্যার অঙ্গে খদ্দর, আমার আশাভরসাস্থল একমাত্র পুত্র আইন অমান্য করিয়া কারাগারে?

ক্রোধে, ক্ষোভে, নৈরাশ্যে সমগ্র অন্তর মথিত হইতে লাগিল। চীৎকার করিয়া বলিলাম, "হতভাগা নিজেও গেল, আমারও সর্ব্বনাশ—"

"ভয় নেই। তোমার সর্ব্বনাশ সে করেনি। নীরবে প্রহার সহ্য করেছে, তবু সে নিজের কোন পরিচয় দেয় নি। তোমার ভবিষ্যৎ নষ্ট হয় নি। নিজের কাজে সে নিজেই শাস্তিভোগ করবে।"

গৃহিণীর উদ্দীপ্ত নয়নের দিকে দৃষ্টি স্থির রাখিতে পারিলাম না। কশাহত কুকুরের অবস্থার সহিত আমার অবস্থার পার্থক্য হয় ত না-ও থাকিতে পারে; কিন্তু কণ্ঠস্বরে জোর দিয়া বলিলাম, "তোমার ছেলে ক্ষেপেছে ব'লে যে সবাইকে পাগল হয়ে আত্মহত্যা করতে হবে, তার কোন মানে নেই। ওকে ৬টি মাস ঘানি টান্‌তে হবে। আমি ওর জন্য—"

করপল্লব আন্দোলিত করিয়া গৃহিণী মৃদু হাসিলেন। সে হাসি বিদ্রূপ অথবা উপেক্ষার বজ্রাগ্নিপূর্ণ কি না, বুঝিতে পারিলাম না। স্থিরকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমার কিছু করতে হবে না। কেনই বা করবে? সে হতভাগা, তার মা-বোন্‌ই তার দুঃখের অংশ গ্রহণ করবে।"

স্থির-দৃষ্টিতে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তোমাদের মতলব কি? আমি বাড়ীর কর্ত্তা নই? আমার সঙ্গে বিদ্রোহ করা কি লেখাপড়া শেখার ফল?"

ধীরে ধীরে নত হইয়া, আমার পদধূলি গ্রহণ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "জীবনে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করিনি। কিন্তু তুমি পুরুষমানুষ, মা'র মনের অবস্থা বুঝবার শক্তি তোমার নেই। আমি শুধু মায়ের কর্ত্তব্য পালন করব।"

"তার মানে?"

"খুব সোজা কথা। আজ যারা—বুদ্ধির দোষেই হোক্, আর যে জন্যেই হোক্, কারাগারে গেছে, তাদের মা, বোন্, স্ত্রী-কন্যারা মিলে স্থির করেছেন, তাদের কি অবস্থা ঘটছে, সঠিক না জানা পর্য্যন্ত সকলে কারাদ্বারে ধন্না দিয়া থাক্‌বেন। জনরব, তাদের অবস্থা খারাপ হয়েছে।"

অন্যায়, ঘোর নির্ব্বুদ্ধিতা! এরূপ মনোবৃত্তির, এমন কার্য্যের অনুমোদন করিতে আমার দীর্ঘকালের অভ্যাস প্রতিবাদ করিয়া উঠিল।

বলিলাম, "অধিকার-সীমার বাইরে গেলে শাস্তি পেতেই হবে, নিয়ম-লঙ্ঘনের দণ্ড এড়াবার উপায় নেই। প্রকৃতির রাজ্যেও যেমন, মানুষের রাজ্যেও ঠিক তাই।"

অবিচলিত-কণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "তোমার সঙ্গে তর্ক করা অন্যায়; করবার প্রবৃত্তিও নেই। নিয়ম-লঙ্ঘনের ফলে তোমাদের বিচারে যা শাস্তি আছে, দাও; কিন্তু প্রহারের অধিকার সভ্যসমাজ স্বীকার করেন কি?"

গৃহিণী দাঁড়াইলেন না। দৃঢ়-লঘুচরণে তিনি কক্ষত্যাগ করিলেন।

"অরুণা!"

কন্যা ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার সুগৌর মুখমণ্ডলে স্থির-প্রতিজ্ঞার দীপ্তি সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

"তুমিও কি তোমার গর্ভধারিণীর কথায় নেচে উঠেছ? জান, আর দু'দিন পরে যার সঙ্গে তোমার বিয়ে হবে, সে-ও আমার মত এক জন হাকিম?"

স্নিগ্ধ, অকম্পিত স্বরে অরুণা ধীরে ধীরে বলিল, "বাবা, আমার অপরাধ নিও না।"

অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর। বিচলিত-স্বরে সক্ষোভে বলিয়া উঠিলাম, "যা ইচ্ছা কর গে।"

৪

কিন্তু সান্ত্বনা কোথায়? চিত্ত কোনও মতেই আশ্বস্ত হইতেছে না। এ কি দুর্দ্দৈব, ভগবান্!

হাঁ, ভগবান্‌কে চরম দুঃখেই মানুষের মনে পড়ে। এত দিন এমন ভাবে কখনও তাঁহার কথা ভাবি নাই।

মান-সম্ভ্রম, প্রতিপত্তি, পদগৌরব যে কোন মুহূর্ত্তেই এই সকল অবিবেচক লোকের নির্ব্বুদ্ধিতায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু এমন শক্তিও ত নাই যে, তাহাদিগকে আমার মতে ফিরাইয়া আনিতে পারি?

আহারাদির পর কন্যাকে লইয়া গৃহিণী বাহির হইয়াছেন। প্রশ্নের উত্তরে গন্তব্য স্থানের পরিচয় না দিয়া শুধু মৃদু হাসিয়াছিলেন। এই মৃদু হাস্যই সাংঘাতিক, আমি উহাকে সত্যই ভয় করি।

আকাশে মেঘ করিয়াছে। স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া আছি। মেঘলোকের অপর প্রান্তে কি আশার আলোক প্রদীপ্ত?

তন্দ্রাতুর নেত্রের সম্মুখে একখানি কচি মুখ ভাসিয়া উঠিল। কৃষ্ণ-কুঞ্চিত কেশরাজি সুগঠিত মস্তকে তরঙ্গায়িত হইতেছে। সরল, প্রসন্ন, উজ্জ্বল নয়নে মায়ালোকের অপূর্ব্ব দীপ্তি! নবনীত-কোমল দেহের স্পর্শ স্বর্গলোককে ধরায় নামাইয়া আনে নাই ত?

আমার মাদু, আমার সোনা, আমার বংশতিলক! বুকে চাপিয়া তৃপ্তি পাই না—আমার সর্ব্বাঙ্গে সর্ব্বক্ষণ তোর স্নেহ-স্পর্শ অক্ষুণ্ণ থাকুক!

"বাবা! বাবা!—"

আঃ! কাণ জুড়াইয়া গেল, মনুষ্যজন্ম সার্থক হইল। ওরে আমার সর্ব্বস্ব—

তন্দ্রা টুটিয়া গেল, নির্ম্মম অমোঘ সত্য নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় প্রচণ্ড আঘাতে হৃদয়কে পীড়িত করিয়া তুলিল।

পরম স্নেহে, বুকের রক্ত দিয়া যাহাকে গড়িয়া তুলিয়াছি, আজ সে পিতৃদ্রোহী! হাঁ, আজ স্নেহময় পিতার মুখের দিকে না চাহিয়া সে খেয়ালের বশে এই বুকে যে দাগা দিয়াছে, তাহাতে কি তাকে ক্ষমা করা চলে?

অভিমান, ক্ষোভ প্রচণ্ড তেজে বুকের মধ্যে জ্বলিয়া উঠিল। এই উনবিংশবর্ষ বয়সে এমনই অকৃতজ্ঞতা যে সন্তান প্রকাশ করিতে পারে, অন্তরের সমুদয় মাধুর্য্যরস, স্নেহ তাহার দিকে প্রবাহিত হইতে পারে না। পিতার প্রতি সন্তানের গুরুকর্ত্তব্য সে বিস্মৃত হইয়াছে, তাহাকে দয়া করা, ক্ষমা করা অসম্ভব। কিন্তু—কিন্তু—

হায়! স্নেহাতুর পিতৃ-হৃদয়!—কিন্তু কে তাহা বুঝিবে? স্ত্রী বুঝিলেন না, কন্যা বুঝে নাই—পুত্র ত বুঝিতেই চাহে নাই।

অদৃষ্টের গতি কে রোধ করিবে? আগুনে হাত দিলে তাহা পুড়িবেই। ইচ্ছা করিয়া যাহারা অগ্নিতে ঝাঁপ দিতে চাহে, মৃত্যু তাহাদিগের অনিবার্য্য ফল। অপরিণতবুদ্ধির বশে আজ সে যাহা করিয়াছে, তাহার দুঃখময় ফলভোগ করিতেই হইবে। কিন্তু জানিয়া শুনিয়া আমি কোনমতেই ইহার সমর্থন করিতে পারি না। কথা এক দিন প্রকাশ পাইবেই। তখন অরুণার বিবাহেও বাধা পড়িবে না, কে বলিল? মণীশচন্দ্র হয় ত বিবাহ করিতে সাহসী হইবে না।

সব মজাইল দেখিতেছি। প্রভাতকে কলিকাতায় না রাখিলেই ভাল হইত। উহার দাদু এই বৃদ্ধবয়সেও ঘোর স্বদেশী। তাঁহার কি? ব্যবসাদার মানুষ, বহুলক্ষ টাকার মালিক, তাঁহার পক্ষে সখের দেশ-প্রেমিক সাজা আদৌ কঠিন নহে। কিন্তু আমাদের মত যাহারা সরকারী চাকুরীয়া—

চলিয়া চলিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। আর পারি না। দুই হাতে মাথা চাপিয়া একখানি আরাম-কেদারায় বসিয়া পড়িলাম।

নয়ন মুদ্রিত করিয়াও রক্ষা নাই! শুধু তাহারই মূর্ত্তি অন্ধকারেও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিবে?

এখনও গুম্ফ-শ্মশ্রুর রেখা তাহার অকলুষ আননে দেখা দেয় নাই। আয়ত নয়নযুগলে বাল্যের সরল, পবিত্র দৃষ্টি! ঋজু, বলিষ্ঠ দেহে কৌমার্য্যের স্নিগ্ধ মাধুর্য্য!

দুর্ব্বলতা, ঘোর দুর্ব্বলতা!—বিচারনিষ্ঠ অন্তর কখনই দুর্ব্বলতার প্রশ্রয় দিবে না।

ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলাম। দিবার সমস্ত আলোক কখন্ সন্ধ্যার ক্রোড়ে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিল, কিছুই বুঝিতে পারি নাই।

এখনও তাঁহারা ফিরিলেন না কেন?

সম্মুখের উদ্যানে প্রস্ফুটিত বেলফুল বাতাসের তরঙ্গে হিল্লোলিত হইয়া উঠিতেছিল। আমার সমগ্র জীবন এমনই শুভ্র আনন্দের তরঙ্গদোলায় নৃত্য করিয়া আসিয়াছে। আজ কোথা হইতে মসীরেখা সে শুভ্রতাকে আচ্ছন্ন করিল?

অসহ্য! অসহ্য!—

"এই যে আপনি এসে পড়েছেন!"

চমকিতভাবে ফিরিয়া চাহিলাম। এ কি! মণীশচন্দ্র কোথা হইতে আসিল?

দুই হাতে তাহার অবনত দেহকে তুলিয়া ধরিলাম। ভাবী জামাতার আকস্মিক আগমনে আনন্দের সঙ্গে শঙ্কার উদ্বেগও অনুভব করি নাই, ইহা অস্বীকার করিতে পারি না।

বসিবার ঘরে তাহার সঙ্গে প্রবেশ করিলাম।

৫

মৃদু কণ্ঠে মণীশ বলিল, "আসামের জলবায়ু সহ্য হচ্ছিল না। তাই ছুটী নিতে বাধ্য হয়েছি।"

বলিলাম, "তা বেশ করেছ। কত দিনের ছুটী নিলে?"

মণীশচন্দ্রের আননে সূক্ষ্ম হাস্যরেখা প্রকটিত দেখিলাম। সে বলিল, "শরীর যত দিন সুস্থ না হয়!"

সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে ভাবী জামাতার দিকে চাহিয়া বলিলাম, "তার মানে?"

"আজ্ঞে, একটা ব্যবসা করবার সুযোগ ঘ'টে গেছে। বছরখানেক পরীক্ষা ক'রে দেখি, যদি সুবিধা না হয়, তখন ফিরে যাবার চেষ্টা করবো।"

কথাটা আমার আদৌ ভাল লাগিল না। ৩ শত টাকা বেতনের পাকা চাকরী ছাড়িয়া ব্যবসায়ের অনিশ্চিত ঘূর্ণি-পাকে—না, সমীচীন নহে।

বলিলাম, "ভাল কাজ হবে না। নিশ্চিতকে পরিত্যাগ ক'রে অধ্রুবের পশ্চাতে দৌড়ান শাস্ত্রকারদিগেরও নিষেধ। ও সব পাগলামী ছেড়ে দেও।"

নত দৃষ্টিতে মণীশচন্দ্র চাহিয়া রহিল। বুঝিলাম, আমার উপদেশ তাহার হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই।

কাপড়ের খস্‌খস্‌ ও পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই গৃহিণীর খদ্দর-মণ্ডিত বপু দ্বারপথে দেখা দিল। অরুণা একবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই চকিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

মণীশচন্দ্র গৃহিণীর চরণ বন্দনা করিয়া দাঁড়াইল। সম্মুখের আসনে তাহাকে বসিতে বলিয়া গৃহিণী প্রস্থান করিলেন।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আষাঢ়ের প্রথমেই শুভদিনে অরুণার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেলি, কি বল ?"

সলজ্জভাবে মণীশ দৃষ্টি নত করিল।

ছেলেটি বড় ভাল। তরুণ দলের অনেকের মধ্যেই অহমিকা, ঔদ্ধত্য এবং পাণ্ডিত্যগর্ব্বের একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু এই তরুণ, সুশিক্ষিত যুবকের ব্যবহারে আমি কখনও তাহা লক্ষ্য করি নাই। বিধবা মাতার একমাত্র সন্তান, গৃহে স্বচ্ছন্দ-জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের মত জমী-জমা, তালুক এবং কিছু নগদ অর্থও আছে—চাকুরী না করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু স্বাবলম্বী এই ছেলেটির চরিত্রের মাধুর্য্য ও দৃঢ়তা অসম্ভব। নিজের উপার্জ্জনে সে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিগুলি আয়ত্ত করিবার পক্ষপাতী ছিল এবং সেই উপায়েই সে সাফল্যলাভ করিয়াছে।

আষাঢ়ের প্রথমে মণীশচন্দ্রের বিবাহে আপত্তি হইবে না, এ সংবাদ ভাবী বৈবাহিকার পত্রেই জানিয়াছিলাম। মণীশের মৌনভাব দেখিয়া উহা সম্মতির লক্ষণ স্থির করিয়া লইলাম।

গৃহিণী ফিরিয়া আসিলে বলিলাম, "কোথায় গিয়েছিলে ?"

মৃদুকণ্ঠে তিনি বলিলেন, "বাবার কাছে।"

প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া আছি দেখিয়া তিনি বলিলেন, "হিসাবটা ঠিক ক'রে এলাম। বাবা বল্লেন, এত দিনে টাকাটা খাটিয়ে সুদে-আসলে ৪ লাখ হয়েছে।"

গৃহিণীর যৌতুকের টাকাটা ব্যবসায়ে খাটাইবার জন্য শ্বশুর মহাশয়ের হাতেই দিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পরিমাণ যে এত হইয়াছে, উহা কল্পনা করিতে পারি নাই।

গৃহিণী স্নিগ্ধহাস্যে বলিলেন, "তুমি ত এখন ৫ শ' টাকা মাইনে পাচ্ছ। ব্যাঙ্কে যদি ৪ লাখ টাকা জমা রাখি, বছরে তার কত সুদ হ'তে পারে ?"

"অন্ততঃ ২০ হাজার টাকা—"

গৃহিণী তেমনই রহস্যপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, "বিষয়ের আয়ও হাজার তিনেক। এই টাকাতে তোমার মত অবস্থার ৪টি পরিবারের সংসার চলে না ?"

দ্বারপ্রান্তে অরুণা স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে দেখিলাম। তাহার মুখেও রহস্যময় দীপ্তি।

চঞ্চলভাবে দাঁড়াইয়া বলিলাম, "কি বল্‌তে চাও তুমি ?"

অবিচলিতকণ্ঠে গৃহিণী বলিলেন, "কিছুই বল্‌তে চাই না। বলবার কোন কথা আমার নেই।"

বাহিরে ত্রয়োদশীর চন্দ্র আকাশকে আলোকপ্লাবনে ডুবাইয়া রাখিয়াছে। বৃক্ষলতা, তৃণগুল্ম চন্দ্রকিরণে অভিষিক্ত হইতেছিল। কয়েক মুহূর্ত্ত বাতায়ন-পথে দৃষ্টি প্রেরণ করিয়া তাহাই দেখিলাম। তার পর মণীশের দিকে ফিরিয়া বলিলাম, "তা হ'লে আমি পুরোহিতকে ডাকিয়ে একটা দিন দেখি ?"

মণীশ এতক্ষণ স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। আমার প্রশ্নে সচকিত হইয়া উঠিয়া সে বলিল, "আর কিছু দিন থাক না। প্রভাত বাবু ফিরে আসুন।"

মণীশ কি তবে এ বিবাহে অনিচ্ছুক ?

ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলাম, "হতভাগাটা আমার সর্ব্বনাশ না ক'রে ছাড়বে না দেখছি।"

গৃহিণী বলিলেন, "আমাদের সংস্রব তুমি ত্যাগ কর। তোমার উন্নতির অন্তরায় আমরা হ'তে চাই না। আমি মা, সন্তানকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।"

না, আমার মনের অবস্থা কেহই বুঝিবে না। সে যে আমার বুকের একখানা হাড়, গৃহিণী কি তাহা জানেন না ? কিন্তু সরকারী কর্ম্মচারীর দায়িত্বসম্বন্ধে তাঁহার কোন জ্ঞানই নাই।

মণীশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "প্রভাত বাবু যে দিন বাড়ী ফিরবেন, তার পরই যে শুভদিন থাকবে, সেই দিনই আপনার আদেশ নতমস্তকে পালন করবো।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে তোমার অনুগ্রহ, বাবা !"

মণীশ অবিচলিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "না, মা, ও কথা ব'লে আমার অপরাধী করবেন না। সেটা আমার কর্ত্তব্য।"

মণীশ চলিয়া গেলে, অরুণা ধীরে ধীরে কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হাতে একখানি মোটা খদ্দরের ধুতি। সে আসিয়া নত হইয়া আমার চরণে প্রণাম করিয়া বলিল, "বাবা, এই কাপড়খানা আপনি পরুন।"

আমি চমকিত হইয়া উঠিলাম।

অরুণা হাসিয়া বলিল, "আমার নিজের হাতের কাটা সূতো দিয়ে এই কাপড় তৈরী। যা'র হাতের তৈরী কাপড় দাদা পরেছে, এখানা তাঁতে বুনিয়ে আপনার জন্ম আজ এনেছি। খদ্দর পরলে কোন অন্যায় হবে না।"

তাহা হয় না, সে কথা সত্য। খদ্দর পরা অপরাধ নহে, তাহা জানি। কিন্তু—কিন্তু—

ভগবান্! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩৩৭

নিষ্কৃতি

১

অসময়ে—বেলা গড়াইয়া গেলে, শৈলেশকে আপিসে আসিতে দেখিয়া, তাহার আপিসের বন্ধু বিমল বলিল, "কি রে? ব্যাপার কি?"

টুপীটা টেবলের উপর রাখিয়া শৈলেশ একগাল হাসিয়া বলিল, "আর চাকরী করছি না—বিলেত যাচ্ছি।"

আপিসের বড়বাবু তখনই সেই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। শৈলেশকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "শৈলেশ বাবু, ম্যানেজার তোমার ব্যবহারে বড় অসন্তুষ্ট হয়েছেন। প্রায় কামাই, তার উপর আজ কারখানার কাজে এখন আস্‌ছ।"

উপেক্ষাভরে শৈলেশ বলিল, "আমি ত আর চাকরী কর্‌ব না। আজই আমি কাজে ইস্তফা দিতে এসেছি।"

ঘরের মধ্যে যেন একটা সাড়া পড়িয়া গেল। ৮০৲ টাকা বেতনের কাজ—শৈলেশের মত তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত যার বিদ্যা, সে স্বেচ্ছায় ছাড়িয়া দেয়!

বড়বাবু বলিলেন, "বেশ! দরখাস্ত আজই দিও।" বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

বিমল বলিল, "ব্যাপারখানা কি? রাতারাতি আলাদীনের প্রদীপ পেলি না কি, ভাই?"

গম্ভীরভাবে, মুরুব্বীয়ানা চালে, কৃষ্ণবর্ণ দেহের উপর প্রকাণ্ড মাথাটা হেলাইয়া শৈলেশ বলিল, "বিলেত যাচ্ছি। ফোরম্যান্ হয়ে বিলিতী সার্টিফিকেট আন্‌তে পারলে রেলে বড় চাকরী মারে কে?"

লক্ষ্মীনারায়ণ দীর্ঘকাল চাকরী করিয়া মাথার চুল পাকাইয়াছে, সে বলিল, "ভায়া ত বিলেত যাচ্ছ; কিন্তু রসদ যোগাবে কে?"

উচ্চ হাস্যকে যথাসম্ভব সংযত করিয়া শৈলেশ বলিল, "তার যোগাড় না ক'রে কি যাচ্ছি! শাশুড়ী বেটী প্রথমে দিতে রাজী হয় নি—বিলেত গেলে না কি মানুষ বাঁদর হয়ে আসে! তার পর দু'এক চাল দিতেই কিস্তিমাৎ। বাবা, ১৫ হাজার টাকার বিষয়ের আয়, একটা ছেলে, তার মালিক। মেয়েটা বুঝি ভেসে এসেছে? নগদ ২ হাজার দিয়ে এমন কুলীনের ছেলে সস্তায় পেয়েছে। এখন বিলেতে যাবার খরচ দেবে না?"

বিমল তাহার বন্ধুর সৌভাগ্যে বোধ হয় একটু ঈর্ষ্যান্বিত হইয়াছিল। সে বলিল, "কিন্তু ঘরে সোমত্ত স্ত্রী!"

নোয়াখালীবাসী চন্দ্রকান্ত স্পষ্টবক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। সে টানিয়া টানিয়া বলিল, "বিমলবাবুর যে ভারী টান্। সোমত্ত স্ত্রীকে ত আর বিসর্জ্জন দিয়ে যাচ্ছে না!"

লক্ষ্মীনারায়ণ একটা পাণ মুখে ফেলিয়া, এক টিপ জর্দ্দা গ্রহণ করিল। তার পর কাসিয়া, গলাটা একটু পরিষ্কার করিয়া লইয়া বলিল, "তা শৈলেশ ভায়া বিবাহিত জীবন ত বছরখানেক ধ'রে ভোগ ক'রে এসেছে। এখন কয়েক বছর খাস্ বিলেতের—তা সেখানকার জল-হাওয়া ভাল।"

শৈলেশ সম্ভবতঃ বিলাতের—স্বাধীন দেশের স্বাধীন, মুক্ত জল-হাওয়া এবং আনুষঙ্গিক সুখময় জীবন যাপনের মধুর চিত্র কল্পনানেত্রে দেখিয়া আরও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

তৃতীয় শ্রেণী হইতে তিনবার 'প্রমোশন' না পাইয়া সে দশ বৎসর পূর্ব্বে মা সরস্বতীর মুখদর্শন করিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়া স্কুল ছাড়িয়া দিয়াছিল। তার পর নানা কৌশলে সে মার্টিন কোম্পানীর কারখানায় হাতুড়িপেটা কাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। বিদ্যা না থাকিলেও স্বাভাবিক বুদ্ধি ও শরীরের শক্তি তাহার যথেষ্ট ছিল। সে জানিত, জোগাড়ের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই চারি বৎসর লোহা পিটিয়া সে উল্লিখিত কারখানাতেই মাসিক ৪০৲ টাকা বেতনের একটা কাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়াছিল। মাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দেশে থাকিতেন। সেখানে সংসার চলিবার মত কিছু সম্পত্তি ছিল। সুতরাং শৈলেশ কলিকাতা সহরে আপনাকে জমীদারের ছেলে বলিয়া কোন কোন স্থানে চালাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইত না।

চাকরী হইবার পর শ্যামবাজারের এক অপ্রশস্ত গলীর কোনও মেসে সে একটা ঘর ভাড়া লইয়া বেশ পরিচ্ছন্নভাবে থাকিত। বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে তাহার একটা বিশেষ খেয়াল ছিল। পল্লীতে পূর্ব্ববঙ্গের এক জমীদারের একটি বাড়ী ছিল। একমাত্র পুত্র ও একটি বয়স্থা কন্যা লইয়া পরলোকগত

জমীদারের বিধবা স্ত্রী সেই বাড়ীতে সম্প্রতি বাস করিতে-ছিলেন। পুত্রটি প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে; কন্যাটিকে কোনও কুলীন ভদ্র সন্তানের হস্তে সমর্পণ করিয়া কন্যা-জামাতাকে বাড়ীতেই প্রতিপালন করেন, এমন ইচ্ছা বিধবার আছে জানিতে পারিয়া, শৈলেশ পূর্ব্ববঙ্গের কিশোর জমীদার-পুত্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়াছিল।

তাহার বেতন তখন ৭০৲ টাকা। প্রতিদিন অপরাহ্ণ-কালে শৈলেশ পরিচ্ছন্নবেশে, এসেন্সচর্চ্চিত-দেহে ললিতের পড়িবার ঘরে আসিত। আপিসে তাহার কাজ ছিল—বেলা ৮টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত। তাহার দেহের বর্ণ কালো হইলেও আবলুসকাষ্ঠ-নিন্দিত নহে। স্বভাবিক শ্রী এত কদর্য্য নহে যে, ভদ্রসমাজে অচল। পাত্র বুঝিয়া সে অতি মোলায়েমভাবে আলাপ করিতে বিশেষ দক্ষ ছিল। সুতরাং আজন্ম পল্লীসহরে বর্দ্ধিত ললিতকুমার প্রকৃতই শৈলেশকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিয়াছিল। শৈলেশের একটা মস্ত গুণ ছিল, সে মজলিসী। নানা দেশের নানা সংবাদ সে সত্য মিথ্যা অনর্গল বলিয়া যাইতে পারিত।

দুই মাসেই সে ললিতের মাতার স্নেহদৃষ্টি আকর্ষণে সাফল্য লাভ করিয়াছিল। প্রথম দিন হইতেই সে বিধবাকে 'মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিল। কথায় কথায় শৈলেশ জানাইয়া দিয়াছিল, সে মহাকুলীনের সন্তান এবং তখনও তাহার কৌমার্য্যের পবিত্রতা ক্ষুণ্ন হয় নাই। শৈলেশের চাল-চলন, বিনয়-নম্র ব্যবহার, শোভন আত্মীয়তা এবং তাহার কৌলীন্যমর্য্যাদা বিধবার মনকে তাহার প্রতি অনুকূলভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। গোপনে সন্ধান লইয়া তিনি জানিয়া-ছিলেন, প্রকৃতই শৈলেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের সন্তান, তবে অবস্থা ভাল নহে। কিন্তু তিনি ত কন্যা-জামাতার পালনভার লইতে চাহেন, সুতরাং ভাল অবস্থার পাত্র ত ঘরজামাই হইয়া থাকিবে না।

প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ এড়াইবার উপায় নাই। সুন্দরী, তরুণী লীলার সহিত শৈলেশের বিবাহ হইয়া গেল। দেশ হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সাক্ষিগোপাল কর্ত্তার ন্যায় ভ্রাতার বিবাহ দেওয়াইলেন। অবশ্য শৈলেশ নগদ ২ হাজার টাকা হইতে কিছু নগদ টাকা বিবাহে ব্যয় করিয়াছিল। বাকি টাকাটা সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্কে তাহার নামে জমা ছিল।

বিলাতে গিয়া একটা হোমরা-চোমরা হইবার সাধ তাহার বরাবরই ছিল। জমীদারের জামাতা হইয়া সে সেই সাধ মিটাইবে না? শ্বশ্রূমাতা, শ্যালক এবং স্ত্রী তাহাকে বিলাত যাইবার সঙ্কল্প ত্যাগ করাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু শৈলেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বিলাতে না যাইতে দিলে সে হয় বিবাগী হইয়া যাইবে, নয় ত আত্মহত্যা করিবে, এই কথা প্রকাশ করিবার পর অপর পক্ষ হইতে অগত্যা মত দিতে হইয়াছিল; কিন্তু আপিসের বন্ধুদিগের নিকট শৈলেশ সে কথাটা প্রকাশ করিল না।

বিমল একটু ক্ষুণ্ন-মনে বলিল, "তা হ'লে কবে যাচ্ছ?"

"আসছে সপ্তাহে—বোম্বে মেলে।"

"যাও ভাই, ফিরে এসে যেন মনে থাকে।"

হা হা করিয়া হাসিয়া গুরুগম্ভীর-চালে শৈলেশ বিদায় লইল।

২

তিন বৎসর পরে শৈলেশ শুধু এডিনবরার কোনও কারখানা হইতে ছাপান ডিপ্লোমা লইয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার আগমনে বিরাট পৃথিবীতে কোনও পরিবর্ত্তন না দেখা গেলেও, তাহার শ্বশুরালয়ে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। ট্রেণ হইতে নামিবার সময়, স্বাধীন দেশের জল-হাওয়া এবং আহার্য্য-পুষ্ট—বর্দ্ধিতায়তন দেহকে ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবীতে পরিশোভিত করিয়া শৈলেশ যখন কায়দা-দুরস্ত হাসিমুখে, চুরুটিকা-শোভিত হস্তে কামরা হইতে বাহির হইল, তখন তাহার বন্ধুবান্ধব এবং শ্যালকও বিস্মিত হইয়াছিল।

শৈলেশ জানিত, স্বদেশী আন্দোলনের পর হইতে বিলাতী হ্যাট-কোটের মর্য্যাদা অপেক্ষা বাঙ্গালীর ধুতি ও পাঞ্জাবীর সম্ভ্রম দেশবাসীর নিকট অনেক অধিক। তাই সে অবলীলা-ক্রমে গাড়ীর মধ্যে ভোল ফিরাইয়া লইয়াছিল। অবশ্য সে জন্য তাহার সাহেবীয়ানা-মুগ্ধ চিত্ত একটু ক্ষুণ্ন হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু সংসারে যাহারা চালাকীর দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ করিতে চাহে, মনের বালাই তাহারা বড় একটা আমলে আনিতে চাহে না।

বাড়ীতে বা বন্ধুসমাজে ধুতি, চাদর ও পাঞ্জাবীর বাহার প্রকট হইলেও শৈলেশ (খানাপিনা) সম্বন্ধে একটা রফা

করিয়া লইল। ভাত, ডাল, মাছ, তরকারি চলুক, তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু মাটীর উপর আসন বা পিঁড়া পাতিয়া বসিয়া—আরে ছিঃ! সে টেবল ও চেয়ারকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া লইল। অন্তঃপুরে বাড়ীর লোক ছাড়া আর কেহ ত সে ব্যাপার দেখিতে আসিতেছে না। অন্যত্র, নিমন্ত্রণ-সভা প্রভৃতিতে সামাজিক ব্যবস্থা মানিয়া চলিতে সে কোন সময়েই পশ্চাৎপদ নহে।

তাহার প্রচণ্ড যুক্তি ও গলাবাজীর জোরে অল্পদিনের মধ্যে শ্যালক ও পত্নীকেও টেবলে বসিয়া বিলাতী কায়দায় ভাত-তরকারী ভক্ষণে রাজী করাইয়া লইল।

শুধু বিধবা শাশুড়ীকে সে খানার টেবলে তখনও বসাইতে পারে নাই।

বিলাত-প্রত্যাগতের শুভকামনায় ছোট-খাট উৎসব, ভোজ প্রভৃতি ব্যাপারগুলি মিটিয়া গেল। শৈলেশ শুহ প্রত্যহ ১১টার সময় সুখভোজ্যপুষ্ট বিপুল দেহকে প্যাণ্ট-কোটে আবৃত করিয়া টুপী মাথায় ক্লাইভ ষ্ট্রীটের দিকে অভিযান করিত। সন্ধ্যার পর দুই একটা ইংরাজী গানের চরণ কাংস্য-বিনিন্দিত কণ্ঠে সুরে বেসুরে আওড়াইতে আওড়াইতে সে শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিত। বিলাতফেরত জামাতার ভোগের জন্য শাশুড়ী ঠাকুরাণী নানাবিধ ফল-মূল ও জল-খাবারের আয়োজন করিয়া রাখিতেন। দিনগুলি যেন চির-বসন্তের স্নিগ্ধ বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া যাইতেছিল।

শৈলেশ চাকরীর দরখাস্ত করে নাই, এমন কথা নহে; কিন্তু চাকরী সে পায় নাই বা করে নাই। বন্ধুবান্ধবের প্রশ্নে সে বলিত, ৫ শত টাকা বেতন না হইলে সে কোন চাকরী করিতে পারে না—তাহার ইজ্জত নষ্ট হইবে। কিন্তু এই বিশাল ভারতবর্ষে তাহার মর্য্যাদা কেহই বুঝিল না। ৫ শত টাকা প্রাথমিক বেতন দিয়া কোনও রেলকোম্পানী তাহার বিলাতী প্রশংসাপত্রের সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অগ্রসর হইল না।

কিন্তু তাহাতে সংসার অচল হইবার কোন সম্ভাবনা দেখা গেল না। জমীদারের জামাতার রাজভোগ পুরা মাত্রাতেই চলিতে লাগিল। বিলাতী ভদ্রতার অনেকগুলি লক্ষণ শৈলেশ শুহে মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছিল। ক্লব এবং ঘোড়-দৌড়—প্রত্যেক ভদ্রলোকেরই ইহাতে যোগ দেওয়া অত্যাবশ্যক, নহিলে সে ভদ্রসমাজে অপাংক্তেয়। এ বিষয়ে শৈলেশকে কেহ দোষ দিতে পারিত না। কিন্তু ক্রমশঃ প্রকাশ পাইল, লীলার অনেকগুলি অলঙ্কার তাহাদের নিভৃত স্থান ত্যাগ করিয়া কোথাও নির্ব্বাসনদণ্ড ভোগ করিতেছে। কিন্তু সে গোপন তথ্যটা বিধবা ও তাঁহার পুত্র ললিত ব্যতীত আপা-ততঃ অন্যের অগোচর রহিল।

কোন কোন শনিবার সন্ধ্যার পর শৈলেশ তাহার প্যাণ্টের পকেট চাপড়াইয়া অতি প্রফুল্লচিত্তে বাড়ী ফিরিত, সে কথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না। সে দিন ঝম্‌ঝম্ করিয়া টাকা ও নোটের তাড়া সে লীলার সম্মুখে ফেলিয়া দিত।

শৈলেশের আর একটা গুণ ছিল, বিলাতের কাহিনী সে অসঙ্কোচে গল্প করিয়া যাইত। প্রথমতঃ বন্ধুবান্ধব, পরিশেষে শ্যালক, স্ত্রী ও শাশুড়ীর নিকটও কুণ্ঠাহীনভাবে সে অনেক কথা প্রকাশ করিয়াছিল।

স্বাধীন দেশের স্বাধীন মতবাদপুষ্টা নারীরা পুরুষের সহিত সময়ে অসময়ে মিশিতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করে না। কি মধুর তাহাদের ব্যবহার। তাহাদের যে কাপড় কাচিত, তাহার কুমারী কন্যা 'কেটি' শৈলেশের 'লেডীফ্রেণ্ড।' প্রতি শনিবারে কেটি তাহার সহিত ভ্রমণে বাহির হইত। সপ্তাহে উভয়ের মধ্যে তিন চারিখানি পত্র-ব্যবহার না হইলে দিন যেন ভারী হইয়া থাকিত। প্রবাসের দুঃখ সে কেটির জন্য এক দিনও অনুভব করে নাই। সে তাহার এমনই অন্তরঙ্গ বন্ধু যে, কলিকাতায় আসিবার পরও প্রতি মেলে পত্র লিখিয়া থাকে। সে-ও প্রতি মেলে তাহার মধুর মিষ্ট পত্রের উত্তর দিয়া থাকে।

স্ত্রী তেমন ইংরাজী জানে না, সুতরাং শৈলেশ তাহাকে অনুবাদ করিয়া পত্রের মর্ম্মার্থ বুঝাইয়া দিত। অবশ্য ইহাতে লীলার আননে যে প্রীতির আলোক উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, এমন কথা হলপ করিয়া বলা যায় না।

শ্যালক তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে। সে ভগিনী-পতির লজ্জাহীনতায় অনেক সময় আরক্ত মুখে বলিয়া উঠিত, "শৈলেশ, বিলেতে তুমি যা-ই ক'রে থাক, আমার ছোট বোন্‌টির কাছে অন্ততঃ একটু সমঝে চল। তোমার কেটির ঐ অভদ্র ইতর ভাষায় লেখা পত্র তুমি অমূল্য সম্পদ ব'লে কাছে রাখতে চাও, তাতে আপত্তি ক'রে লাভ নেই; কিন্তু আমাকে ও সব দেখিও না।"

শৈলেশ শ্যালকের এইরূপ কথায় অত্যন্ত চটিয়া উঠিত এবং কয়েকদিন তাহার সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া

দিত। ইহাতে ললিতের মাতা অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িতেন। ললিতও স্নেহাস্পদা ভগিনীর মুখে ম্লানচ্ছায়া দেখিয়া আবার শৈলেশের মনোরঞ্জন করিত।

৩

বচনে শৈলেশ স্বয়ং বৃহস্পতি ঠাকুরকেও অতিক্রম করিতে পারিত। বিলাতী আবহাওয়ায় তিন বৎসর বাস করায় সে শক্তিটা সত্যের সীমারেখা ছাড়াইয়া ক্রমে প্রান্তরাজ্যের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

কোন কোন স্পষ্টবক্তা আত্মীয় বা বন্ধু যখন তাহার উপার্জ্জনের পরিমাণ শুনিয়া বলিতেন যে, এমন অবস্থায় তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে অন্যত্র স্ত্রী সহ বাস করাই সঙ্গত, তাহার সন্তানাদি হইতেছে, অর্থেরও যখন অভাব নাই, তখন কেন আর শ্বশুরালয়ে 'কায়েম মোকাম' হইয়া থাকা? শৈলেশ তখন গম্ভীর হইয়া বলিত, "কি জানেন, ওদের জমীদারীর আয় যা শুনেছেন, তা ঠিক নয়। কর্ম্মচারীরা চুরি ক'রে সব নষ্ট ক'রে ফেলেছে। কোন রকমে সদর খাজনা, আর মালেকের টাকা দেওয়া চলে। আমি আছি, তাই ওদের দু'বেলা চর্ব্ব্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয় চলে। এখন যদি চ'লে যাই, সেটা ভাল দেখাবে না। সংসার-খরচটা আমিই দেই।"

শ্রোতা অবশ্য এই নির্জ্জলা সত্য সংবাদে কতটা প্রত্যয় করিতেন, তাহা বলা যায় না, তবে শৈলেশের মুখ যে এই সংবাদ প্রচার করিয়া প্রসন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিলেই বুঝা যাইত।

এ সংবাদ যে ললিত ও তাহার মাতার কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত, তাহা নহে। ললিত মাঝে মাঝে বিরক্ত হইয়া ভগিনীপতির বিরুদ্ধে উত্তেজিত হইয়া উঠিত; কিন্তু মাতার সান্ত্বনা-বাক্যে এবং কনিষ্ঠ সহোদরার মুখ চাহিয়া সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইত।

এক দিন শৈলেশ প্রচার করিয়া দিল, সে একটা বড় ইংরাজ কোম্পানীর অংশী হইয়াছে। লাভের চারি আনা অংশ তাহার প্রাপ্য। সে কোম্পানীর ম্যানেজার। কাজের জন্য আপাততঃ তাহাকে জার্ম্মাণী, ফ্রান্স ও ইটালী ঘুরিয়া আসিতে হইবে—ইংলণ্ডেও কয়েক দিনের জন্য যাওয়া প্রয়োজন। খরচপত্র সবই কোম্পানী বহন করিবে। তবে পাঁচ হাজার টাকা নিজের তহবিলস্বরূপ সঙ্গে না রাখিলে চলিবে না। ললিত ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে সে টাকাটা যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

ললিত ইদানীং শৈলেশের ব্যবহারে ভণ্ডামীর পরিচয় পাইয়া তাহার উপর একান্ত বিরূপ হইয়াছিল। শুধু ভগিনীর মুখ চাহিয়া সে শৈলেশের সর্ব্ববিধ উপদ্রব সহ্য করিত। মাতার ঘরজামাই রাখিবার দুর্নিবার বাসনার ফলেই যে সে অমন চমৎকার মেয়েটির সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহা বুঝিয়া সে মনে মনে আপনাকে শত ধিক্কার দিত। কিন্তু এখন ত আর উপায় ছিল না।

জামাতার প্রস্তাব শুনিয়া বিধবা জিজ্ঞাসুনেত্রে প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রের পানে চাহিলেন। তিনি নিজে কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

ললিত তখন মেডিক্যাল কলেজে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। সে কোন উত্তর করিল না।

শৈলেশ বলিল, "মা, দু'তিন দিনের মধ্যে টাকাটা আমার চাই। ললিতকে বলুন, একখানা চেক্ লিখে দিক্।"

ললিত উজ্জ্বল দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল, "টাকা দিতে পারব না।"

শৈলেশ বোধ হয় এই উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল। সে গম্ভীর কণ্ঠে অনুজ্ঞার স্বরে বলিল, "দিতেই হবে। না দিলে—"

বিদ্রূপভরে ললিত বলিল, "তার মানে? না দিলে কেড়ে নেবে না কি?"

শৈলেশ বলিল, "দরকার হ'লে তাও নিতে হবে বৈ কি।"

"বটে!—"

মাতা মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পুত্রের পৃষ্ঠে হাত রাখিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "ললিত!"

ললিত আত্মসংবরণ করিয়া কোটটা আলনা হইতে টানিয়া লইল।

শৈলেশ বলিল, "বিষয়টা তোমার সত্য; কিন্তু তোমার বোন্ও ত ভেসে আসে নি। তাকে ৫ হাজার টাকা তুমি দেবে না কেন?"

ললিত স্থির স্বরে বলিল, "বোন্‌কে দেই না দেই, তা জানবার তোমার কোন প্রয়োজন নেই। আমার বোন্ সে, আমি বুঝব।"

"আর আমি যদি বুঝতে চাই ?"

"দেখ শৈলেশ, আমি সোজা বলছি, তোমাকে টাকা দিতে পারব না।"

শৈলেশ তখন অভিনেতার ন্যায় অঙ্গসঞ্চালন করিয়া বলিল, "তবে কেটিকে নিয়ে সেখানে যা তা ক'রে জীবন কাটাতে পারব। তোমার বোন্ তোমার ঘাড়েই চিরদিনের জন্য থাকবে।"

ললিত মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এই পাষণ্ডের হস্তে সে তাহার মধুরস্বভাবা, সুন্দরী ভগিনীকে সমর্পণ করিয়াছে! লোকটা শুধু হৃদয়হীন নহে, এমন পশু!

সে চাহিয়া দেখিল, তাহার মাতার মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে। দরজার অপর প্রান্তে দণ্ডায়মানা সহোদরার অশ্রুসিক্ত নেত্র তাহার সঙ্কল্প টলাইয়া দিল।

নতমস্তকে সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আচ্ছা, কাল তোমাকে চেক্ দেব।"

মুহূর্ত্তমধ্যে সে দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া গেল।

৪

মেডিকেল কলেজ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া ললিত বিবাহ করিয়াছিল; কিন্তু সংসারে অহেতুক অশান্তির বিরাম ছিল না। অশ্বত্থবৃক্ষ শত শত পাদ-শিরার দ্বারা যেমন অট্টালিকার ভিতর বাহির সর্ব্বত্রই ধীরে ধীরে অধিকার করিয়া ক্রমেই ঊর্দ্ধে ও প্রস্থে বাড়িতে থাকে, শৈলেশও তেমনই তাহার পরিবারে দৃঢ়মূল হইয়া বাড়িতেছিল। তাহার হেয় সাহেবীয়ানার প্রভাব অন্তঃপুরকে পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিতে উদ্যত। অবশ্য ললিত আধুনিক মতাবলম্বী হইলেও কতকগুলি বিষয়ে সে রক্ষণশীল ছিল। অপরিচিত অথবা সদ্যঃ-পরিচিত কাহারও সম্মুখে নির্ব্বিচারে স্ত্রী-ভগিনীকে টানিয়া বাহির করা সে আদৌ সমীচীন বলিয়া মনে করিত না,—ট্রামে বা বাসে দশ জনের ক্ষুধিত দৃষ্টির সম্মুখে পরিবারস্থ কোনও নারীকে লইয়া বায়ু-সেবনের অথবা থিয়েটার-বায়স্কোপ-দর্শনের অত্যন্ত বিরোধী ছিল। মুক্ত আলো ও বায়ু, নারীর পক্ষে পুরুষের ন্যায়ই সমান প্রয়োজন; কিন্তু যে দেশের পুরুষ নারীকে সম্ভ্রমের সহিত দেখিতে ও ব্যবহার করিতে ভুলিয়া গিয়াছে, সেই আত্মবিস্মৃত দেশের লোকের সম্মুখে নারীকে ঐরূপ ভাবে বাহির করায় কিছুমাত্র বীরত্ব নাই, বরং অপরাধ আছে, ইহাই ছিল তাহার বিশ্বাস। যাহারা যথার্থ ভদ্র এবং অভিজাত-সম্প্রদায়ের, তাহাদের নারীরা খোলা ট্যাক্সি, মোটর অথবা ফিটনে চড়িয়া বেড়াইয়া থাকেন; কিন্তু ট্রামে বা বাসে চড়িয়া অপরিচিত দশ জনের সঙ্গে যাইতে চাহেন না। শৈলেশ কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত আচরণ করিত। এজন্য ললিতকে অনেক সময় তাহার অভিজাত-সম্প্রদায়ের উদার মতাবলম্বী উচ্চ-শিক্ষিত আধুনিক বন্ধুগণের নিকট হইতেও তীব্র মন্তব্য শুনিয়া পরিপাক করিতে হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। পল্লীর অনেকের গৃহে শৈলেশ অযাচিত উপদেষ্টা। বৈষয়িক, সাংসারিক অথবা সামাজিক সকল ব্যাপারেই সে অনাহূত হইয়া মন্তব্য প্রকাশ করিত। কোনও পরিবার বেশ স্বচ্ছন্দ-জীবন যাপন করিতেছে, দুই ভ্রাতার পরিবারের মধ্যে সম্প্রীতি আছে; কিন্তু জ্যেষ্ঠ সহোদর জীবিত নাই। শৈলেশ সেই পরিবারে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিয়াছে। সম্পত্তির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হয় নাই। শৈলেশ বন্ধুত্বের অবকাশে এমন ভাবে কথা রটাইয়া দিল যে, বিধবাকে বঞ্চিত করিবার জন্য দেবর গোপনে চেষ্টা করিতেছে। এই ত সে দিন রাস্তার জন্য যে জমীটা কর্পোরেশন কিনিয়া লইয়াছে, তাহার এক পয়সাও বিধবাটি পাইবে না। ২০ হাজারের প্রত্যেক পয়সাটি দেবরের নামে ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হইয়া গিয়াছে। ইত্যাদি।

কথাটার মধ্যে সত্য থাকুক আর নাই থাকুক, সেই সংসারে একটা জটিল সমস্যা গজাইয়া উঠিত এবং পরিশেষে ললিতকে সে জন্য নানা অপ্রীতিকর ব্যাপারের মধ্যে টানিয়া লইয়া যাইত।

লোক বলিত, মানুষের কাজকর্ম্ম না থাকিলেই খুড়ার গঙ্গাযাত্রা করিয়া থাকে। পাড়া-প্রতিবেশীর তাহার সম্বন্ধে এইরূপ অপ্রীতিকর ধারণা জন্মিলেই শৈলেশ তাহাকে অহেতুক মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিত।

শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াইল যে, ললিত কোনও মফঃস্বল-সহরে সরকারী হাঁসপাতালে চিকিৎসকের কাজ যোগাড় করিয়া লইল। চাকরীর প্রয়োজন না থাকিলেও হাঁস-পাতালের অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হইলে পরিশেষে সে কলিকাতায় আসিয়া চিকিৎসা-ব্যবসায় অবলম্বন করিবে। পৈতৃক

সম্পত্তির যাহা আছে, থাকুক। অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জন না হইলে বর্ত্তমান যুগে জীবনযাপন করা অসম্ভব। তাহারও সংসারে নবীন আগন্তুকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল।

গোপনে মাতা-পুত্রে কথা হইতেছিল।

মাতা বলিলেন, "লীলাকে ছেড়ে আমি থাকব কি ক'রে, বাবা ?"

ললিত বলিল, "কেন ? লীলাও আমাদের সঙ্গে যাবে। মাঝে মাঝে কল্‌কাতায় এসে থাকবে। সরকারকে হুকুম দিয়ে যাব, মাসে দু'শ টাকার বেশী কলকাতায় খরচ করবে না। তাতে ওদের বেশ চ'লে যাবে।"

"তা তুই যে জন্যে পালাচ্ছিস্‌, শৈলেশ যদি সেখানে গিয়ে থাকতে চায় ?"

ললিত হাসিয়া বলিল, "সে ভাবনা নেই, মা। কলকাতার এই সব আকর্ষণ ছেড়ে ওরকম পাড়াগাঁয়ে ও দু'দিনের বেশী তিন দিন কখনও থাকতে পারবে না।"

"আচ্ছা, আমাদের উপর রাগ ক'রে যদি বিলেত-টিলেত চ'লে যায়, তবে লীলার আমার কি হবে ?"

ললিত মাথা নাড়িয়া বলিল, "তুমি পাগল হয়েছ, মা! বিলেতে যার টাকা নেই, কেউ তার মুখের দিকে চায় না। আর তুমি বুঝি মনে করেছ, ওর সেই কেট না ফেটী এখনও ওর আশায় ব'সে আছে ? সে আমি জানি, কবে বিয়ে ক'রে সে সংসারধর্ম্ম করছে। আর যদিই বা যায়, লীলার একটা ছেলে, একটা মেয়ে, তাদের ভার আমার উপর। আমি লেখাপড়া শিখিয়ে তাদের মানুষ ক'রে দেব। লীলাকে একখানা বাড়ী কিনে দেব, আর হাজার দশেক টাকা তার নামে ব্যাঙ্কে জমা ক'রে রাখব। তুমি কিছু ভেবো না, মা। আমি সব ঠিক ক'রে রেখেছি।"

মাতা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

নিষ্কৃতির আশায় উৎফুল্ল হইয়া ললিত বিদেশযাত্রার আয়োজনে মন দিল।

বঙ্গবাণী—কার্ত্তিক, ১৩৩৪

মিলন

১

"বাপ জান্‌, বাচ্চাকে একটু ধর, আমি আস্‌ছি।"

ছয় বৎসরের বালক রহমৎ তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগলের সাহায্যে মুকুলিত পদ্মের ন্যায় সুন্দরী এক বৎসরের বালিকাকে তাহার মসীকৃষ্ণ বুকের উপর তুলিয়া লইল। মেঘের কোলে বিদ্যুতের একটা স্থির রেখা কে যেন আঁকিয়া দিল।

বালক কত অর্থহীন কথা উচ্চারণ করিয়া শিশুর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করিতেছিল, এমন সময় রহমতের জননী একটি পেয়ালা ভরিয়া উষ্ণ দুগ্ধ লইয়া তথায় ফিরিয়া আসিল।

রোরুদ্যমানা বালিকাকে কোলের উপর শোয়াইয়া দিয়া রহমৎ তখন তাল-মান-লয়-হীন শিশুকণ্ঠের সঙ্গীতের দ্বারা তাহাকে ভুলাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল।

মাতা বলিল, "এই যে আমি এসেছি, খুকীকে আমার কাছে দে।"

বালক বলিল, "না মা, আমি ওকে দুধ খাইয়ে দেব।"

মাতা হাসিয়া বলিল, "দূর পাগল ছেলে, তুই পারবিনে।"

অনেক প্রকারে বুঝাইয়া পুত্রের ক্রোড় হইতে মাতা শিশুকে তুলিয়া লইল।

এই শিশু কন্যাটি ইরাকের নরপতি সর্দ্দার মোয়াজিমের সন্তান। প্রসবের পর প্রসূতির মৃত্যু ঘটায় সর্দ্দার শিশুর পালনভার ধাত্রী রহমৎ-জননীর উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। রহমতের মাতার কিছু দিন পূর্ব্বে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তাহার স্বামীও অল্পদিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। সর্দ্দার মোয়াজিম এই ক্রীতদাস-দম্পতিকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। রহমতের মাতার বক্ষে দুগ্ধধারা ছিল—তাঁহার মাতৃহারা কন্যা এই বিশ্বস্তা ক্রীতদাসী—ধাত্রীর পরিচর্য্যায় মানুষ হইয়া উঠিবে, এ আশা মোয়াজিমের ছিল। শুদ্ধান্তঃপুরের এক প্রান্তে উদ্যানসমীপবর্ত্তী কতিপয় কক্ষে রহমৎ ও তাহার মাতা আশ্রয় পাইয়াছিল।

বালক রহমৎ, সর্দ্দার-নন্দিনীকে সর্ব্বক্ষণ কোলে লইতে পারিলে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পড়িত। তাহার সদ্যোজাতা ভগিনীর অকালমৃত্যুর জন্য, রহমতের জাগ্রত ভ্রাতৃস্নেহ প্রভু-কন্যার উপর চরিতার্থতা লাভ করিতেছিল। শিশুর নামকরণ হইয়াছিল রাবেয়া। রহমৎ এক দণ্ড রাবেয়াকে নয়নের অন্তরাল করিতে চাহিত না। শৈশবের স্বপ্নস্বর্গে সে রাবেয়াকে রাণীর মত ভাবিয়া স্নেহ ও প্রীতির অর্ঘ্যে পূজা করিত।

২

বসন্তের প্রভাতে চারিদিক্‌ ফলে ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। ইউফ্রেটস্‌ ও টাইগ্রীস্‌ নদীর সঙ্গমস্থলে বিস্তীর্ণ—সীমাহীন জলরাশি দিক্‌চক্রবালে মিলাইয়া গিয়াছে। নদীর তীরবর্ত্তী রাজোদ্যানে প্রকৃতির রঙ্গিণী মূর্ত্তি, মনোলোভা শোভা! সর্দ্দারের প্রাসাদশীর্ষে জাতীয় পতাকা উড্ডীন হইতেছে। প্রাসাদ-সংলগ্ন বিস্তীর্ণ সোপানশ্রেণী টাইগ্রীস নদীর গর্ভে নামিয়া গিয়াছে। সর্দ্দারের সুদৃশ্য বজরা সোপানের এক পার্শ্বে শৃঙ্খলিত হইয়া রহিয়াছে।

পুষ্পভারাবনত একটি বৃক্ষের একটি শাখা নত করিয়া পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর রহমৎ দশমবর্ষীয়া রাবেয়ার জন্য কিছু পুষ্পচয়ন করিতেছিল। প্রীতিবিস্ফারিতনেত্রে বালিকা অদূরে দাঁড়াইয়া রহমতের কার্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিল। নিকটে তখন কেহই ছিল না।

পঞ্চদশবর্ষীয় কিশোর হইলেও রহমতের দেহে নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চার অভ্রান্ত পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল। তাহার মাংসপেশীবহুল বলিষ্ঠ বাহুযুগল, কপাটবক্ষ তাহার নিকষকৃষ্ণ দেহের ঔজ্জ্বল্য ও শোভা বর্দ্ধিত করিয়াছিল। সুখভোগলালিতা সর্দ্দার-নন্দিনীর সুগৌর দেহেও বস্‌রাই গোলাপের দীপ্তি ক্রমেই স্ফুটতর হইতেছিল।

সুন্দর একটি তোড়া বাঁধিয়া রহমৎ সসম্ভ্রমে উহা লইয়া রাবেয়ার সম্মুখে উপস্থিত হইল। রাবেয়া বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার আশৈশব সহচর, অনুগত ও ভক্ত রহমৎকে ভ্রাতৃজ্ঞানে স্নেহ করিত। তবে সে যে ইরাকের সর্দ্দারের কন্যা, আভিজাত্য, পদমর্য্যাদা এবং রূপগৌরব তাহার যে অসামান্য, এই বোধশক্তি ধীরে ধীরে তাহার কিশোর মনের এক প্রান্তে যে সমুদিত হইতেছিল, তাহা তাহার ব্যবহারে সময় সময় প্রকাশ না পাইত, এমন নহে।

রহমতের প্রসৃত করপল্লব হইতে পুষ্পগুচ্ছ লইয়া রাবেয়া চঞ্চলচরণে উদ্যানপ্রান্তে ছুটিয়া গেল। রহমৎও প্রভুর অনুগামী বিশ্বস্ত কুকুরের ন্যায় তাহার অনুগামী হইল।

প্রভাত-আলোকের দীপ্তিচ্ছটা তখন দিগন্তবিস্তৃত উচ্ছল জলরাশির উপর নৃত্য করিতেছিল। বালিকা দিক্‌চক্রবালে মুগ্ধদৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সহসা বলিয়া উঠিল, "রহমৎ, ঐ যে জলের মধ্যে অনেক দূরে একটা কালো জিনিস দেখা যাচ্ছে, ওটা কি জান ?"

রহমৎ বলিল, "ওটা একটা দ্বীপ।"

"ওখানে কি আছে ?"

"শুনেছি, কিছু নেই, শুধু একটা পাহাড়।"

"ওখানে মানুষ আছে ?"

"না, শাহজাদী, মানুষ, জানোয়ার কিছুই ওখানে নেই।"

বালিকার কৌতূহল ইহাতে নিবৃত্ত হইল না। সে তাহার চপল নয়নযুগল রহমতের দিকে ফিরাইয়া বলিল, "ওখানে যাওয়া যায় না ?"

"যায়, নৌকো ক'রে।"

বালিকা কয়েক মুহূর্ত কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপের দিকে নিবিষ্ট-মনে চাহিয়া রহিল। জ্ঞানসঞ্চারের পর হইতে উদ্যানে বেড়াইবার সময় কতবার ঐ দূরবর্তী দ্বীপটিকে সে দেখিয়াছে, উহা কি, তাহা জানিবার জন্য আগ্রহ জন্মিয়াছে, কিন্তু খেলায় ভুলিয়া কাহাকেও সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতে তাহার মনে হয় নাই। আজ বসন্তপ্রভাতে, জলবিস্তারের মধ্যে দ্বীপটি যেন কোন মায়ারাজ্যের একটা বিচিত্র পদার্থের ন্যায় মনে হইতেছিল।

"আচ্ছা রহমৎ, তুমি ওখানে কখন গিয়েছ ?"

"না, শাহজাদী। ওখানে যা'র তা'র যাবার হুকুম নেই। যে সর্দারের বিষনজরে পড়ে, রাজদ্রোহী হয়, তাকে ওখানে বন্দী ক'রে রাখা হয়।"

বালিকা সবিস্ময়ে রহমতের দিকে ফিরিয়া চাহিল। তাহার কোমল হৃদয় দ্বীপটিকে আর অনুকূলভাবে গ্রহণ করিতে পারিল না। সে বলিল, "তবে ত ওটা বড় খারাপ জায়গা। না, আমি ওখানে যেতে চাইনে।"

রহমৎ মৃদু হাসিয়া বলিল, "শাহজাদীর ওখানে যাবার ত কোন দরকার হবে না। ও জায়গা দুষমনদের শাস্তির জন্য।"

শুষ্ক পত্র-মর্মরের শব্দে রহমৎ সহসা পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিল। স্বয়ং সর্দার মোয়াজিম খাঁ, এত সকালে এখানে! তিনি ত কোন দিনও এ দিকে বেড়াইতে আসেন না!

সসম্ভ্রমে কিশোর রহমৎ সর্দারকে আভূমি নত হইয়া অভিবাদন করিল। সর্দারের আনন ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। অনেক দিন তিনি কন্যার কোন তত্ত্ব লইতে পারেন নাই। রাজকার্য্য এবং হারেমের আমোদ-প্রমোদে সকল সময়ই তিনি বিব্রত থাকিতেন। মাতৃহারা বালিকা কন্যা ধাত্রীর দ্বারা উত্তমরূপেই লালিত-পালিত হইতেছে, এই বিশ্বাসের বশে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। আজ দেখিলেন, কন্যা ক্রমেই বড় হইয়া উঠিতেছে। অল্পদিনেই নারীত্বের মাধুর্য্য তাহার দেহে বিকশিত হইয়া উঠিবে। এখন তাহাকে বাদশাজাদীর ন্যায় শুদ্ধান্তঃপুরের কঠোর নিয়মাধীন রাখা প্রয়োজন। কোনও পুরুষের সান্নিধ্য ইরাক সর্দারের কন্যার পক্ষে আর এখন শোভন নহে।

ধাত্রীর দিকে ফিরিয়া তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "রাবেয়া তোমার প্রতিপালনগুণে ভালই আছে; কিন্তু এখন থেকে তাকে হারেমের মধ্যে রাখাই দরকার। এ অঞ্চল থেকে আজই তোমরা ভিতরের মহলে চ'লে যাবে। তোমার ছেলে রহমৎ কাল থেকে দরবারে হাজিরা দেবে। তার শিক্ষার ভার আমার উপর। আমি তার জন্য আলাদা বাড়ীর ব্যবস্থা ক'রে দেব। মাঝে মাঝে—যখন ইচ্ছা হবে—তুমি ছেলের কাছে গিয়ে থাকতে পারবে।"

৩

রহমৎ আর রাবেয়ার দেখা পায় না। জননীর নিকট সে শুনিতে পায়, সর্দার-নন্দিনী এখন নৃত্যগীত ও নানাবিধ ললিতকলা শিক্ষা করিতেছে। তাহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দিন দিন পরিপূর্ণতার পথে চলিয়াছে। রহমৎ তাহাতেই কতকটা তৃপ্তি পায়। কিন্তু দর্শনাকাঙ্ক্ষা তাহাতে মিটে না, বরং বাড়িয়া চলে। দশ বৎসর ধরিয়া সে যে সকল সময়ই তাহার অনুরক্ত সঙ্গী ছিল!

রহমতের অধ্যবসায় ছিল। মল্ল ও যুদ্ধবিদ্যা সে অল্পদিনের মধ্যে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। শারীরিক বলে, অস্ত্রচালন-কৌশলে এবং সাহসে সে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ

বীরকেও অতিক্রম করিয়া গেল। তাহার অন্তরের গোপনতম প্রদেশে যে দুরাকাঙ্ক্ষা ছিল, তাহাকে জয় করিবার জন্ত চেষ্টা করা দূরে থাকুক, আশার বারিসেচে সে দুরাকাঙ্ক্ষার লতাটিকে সতেজ ও পল্লবিত করিয়া তুলিয়াছিল। সর্দারকে সন্তুষ্ট করিয়া সে কোনদিন কি রাবেয়াকে লাভ করিতে পারিবে না?

কিন্তু ঘুণাক্ষরেও সে তাহার অন্তরের এই গোপন আশার আভাস কাহাকেও জানিতে দেয় নাই—এমন কি, তাহার জননীও কিছুই জানিত না।

উঃ! আজ দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে সে একবারও সেই লোক-বিমোহিনী রাবেয়ার বরবপুর দর্শন পর্য্যন্ত পায় নাই, বাক্যালাপ ত দূরের কথা। তাহার কালো বুকের অন্তরালে রাবেয়ার জন্ত যে প্রেম, যে স্নেহ, যে প্রীতি সঞ্চিত রহিয়াছে, তাহার পরিমাপ করিবে কে? যতই দিন যাইতেছিল, যতই রাবেয়া তাহার কাছে দুর্লভতর হইতেছিল, তাহার প্রেম ততই গভীরতর অনুভূতিতে তাহার সমগ্র চিত্তকে পবিত্র ও সুন্দর করিয়া তুলিতেছিল। তাহার দেহের প্রতি অস্থিতে রাবেয়ার মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে, তাহার সমগ্র অন্তর শুধু রাবেয়ার স্মৃতি-সৌরভে আমোদিত।

সে দিন রাজ্যমধ্যে একটা ভীষণ চাঞ্চল্যের প্রবাহ বহিয়া গেল। প্রজাগণ সন্ত্রস্ত এবং রাজসভা মন্ত্রণা ও আলোচনার বাক্যজালে সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। রহমৎ যথাসময়ে নিয়মিত-ভাবে দরবারে আসিয়া আপনার নির্দ্দিষ্ট আসনে বসিয়াছিল। সর্দ্দার ইদানীং তাহাকে অন্যতম সেনানী-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

সর্দ্দারের আগমনে সভাস্থল সহসা নিস্তব্ধ হইল। সিংহাসনে উপবেশন করিয়া মোয়াজিম খাঁ একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন। তাঁহার মুখমণ্ডলে দুশ্চিন্তার কালো ছায়া—ললাট রেখাঙ্কিত।

কিয়ৎকাল নীরব থাকিয়া সর্দ্দার গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আজ আমার রাজ্য বিপন্ন। সকলেই শুনে থাকবেন, দুর্দ্ধর্ষ দস্যু-সর্দ্দার জিন্দা খাঁ সীমান্তপ্রদেশের ৬।৭ খানা গ্রাম অধিকার ক'রে রাজধানী আক্রমণের উদ্যোগ করছে। তার আক্রমণ ব্যর্থ করবার জন্ত সেনাপতি রেজা খাঁ হাজার সৈন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। সেনাপতি আহত, সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। এই দুরন্ত দস্যুদলকে পরাজিত না করতে পারলে রাজ্যের সর্ব্বনাশ হবে। আমি একজন সাহসী ও চতুর সেনানায়ককে এই কাজের ভার দিতে চাই। কিন্তু বেশী সৈন্ত আমি দিতে পারব না। দেশের চারিদিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত সেনাদলকে ছড়িয়ে রাখ্‌তে হবে—রাজধানী রক্ষার জন্তও প্রচুর সৈনিক প্রয়োজন। আপনাদের মধ্যে কে অল্পসংখ্যক সৈন্ত নিয়ে দস্যুর বিরুদ্ধে যেতে চান?"

দস্যুর সর্দ্দার জিন্দা খাঁর নাম সকলেই জানিত। এই প্রবল-পরাক্রান্ত দস্যুর নামে সমগ্র আরবদেশ কম্পিত হইত। এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে পরাজিত করিতে পারে নাই। বিশেষতঃ সেনাপতি রেজা খাঁর ন্যায় অমিততেজা ও রণকুশল সেনানায়কও যখন যুদ্ধে পরাজিত ও আহত, তখন অল্পসংখ্যক সৈন্ত লইয়া কে ধ্রুব মৃত্যুকে বরণ করিয়া লইবে?

সভার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা প্রচণ্ড নীরবতার যবনিকা কে যেন প্রসৃত করিয়া দিয়াছিল।

সর্দ্দার জানিতেন, জিন্দা খাঁর নাম শুনিলে কেহই সাহস করিয়া তাহার বিরুদ্ধে স্বল্প সেনাবলসহ অভিযান করিতে চাহিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সীমান্তপ্রদেশে অধিক সৈন্ত প্রেরণ করিবার সাহসও তাঁহার ছিল না।

মোয়াজিম খাঁ কণ্ঠস্বর উর্দ্ধে তুলিয়া বলিলেন, "আজ এই দুশ্চিন্তার দায় হইতে আমাকে যে মুক্তি দিতে পারবে—এই পাপিষ্ঠ দস্যুকে পরাজিত করতে পারবে, তাকে আমি বিশেষ পুরস্কার দান করব—সে যা চাইবে, যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, তাই তাকে দেব।"

সেনাপতি ফৈজু দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "বিশ সহস্র সৈন্ত হইলে আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি, জাঁহাপনা।"

"অসম্ভব! এত অধিক সৈন্ত এ সময়ে দেবার শক্তি আমার নাই। দশ হাজার তুমি পাইতে পার।"

সেনাপতি আসন গ্রহণ করিলেন।

সভামধ্যে একটা গুঞ্জন-শব্দ উত্থিত হইল; কিন্তু কোনও উৎসাহী বীরকে সর্দ্দারের সম্মুখে আর উত্থিত হইতে দেখা গেল না।

মোয়াজিম খাঁ নৈরাশ্যভরে বলিয়া উঠিলেন, "কি দুর্ভাগ্য! ইরাক্ কি আজ বীরশূন্য?"

সভার প্রান্তদেশ হইতে গম্ভীর-কণ্ঠে ধ্বনিত হইল, "নিশ্চয় নহে। আপনি আদেশ করুন, জাঁহাপনা! আমি ৫ হাজার

সৈন্য নিয়ে জিন্দা খাঁকে আরবের মরুভূমি পার ক'রে দিয়ে আসি।"

দরবার-গৃহের প্রত্যেক ব্যক্তির বিস্মিত দৃষ্টি সেই দিকে নিক্ষিপ্ত হইল।

দীর্ঘাকার, বলিষ্ঠদেহ বীর যুবক অবনতশিরে সর্দারকে অভিবাদন করিয়া নম্রকণ্ঠে বলিল, "দাস এখনই প্রস্তুত।"

ক্রীতদাসনন্দন রহমৎ খাঁকে অনেকেই চিনিত। তাহার প্রচণ্ড শারীরিক শক্তি এবং অস্ত্রচালনা-কৌশলের পরিচয় রাজধানীর কাহারও অগোচর ছিল না; কিন্তু এই অসীম-সাহসী যুবার দুরাকাঙ্ক্ষাকে তাহারা মনে মনে প্রশংসা করিতে পারিল না। ৫ হাজার সৈন্য লইয়া অমিতপরাক্রম জিন্দা খাঁর বিরুদ্ধে অভিযান! এ যে ধ্রুব মৃত্যুর সম্মুখে আত্মোৎসর্গ মাত্র।

মোয়াজিম খাঁ বিস্ময়বিহ্বল-নয়নে মুহূর্ত্তমাত্র তাহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। তার পর স্নেহাপ্লুতকণ্ঠে বলিলেন, "রহমৎ! তুমি যদি অসাধ্যসাধন করতে পার, তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

সর্দারের আদেশে যুবক সিংহাসন-পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। সে ধীর, দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, "জাঁহাপনার কৃপাদৃষ্টি-বলে আমি দেশকে শত্রুমুক্ত করতে পারব!"

"তোমার প্রার্থিত পুরস্কার তখনই পাবে, রহমৎ।"



৪

রাজধানী উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছিল। রহমৎ—ক্রীতদাস-নন্দন যুবক প্রকৃতই দুর্দ্ধর্ষ জিন্দা খাঁকে পরাজিত করিয়াছিল। দুই মাস ধরিয়া চেষ্টার পর এক দিন সে এই শক্তিমান দস্যু-সর্দারকে একাকী পাইয়াছিল! রহমতের উদ্দেশ্য ছিল, অধিক সৈন্য ক্ষয় না করিয়া একবার যদি বীর জিন্দা খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভবপর হইতে পারে। সে জানিত, এ পর্য্যন্ত দ্বন্দ্বযুদ্ধে কেহই জিন্দা খাঁকে আহ্বান করিতে সাহস করে নাই। কারণ, দস্যু-সর্দারের দেহে অপরিমেয় শক্তি এবং তরবারি-চালন-নৈপুণ্য অনন্যসাধারণ ছিল।

এক দিন কোনও বনপ্রান্তে রহমৎ জিন্দা খাঁকে দেখিতে পায়। তখন সেখানে জনপ্রাণী ছিল না। কোনও ইরাণী সুন্দরীর নিকট হইতে পদব্রজে সে নিজ আস্তানার দিকে যাইতেছিল। রহমৎ সেনাদলকে টাইগ্রীস নদীর তীরবর্ত্তী প্রচ্ছন্ন ও নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ফকীরের ছদ্মবেশে জিন্দা খাঁর সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। অধিক সংখ্যক শত্রুহস্তে নিপতিত হইলে তাহার প্রাণনাশের সম্ভাবনা ছিল, তাহা সে জানিত; কিন্তু ভয় কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। বর্ম্মাবৃত দেহের উপর ফকীরের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া অনুসন্ধানের ফলে জিন্দা খাঁর প্রণয়িনীর গৃহ সে আবিষ্কার করে।

অরণ্যপ্রান্তে বিশ্রামার্থ জিন্দা খাঁ যখন একটি বৃক্ষতলে বসিয়াছিল, রহমৎ তখন তাহার সমীপে উপস্থিত হয়। কথায় কথায় ফকীরবেশী রহমৎ জিন্দা খাঁকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করে। দস্যু হইলেও বীরত্বের গর্ব্ব এবং অভিমান তাহার ছিল। সে তরুণবয়স্ক রহমতের অসমসাহসিকতা দেখিয়া প্রথমে বিস্মিত হইয়াছিল। সমগ্র আরব দেশের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাহার সম্মুখীন হইতে সাহস পায়।

কিন্তু অদৃষ্টলক্ষ্মী রহমতের প্রতি বিরূপ হয়েন নাই। জিন্দা খাঁ জানিত না যে, শারীরিক শক্তিতে আরব দেশে তাহার অপেক্ষাও শক্তিশালী যুবক জন্মগ্রহণ করিতে পারে, অস্ত্রচালন-কৌশলে শুধু তাহার একাধিপত্য নহে।

কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর জিন্দা খাঁ প্রাণ হারাইল। কৌশলে কার্য্যসিদ্ধি হওয়ায় রহমৎ সেনাদলের সাহায্যে জিন্দা খাঁর দস্যুদলকে সীমান্তপ্রদেশ হইতে তাড়াইয়া দিল। জিন্দা খাঁই দস্যুদলের প্রাণশক্তি ছিল। তাহার মৃত্যু-সংবাদে তাহারা উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

সর্দার, রহমতের উল্লিখিত বীরত্ব ও রণকৌশলের পরিচয় পাইয়া রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শত্রু দমন করিয়া রহমৎ যখন দরবার-গৃহে প্রবেশ করিল, সর্দারের আদেশে বীর যুবককে পুষ্পমাল্যে অভিনন্দিত করা হইল। রহমতের জয়ধ্বনিতে দরবার-গৃহ পরিপূর্ণ হইয়া গেল।

সর্দার তখন স্নেহাপ্লুত-কণ্ঠে বলিলেন, "রহমৎ, তুমি দেশের ইজ্জৎ, শান্তি রক্ষা করেছ, শত্রুভয় থেকে প্রজাগণকে চিরমুক্তি দিয়েছ। তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নেই। কি পুরস্কার চাও, বল।"

রহমৎ নীরবে, নত নেত্রে বসিয়া রহিল। প্রচুর রাজৈশ্বর্য্য, প্রভূত সম্মান, কিছুই সে চাহে না। সে শুধু আশৈশবের ক্রীড়া-সঙ্গিনীকে জীবনসঙ্গিনী করিতে চাহে। ইহা হয় ত

তাহার পক্ষে দুরাশা, কিন্তু সেই আশার বলেই সে অসাধ্য-সাধন করিতে গিয়াছিল। রাবেয়ার প্রতি তাহার একনিষ্ঠ প্রেমই তাহার বক্ষে ও বাহুতে শক্তিসঞ্চার করিয়াছিল, নহিলে জিন্দা খাঁর কাছে সে শিশু মাত্র।

"বল, রহমৎ, তুমি কি চাও? আমার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ—"

বাধা দিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে রহমৎ বলিল, "বান্দাকে অত লোভী মনে করবেন না, জাঁহাপনা। অর্থ বা ভূসম্পত্তির প্রতি অধমের কোন আকর্ষণ নেই।"

বিস্মিত নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সর্দার বলিলেন, "তবে কি চাও তুমি, বল?"

জিন্দা খাঁর সহিত যুদ্ধে যাহার বক্ষ স্পন্দিত হয় নাই, আজ তাহার হৃদয় ঘন ঘন আন্দোলিত হইতে লাগিল। অর্দ্ধস্ফুট কণ্ঠে অবশেষে সে তাহার বক্তব্য প্রকাশ করিল।

সর্দারের আনন্দোজ্জ্বল আনন সহসা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিল। ক্রীতদাস-নন্দন রহমৎ কি সত্য সত্যই কথাটা উচ্চারণ করিয়াছে? অথবা উহা তাঁহার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা?

সর্দার-নন্দিনী—ইরাক্ নরপতির দুহিতা ক্রীতদাসের পত্নী হইবে? ইহা অপেক্ষা অসম্ভব, অবিশ্বাস্য ব্যাপার কি হইতে পারে? ক্রীতদাসের স্পর্দ্ধারও কি একটা সীমা নাই?

প্রচণ্ড ক্রোধে মোয়াজিম্ খাঁ রুদ্ধবাক্ হইলেন। কিন্তু রহমৎ উপকারী বন্ধু। পুরস্কার দিতে তিনি প্রতিশ্রুত। তাই অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বলিলেন, "দাস হয়ে যে প্রভু-কন্যাকে প্রার্থনা করে, সে শুধু অপরাধী নহে—রাজ-দ্রোহী। কিন্তু তোমার বীরত্বে আমি তুষ্ট, তুমি অন্য পুর-স্কার চাও।"

রহমৎ যুক্তকরে বলিল, "অন্য কোন পুরস্কারের প্রার্থী আমি নই, জাঁহাপনা।"

তাহার বীর-রক্ত ধমনীমধ্যে দ্রুত তালে নাচিয়া উঠিয়া-ছিল, কণ্ঠস্বরেও ঔদ্ধত্যের ঝঙ্কার অনুরণিত হইয়া থাকিবে।

সভাসদগণ তাহার স্পর্দ্ধায় অতিমাত্র বিস্মিত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলিয়া উঠিল, "ইরাক সর্দারের কন্যার পাণি-প্রার্থনা ক্রীতদাসের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ।"

শত কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি হইল।

রহমতের উদ্‌গত ক্রোধ তাহার নয়নে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে মানুষ, সে কর্ম্মী, সে বীর-পুরুষ। তাহার আত্মসম্মান তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। উন্নতশিরে দাঁড়াইয়া সে বলিয়া উঠিল, "ক্রীতদাসত্ব কারও শরীরে লেখা থাকে না।"

দীপ্তরোষে মোয়াজিম খাঁ গর্জ্জিয়া উঠিলেন, "কুক্কুর, তোর এত বড় স্পর্দ্ধা!—বিদ্রোহীটাকে যাবজ্জীবন দ্বীপে বন্ধ ক'রে রাখবার হুকুম দিলাম। আমার উপকার করেছে ব'লে প্রাণদণ্ড দেওয়া হ'ল না। প্রহরি, একে নিয়ে যাও।"

সেনাপতির আদেশে রহমৎ তাহার কোষবদ্ধ তরবারি নীরবে সর্দারের চরণতলে খুলিয়া রাখিল। নীরবে প্রহরি-বেষ্টিত হইয়া সে নির্ম্মম দণ্ডভোগ করিতে চলিল। রাবেয়া যখন চিরজন্মের মত তাহার কাছে দুর্লভ, তখন কারাগারে বন্ধনই তাহার কাছে শ্রেয়ঃ।

উন্নতশীর্ষে রহমৎ ধীরে ধীরে সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

৮

সীমাহীন জলবিস্তার—দূরে এক দিকে শুধু ইরাক সর্দারের শুভ্র প্রাসাদ ক্ষুদ্র খেলাগৃহের ন্যায় দেখা যাইতেছিল। বৃক্ষ-লতাহীন, শুষ্ক, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপটি যেন জলমগ্ন দৈত্যের ন্যায় মাথা খাড়া করিয়া আকাশ-পানে চাহিয়া আছে। উহার গর্ভে একটি গুহামধ্যে অনুরূপ কৃষ্ণবর্ণের একমাত্র অধিবাসী রহমৎ, সেই প্রাসাদের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল।

অপরাহ্নের আলো ক্রমে দিকে দিকে ম্লানরেখা টানিয়া দিয়া পশ্চিম-সমুদ্রবেলায় চলিয়া পড়িতেছিল। বৈশাখের আকাশপ্রান্তে একখানি ক্ষুদ্র মেঘ দূর হইতে একটি বিন্দুর মত দেখা যাইতেছিল, বায়ু স্তব্ধপ্রায়, জলবিস্তার নিস্তরঙ্গ—প্রকৃতি যেন রূঢ় বেদনায় গুমরিয়া উঠিবার উপক্রম করিতেছে।

গুহামধ্যে বন্দী শৃঙ্খলিত নহে, মুক্ত। হিংস্র-জলজন্তু-সমাকীর্ণ সে জলবিস্তার অতিক্রম করিয়া কোনও ব্যক্তি পলায়ন করিতে সমর্থ নহে মনে করিয়াই ইরাকের অধিপতি রহমৎকে গুহামধ্যে মুক্ত অবস্থায় রাখিয়াছিলেন। অস্ত্রধারী সেনাদল সাহায্যে নৌকাযোগে সপ্তাহে দুই বার করিয়া দ্বীপমধ্যে তাহার জন্য আহার্য্য ও পানীয় প্রেরিত হইত।

দুই মাস এই জনশূন্য দ্বীপে রহমৎ নির্ব্বাসিত। জীবনে তাহার কোন মমতা ছিল না। ইচ্ছা করিলে যে কোনও দিন সে পলায়ন করিতে পারিত। হিংস্র জলজন্তুর ভয়ে তাহার অন্তর কোনও দিন কম্পিত হয় নাই। আবাল্য সন্তরণে তাহার প্রচণ্ড আনন্দ ছিল। ইরাকসর্দ্দার কল্পনা করিতে পারেন নাই যে, দুই মাসের মধ্যে কতবার এই অসমসাহসিক যুবক সন্ধ্যাকালে—প্রাসাদ-কক্ষে দীপমালা জ্বলিয়া উঠিলে দ্বীপ হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, সলিলরাশি পার হইয়া তাহার জীবনানন্দদায়িনীকে একবার দেখিবার আশায় পরপারে ভাসিয়া গিয়াছে, আবার ব্যর্থ-মনোরথে ফিরিয়া আসিয়াছে। সে জানিত, প্রাসাদের কোন্ কক্ষে রাবেয়া অবস্থান করে। সোপান-শ্রেণীর ঠিক উপরের কক্ষেই তাহার আরাধ্যা দেবী বাস করিত। সেই কক্ষের অপর পার্শ্বে তাহার জননী থাকিত। সন্ধ্যার অন্ধকারে সূক্ষ্মবিন্দুবৎ আলোকরশ্মি বহুদূর হইতে রহমতের তীক্ষ্ণদৃষ্টিপথে পতিত হইত। অমনই অধীর আগ্রহে সে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িত। তাহার বলিষ্ঠ বাহু সন্তরণে ক্লান্ত হইত না। প্রচণ্ড আগ্রহ যাবতীয় বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া তাহাকে পরপারে টানিয়া আনিত। দীর্ঘকালের প্রতীক্ষার পর সে একবারমাত্র চকিতবৎ বাতায়ন সমীপে সেই বরবর্ণিনীর দেখা পাইয়াছিল। তাহাতেই তাহার আত্মা তৃপ্তিলাভ করিয়াছিল। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিবলে পৃথিবী স্মরণাতীত যুগ হইতে আপন কেন্দ্রে আবর্ত্তিত হইতেছে, ঠিক যেন সেই শক্তি রহমৎকেও ইরাকের জলবায়ু-এমন কি, নির্জ্জন দ্বীপে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিয়াছিল। নহিলে কবে সে মোয়াজিম খাঁর রাজ্যসীমা ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে পারিত।

না, সে ঐ প্রাসাদে—যেখানে তাহার শৈশবসঙ্গিনী জীবনের একমাত্র আরাধ্যা দেবী বাস করিতেছে, সেই প্রাসাদ-পানে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া এই নির্ব্বাসিত জীবনপাত করিবে, কোথাও যাইবার—পলায়ন করিয়া জীবনরক্ষা করিবার তাহার কোন সাধ নাই। ইরাকের বাতাস রাবেয়ার দেহসুরভি বহন করিয়া পবিত্র, যে প্রাসাদে সে বাস করিতেছে, তাহার পাদমূল চুম্বন করিয়া তরঙ্গরাশি এই শৈলমূলে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে, ইহাদের মধ্য দিয়াই সে রাবেয়ার রূপ, গন্ধ, স্পর্শের রস কি অনুভব করিতে পারিতেছে না? না, এখানেই তাহার চির-নির্ব্বাসিত জীবন শেষ হইয়া যাউক।

কিন্তু আজ রক্ষিগণের মুখে সে যে সংবাদ শুনিয়াছে, তাহাতে, এতদিন সে যে আশ্বাসে বাঁচিয়াছিল, তাহাও ত চূর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দারনন্দিনীর আজ বিবাহ—পারস্যের উপকূলবর্ত্তী কোনও জনপদের রাজকুমার চিরদিনের জন্য রাবেয়াকে জীবনসঙ্গিনী করিতে আসিয়াছে। আজ রজনীতে রাজধানী উৎসবানন্দে মাতিয়া উঠিবে। কাল প্রভাতে রাবেয়া সুন্দরী স্বামীর সহিত শ্বশুরালয়ে চলিয়া যাইবে—তখন প্রাণহীন আশাশূন্য আনন্দ-বঞ্চিত এই ইরাকে রহমতের অবস্থিতির সার্থকতা কোথায়?

যুবক স্থির-দৃষ্টিতে তটাভিমুখে চাহিয়া রহিল। তাহার বলিষ্ঠ বাহুযুগল ঘন ঘন স্পন্দিত হইতেছিল, বিশাল বক্ষোদেশ আন্দোলিত হইয়া তাহার অন্তর্নিহিত বেদনাকে প্রকাশ করিতেছিল।

ঘনান্ধকারে জল ও স্থল সমাচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছিল! রহমৎ দেখিল, তীরভূমি আলোক-রেখায় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। নিশ্চয়ই প্রাসাদ ও রাজধানী আজ মহানন্দে মাতিয়া উঠিয়াছে। রহমৎ! রহমৎ! আজ তোমার ইহলোকের সকল সাধ, সব আনন্দের সমাধি!

স্তব্ধভাবে যুবক সেই আলোকমালার পানে চাহিয়া রহিল।

রাবেয়া এ বিবাহে কি সুখী? না হইবে কেন? অভিজাত দেশের রাজপুত্র আজ হইতে তাহার জীবনপথের চিরসঙ্গী। অর্থ, রূপ, সম্মান যাহাদের অদৃষ্টে বিধাতা পূর্ণমাত্রায় মাপিয়া রাখিয়াছেন, সুখ তাহাদের অফুরন্ত, আনন্দ তাহাদের অবিনশ্বর।

সেই ভাল, সেই ভাল। রাবেয়া যদি সুখী হয়, তাহার সুন্দর আননে যদি তৃপ্তির মাধুর্য্যধারা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, তাহা হইলেই রহমৎ কৃতার্থ! ভালবাসার পাত্রের সুখ ও আনন্দে যে তৃপ্তিলাভ করিতে না পারে, তাহার মনুষ্যজন্ম ব্যর্থ।

কিন্তু একবার—শেষবারের জন্য সে কি তাহার আবাল্য-সঙ্গিনীর হাসিমুখ—দয়িত-লাভের আনন্দে কেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে, তাহা দেখিতে পাইবে না?

ধীরে ধীরে যুবক গুহার বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। ও কি! আকাশ যে কালো মেঘে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে! দামিনীর প্রচণ্ড দীপ্ত হাস্যরেখা যেন তাহাকে

বিদ্রূপ করিতে করিতে সীমাহীন আকাশের বুকে নৃত্য করিয়া গেল।

দূরে—বহুদূরে আলোক-দীপ্তির তরঙ্গ তুলিয়া কাহারা যেন তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিল। কটিদেশের বস্ত্র-বন্ধনী দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিয়া অসমসাহসী যুবক শৈলদেহ বাহিয়া নীচে অবতরণ করিতে লাগিল। কালো জলে তরঙ্গ তুলিয়া বারিরাশি ও কি বার্ত্তা বহন করিয়া আনিতেছে?

রহমৎ দৃঢ়সংকল্পে সলিলমধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িল। তার পর তীরস্থ আলোকমালার প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিয়া, বারিরাশি মথিত করিতে করিতে সে অগ্রসর হইল।

শোঁ শোঁ শব্দে ঠিক সেই মুহূর্ত্তে ঝটিকার কৃষ্ণজটাজাল বারিবিস্তারের উপর দিয়া যেন মৃত্যুর বার্ত্তা লইয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল। কড় কড় শব্দে আকাশে অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল। অকস্মাৎ দৈত্যের ন্যায় সহস্র বাহু উদ্যত করিয়া ভীমকান্ত তরঙ্গদল রহমতের দিকে অট্টহাস্যে ছুটিয়া চলিল। রহমৎ স্থিরলক্ষ্যে অগ্রসর হইতে লাগিল।

* * * *

প্রভাত-অরুণকিরণে প্রকৃতি হাসিতেছিল। গতরজনীর দুর্য্যোগের কোনও চিহ্ন আকাশে বা বাতাসে ছিল না।

তিন চারিখানি সুদৃশ্য বজরা পুষ্পমাল্য ও পতাকায় সুশোভিত হইয়া সোপান-শ্রেণীর পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। দেশীয় আচার অনুসারে নবদম্পতি বজরায় চড়িয়া জল-বিহারে যাইবে।

নবপরিণীতা রাজকন্যা রত্নাভরণে ভূষিতা হইয়া প্রথম বজরায় আরোহণ করিবার জন্য সোপান-শ্রেণী অতিক্রম করিতেছিল। নানা আভরণে সুশোভিতা সঙ্গিনীগণ পশ্চাতে কলহাস্যে চারিদিক্ মুখরিত করিয়া তুলিতেছিল। রাজকন্যা সর্ব্বাগ্রে বজরায় আরোহণ করিলে সকলে তাহার অনুগামিনী হইবে। সর্দ্দার মোয়াজিম খাঁ সকলের পশ্চাতে জামাতার সঙ্গে আসিতেছিলেন।

বজরার মাঝিমাল্লা ও রক্ষকগণ সসম্ভ্রমে সেই শোভাযাত্রার দিকে চাহিয়া ছিল। রাজকন্যা সর্ব্বনিম্ন সোপানের কাছে দাঁড়াইতেই প্রথম বজরাখানি সম্মুখদিকে সরিয়া আসিল। মখমলমণ্ডিত দারুনির্ম্মিত আরোহণী বজরা হইতে প্রস্তরমণ্ডিত সোপানশ্রেণীর উপর নামাইয়া দেওয়া হইল।

রাজকন্যা চঞ্চল-চরণে আরোহণীর উপর উঠিলেন। সম্ভবতঃ আরোহণী সুবিন্যস্ত হয় নাই, উহার উপর দাঁড়াইবা মাত্র সহসা উহা একপার্শ্বে সরিয়া গেল।

সুন্দরীর মুখ হইতে একটা অব্যক্ত বিস্ময় ও আতঙ্কের চাপা শব্দ হইবামাত্র সঙ্গিনীরা চারিদিক্ হইতে ছুটিয়া আসিল। না, রাজকুমারীর অঙ্গে কোনও বিশেষ আঘাত লাগে নাই; কিন্তু সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, একটা অর্দ্ধনগ্ন মৃতদেহ বজরা ও সোপানশ্রেণীর মধ্যে ভাসি-তেছে। রাজকুমারীর কোমল চরণযুগল শবদেহ স্পর্শ করিয়াছিল।

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া রাবেয়া উপরের সোপানের উপর উঠিয়া দাঁড়াইল। ভীষণ কৃষ্ণবর্ণ মৃত-দেহটা কোথা হইতে আসিল? গোলমাল শুনিয়া মোয়াজিম খাঁ ঘটনাস্থলে আসিলেন। তাঁহার আদেশে মৃতদেহ তীরে তোলা হইল।

বৃদ্ধা ধাত্রী রহমতের জননীও রাবেয়ার সঙ্গে আসিয়াছিল। সেও ব্যাপার দেখিবার জন্য তথায় আসিয়া দাঁড়াইল। মোয়াজিম তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেই বিবর্ণ, বিকৃত মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ধাত্রী দুই হস্তে বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া পড়িল। তাহার মুখ হইতে চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মর্ম্মভেদী স্বরে বাহির হইল—"বাপজান!"

মিলন-রজনীর প্রভাতে শৈশব-সঙ্গীর প্রাণহীন দেহস্পর্শে রাবেয়ার সুন্দর গোলাপী আননে কি মৃত্যুর বিবর্ণতা ফুটিয়া উঠিয়াছিল?

অগুরু—পৌষ, ১৩৩৫

কেরাণী

প্রথম পরিচ্ছেদ

উচ্চহাস্যে সতীশ বলিল, "তোমার সবতাতেই বাড়াবাড়ি, ভাই! বর্ণনা করতে বসলে আর জ্ঞান থাকে না। শেষে অতিরঞ্জনের ছাপে আসল সত্যটুকু কোথায় লুপ্ত হয়, আর খুঁজে পাওয়া যায় না।"

অবিনাশ এমন ভাবে টেবলের উপর আঘাত করিল যে, তাহার হাত লাগিয়া চায়ের পেয়ালা উলটাইয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তাড়াতাড়ি সেটাকে ধরিয়া উত্তেজিতকণ্ঠে সে বলিল, "এক বর্ণও মিথ্যা বলি নি। তোমরা লক্ষপতি, সুখী মানুষ, গরীব কেরাণীর দুঃখ বুঝবার অবকাশ ও সুযোগ তোমাদের কোথায়? আর প্রয়োজন বা কি? তোমাদের এ বিষয়ে ত অভিজ্ঞতা নেই, শুধু কেতাব আর সংবাদপত্র প'ড়ে সব দুঃখটুকু কি অনুমান করা যায়?"

"তা ভাই, যাই বল না কেন, হ'তে পারে, অর্থের অভাব কেরাণী-জীবনে না ঘুচতে পারে, আর রোজ রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে আপিস যাওয়ার কষ্ট আছে। সে ত সকলেরই আছে, সময়মত সকলকেই কাজ করতে হয়, কিন্তু তুমি যে সব কষ্ট ও লাঞ্ছনার কথা বলছ, তা সত্য হ'লে এ পথে কি কেউ যেত? শুনেছি, টাকা জমা দিয়েও অনেকে কেরাণীগিরির চাকরীও লয়।"

নরেন্দ্র এতক্ষণ নিঃশব্দে বসিয়া চা পান করিতেছিল। সে বলিল, "না ভাই সতীশ, তুমি একটা ভুল করছ, অবিনাশের বর্ণনা অতিরঞ্জিত নয়। অবশ্য, আমাকে কেরাণীগিরির ঘানিতে এখনও কাঁধ দিতে হয়নি বটে, তবে আমি জানি, এমন কষ্ট, এমন লাঞ্ছনা আর কোন কাজে নেই।"

"কষ্ট? লাঞ্ছনা?—এই দুনিয়ায় এমন অভিশপ্ত জীব আর নেই। বাঙ্গালাদেশের কেরাণী কুকুর-বিড়ালের অপেক্ষাও অধম জীব। অথচ শিক্ষিত ভদ্র-সমাজের যে অংশ এইরূপে পিষ্ট হয়ে দিন দিন মনুষ্যত্ব-বর্জ্জিত হচ্ছে, তার সংখ্যা নিতান্ত তুচ্ছ নয়।"

নরেন্দ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, "কয়েকজন উকীল, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার ও মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ী ছাড়া আর সবই ত হতভাগ্য কেরাণী!"

উন্মুক্ত বাতায়ন পথে বাহিরের রাজপথের দিকে চাহিয়া সতীশচন্দ্র বলিল, "এতই যদি কষ্ট, এমনই যদি জঘন্য, তবে এ পথে সাধ ক'রে বাঙ্গালী যায় কেন? লাঙ্গল ধরাও যে এর অপেক্ষা ভাল।"

অবিনাশ এবার অনুশোচনার স্বরে বলিল, "পোড়া পেটের দায়ে, ভাই। তা ছাড়া আরামপ্রিয়, উদ্যমহীন বাঙ্গালী বৈদ্যুতিক পাখার বাতাস ও বিজলী-বাতির কুহকে মুগ্ধ হয়ে আপাতরম্য কেরাণীখানায় প্রবেশ করে।"

সতীশ ভৃত্যকে ডাকিল, "চিনিবাস, আমাদের জন্য বাড়ীর ভিতর থেকে আরও কিছু খাবার নিয়ে আয়।"

পান-ভোজন শেষ হইলে সতীশচন্দ্র বলিল, "যাক্, ভাববার জন্য একটা নূতন বিষয় পাওয়া গেল। এ বিষয়টা কখনও আলোচনা ক'রে দেখি নি।"

নরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষায় এ বিষয়ে একটা প্রবন্ধ লিখবে না কি?"

"না, সে ত হয়ে গেছে। বড় ভুল করেছি। অবিনাশ আগে যদি বলত, তবে সত্যই বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেরাণীতত্ত্ব নাম দিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতাম।"

অবিনাশ গম্ভীরভাবে বলিল, "ঠাট্টা-তামাসা নয়। কেতাবী বিদ্যায় এ সকল বিষয়ের আলোচনা চলে না। দস্তরমত কেরাণীগিরি ক'রে অভিজ্ঞতা জন্মালে তবে লেখা যায়!"

নরেন্দ্র ও সতীশ হাসিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সতীশচন্দ্রের মাথায় খেয়াল চাপিল; সে একবার কেরাণীগিরির বহরটা যাচাই করিয়া দেখিবে। কিন্তু পিতামাতা বা আত্মীয়-স্বজন কাহাকেও এ বিষয় জানিতে দেওয়া হইবে না। কারণ, তাহা হইলে তাহাকে কেহই এ কার্য্য করিতে দিবেন না। সে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র, ধনকুবের পিতার সন্তান, অভিজাতবংশে তাহার জন্ম। সামান্য কেরাণীগিরি করিবার তাহার কোনই প্রয়োজন নাই। পিতা রাধাগোবিন্দ মিত্র

রাজসরকারের উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত, রায় বাহাদুর খেতাব ত আছেই। অনেক বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীর সহিত তাঁহার অন্তরঙ্গ মিত্রতা। জ্যেষ্ঠ সহোদর-যুগল বিলাত-ফেরত—এক জন সিভিলিয়ান্, অপরটি ডাক্তার। রাজসরকারে উভয়েই নিযুক্ত। কলিকাতা সহরে তাঁহাদের ধনগৌরব ত আছেই; মান, সম্ভ্রম, প্রতিপত্তিও যথেষ্ট। এ অবস্থায় সে যদি সামান্য চাকরী করিতে যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের মাথা হেঁট হইবে। কিন্তু খেয়ালটা মিটাইতে না পারিলেও ত তাহার মন তৃপ্তিলাভ করিতেছে না। বাল্যকাল হইতেই সে অত্যন্ত জেদী ও খেয়ালী। পিতা-মাতার কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া অসম্ভব আদরে সে বাল্যকালে লেখাপড়ায় অত্যন্ত অমনোযোগী ছিল। খেলাধূলায় ও দুষ্টামি করিয়াই সে বহুদিন কাটাইয়া দিয়াছিল। শেষে তাহার পিতা যখন হতাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন এবং পরিণামে তাহাকে কোনও কারবারে ঢুকাইয়া দিবার জন্য জল্পনা-কল্পনা করিতেছিলেন, সেই সময়েই সতীশ জেদ করিয়া বলিল যে, সে এখন ব্যবসায়ে যাইবে না। তদবধি সে অখণ্ড মনোযোগের সহিত লেখা-পড়ায় মন দিয়াছিল। প্রকৃতিদত্ত মেধাবলে সে যে শুধু একটির পর আর একটি পরীক্ষা অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তাহা নহে, প্রত্যেক পরীক্ষায় সে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আত্মীয়-স্বজন সকলেরই বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল।

বিজ্ঞানে এম এস-সি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবার পর সকলেই তাহাকে বিলাতে যাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন। কিন্তু খেয়ালী সতীশ সে দিক্ দিয়া যায় নাই। সে বি, এল পরীক্ষার সঙ্গে রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তির জন্য চেষ্টা করিতেছিল। বিলাত যাওয়ার প্রসঙ্গে সে এক অদ্ভুত মত বাহির করিয়াছিল। তাহার ধারণা, অনেক বাঙ্গালী বিলাতে গিয়া ঠিক মানুষরূপে ফিরিয়া আসে না—আর একটা কিছু হয়।

রাধাগোবিন্দ মিত্র পিতৃপুরুষের ধর্ম্মমত ত্যাগ না করিয়াও প্রতীচ্য আচার-ব্যবহারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। গৃহে পৈতৃক শ্যামরায়ের বিগ্রহ ছিল, যথারীতি পূজাপাঠও হইত। সে সকল বিষয় তিনি বন্ধ করেন নাই বটে, তবে নিজে তাহাতে বড় যোগ দিতেন না। পুত্র, কন্যা প্রভৃতি সকলকেই অল্প-বিস্তর পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন; কিন্তু খেয়ালী সতীশচন্দ্রকে তিনি কোনমতে বাগে আনিতে পারেন নাই। তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করা হইত, সে সর্ব্বাগ্রে সেইটাই করিয়া বসিত। কোনও মতেই কেহ তাহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

কোনও সম্ভ্রান্ত, অভিজাত বংশের বিদুষী কন্যার সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব চলিতেছিল। কন্যার পিতাও রাধাগোবিন্দ বাবুর ন্যায় কুসংস্কারবর্জ্জিত। বালীগঞ্জের নিকটেই তাঁহাদের বাড়ী। কন্যা তখনও নাকি কলেজে পড়িতেছিল। পিতা, মাতা, ভ্রাতা প্রভৃতি সকলেরই এ বিবাহে আগ্রহ ছিল। কন্যাপক্ষও বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎকৃষ্ট ছাত্রটিকে কবলিত করিবার জন্য বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত ছিলেন; কিন্তু যে বিবাহ করিবে, তাহাকে কেহই রাজি করাইতে পারে নাই। সতীশচন্দ্র তাহার মাতাকে স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছিল যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষার ফল বাহির হইলেও সে বিবাহ করিবে না। এম্ এল্ পরীক্ষা দিয়া, পড়া শেষ করিয়া সে যখন ব্যবসায়ে প্রবেশ করিবে, তখন বিবাহের কথা চলিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

এ হেন খেয়ালী সতীশচন্দ্র যখন মনে মনে সংকল্প করিয়া বসিল যে, সে কেরাণীগিরি করিবে, তখন সে আর কোনও মতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিল না। পিতৃবন্ধু ডোনাল্ড সাহেবের নিকট এক দিন সে হাজির হইল। ডোনাল্ড সাহেব উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী। তিনি তাহাকে বিশেষরূপ চিনিতেন এবং তাহার বিদ্যাবুদ্ধির জন্য তাহাকে অত্যন্ত স্নেহও করিতেন।

করমর্দ্দন করিয়া সাহেব তাহার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিলেন। সতীশচন্দ্র সপ্রতিভভাবে নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিল।

"তুমি চাকরী করিবে? বল কি?"

"হ্যাঁ সাহেব, কোন একটা আপিসে যদি চাকরী করিয়া দাও, বড় ভাল হয়। ছোটখাট যাহাই হউক না কেন, আমার একটা চাকরী চাই।"

"ডেপুটী হইতে চাও?"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "হাকিমী আমি করতে পারব না, সাহেব। সে সব চাকরীর জন্য আমি আসি নি। কোন আপিসে একটা কেরাণীগিরি চাকরী আমি চাই।"

সাহেব বিস্মিতভাবে বলিলেন, "কেরাণীগিরির জন্য এত সখ হইল কেন? তোমার বাবা মত দিবেন? এ অদ্ভুত খেয়াল হইল কেন?"

"বাবা কি দাদারা জানতে পারলে হবে না। আমি কাহাকেও না জানিয়ে কাজ করতে চাই। কথাটা খোলসা ক'রে বলি, শুনুন। আমি কেরাণীগিরি সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখব, তাই এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চাই।"

সাহেব হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "এ ত বড়ই অদ্ভুত প্রস্তাব! এমন কথা কোন বাঙ্গালীর মুখে আমি এ পর্য্যন্ত শুনি নাই।—আচ্ছা, আমি তোমাকে একখানা পত্র দিতেছি। আমার জামাই ডিকেন্স সাহেব সেখানকার কর্ত্তা। তিনি এই মাসেই ছুটী লইয়া বিলাতে চলিয়া যাইবেন। সে আফিসে বোধ হয় কোন কাজ খালি থাকিতে পারে। এই আপিসের বড় কর্ত্তা ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবকে চেন ত? হাঁা, তোমার বাবার সঙ্গে তাঁর প্রগাঢ় বন্ধুত্ব আছে। তিনি এখন সিমলার পাহাড়ে আছেন। তাঁর কাছেও আমি তোমার জন্য পত্র লিখিতে পারি।"

সতীশচন্দ্র তাড়াতাড়ি বলিল, "না, সাহেব, তাঁকে জানাবেন না। আমি সকলের অজ্ঞাতসারে কাজ করতে চাই। আমি যে এম, এস্-সি পাশ করেছি, আপনার জামাতার নিকট সে কথা লিখবেন না।"

সাহেব হাসিয়া বলিলেন, "তুমি বড় রহস্যময় হইয়া উঠিতেছ। আচ্ছা, তোমার কথামত আমি পত্র লিখিয়া দিতেছি। কিন্তু কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তুমি কি প্রবন্ধ লেখ, তাহা একবার আমাকে পড়িতে দিও।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তাহার চাকরী জুটিয়াছিল। জনৈক বৃদ্ধ কেরাণী অবসর গ্রহণ করায় ক্রমে ক্রমে প্রমোসন দিয়া নিম্নপদে নূতন লোক লইবার কথা ছিল। ডিকেন্স সাহেব শ্বশুরের প্রেরিত যুবকটিকে সেই পদে বহাল করিলেন। মাসিক বেতন ত্রিশ টাকা। আপিসের বড়বাবুর অন্যতম শ্যালক সেই পদের প্রার্থী ছিলেন; কিন্তু বিলাতযাত্রার পূর্ব্বে সাহেব হেড্ক্লার্কের এ অনুরোধটি এবার রক্ষা করিতে পারিলেন না।

সাহেবের পরিচিত লোক বলিয়া আপিসের বড়বাবু মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেও, সতীশচন্দ্রকে নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে দেখিতে পারিলেন না। বড়বাবুরূপ জীবের সহিত যাঁহাদের কোনও কালে পরিচয় ঘটে নাই, তাঁহাদের সাধ্য নাই, এই অপূর্ব্ব প্রাণীর স্বরূপ অবগত হইতে পারেন। সুতরাং সতীশচন্দ্র প্রথমতঃ বড়বাবুর মুখোসপরা মুখখানিই দেখিতে পাইল। তাঁহার আসল মূর্ত্তিটি তখন প্রকাশ পাইল না।

প্রত্যহ দশটা পাঁচটা পর্য্যন্ত গৃহে অনুপস্থিত থাকিবার একটা কারণ আবিষ্কার না করিতে পারিলে সতীশচন্দ্র ধরা পড়িয়া যাইবে, এজন্য সে বাড়ীতে জানাইয়া রাখিল, প্রত্যহ সে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে পড়িতে যাইতেছে। বাড়ীর জুড়ি অথবা মোটর লইয়া সে কোনও দিন বাহির হইত না—পাছে সোফার অথবা কোচম্যান তাহার গন্তব্য স্থানের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে। সাধারণ পরিচ্ছদে সে ট্রামে চড়িয়াই আপিসে যাইত। ঘুণাক্ষরেও সে কোনও দিন বন্ধুবান্ধববর্গের কাহারও নিকট চাকরীর কথা প্রকাশ করিল না। নূতন জীবনের অভিজ্ঞতালাভের আকাঙ্ক্ষা তাহাকে উৎসাহিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই ছদ্ম অভিনয়ের অন্তরালে কৌতুকের উৎস লুক্কায়িত আছে মনে করিতেই তাহার চিত্ত পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। নিয়মের বাঁধাবাঁধির মধ্যে এ পর্য্যন্ত কেহ তাহাকে আনিতে পারে নাই। স্বেচ্ছায় এখন সে সেই নিয়মের শৃঙ্খলে আপনাকে ধরা দিয়াছিল।

আপিসের কেহই জানিত না যে, সতীশচন্দ্র মিত্র রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ পরীক্ষা দিয়াছে; সে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে এবং তাহার পিতার বহু লক্ষ মুদ্রার কোম্পানীর কাগজ আছে, এ কথাও সে প্রকাশ করে নাই। অন্যান্য কেরাণী এবং আপিসের বড়বাবু ও সাহেব পর্য্যন্ত জানিতেন, সে দরিদ্র-সন্তান, পেটের দায়েই চাকরী করিতে আসিয়াছে। সেই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া কেরাণীরাও তাহার উপর মুরুব্বীয়ানা প্রকাশ করিত। সে মনে মনে হাসিত এবং একমনে নিজের কাজ করিয়া যাইত। প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ের কিছু পূর্ব্বেই সে আপিসে হাজির হইত। নিজের কাজের সঙ্গে সঙ্গে সে বিশেষ আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিত, অন্য কেরাণীবাবুরা কে কি করেন।

ত্রিশ টাকা মাসিক বেতন তাহার নিকট অতিতুচ্ছ। প্রতিমাসেই হাতখরচের জন্য তাহার পিতা তাহাকে একশত করিয়া টাকা দিতেন। তাহা ছাড়া স্কলারশিপের টাকাও ছিল। প্রয়োজন হইলে, চাহিবামাত্রই পিতার নিকট হইতে সে যথেষ্ট অর্থ পাইত। সুতরাং প্রথম মাসের মাহিনা পাইয়া সে আপিসের মধ্যেই কেরাণীদিগকে খাওয়াইয়া দিল।

তাহার এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল; কিন্তু সে যখন গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিল, দুনিয়াতে সে একা, দ্বিতীয় আত্মীয় কেহ নাই, তখন সহানুভূতিতে সকলের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পার্ক ষ্ট্রীটের কাছাকাছি তাহাদের আপিস। ট্রাম হইতে নামিয়া প্রত্যহই সতীশকে খানিকটা পথ হাঁটিয়া যাইতে হইত। আপিসের গেটের কাছে আসিলেই সে একখানি জুড়ি ও তাহার মধ্যস্থ একমাত্র ষোড়শী যাত্রীকে প্রায়ই সেখান দিয়া যাইতে দেখিত। কোনও দিন গেটের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় দেখা হইত; কোনও দিন আপিসের বাহিরে, পথেই দেখা মিলিত। সতীশ দেখিয়াই বুঝিয়াছিল, মেয়েটি কোনও স্কুল অথবা কলেজের ছাত্রী। কারণ, তাহার সম্মুখস্থ আসনে বই এবং খাতাপত্র দেখিতে পাওয়া যাইত। প্রত্যহ প্রায় একই সময়ে একই স্থলে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটিতে থাকায় সতীশের মনে একটা কৌতুক জাগিয়া উঠিল। ব্যাপারটা ঠিক যেন উপন্যাসেরই মত কৌতুহলোদ্দীপক। সতীশ এই নবীনা, অপরিচিতার মুখ-চক্ষুর ভঙ্গীতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিত যে, সে সামান্য কেরাণী, চাকরীর জন্য আপিসে যাইতেছে, এ কথাটি যেন অপরিচিতা বুঝিয়া রাখিয়াছে। প্রত্যহ গাড়ীখানি তাহার পার্শ্ব দিয়া চলিয়া যাইবার সময় সে অভ্যাসবশে সেই দিকে চাহিত। দৃষ্টি-বিনিময় হইবামাত্র নবীনা উপেক্ষাভরেই মুখ ফিরাইয়া লইত। আবার পরদিবস ঠিক এই অভিনয়ই চলিত।

পূর্ব্বে খুব সাধারণ পরিচ্ছদেই সতীশ আপিসে আসিত। কিন্তু এক দিন সহসা তাহার মনে কি খেয়াল চাপিল। সে উৎকৃষ্ট বেশভূষা করিয়া অঙ্গুলীতে হীরকাঙ্গুরীয় এবং সোনার রিষ্টওয়াচ ধারণ করিয়া আপিসে চলিল। সে বুঝিল, তাহার বেশের পরিবর্ত্তন নবীনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। শুধু তাহাই নহে, আপিসের সকলেই তাহার এই পরিবর্ত্তন দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া গেল। সে যেরূপ জামা, কাপড় ও জুতা পরিয়া আসিয়াছিল, আপিসের কাহারও তত বেশী দামের বেশ-ভূষা করিবার সামর্থ্য ছিল না। পরদিবস সে আবার নূতন প্রকার পরিচ্ছদ পরিয়া আসিল। সতীশ দেখিল, নবীনা ছাত্রীটি তাহার বেশবিন্যাসের পারিপাট্য কৌতুকের সহিত লক্ষ্য করিতেছে। আপিসের মধ্যেও তাহার এই প্রকার আকস্মিক পরিবর্ত্তনে একটা আলোচনারও সূত্রপাত হইয়াছিল।

ডিকেন্স সাহেব ছুটী লইয়া বিলাতে চলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে যে নূতন সাহেব আসিয়াছিলেন, সতীশ-চন্দ্রের কথা তিনি কিছুই জানিতেন না। বড়বাবু এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার মুখের গ্রাস যে ব্যক্তি কাড়িয়া লইয়াছে, তাহাকে কোনও বড়বাবু মার্জ্জনা করিতে পারেন না। তবে কাজকর্ম্মে সতীশের কোনও গলদ বাহির হয় নাই। নিয়মিত সময়ে আপিসে আসা ও যাওয়ার প্রতি তাহার লক্ষ্যও ছিল; কাজেই তিনি তাহাকে কায়দা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ ডিকেন্স সাহেবের আনীত লোক সে, কাজেই বড়বাবু সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। নূতন সাহেব আসিলে অসুবিধা অনেকটা দূরীভূত হইয়াছিল; কিন্তু সুযোগ মিলিতেছিল না। সতীশচন্দ্র যখন বিলাসী বাবুর ন্যায় প্রত্যহ নব নব পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া আপিসে আসিতে লাগিল, তখন বড়বাবুর আর ধৈর্য্যধারণের সীমা রহিল না। এক দিন তিনি সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওহে, এটা থিয়েটার নয়।"

সতীশ প্রকৃতই জানিত না যে, তাহার উপর বড়বাবুর মর্ম্মান্তিক আক্রোশ আছে। সে সবিস্ময়ে বিনীতভাবে বলিল, "আপনার কথা আমি বুঝতে পাচ্ছি না।"

মুরুব্বীয়ানা চালে চেয়ারে হেলান দিয়া গম্ভীরভাবে বড়বাবু বলিলেন, "সোজা কথাটা বুঝতে পারলে না? আপিস থিয়েটারও নয়, শশুরবাড়ীও নয়, এখানে অত বাহার ক'রে আসা ভাল নয়। এত টাকা তুমি কোথায় পাও?"

সতীশের মনটা সে দিন খুবই প্রসন্ন ছিল, কারণ, পূর্ব্ব-দিবসে সে সংবাদ পাইয়াছিল যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদের বৃত্তি এবার সেই পাইয়াছে। সুতরাং বড়বাবুর তিক্ত অপ্রীতিকর মন্তব্য তাহার চিত্তে প্রথমতঃ তেমন আঘাত করিল না। সে বলিল, "পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয়, ইহা আমার জানা ছিল না। সুতরাং আপনার মন্তব্যের হেতু আমি বুঝতে পারলাম না।"

বিদ্রূপভরে বড়বাবু বলিলেন, "ত্রিশ টাকা মাহিনার

কেরাণীর এত বাবুয়ানা কেন ? সাহেবের কাণে গেলে অনর্থ হবে, তাহা ব'লে রাখলাম।"

সতীশের চিত্ত জলিয়া উঠিল। দুই মাস সে এখানে কাজ করিতেছে। ইহার মধ্যে বড়বাবু অন্যান্য কেরাণীর প্রতি প্রায়ই তাঁহার প্রভুত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা সে লক্ষ্য করিয়াছে, কিন্তু তাহার সহিত এ পর্য্যন্ত তিনি কোনও অশিষ্ট ব্যবহার করেন নাই। আজ অসম্মানজনক উক্তি শুনিয়া তাহার উদ্ধত প্রকৃতি আত্মপ্রকাশ করিল। একটু উষ্মার সহিত বলিল, "আপনি বোধ হয়, একটু অনধিকারচর্চ্চা করছেন। আপিসের কাজের সঙ্গে কারও বেশভূষার বাহুল্য বা পারিপাট্যের কোন সংস্রব নাই। আর আমার বাবুয়ানার সঙ্গেও বোধ হয় সাহেবেরও কোনরূপ সম্বন্ধ থাকতে পারে না"

আজ পর্য্যন্ত দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপশালী, আপিসের হর্ত্তা-কর্ত্তারূপ এই বড়বাবুটির মুখের উপর এমন দুঃসাহসের পরিচয় কেহ দিতে পারে নাই। তিনি সবিস্ময়ে এই নবীন কেরাণীর মুখের দিকে কয়েক মিনিট তাকাইয়া থাকিয়া পরে তাহাকে নিঃশব্দে বিদায় দিলেন। সতীশচন্দ্র বুঝিল, এইবার কেরাণী-জীবনের আর এক অঙ্ক অভিনয়ের সূত্রপাত হইল। এবার হয় ত নূতন দৃশ্যপটের অবতারণা শীঘ্রই হইবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তাহার অনুমান মিথ্যা নহে। কাজকর্ম্মের নানা প্রকার ক্ষুদ্র খুটিনাটি লইয়া ইদানীং হেডক্লার্ক প্রায়ই তাহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিতে আরম্ভ করিলেন। সতীশচন্দ্র মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কোনমতেই সে হটিবে না। অত্যন্ত যত্ন পূর্ব্বক সে আপনার নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিয়া যাইত, সে জন্য বড়বাবু চেষ্টা করিয়াও সহসা তাহার কাজের বিশেষ কোনও ত্রুটি আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। এক দিন একটি সামান্য বিষয়ের জন্য তিনি সতীশচন্দ্রকে ডাকাইয়া তাহার স্কন্ধে দোষারোপের চেষ্টা করিয়াছিলেন। চোখ রাঙাইয়া চড়াগলায় কি বলিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ধীরভাবে সতীশচন্দ্র তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল যে, যে ত্রুটির জন্য তিনি মেজাজ গরম করিতেছেন, তাহার জন্য সে আদৌ দায়ী নহে এবং ভবিষ্যতে কোনও কার্য্যের প্রয়োজন হইলে তিনি কাগজে-কলমে যেন তাহার নিকট হইতে কৈফিয়ৎ গ্রহণ করেন। মৌখিক আলোচনা করিবার স্পৃহা এবং অবকাশ তাহার আদৌ নাই।

সে দিন সকাল হইতে মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইয়াছিল। বেলা সাড়ে নয়টার সময় বৃষ্টি ধরিলে সতীশচন্দ্র বাড়ী হইতে বাহির হইল। আজ তাহার আপিসে পৌঁছিতে কিছু বিলম্ব হইবে। সে কল্পনা-নেত্রে অনুমান করিয়া লইল, হেডক্লার্ক আজ তাহার এই অপরাধ লইয়া একটা কাণ্ড বাধাইয়া বসিবেন। ব্যাপারটি মনে মনে আন্দোলন করিতে করিতে সে পরম কৌতুক অনুভব করিল। অভিজ্ঞতা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে।

আজ বেলা হইয়া গিয়াছিল, সুতরাং গাড়ী বোধ হয় এতক্ষণ চলিয়া গিয়াছে, আপিসের কাছাকাছি আসিয়াই কথাটা সতীশের মনে অকস্মাৎ উদিত হইল। উভয়ের এই যে নীরব দর্শন, ইহা নিত্য-ব্যাপারের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল।

রাজপথে জনতা দেখিয়া সতীশ দ্রুতপদে সেই দিকে চলিল। দেখিল, একটা ভাড়াটিয়া গাড়ী পথের এক পার্শ্বে কাত হইয়া পড়িয়া আছে, আর তাহারই অপর পার্শ্বে প্রত্যহ-দৃষ্ট সেই জুড়ি দাঁড়াইয়া। দেখিয়াই সে বুঝিল যে, দুইখানি গাড়ীতে সংঘর্ষ হইয়াছে। জুড়ি-গাড়ীর কোচম্যান এবং ভাড়াটিয়া গাড়ীর গাড়োয়ান উভয়েই ভূমিশায়ী। পথের ফুটপাতের উপর বিবর্ণমুখে নবীনা সুন্দরী দাঁড়াইয়া আছে। কৌতূহলী জনতা শুধুই জটলা করিতেছে। মুহূর্ত্তমধ্যে সতীশ ঘটনাস্থলে গিয়া সহিসের সাহায্যে কোচম্যান ও গাড়োয়ানকে উঠাইল। সাংঘাতিকরূপে আহত না হইলেও তাহাদের উভয়েরই চলৎশক্তি ছিল না। অন্য একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উভয়কে হাঁসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া সতীশ সসম্ভ্রমে অপরিচিতার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। অজ্ঞাতকুলশীল হইলেও সেই দুর্ঘটনার সময় একটা পরিচিত মুখ দেখিয়া নবীনার আনন সহসা আলোকদীপ্ত হইয়া উঠিল।

সতীশ সংক্ষেপে বলিল, "আপনি গাড়ীতে চ'ড়ে বসুন। ঘোড়া ও গাড়ীর বিশেষ কোনও ক্ষতি হয় নি।"

কৌতূহলী জনতার দৃষ্টিপথ হইতে আপনাকে লুকাইবার জন্য যন্ত্রচালিতবৎ নবীনা গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিল। সতীশ সহিসকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুই গাড়ী হাঁকাতে পারিস ?"

সে যাহা বলিল, তাহাতে সতীশচন্দ্র সন্তুষ্ট হইতে পারিল

না। নবীনা মৃদুস্বরে বলিল, "ও নূতন লোক, বোধ হয় পারবে না। এখন কি হবে?"

তখন সতীশচন্দ্র বলিল, "আমার জুড়ি হাঁকান অভ্যাস আছে; কোথায় যাবেন, বলুন, আমি পৌঁছে দিয়ে আসছি।"

লজ্জারক্ত আননে নবীনা বলিল, "আপনি যাবেন? আপনার তাতে কত কষ্ট হবে। বিশেষতঃ আপনার আপিসের বেলা—"

বাধা দিয়া সতীশচন্দ্র বলিল, "সে জন্য আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এখন কোথায় যেতে হবে, অনুগ্রহ ক'রে বলুন। আপনাকে রেখে দিয়েই আমি আপিসে ফিরতে পারব।"

"তবে কলেজে—বেথুন কলেজেই গেলে ভাল হয়; কিন্তু আপনার বড় কষ্ট হবে। বিশেষতঃ—"

সতীশচন্দ্র ততক্ষণে কোচবাক্সে চাপিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া দিয়াছিল।

যথাস্থানে পৌঁছিয়া নবীনা সহিসকে ঘোড়া দুইটিকে আস্তাবলে বাঁধিয়া রাখিয়া বাড়ীতে খবর দিবার জন্য আদেশ করিল। তার পর নতমস্তকে মধুর ভঙ্গীতে সতীশকে অভিবাদন করিয়া, তাহার অযাচিত সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞতা জানাইয়া ভিতরে চলিয়া গেল।

বেলা প্রায় বারোটার সময় আপিসে আসিতেই হেড-ক্লার্ক তাহার অকারণ বিলম্বের জন্য কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিলেন। সে বুঝিল, আজ বড়বাবু তাহাকে বাগে পাইয়াছেন, অল্পে ছাড়িবেন না। সে সংক্ষেপে পথের দুর্ঘটনার কথা প্রকাশ করিল।

বড়বাবু ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া বলিলেন, "তোমার ও সব বাজে কথা শুনতে চাই না। এটা গভর্ণমেণ্টের আপিস, ইয়ারকি দেবার জায়গা নয়। তুমি কোথায় সারা রাত্রি জেগে, ইয়ারকি দিয়ে ইচ্ছামত যখন তখন আপিসে আসবে, এরূপ আব্দার চলবে না, আমি আজই তোমার নামে রিপোর্ট করব।"

সতীশচন্দ্রের আজ মেজাজ ভাল ছিল না। তার পর এরূপ শ্লেষ, বিদ্রূপ এবং কটূক্তি, বিশেষতঃ তাহার চরিত্রের প্রতি এমন নির্ম্মম ইঙ্গিত সহ্য করা কোন কালেই তাহার অভ্যাস ছিল না। সে তীব্রভাবে বলিল, "আপনার যা খুসী, তাই করতে পারেন। আমার বক্তব্য বলেছি, বিশ্বাস না করেন, ক্ষতি নেই; কিন্তু আপনি মনে রাখবেন, ভদ্রসন্তানের সহিত আপনি কথা বলছেন। ওরূপভাবে ব্যঙ্গ কর্‌বার কোনও অধিকার আপনার নেই, সেটা ভুলবেন না।"

সতীশচন্দ্র নিজের আসনে ফিরিয়া গিয়া গম্ভীরভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। হেড্‌ক্লার্ক সাহেবের নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিবেন, অন্যান্য কেরাণীরা সে কথা তাহাকে গোপনে জানাইয়া গেল।

আপিসের কেরাণীরা বড়বাবুকে ভয় করিয়া চলিত। কারণ, তাহারা জানিত, তিনিই তাহাদের ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু মনে মনে কেহই এই অত্যাচারী বড়বাবুটির প্রতি প্রসন্ন ছিল না। শুধু যে কয়জন আত্মীয়কে তিনি নিজের আপিসে চাকরী করিয়া দিয়াছিলেন, তাহারাই তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল। কারণ, সুবিধা তাহারাই ভোগ করিতে পাইত। সাহেব দুই আপিসে কাজ করিতেন। এ জন্য এই আপিসের কার্য্য-পরিচালনের ভার হেড ক্লার্কের উপরেই ন্যস্ত ছিল। তিনি শুধু সহি করিয়া খালাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

পরদিবস আপিসে আসিবার সময় সতীশ আকাঙ্ক্ষিত জুড়ির প্রতীক্ষায় মুখ তুলিয়া চাহিতেই দেখিতে পাইল, গাড়ীখানি মৃদুগতিতে আসিতেছে। আজ একটু পূর্ব্বেই দেখা হইয়া গেল। তাহাকে দেখিতে পাইয়া নবীনা কোচম্যানকে কি ইঙ্গিত করিল। এ লোকটি নূতন। সে তখনই অশ্বরজ্জু সংযত করিল। সহিস দৌড়িয়া সতীশের কাছে আসিয়া "মেমসাহেবের" সেলাম জানাইল। "মেমসাহেব" শব্দে সতীশ একটু চমকিয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু পরক্ষণেই আত্ম-সংবরণ করিয়া দ্রুতপদে গাড়ীর কাছে গিয়া দাঁড়াইল। নমস্কার করিয়া অপরিচিতা বলিল, "আমায় ক্ষমা করবেন। কা'ল আপনার নাম ও ঠিকানা নিতে ভুলে গিয়েছিলাম। দয়া ক'রে দিবেন কি?"

সতীশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমার নাম ও ঠিকানায় আপনার বিশেষ কোন প্রয়োজন হ'বে—"

নবীনা তাড়াতাড়ি বলিল, "আমার উপকারকের নামধাম জানব না, এত বড় অকৃতজ্ঞতা মার্জ্জনার যোগ্য নয়! আপনি অনুগ্রহ ক'রে এই খাতায় লিখে দিন।" বলিয়া

সুন্দরী তাহার বাঁধান খাতা ও ফাউণ্টেনপেন্‌টি সতীশের সম্মুখে ধারণ করিল। তাহার মিষ্ট অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সতীশ তাহার নিজের নাম লিখিয়া দিল; কিন্তু ঠিকানা লিখিবার সময় সে তাহার বন্ধু অবিনাশের বাড়ীর ঠিকানা দিল।

নবীনা একখানি কাগজে নিজের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া সতীশচন্দ্রের হাতে দিয়া বলিল, "যদি কখনও আমাদের ওদিকে যান, দয়া ক'রে আমাদের বাড়ী যাবেন।"

নমস্কার আদান-প্রদানের পর গাড়ী চলিয়া গেল। সতীশচন্দ্র দেখিল, কাগজে নাম লেখা রহিয়াছে—"কুমারী অনিলা রায়, ৩নং বালিগঞ্জ।"

সে দিনও আপিসে আসিতে তাহার পাঁচ মিনিট বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল। সে অন্যান্য কেরাণীদের নিকট শুনিতে পাইল, বড়বাবু সাহেবের নিকট তাহার নামে রিপোর্ট করিয়াছেন। আজ খোদ বড় সাহেব বারোটার পর আপিস দেখিতে আসিবেন। তিনি সিমলা-শৈল হইতে সংপ্রতি ফিরিয়া আসিয়াছেন। ছোট সাহেব তাঁহার নিকট সতীশের অবাধ্যতার ব্যাপার পেশ করিবেন বলিয়াছেন। বড়বাবু তাহার স্কন্ধে যে সকল অপরাধ চাপাইয়াছেন, তাহার পরিণামফল বড়ই গুরু হইবার সম্ভাবনা। উপরওয়ালার প্রতি অসম্মানসূচক বাক্যপ্রয়োগ এবং তাঁহার কথার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি, চাকরী পর্য্যন্ত লইয়া টানাটানি হইতে পারে। সতীশ আরও সংবাদ পাইল, বড়বাবুর প্ররোচনায় ছোট সাহেব তাহার উপর নাকি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহাদের ডিপার্টমেণ্টের বড় কর্ত্তা যখন ঘটনাবশে স্বয়ং আপিসে আসিতেছেন, তখন এই গুরু বিষয়ের বিচার তিনিই করিবেন, সাহেব এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র মনে মনে হাসিয়া নিজের আসনে বসিল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে বুঝিল, তাহার কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার অবসর শেষ হইয়া আসিয়াছে। আর এ অভিনয় চলিবে না। বড় সাহেব ম্যাক্‌ফারসন যখন আজ আপিসে আসিয়া তাহার অপরাধের বিচার করিতে বসিবেন, তখন নিশ্চয়ই তাহার ডাক পড়িবে। তখন?—তিনি ত নিশ্চয়ই তাহাকে চিনিয়া ফেলিবেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে সাহেব প্রায়ই তাহাদের বাড়ী গিয়া থাকেন। তাহার সহিত ম্যাক্‌ফারসন সাহেবের যে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তিনি তাহাকে কতদিন কতবার নানাপ্রকার উপহার দিয়াছেন। তাহার রচিত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থও সে দিন তিনি এক প্রস্থ ডাকে তাহাদের বাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন।

সতীশচন্দ্র আপন মনে কাজ করিতে করিতে এমন নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল যে, চাপরাসী আসিয়া যখন তাহাকে জানাইল যে, বড়বাবু সাহেবের ঘরে তাহাকে ডাকিতেছেন, তখন তাহার চমক ভাঙ্গিল। ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, বারোটা বাজিয়া পনের মিনিট হইয়া গিয়াছে।

দুই এক জন পরিণতবয়স্ক কেরাণী মৃদুস্বরে উপদেশ দিল, সাহেবদিগকে যেন আভূমি নত হইয়াই সে সেলাম করে। মার্জ্জনাভিক্ষা করাই এ ক্ষেত্রে প্রশস্ত, কারণ, বড়বাবু তাহা হইলে প্রসন্ন হইয়া তাহার প্রতি লঘু দণ্ডের জন্য সাহেবকে অনুরোধ করিতেও পারেন ইত্যাদি।

কাহারও কথায় কোনও উত্তর না দিয়া প্রশান্তভাবে সতীশচন্দ্র সাহেবের কক্ষে প্রবেশ করিল। একটি মুক্ত বাতায়নের ধারে দাঁড়াইয়া সাহেবদ্বয় নিবিষ্টভাবে কি আলোচনা করিতেছিলেন। সতীশ বুঝিল, তাহারই সম্বন্ধে কথা হইতেছে। ছোট সাহেব বলিয়া যাইতেছেন আর বড় সাহেব নতমস্তকে তাহা শুনিতেছিলেন। হেড্‌ক্লার্ক একটা সরল বিস্ময়ের চিহ্নের মত অদূরে কাগজ-পত্র-হস্তে দাঁড়াইয়াছিলেন। সতীশ কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতেই সাহেবযুগল ফিরিয়া চাহিলেন। ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেব ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করিয়া চসমার মধ্য হইতে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সতীশের দিকে চাহিলেন, সে তাঁহাকে স্পষ্ট স্বরে গুড্‌মর্ণিং করিয়া অভিবাদন করিল। ম্যাক্‌ফারসন্ সাহেবের মুখে অকস্মাৎ প্রসন্নতার হাস্য উদ্ভাসিত হইল। তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন, "হ্যালো, সতীশ, তুমি—তুমি এখানে?" বলিয়াই দ্রুতবেগে কক্ষতল অতিক্রম করিয়া প্রবল বেগে সতীশচন্দ্রের কর-কম্পন করিলেন। তার পর বিস্ময়বিমূঢ় ছোট সাহেবের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "এটি আমার বিশেষ বন্ধু রাধাগোবিন্দ মিত্রের—রায় বাহাদুর রাধাগোবিন্দের ছোট ছেলে, তুমি নিশ্চয় তাঁহাকে চেন। রাজস্ব-বিভাগের তিনি এক জন বড় কর্ম্মচারী। হাঁা, তিনিই। সতীশ, তোমার বাবার কাছে শুনলাম যে, রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ বৃত্তি এবার তুমিই পেয়েছ। কা'ল দুপুরবেলা তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।" ছোট সাহেবের দিকে ফিরিয়া

তিনি বলিলেন, "হ্যামিল্‌টন, এ ছেলেটির গুণ তুমি জান না? কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রত্যেক পরীক্ষাতেই প্রথম স্থান অধিকার ক'রে এসেছে। ছেলেটি রত্নবিশেষ। যাক্, সতীশ, তুমি এখানে কি মনে ক'রে?"

হেড্‌ক্লার্ক কাঠের পুতুলের মত নির্ব্বাক্‌ভাবে এই ব্যাপার দেখিতেছিলেন। ত্রিশ টাকা বেতনের সতীশ মিত্র রায়চাঁদ-প্রেমচাঁদ-বৃত্তিধারী! আবার স্বনামধন্য রাধাগোবিন্দ মিত্রের পুত্র! ছোট সাহেবও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিলেন। অবশেষে হ্যামিলটন্ সাহেব ঘটনাটার কথা সংক্ষেপে বড় সাহেবকে বলিলেন।

সবিস্ময়ে বড় সাহেব বলিলেন, "তুমি ত্রিশ টাকার মাহিনায় আমার আপিসে কাজ লইয়াছ, সতীশ? কেন, কি দুঃখে?" পরক্ষণেই ছোট সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অন্য কোন নিরিবিলি ঘর আছে? চল, সেই ঘরে গিয়া আমরা এই ব্যাপারটার ব্যবস্থা করি।" ছোট সাহেব নিজের খাস-কামরায় বড় সাহেবকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। ম্যাক্‌ফারসন্ সতীশকে ডাকিয়া বলিলেন, "শুধু তুমি আমাদের সঙ্গে এস, সতীশ!"

অপমানিত বড়বাবু নতমস্তকে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আজ কি তিনি শুধু স্বপ্নই দেখিতেছেন? ইন্দ্রজাল নহে ত?

* * * *

সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সাহেবদ্বয় হাসিয়াই অস্থির। কেরাণী-জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য সতীশচন্দ্র এমন ভাবে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ব্যাপারটা উপন্যাসের মতই কৌতুকাবহ! তার পর বড়বাবুর দুর্ব্ব্যবহারের কথা সে স্পষ্টভাবেই সাহেবদিগকে জানাইয়া দিল। অল্পবুদ্ধি বাঙ্গালী ক্ষমতার গর্ব্বে কিরূপ নীচ, স্বার্থপর ও অত্যাচারী হয়, তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন আপিসের বড়বাবুরা, এ কথা নির্দ্দেশ করিতে সতীশচন্দ্র বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করিল না। বড় সাহেব বলিলেন, "তোমার কথা খুবই সত্য, সতীশ, কিন্তু সে দোষ ইংরাজের নয়।"

সতীশচন্দ্র দৃঢ়স্বরে বলিল, "আপনারা নিজের কর্ত্তব্য পালন করিলে কেহ এই প্রকার অত্যাচারী হইয়া উঠিতে পারে না। আপনারা হেডক্লার্কদিগের উপর সমস্ত ভার দিয়া নিশ্চিন্তমনে হাসিয়া খেলিয়া বেড়ান বলিয়াই তাহারা আপনাদের ক্ষমতা আত্মসাৎ করিয়া থাকে।"

সাহেবদ্বয় সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিতে পারিলেন না।

ম্যাক্‌ফারসন্ বলিলেন, "তার পর তোমার Research এখানে আর কত দিন চলিবে?"

"আজ্ঞে, আর চলিল কৈ? আপনি আসিয়াই সব গোলমাল করিয়া দিলেন।"

"তুমি যদি সত্যই চাকরী করিতে চাও, তবে তোমাকে আমি ভাল একটা কাজ দিতে পারি। কালে তুমি খুব বড়দরের রাজকর্ম্মচারী হইতে পারিবে।"

সতীশ বলিল, "ধন্যবাদ; কিন্তু চাকরীর সখ আমার মিটিয়াছে। ও পথে আর যাইব না, মহাশয়। আচ্ছা, তবে এখন আসি সাহেব। একবার বড়বাবুর কাছে বিদায় লইয়া যাইতে হইবে। সাহেব, আপনি বাবাকে এ সকল কথা বলিবেন না। আচ্ছা, নমস্কার! নমস্কার, মিঃ হ্যামিল্‌টন্!"

সাহেবযুগল সাদরে তাহার করমর্দ্দন করিলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

মাতা বলিলেন, "বাবা, পড়া ত শেষ হ'ল, এইবার বৌ ঘরে আন্‌বার বন্দোবস্ত করি?"

সতীশচন্দ্র কেরাণীর কাজ ছাড়িয়া দিয়া কয়দিন নিতান্ত কর্ম্মহীন জীবন যাপন করিতেছিল। কয়মাস একটা নূতন-ত্বের মধ্য দিয়া সে চলিতেছিল। প্রত্যহ পাঁচ ছয় ঘণ্টা সাধারণ বাঙ্গালী ভদ্রলোকের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের প্রণালীর সহিত পরিচিত হইয়া সে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। উদ্ধত প্রকৃতিটা স্বেচ্ছায় বরণ করা শাসন-শৃঙ্খলার বেষ্টনীর মধ্যে পড়িয়া অনেকটা শান্ত হইয়াছিল, সে জন্য অন্য সময়ে বিবাহের বিরুদ্ধে সে যতটা জোর করিয়া মত প্রকাশ করিত, আজ ততটা করিতে পারিল না। নম্রকণ্ঠে সে বলিল, "বিবাহ দিতে চাও দাও। কিন্তু তার আগে বাবাকে ব'লে একটা কারবার খুলতে ব'লে দাও। কাজ আরম্ভ না হ'লে বিবাহ করা চল্‌বে না। আর একটা কথা, মেমসাহেব গোছের বৌ ঘরে আন্‌তে পার্‌বে না। ও সব আমি পছন্দ করি না।"

তাহার কনিষ্ঠ সহোদরা লীলা সেখানে দাঁড়াইয়াছিল; সে বলিল, "মেমসাহেব আবার কাকে বলে? লেখা-পড়া করলে কি ভাল জামা-কাপড় পরলেই কি মেমসাহেব হয়?"

গম্ভীর-স্বরে সতীশ বলিল, "না, তা নয় বটে; কিন্তু আমরা বাঙ্গালী, হিন্দু, আমাদের ঘরের মেয়েরা লক্ষ্মীর মত পায় আলতা, কপালে সিঁদুর-টিপ পরবে, তাহা না ক'রে জুতো পায় দিয়ে, পাউডার মেখে, পেখম ধ'রে বেড়ালে বড়ই বিশ্রী দেখায়। এ রকম বৌ যার ভাল লাগে লাগুক, আমি ত বরদাস্ত কর্‌তে পার্‌ব না।"

মাতা ও কন্যা পরস্পর দৃষ্টি-বিনিময় করিলেন। সতীশের এ ইঙ্গিত যে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূদ্বয়ের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা উভয়েই বুঝিলেন।

লীলা বলিল, "তা তোমার জন্য বাবা যে মেয়ে ঠিক করেছেন, নিজের চোখে একবার তাকে দেখ্‌বে?"

মাতা বলিলেন, "সে ভাল কথা। এ কালের সব ছেলেই ত নিজেরা দেখে বিয়ে কর্‌ছে। তোর মত যদি হয়, বন্দোবস্ত করা যায়।"

সতীশ হাসিয়া বলিল, "তোমরা ক্ষেপেছ না কি? বাপ-মা থাক্‌তে যে সব ছেলে নিজে মেয়ে দেখ্‌তে যায়, আমি কোন দিন তাদের বুদ্ধির প্রশংসা কর্‌তে পার্‌ব না। সন্তানের ভালমন্দ মা-বাপের চেয়ে কেহই ভাল বুঝ্‌তে পারে না। তোমরা যা ঠিক কর্‌বে, তাই হবে। তবে মেমসাহেব না হলেই হ'ল।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বন্ধু অবিনাশ একখানি সুদৃশ্য খামে আঁটা পত্র সতীশচন্দ্রের হাতে দিল। সে পড়িয়া দেখিল, উপরে তাহারই নাম। কৌতূহলপরবশ হইয়া সে খামখানি খুলিয়া দেখিল, ছোট একখানি সুদৃশ্য কাগজে কয় ছত্র লেখা;—"সবিনয় নিবেদন, আমার জন্মতিথি উপলক্ষে বাড়ীতে ক্ষুদ্র প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হইয়াছে, দয়া করিয়া পদধূলি দিলে সুখী হইব। বাবার সহিত আপনার পরিচয় করাইয়া দিবার ইচ্ছা হইয়াছে। আশা করি, আমাদিগকে আপনার সঙ্গলাভে বঞ্চিত করিবেন না। ইতি নিবেদিকা অনিলা রায়।"

অবিনাশ বলিল, "ব্যাপার কি হে?"

"সে একটা রোমান্স। তবে আশঙ্কার কোন কারণ নেই।" এই বলিয়া সে ক্ষুদ্র কাহিনীটি বলিয়া গেল।

অবিনাশ বলিল, "প্রেমে পড় নাই ত? এরূপ ক্ষেত্রে এ রকম হয়, অন্ততঃ কেতাবে লেখে।"

সতীশ হাসিতে লাগিল। অবিনাশ আবার বলিল, "নিমন্ত্রণে যাবে না কি?"

"হাঁ, ব্যাপারটা দেখে আসা যাক্। কিন্তু একটা কথা ভাবছি, আমার বিবাহের সম্বন্ধ যেখানে হচ্ছে, শুনেছি, তাঁরাও বালিগঞ্জে থাকেন। যদি এই বাড়ীতে তাঁদেরও নিমন্ত্রণ হয়ে থাকে, তবে সেখানে দেখা হয়ে যেতে পারে। মা বাবা যদি পরে জান্‌তে পারেন, ভাববেন, আমি কৌশল ক'রে সেখানে মেয়ে দেখতে গিয়েছিলাম।"

অবিনাশ বলিল, "আরে বালিগঞ্জ কি একটা ছোট জায়গা? সেখানে অনেক লোকের বাস। জন্মতিথির প্রীতিভোজে খুব আত্মীয়-বন্ধুবান্ধবই নিমন্ত্রিত হয়। এ খুব ছোট ব্যাপার। দেখ্‌ছ না, কার্ড পর্য্যন্ত ছাপায় নি।"

বন্ধুর কথায় আশ্বস্ত হইয়া সতীশচন্দ্র নিমন্ত্রণ রাখিতে গেল। ৩ নং বালিগঞ্জ রোডস্থ ভবন খুঁজিয়া লইতে তাহাকে কোনই বেগ পাইতে হইল না।

নীচের হলঘরে প্রবেশ করিতেই কয়েকজন সুবেশধারী ভৃত্য ছুটিয়া আসিল। নিমন্ত্রিতগণ তখনও সকলে আসেন নাই, যাঁহারা আসিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় উপরেই ছিলেন। ভৃত্যগণ তাঁহাকে উপরে যাইতে অনুরোধ করিল। কিন্তু সতীশের ইচ্ছা, অধিক লোকের সহিত এখানে দেখা-সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল। অনিলা রায়ের সহিত দেখা করিবার কথা জানাইয়া একখানি কাগজে সে তাহার নাম সহি করিয়া দিল।

পর-মুহূর্ত্তেই একখানি ফিরোজা রঙের জরীর ফুল দেওয়া মূল্যবান্ ঢাকাই শাড়ী পরিয়া নগ্নপদে অনিলা সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চরণে জুতার পরিবর্ত্তে অলক্তক-রেখা দেখিয়া সতীশ বিস্মিত হইল! মেমসাহেব বলিয়া যাহাকে সে একটু কৃপার দৃষ্টিতে দেখিত, জন্মতিথি উপলক্ষে সে বাঙ্গালী-রমণীর স্বাভাবিক বেশে তাহার সম্মুখে আবির্ভূতা হওয়ায় সতীশচন্দ্র অত্যন্ত প্রীত হইল। সে সহসা বলিয়া ফেলিল, "আজ আপনাকে চমৎকার দেখাচ্ছে।"

লজ্জার অরুণরাগ তাহার আননে ফুটিয়া উঠিল। সে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আসুন, বাবার সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দেই।"

সতীশচন্দ্র কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "আমি উপরে যাব না। অন্যত্র আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে। তবে আপনি

দুঃখিত হবেন বলেই আমি এসেছি। যদি কিছু মনে না করেন, তবে—"

"আচ্ছা, আপনি তবে এইখানে বসুন, আমি বাবাকে ডেকে আনছি।"

অনিলা দ্রুত ও লঘুগতিতে চলিয়া গেল।

সতীশচন্দ্র অন্যমনে দেওয়ালের সুদৃশ্য চিত্রগুলি দেখিতেছে, এমন সময় পরিচিতকণ্ঠে কেহ ডাকিল, "দাদা, তুমি? তুমি এখানে?"

চমকিতভাবে সতীশ পশ্চাতে চাহিয়া দেখিল, ভিতরের দ্বারপথে তাহার সহোদরা লীলা দাঁড়াইয়া।

মৃদু হাসিয়া লীলা বলিল, "মেয়েটিকে কেমন দেখলে? পছন্দ হয়? মেমসাহেব, না, বাঙ্গালীর ঘরের লক্ষ্মী মেয়ে?"

সতীশচন্দ্র সবিস্ময়ে বলিল, "তুই কি বল্‌ছিস্, কার কথা বল্‌ছিস্? আর এখানেই বা এলি কি ক'রে?"

লীলা বলিল, "বাঃ! এখানে নিমন্ত্রণ হয়েছে, এসেছি। মা, বাবা, তাঁরাও উপরে আছেন। এটা যে রায় রামজীবন চৌধুরীর বাড়ী, তা জান না? যাঁর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ের কথা হচ্ছে গো! অনিলা তাঁরই একমাত্র মেয়ে—এইমাত্র তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছিল। তুমি লুকিয়ে লুকিয়ে কবে তার সঙ্গে ভাব ক'রে ফেলেছ বল ত? দু'জনের যে বেশ জানাশোনা আছে দেখছি! পছন্দ হয়েছে ত?"

সতীশচন্দ্রের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। সে মৃদুস্বরে বলিল, "দূর হয়ে যা বাঁদরি! আমার সঙ্গে ঠাট্টা!"

সহসা পদশব্দ পাইয়া লীলা সেখান হইতে সরিয়া গেল। তাহার মুখের জবাব মুখেই রহিয়া গেল।

অনিলা এক জন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সহিত হলঘরে প্রবেশ করিল। সে বলিল, "বাবা, ইনিই সে দিন আমাকে সাহায্য করেছিলেন। এঁর কথাই আপনাকে বলেছিলাম।"

রামজীবন বাবুকে সতীশ চিনিত। তিনিও তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছেন। সতীশের দিকে চাহিতেই তিনি সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি? তা নীচে দাঁড়িয়ে কেন? এস বাবা, উপরে চল, তোমার বাবা ও মা সেখানে আছেন। পাগ্‌লী মেয়ে, তুই সতীশকে নীচে বসিয়ে রেখে গেছিস; একটু বুদ্ধিশুদ্ধি নাই।"

অনিলা অবাক্ হইয়া একবার পিতা, আরবার সতীশচন্দ্রের দিকে চাহিতেছিল। তাহার পিতার কি মতিভ্রম হইয়াছে?

কন্যার বিস্মিত ভাব দেখিয়া তিনি বলিলেন, "রাধাগোবিন্দ বাবুর পুত্র ইনি। লীলার দাদা। চল বাবা, উপরে চল। ওহে হরিশ, সতীশ বাবুকে উপরে নিয়ে চল ত। আমি একবার গেটের কাছে যাই।"

হরিশ আধ্যাধারী ভদ্রলোকটি সতীশের কাছে আসিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। সতীশচন্দ্রও অধিকতর বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল, "আপনি এখানে যে, বড়বাবু?"

"রামজীবন বাবু যে আমার মামাত ভাই। কিছু মনে করো না সতীশ বাবু, তোমার সঙ্গে না জেনে আমি বড়ই অন্যায় ব্যবহার করেছিলাম।"

সতীশচন্দ্র বিনয়-নম্রস্বরে বলিল, "গতস্য শোচনা নাস্তি। ও কথা ছেড়ে দিন।"

হরিশ বাবু সতীশচন্দ্রের হাত ধরিয়া উপরে উঠিতে লাগিলেন।

অনিলা নতনেত্রে দাঁড়াইয়াছিল। সে বলিল, "বাবা!"

"কি মা?"

"আপনার ভুল হয় নাই ত? উনি যে কেরাণী, আমি নিজের চোখে ওঁকে কাজ করতে দেখেছি। রাধাগোবিন্দ বাবুর ছেলে কি কেরাণীগিরি কর্‌তে যাবেন?"

উচ্চহাস্য করিয়া প্রৌঢ় বলিলেন, "সতীশকে আমি ভুল করব? বলিস্ কি? সে ঘটনা আমি আজ তোর হরিশ কাকার মুখে শুনেছি। কেরাণী-জীবনের বিষয় প্রবন্ধ লিখবে ব'লে সতীশ কয় মাস সখ ক'রে হরিশের আপিসে গিয়েছিল। সে এক মজার ব্যাপার! তোমার হরিশ কাকার কাছে শুনো। এখন উপরে যাও মা, আমি ভদ্রলোকদিগকে অভ্যর্থনা করবার জন্য ফটকের কাছে গিয়ে দাঁড়াই। তোমার এখন ওঁদের কাছে থাকা চাই। বেশ লক্ষ্মীটির মত থেক, মা আমার!"

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া লঘুগতিতে অনিলা উপরে চলিয়া গেল। তাহার বুকের উপর হইতে যেন একখানি পাষাণ নামিয়া গিয়াছিল। তিনি তবে কেরাণী নহেন!

নারায়ণ,—১৩২৮

অসহযোগ

বড় ও ছোট, যুগল সাহেবই সে দিন খাস-কামরায় কেরাণী বাবুদিগকে আহ্বান করিলেন। বহু আবেদনের পর সে আপিসের কেরাণীর দল শতকরা ত্রিশ টাকা হারে বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। দরিদ্র, অনশনক্লিষ্ট, অভাব-পীড়িত কেরাণীদিগের আর্থিক অবস্থা এই ব্যবস্থায় বিশেষ উন্নত হয় নাই, তাই তাহারা দ্বিতীয়বার রাজপ্রতিনিধির নিকট আবেদন পাঠাইতেছিল। ছাপান দরখাস্ত স্বাক্ষর করিয়া তাহারা ছোট সাহেবের কাছেই দিয়াছিল। সেই বিভাগের ভাগ্য-বিধাতা, আপিসের বড় সাহেব ঘটনাক্রমে সেই সময় চিরস্থায়ী, সুখময় শৈলাবাস ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় সমতল ভূমিতে নামিয়া আসিয়াছিলেন। যথানিয়মে কাগজ-পত্র তাঁহার নিকটই যাইবার কথা। তিনি যখন এখানেই উপস্থিত, তখন একবার তাঁহাকে দেখাইয়া তার পর রাজপ্রতিনিধির নিকট পাঠাইবার ব্যবস্থাই সুসঙ্গত। কেরাণীরা তাহাতে বিশেষ আপত্তি করে নাই। তাহারই ফলে বড় সাহেব কেরাণীবর্গকে খাস-কামরায় তলব করিয়াছেন।

এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে অনভ্যস্ত কেরাণীর দল উদ্বিগ্ন ও সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল। কারণ, এ বিভাগের কেরাণীরা সাহেবকে দূর হইতেই দেখিত, দূর হইতেই তাঁহার পদধ্বনি শুনিত; কাহারও সহিত মাত্র চোখের দেখা হইত। যে ছোট সাহেব তিন শত পঁয়ষট্টি দিন ছয় ঘণ্টাই আপিসের দোতালার ঘরে অবস্থান করিতেন, সাধারণ কেরাণীদের সহিত তাঁহারই যখন এই প্রকার সম্বন্ধ, তখন হিমনিবাসে অবস্থিত বড় সাহেবের সহিত তাহাদের পরিচয় কতটুকু হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমেয়। বড়বাবুর অঞ্চল-ছায়াই কেরাণী বাবুদের আশ্রয়। সাক্ষাৎসম্বন্ধে বড়বাবুই তাহাদের ভাগ্যের নিয়ামক। তাহারা চিনিত শুধু এই বড়বাবুরূপী ব্যক্তিটিকে। সুতরাং সাহেব সম্ভাষণে বিব্রত হইয়া সকলে সারি বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট কামরার উপস্থিত হইল।

দলের মধ্যে যাহারা সাহসী ও বাক্‌চাতুরীতে কিঞ্চিৎ অভ্যস্ত, এমন কতিপয় যুবককে পুরোবর্ত্তী করিয়া বৃদ্ধের দল পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিল। টেবিলের একধারে বড় ও ছোট সাহেব উপবিষ্ট। সরল রেখার ন্যায়, কোট-প্যান্ট-সুশোভিত বড়বাবু তাহাদের দক্ষিণে আসিয়া দাঁড়াইলেন। অষ্টমী পূজার উৎসৃষ্ট ছাগবৃন্দের ন্যায় বৃদ্ধের দল কাঁপিতে লাগিল।

আক্রমণের প্রারম্ভে সেনাপতি যেমন বিপক্ষ সেনাদলের (যখন সম্মুখ-যুদ্ধের যুগ প্রচলিত ছিল) অবস্থান তীক্ষ্ণনেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকেন, বড় সাহেব তেমনইভাবে কেরাণী-কুলকে একবার দেখিয়া লইলেন, তার পর তাহাদিগের ছাপান আবেদনের এক খণ্ড তুলিয়া লইয়া উহার কিয়দংশ পাঠ করিলেন।

তাহাদের আবেদনের স্থানে স্থানে যে নানাপ্রকার ভ্রম-প্রমাদ আছে এবং সেই সকল বর্ণনা পাঠ করিয়া কর্ত্তৃপক্ষ যে তাহাদের প্রতি বিন্দুমাত্র করুণা প্রকাশ করিবেন না, সে সম্বন্ধে বড় সাহেব নিঃসন্দেহ। বিশেষতঃ সরকার বাহাদুর এখন এত অর্থ পাইবেন কোথা হইতে যে, অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত ব্যয়ভার বহনের পর কেরাণীদিগের আব্দারে কর্ণপাত করিতে পারেন। টাকা নাই, যাহা আছে, তাহা গুরুতর ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে ব্যয়িত হইতেছে। কেরাণীরা দারিদ্র্য-পীড়িত, সে কথা আংশিকভাবে সত্য হইতে পারে, কিন্তু উপায় কি? সমগ্র য়ুরোপের ভীষণ সমরের ফলে কি ভীষণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইতেছে,-ভারতীয় কেরাণীরা কি তাহা অনুমান করিতে পারে? সুতরাং বড় সাহেবের এই উপদেশ যে, তাহারা যেন এই আবেদন-পত্র না প্রেরণ করে, কষ্ট সহ্য করিতে শিক্ষা করা নিতান্ত প্রয়োজন, ব্যয়সঙ্কোচ করিয়া চলিতে না পারিলে কষ্ট হইবেই ত! অবশ্য তিনি কেরাণী-দিগের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন, যাহাতে কেরাণীদিগের মঙ্গল হয়, সে দিকে তাঁহার দৃষ্টি আছে। প্রথমবার যখন তাহারা আবেদন করিয়াছিল, তখন তিনি রাজস্ব-সচিবের সহিত স্বয়ং দেখা করিয়া তাহাদের বেতনবৃদ্ধির জন্য কি পরিশ্রমই না করিয়াছিলেন, কত তর্কজালেরই না অবতারণা করিয়াছিলেন। তাই ত এখন তাহারা শতকরা ত্রিশ টাকা মুদ্রা হারে বেতন বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু আর বাড়িবার সম্ভাবনা নাই। অতএব ধৈর্য্য অবলম্বন কর।

দীর্ঘ বক্তৃতার পর বড় সাহেব বলিলেন, "তোমরা সকল বিষয়ের ব্যয় কমাইয়া দাও। অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়েও ব্যয়সঙ্কোচ আরম্ভ কর। কেমন, বুঝিয়াছ?"

"উল্টা বুঝিলি রাম!"—কেরাণীরা আশা করিয়াছিল, বড় সাহেব তাঁহার পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ করিতে না পারিয়া হয় ত দুঃখিত আছেন, তিনি অর্দ্ধ-সরকারিভাবে যে আশ্বাস-বাণী তাহাদিগকে ইতিপূর্ব্বে শুনাইয়া আসিয়াছিলেন, তদনুসারে কাজ করিতে পারেন নাই বলিয়া হয় ত দ্বিতীয় আবেদনপত্রে একটু জোরাল রকমের মন্তব্য প্রকাশ করিতে চাহেন, তাই তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। কিন্তু এ যে সর্ব্বনাশ! কোথায় রাম রাজা হবে, না বনবাস!

ব্যয়সঙ্কোচ! যাহা হউক, যাহারা অর্দ্ধাশনে প্রতিদিন সপরিবারে তিল তিল করিয়া মরিতেছে, বসনের অভাবে স্ত্রী, পুত্র, কন্যার লজ্জা নিবারণ করিতে চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখে, ঋণের ভারে যাহারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত, তাহারা কোন্ ব্যয়ের সঙ্কোচসাধন করিবে?

স্তম্ভিতভাবে তাহারা পরস্পরের মুখাবলোকন করিতে লাগিল।

বিজয়গর্ব্বে সকলের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বড় সাহেব বলিলেন, "তোমাদের আপত্তি করিবার যদি কিছু থাকে, আমায় বলিতে পার।"

পুরোবর্ত্তী কেরাণীদিগের মধ্যে সাহসী চন্দ্রকান্ত বলিল, "সাহেব, ব্যয়সঙ্কোচের কথা কি বলিতেছেন? আমরা উহার চরমসীমায় উপনীত হয়েছি।"

তার্কিক সাহেব বলিলেন, "তুমি কত দিন চাকরী করিতেছ?"

"আজ্ঞে, বিশ বৎসর।"

"কত বেতন পাও?"

"আশী টাকা মাত্র।"

সাহেব মৃদুহাস্যে বলিলেন, "এই বাগানের মালী ষোল টাকা বেতন পায়। তাহার তুলনায় তুমি তাহার পাঁচ গুণ অর্থ পাইতেছ, তবু তুমি অসন্তুষ্ট কেন?"

কি অপূর্ব্ব সহানুভূতি! কি অখণ্ড যুক্তি! কেরাণীরা চরিতার্থ হইয়া গেল! এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর ছিল। প্রশ্ন-কর্ত্তা মাসিক দুই সহস্র মুদ্রা বেতন পান। কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি ও যুক্তির তীক্ষ্ণতা দেখিয়া তাহারা বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। ভাগ্যবিধাতার ভ্রম দেখাইতে গেলে চাকরী যাইবার সম্ভাবনা, তাই উপযুক্ত উত্তর কেহ দিল না। তবে পূর্ব্বোক্ত কেরাণী একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিল, "সাহেব, আমাদের কষ্ট আপনারা ঠিক বুঝিতে পারিতেছেন না। ব্যয়-সঙ্কোচ সত্ত্বেও আমাদের চলিতেছে না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে, পীড়ার সময় উপযুক্ত ঔষধ-পথ্যের অভাবে আমাদের স্ত্রী পুত্র দিন দিন মৃত্যুর মুখে অগ্রসর হইতেছে।"

ছোট সাহেব এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিলেন, তিনি গম্ভীর-ভাবে বলিলেন, "বাবু, তুমি বিষয়টাকে অতিরঞ্জিত করিতেছ। সত্যই কি তোমার স্ত্রী-পুত্রের আসন্ন মৃত্যু উপস্থিত?"

চন্দ্রকান্ত বলিল, "না সাহেব, ইহাতে অতিরঞ্জন নাই। আমার দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল আমি নিবেদন করি-তেছি মাত্র। আমার স্ত্রী-পুত্রের আসন্ন মৃত্যুর কথা আমি বলিতেছি না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালাদেশের পুরুষ ও নারীর জীবনীশক্তি ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আমি সেই কথাই বলিতেছি।"

বড় সাহেব দেখিলেন, কথাটা বেয়াড়া হইয়া দাঁড়াইতেছে। তিনি একই আঘাতে সব শেষ করিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। বড়বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমার কি মত, বড়-বাবু?"

চন্দ্রকান্তের সাহস দেখিয়া বড়বাবুর মুখমণ্ডল ক্ষণে আরক্ত ক্ষণে বিবর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। তিনি ঘন ঘন রুমাল বাহির করিয়া মুখের ঘর্ম্ম মুছিতেছিলেন। শীতের সময়েও তাঁহার ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছিল। বড় সাহেবের প্রশ্নে একটু চমকিয়া উঠিলেন।

বড়বাবুটির বয়স যে খুব বেশী, তাহা নহে। চল্লিশ বৎসর বয়সেই তিনি পনের টাকার কেরাণী হইতে তিন শত মুদ্রার বড়বাবুর পদ পাইয়াছিলেন। তৃতীয় শ্রেণী হইতেই মা সরস্বতীকে তিনি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাইয়া শ্বশুরের কৃপায় তাঁহার আপিসে প্রবিষ্ট হন। তার পর সু-চেহারা, পরিচ্ছদ-পারিপাট্য, তৈল-মর্দ্দন এবং শ্বশুরের চেষ্টায় বাঞ্ছিত পদ লাভ করিয়া-ছিলেন। একখানি খাতা তাঁহার ছিল। সেই খাতার মধ্যে আফিস-সংক্রান্ত নানাপ্রকার পত্র তিনি নকল করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রয়োজনকালে সেই খাতা দেখিয়া আপি-সের চিঠি-পত্রাদি লিখিতেন। তাহা ছাড়া আপিসের মধ্যে উচ্চশিক্ষিত এবং ইংরাজীতে যাহারা অভিজ্ঞ ছিল, এমন দুই চারি জন কেরাণীর দ্বারা তিনি বাকী কাজ সুকৌশলে নিষ্পন্ন করিতেন। ইংরাজীতে মোটামুটি কথাগুলি গুছাইয়া বলিতেও শিখিয়াছিলেন। এহেন বড়বাবুকে সাহেব প্রশ্ন

করিবামাত্র, তিনি প্রথমতঃ একটু চঞ্চল হইয়া পড়িলেন, তার পর কোনমতে বলিয়া উঠিলেন, "আজ্ঞে, কথাটা এই, বড় কষ্ট সকলের হয়েছে। অবশ্য উনি যা বল্‌ছেন, তার মানেই এই যে, বড় কষ্ট।"

বড় সাহেব বলিলেন, "হাঁ, সে কাঁদুনিতে আমার আপত্তি নাই। তবে—" কেরাণীটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "দেখ, তুমি যে বলিতেছিলে, বাঙ্গালীর জীবনীশক্তি হ্রাস পাইতেছে, তাহা সত্য নহে। গত পাঁচ বৎসরের তালিকা দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, এ দেশের স্বাস্থ্য ক্রমশঃই উন্নত হইতেছে, মৃত্যুর হার কমিয়া গিয়াছে।"

সর্ব্বনাশ! গত পূর্ব্ববর্ষে যে ভারতবর্ষে এক ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগেই ষাট লক্ষাধিক লোক ভবলীলা সংবরণ করিয়াছে এবং রোগের সাধারণ গতি প্রতিরোধ করিবার মত শক্তি ভারতবাসীর দেহে ছিল না বলিয়াই বিশেষজ্ঞগণ যাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে দেশে গড়্‌পড়তা ত্রিশ বৎসরের অধিক মানুষ বাঁচে না, যে দেশে নারী কুড়িতেই বুড়ী, পুরুষ পঁচিশে বুড়া হইয়া পড়িতেছে, সে দেশে স্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি ঘটিতেছে! চন্দ্রকান্ত দেশের সংবাদ কিছু কিছু রাখিত, ইচ্ছা করিলে সে দেখাইয়া দিতে পারিত, গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালা দেশে মৃত্যুর হার পূর্ব্বাপেক্ষা কত বাড়িয়াছে, কিন্তু চাকরী বড় বালাই। উপরওয়ালার ভ্রম নির্দ্দেশ করিতে গেলে তাহার নিদারুণ পরিণাম কি, তাহা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই তাহাকে চাণক্য-নীতি অবলম্বন করিতে হইল।

বড় সাহেব ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য পুনরায় দীর্ঘ বক্তৃতার পর সভাভঙ্গ করিলেন। কেরাণীরা স্ব স্ব আসনে গিয়া উপবেশন করিল।

সাহেবরা চলিয়া গেলে, বড় বাবু কেরাণী চন্দ্রকান্তকে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিলেন, "তোমার সাহস ত কম নয়? বড় সাহেবের সঙ্গে মুখোমুখী কর্‌তে ভয় হলো না?"

মৃদু হাসিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "তা আর সাহস ক'রে সব কথা বলতে পাল্লেম কৈ, মশায়? চাকরী বজায় রাখা চাই ত!"

২

দীর্ঘকালের পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য চন্দ্রকান্ত দেবগৃহে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে আসিয়াছিল। পুরা বেতনে তিন মাসের অবকাশ দেখিতে দেখিতে প্রায় শেষ হইয়া আসিল; কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যের আশানুরূপ উন্নতি হইল না। সেই সময়ে তাহার সহধর্ম্মিণীরও এমন জ্বর ও পক্বাশয়ের যন্ত্রণা বাড়িল যে, বেচারা চারিদিকে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। স্থানীয় হাঁসপাতালের সরকারী ডাক্তার গম্ভীরভাবে বলিয়া গেলেন যে, অবস্থা যেরূপ গুরুতর, তাহাতে বিশেষ যত্নসহকারে রোগিণীর শুশ্রূষার প্রয়োজন। অন্ততঃ মাসাধিককাল অক্লান্ত পরিচর্য্যার প্রয়োজন। বিপন্ন কেরাণী সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিয়া আপিসে অতিরিক্ত এক মাসের ছুটী প্রার্থনা করিল। অর্দ্ধবেতনে হইলেও তাহার ছুটীর একান্ত প্রয়োজন। বড়বাবুর নিকটেও সে স্বতন্ত্র আর একখানি পত্র লিখিয়া ছুটী যাহাতে মঞ্জুর হয়, তজ্জন্য তাঁহাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিল।

তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সে প্রাণ দিয়া আজ বিশ বৎসর সরকারের সেবা করিয়াছে। আপিসের কঠিনতম কার্য্যগুলি সুশৃঙ্খলে সর্ব্বদাই সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছে, বড়বাবুর ব্যক্তিগত কার্য্যেও সে তাঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিল, সুতরাং তাহার এই ঘোর দুর্দ্দিনে আপিস নিশ্চয়ই তাহার বিষয়ে সুবিবেচনা করিবে। বড়বাবুই প্রকারান্তরে ছুটী দিবার মালিক, সুতরাং তাহার ছুটী অবশ্যম্ভাবী। অতএব সে আশাপূর্ণ হৃদয়ে পত্নীর শুশ্রূষায় মন দিল।

পূর্ব্ব-অবকাশের পাঁচ ছয় দিন বাকি থাকিতেই সে দরখাস্ত করিয়াছিল। পাঁচ দিন যখন চলিয়া গেল, তখন সে ভাবিল, আর আশঙ্কা নাই, তাহার ছুটী সম্ভবতঃ মঞ্জুর হইয়াছে। ইতিমধ্যে আপিসের কোন বন্ধুর পত্রে সে যাহা জানিতে পারিয়াছিল, তাহাতে নিরাশার বিশেষ কোন হেতুও সে দেখে নাই। কিন্তু ষষ্ঠ দিবস সন্ধ্যার সময় সে একখানি তার পাইল, তাহাতে আপিসের বড়বাবু তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে লিখিতেছেন যে, ছুটী মঞ্জুর হইল না, আগামী কল্য যথাসময়ে তাহাকে আপিসে হাজির হওয়া চাই।

বিস্ময়-বিমূঢ় চন্দ্রকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। এই কি তাহার প্রাণপণ সেবার পুরস্কার! পত্নী সাংঘাতিকরূপে পীড়িতা, নিজের স্বাস্থ্য ভগ্ন, প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কার্য্যে পাওনা, তথাপি একমাসের ছুটী মঞ্জুর হইল না! নিজের শরীরের প্রতি, সুবিধার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যে উচ্চ প্রশংসার সহিত দীর্ঘকাল গবর্ণমেন্টের সেবা করিয়া

আসিয়াছে, আজ ঘোরতর দুর্দ্দিনে একান্ত প্রয়োজনের সময়েও সে অর্দ্ধ-বেতনেও একমাসের ছুটী পাইবে না? এত অবিবেচনা—এমন অবিচার! তাহার মাথায় আগুন জ্বলিতে লাগিল। সম্মুখে রুগ্না স্ত্রী যন্ত্রণায় চীৎকার করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে বেদনায় ও জ্বরের আতিশয্যে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন, তাঁহাকে মৃত্যুর মুখে ফেলিয়া দিয়া এই দুর্ব্বল শরীরে আপিসের খাতাপত্র লিখিতে তাহাকে যাইতেই হইবে। এমনই ঘৃণিত, অপদার্থ এই কেরাণী-জীবন! মনুষ্যত্ব ইহাদের থাকিবে কিরূপে? চাকরী বজায় রাখিতে গেলে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে হয়!

ডাক্তার এমনই সময়ে রোগী দেখিতে আসিলেন। চন্দ্রকান্তের অবস্থা দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া চন্দ্রকান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল। ডাক্তার বলিলেন, "আপনি বোধ হয় দরখাস্তের সঙ্গে সার্টিফিকেট দেন নাই?"

না, সত্যই ত সে তাহা করে নাই। ডাক্তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া চন্দ্রকান্তকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "আপনার দীর্ঘকাল লেখাপড়ার কাজ করা উচিত নয়। আমার মনে হয়, আরও ছয় মাস আপনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করুন, নচেৎ আপনার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইয়া যাইবে। তা ছাড়া—"

"মৃত্যুও হইতে পারে। এই কথা ত? কিন্তু তথাপি কেরাণীকে দাসত্বের ঘানিগাছে কাঁধ দিতেই হইবে, মহাশয়! উপায় নাই, উপায় নাই! ছ'মাস কি বলিতেছেন, মাত্র এক মাসের ছুটী চাহিয়াছি, তাই দিতে চায় না।"

ডাক্তার বলিলেন, "আমি কিন্তু আপাততঃ আপনাকে দুই মাসের ছুটীর জন্য রেকমেণ্ড করিলাম। তাহাতে বিশেষ উপকার হইবে না। তবে একেবারে চাহিলে আপনাদের কর্ত্তারা যদি নানা গোলযোগের সৃষ্টি করেন, তাই মাত্র দুই মাস লিখিয়া দিলাম।" বলিয়াই কাগজ-কলম লইয়া তিনি সার্টিফিকেট লিখিয়া দিলেন।

চন্দ্রকান্ত আবেদনে দুই মাসের ফার্লো প্রার্থনা করিয়া তৎ-সঙ্গে সার্টিফিকেটও আঁটিয়া দিল। তাহার পত্নীর রোগ সম্বন্ধেও ডাক্তার নিজ হস্তে যে মন্তব্য লিখিয়াছিলেন, তাহাও সে কর্তৃপক্ষের অবগতির জন্য পাঠাইল। আবেদনে সে বিনীতভাবে নিবেদন করিল যে, তাহার পত্নীর অবস্থা যেরূপ শোচনীয় এবং তাহার নিজের শরীর যেরূপ দুর্ব্বল এবং মস্তিষ্কের পীড়া যেরূপ বাড়িয়াছে, তাহাতে সে কোনও ক্রমেই এখন আফিসে যাইতে পারিবে না। সে জন্য সাহেব যেন তাহার কোনও অপরাধ গ্রহণ না করেন।

অবশ্য একটা কথার সে উল্লেখ করিতে পারিত। প্রকাশ্যভাবে আপিসে সে ছুটীর দরখাস্ত করিয়াছিল, উত্তরে বে-সরকারীভাবে বড়বাবু নিজের নামে তাহার জবাব দিলেন কেন? আর ছুটী মঞ্জুর না হইবার হেতুই বা কি? এ সব বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আপিস হইতে তাহার দরখাস্তের একটা উত্তর দেওয়া উচিত ছিল; কিন্তু চাকরী যাইবার আশঙ্কায় বিপন্ন চন্দ্রকান্ত সে বিষয়ের আলোচনা করিতে বিরত হইল।

৩

আরক্ত মুখে সাহেব বলিলেন, "সিভিল সার্ব্বিস রেগুলেশন্‌টা আন দেখি; আমি নিজে দেখিব।"

বড়বাবু প্রমাদ গণিলেন, ক্ষমতাটা হাত-ছাড়া হওয়া ত ঠিক নহে। এত দিন সাহেবকে যাহা বুঝাইয়াছেন, সাহেব চক্ষু বুজিয়া তাহাতেই মাথা হেলাইয়াছেন; কিন্তু কি কুক্ষণেই তিনি চন্দ্রকান্তের বিরুদ্ধে সাহেবকে বিবেচনা করিবার অবসর দিয়া নিজে কোন কোন বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়াছেন! সেই সময় হইতেই সাহেব যেন ক্ষেপিয়া গিয়াছে। চন্দ্রকান্ত যে বাস্তবিক বিপন্ন, সে কথাটা স্বয়ং বুঝিলেও সাহেব বুঝিতে চাহিতেছেন না। কালা কেরাণীর এমন সাহস যে, তাঁহার হুকুম সত্ত্বেও সে আপিসে যোগদান করিল না? তাহার পরিবর্ত্তে ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিয়া দুই মাসের ছুটী চাহিতেছে? তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়া সাহেবের শ্বেত দেহের ধমনীতে লোহিত রক্তস্রোত চন্ চন্ করিয়া উঠিয়াছিল। বড় সাহেবের সহিত এই লোকটাই না তর্ক করিয়াছিল?

বড়বাবুকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, সে ব্যক্তি চন্দ্রকান্তই বটে। গম্ভীরভাবে ছোট সাহেব রেগুলেশনের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন।

বড়বাবু কোনমতে বুঝাইয়া দিলেন যে, হাল আইন অনুসারে সরকার কেরাণীদিগের ছুটী সম্বন্ধে বিশেষ কৃপাপরবশ, ছুটী পাওনা থাকিলেই যাহাতে সে ব্যক্তি ছুটী পায়,

তাহার বন্দোবস্ত আপিসকে করিতেই হইবে। সুতরাং চন্দ্রকান্তের ছুটী দেওয়া সম্বন্ধে কোন প্রতিবন্ধক নাই। তবে—

সাহেবের মুখের অন্ধকার যেন একটু তরল হইল। তিনি সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি?"

"বলিতেছিলাম কি, একটা আইন আছে, সেই ধারার বলে আপনি ডাক্তারের সার্টিফিকেট সিভিল সার্জ্জনের দ্বারা countersign করাইয়া লইতে পারেন। ইহাতে বিশেষ লাভ নাই, শুধু পার্টিকে একটু ব্যতিব্যস্ত করা মাত্র।"

সাহেব সলম্ফে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, টেবল চাপড়াইয়া বলিলেন, "আমি তাই করিব। আর সেই জেলার সিভিল সার্জ্জনকে গোপনে একটা চিঠি লিখিয়া দিলেই চলিবে।"

সাহেবের আরক্ত মুখে সন্তোষের উৎকট আনন্দ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বড়বাবু কাজেই সাহেবের মতানুসারে কাজ করিতে চলিলেন। দাসত্ব-প্রবৃত্তি তাঁহাকে এমনই হীন করিয়াছিল যে, তিনি আর বুঝাইতে সাহস করিলেন না যে, এরূপভাবে অকারণ কোনও কেরাণীকে নির্য্যাতন করা সরকার বাহাদুরের অভিপ্রেত নহে। এইরূপ অত্যাচার অবিচার হয় বলিয়াই তাহার প্রতীকারের জন্য তাঁহারা নূতন নিয়মের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু এত কথা বলিতে গেলে যে পাণ্ডিত্য ও বক্তৃতার পরিচয় দিতে হয়, বড়বাবুর ভাণ্ডারে তাহা ছিল না। কাজেই তিনি মৌনাবলম্বন করিয়া কেরাণী-বধ যজ্ঞের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

৪

অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্ত-মনে চন্দ্রকান্ত রুগ্না স্ত্রীর শুশ্রূষায় নিরত। দুই সপ্তাহের প্রাণপণ চেষ্টায় পত্নী অনেকটা ভাল হইয়াছেন। চন্দ্রকান্ত, বিলম্ব দেখিয়া মনে করিয়াছিল, আপিস তাহার ছুটী মঞ্জুর করিয়াছে, কিন্তু সে দিন ডাক খুলিয়া সে যখন আপিসের প্রেরিত পত্রে জানিতে পারিল যে, আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জনের সার্টিফিকেট জেলার সিবিল সার্জ্জনের দ্বারা স্বাক্ষরিত করিয়া না পাঠাইলে তাহার ছুটী মঞ্জুর হইবে না, তখন সে সত্যই বিস্মিত হইল। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে আপিসের কোন কেরাণীর প্রতি কোন দিন এমন ব্যবস্থা প্রযুক্ত হইয়াছে বলিয়া তাহার স্মরণ হইল না। যোগ্যতার সহিত আপনাদের কার্য্য নির্ব্বাহ করার পুরস্কারস্বরূপ কি সাহেব আজ তাহার প্রতি করুণার প্রস্রবণধারা প্রবাহিত করিয়া দিলেন!

কাহাকেও কিছু না বলিয়া সে জেলার ডাক্তার সাহেবের নিকট সার্টিফিকেট সহ পত্র লিখিয়া পাঠাইল। তাহার বিশ্বাস ছিল, অধীনস্থ ডাক্তারের সার্টিফিকেটকে সাহেব ডাক্তার না-মঞ্জুর করিতে পারিবেন না। হাঁসপাতালের ডাক্তার বাবুও সেইরূপ অভিমত প্রকাশ করিলেন। এ যাবৎ এরূপ ব্যাপার ত ঘটে নাই। সুতরাং অপেক্ষাকৃত নিশ্চিন্তভাবে চন্দ্রকান্ত নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

কয়েক দিন পরে আফিসের কোন বন্ধুর পত্রে সে জানিতে পারিল যে, সাহেব গোপনে সিভিল সার্জ্জনের নিকট পত্র দিয়াছে, সুতরাং নির্ব্বিবাদে ছুটী পাওয়া তাহার পক্ষে সহজ হইবে না। সেই দিনই জেলার সিভিল সার্জ্জনের নিকট হইতে উত্তর আসিয়াছে যে, স্বয়ং পরীক্ষা না করিয়া সাহেব উল্লিখিত সার্টিফিকেট মঞ্জুর করিতে অসমর্থ। সুতরাং অবিলম্বে চন্দ্রকান্তকে জেলায় হাজির হইতে হইবে। যদি পীড়ার আধিক্যবশতঃ পর্য্যটনে সে অশক্ত থাকে, তবে সে সংবাদও যেন পাঠান হয়।

চন্দ্রকান্তের চক্ষুর সম্মুখে সহসা পৃথিবী দ্রুতবেগে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল। প্রখর গ্রীষ্মের নিদারুণ উত্তাপে তাহাকে পঞ্চাশ মাইল দূরবর্ত্তী বন্ধুবান্ধববিহীন জেলায় গিয়া ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা দিতে হইবে। তার পর যেরূপ চক্রান্তজাল বিস্তীর্ণ হইয়াছে, তাহাতে সাহেব ডাক্তার সহসা তাহাকে ছুটী দিবে না। কি নির্লজ্জ অত্যাচার! কেন, সে কি অপরাধ করিয়াছে যে, আজ তাহাকে এমন নির্য্যাতন সহিতে হইতেছে।

স্ত্রী তখন বেশ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছেন। স্বামীর বিষণ্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। পুত্রও পিতার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। চন্দ্রকান্ত সকল কথা খুলিয়া বলিল। পত্নী বলিলেন, "তুমি চাকরী ছাড়িয়া দেও। যেখানে এত অবিচার, সেখানে কাজ করিবার দরকার নাই।"

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া চন্দ্রকান্ত বলিল, "কিন্তু এত বড় সংসার চলিবে কি করিয়া?"

স্ত্রী বলিলেন, "তুমি বই লিখিয়া কিছু কিছু পাইতেছ ত?

তা ছাড়া চাষবাস আরম্ভ কর, আমরা কষ্ট করিয়া সংসার চালাইব। একটা চরকা আনিয়া দাও, সূতা কাটিব।"

পুত্র অনিল বলিল, "বাবা, আপনি অত ভাব্‌ছেন কেন? ছেড়ে দিন কাজ। আমি বিপিন বাবুর সঙ্গে একশত বিঘা জমী নিয়েছি। চাষ আরম্ভ করা যাচ্ছে! তা ছাড়া ছাগল-ভেড়ার ব্যবসা করব। কোন ভাবনা নেই বাবা, এক রকমে চ'লে যাবে। চাকরীতে কাজ নেই।"

"বিশ বছরের চাকরী, পেন্‌সনের আশা আছে, হঠাৎ ছেড়ে দিতে মন চায় না। আচ্ছা, ভেবে দেখি।"

অপরাহ্নে ডাক্তারের নিকট চন্দ্রকান্ত সিভিল সার্জ্জনের পত্র দেখাইল। ডাক্তার বাবুর সুগৌর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। তাঁহার সার্টিফিকেট, তাঁহার উপরওয়ালা ডাক্তার সাহেব বিশ্বাস করিল না? অপমানের বেদনা হৃদয়ে বাজিল। তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন, "আপনি কলিকাতায় যান। সেখানে কোন সরকারী সাহেব ডাক্তারকে দিয়া সার্টিফিকেট দিন, তাহা হইলে সব দিক্ রক্ষা হইবে। আপনাদের আপিসের সাহেবের লেখার ফলে সিভিল সার্জ্জন আপনাকে বেগ দিতেছে। সহজে সে আপনাকে সার্টিফিকেট দিবে না। বিশেষতঃ দীর্ঘপথ এই প্রখর রৌদ্রে পর্য্যটন করিলে আপনার রোগ বাড়িবে। এখান হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে সহরে যাইবার সামর্থ্য আপনার হইবে না। কলিকাতার ডাক্তার আপনাকে পরীক্ষা করিলেই সার্টিফিকেট দিতে পথ পাইবে না।"

চন্দ্রকান্ত তাহাই সুযুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিল। জেলার ডাক্তারকে সে লিখিয়া দিল, নিদারুণ গ্রীষ্মে সাঁওতাল পরগণার রৌদ্রতাপ মাথায় লইয়া পথ-পর্য্যটন তাহার স্বাস্থ্যের অনুকূল হইবে না। সুতরাং সে কলিকাতার ডাক্তারের সার্টিফিকেট দিবার জন্য তথায় যাত্রা করিল। তাহার জন্য সাহেবের চিন্তার কোনও কারণ নাই, এখন তিনি যেন হাঁসপাতালের ডাক্তারের সার্টিফিকেট তাহার কাছে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

সেই দিনই চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় যাত্রা করিল। দাসত্বের মধুর রসের পাক কি প্রগাঢ়! একবার যে উহার অপূর্ব্ব স্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, তাহার কি আর পরিত্রাণ আছে!

৫

প্রেসিডেন্সী বিভাগের কোনও প্রবীণ ও বিচক্ষণ সাহেব ডাক্তারের নিকট উপস্থিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সার্টিফিকেট প্রার্থনা করিল। ডাক্তার সাহেব তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, "বাবু, তোমার বুক বড় দুর্ব্বল, চক্ষু দেখিয়া বুঝিতেছি, তোমার মস্তিষ্কের পীড়াও আছে। দীর্ঘকাল বিশ্রাম করা তোমার পক্ষে আবশ্যক।"

চন্দ্রকান্তের হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। এই জন্যই ত সে ডাক্তারের নিকট ঘেঁসিতে চাহে না। সে জানিত, তাহার লৌহদৃঢ় শরীর গুরুতর পরিশ্রমে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে কথা প্রকাশ পাইলে তাহাকে বিশ্রাম করিতে হইবে; কিন্তু বিশ্রামের অবকাশ তাহার কোথায়? বিশ্রাম করিতে গেলে সংসার চলিবে না ত!

ডাক্তার বলিলেন, "আমার ইচ্ছা, তুমি এক বৎসরের অবকাশ লও।"

"সাহেব, অত দিন ছুটী লইলে চলিবে না। কিছু কম করিয়া দাও।"

সাহেব বলিলেন, "আচ্ছা, আপাততঃ আমি তোমাকে ছয় মাসের ছুটীর জন্য লিখিয়া দিতেছি। স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়া থাক, পরে আমাকে আবার দেখাইয়া যাইও। তখন বিবেচনা করা যাইবে। কিন্তু খুব সাবধানে থাকিও, বাবু। আগে শরীর, তার পর অর্থ।"

চন্দ্রকান্তের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া উঠিল। যাহার অধীনে সে দীর্ঘকাল সরকারের সেবা করিয়া আসিল, তিনি তাহাকে ছুটী দিতে অসম্মত, তাহাকে সেজন্য বিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত নহেন, আর যাঁহার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধই নাই, তিনি উপযাচকভাবে দীর্ঘকাল তাহাকে অবকাশ দান করিবার জন্য জোর কলমে সার্টিফিকেট দিতেছেন। উভয়েই শ্বেতাঙ্গ; কিন্তু আমলাতন্ত্রের ব্যবহার কি অপূর্ব্ব!

চন্দ্রকান্ত সংক্ষেপে আপিসের ইতিবৃত্ত সাহেবকে জানাইয়া বলিল, "সাহেব, তোমাতে ও আমার মনিবের মধ্যে ব্যবধান দেখিলে? এই প্রৌঢ় বয়সে আমার প্রাণপণ সেবার বিনিময়ে পুরস্কারের ব্যবস্থা দেখিয়াছ? ইহাতে ভক্তি আনুরক্তি বজায় রাখা সম্ভবপর কি?"

গম্ভীরভাবে ডাক্তার সাহেব বলিলেন, "মনুষ্যত্বের পরিচয় দিবার অবকাশ সত্ত্বেও যাঁহারা উদাসীন, তাঁহাদিগকে বলিবার

কিছুই নাই। সহানুভূতির বন্ধনে সমগ্র ভারতবর্ষকে অচল হিমালয়ের মত সুদৃঢ় রাখা যায়। আজ যদি সকল ইংরাজ সেই নীতি অবলম্বন করিত, তবে ভারতবর্ষে এত চাঞ্চল্য জন্মিবার অবকাশ ঘটিত না। বাবু, তোমাকে আর বিরক্ত করিব না। বুড়ার একটা কথা মনে রাখিও, সহস্র প্রলোভনেও মনুষ্যত্ব হারাইও না।"

গাড়ীতে চড়িয়া চন্দ্রকান্ত কি ভাবিল। তার পর গাড়ী তাহার আপিসের দিকে চালাইবার জন্য আদেশ করিল। তখন দশটা বাজিয়াছে। বাড়ী হইতে সে একখানি আবেদন-পত্র লিখিয়া আনিয়াছিল। অবকাশের স্থানে "ছয় মাস" শব্দটি ফাউন্টেন পেনের সাহায্যে পূর্ণ করিয়া সে উহা পকেটে রাখিয়া দিল। স্বয়ং দেখা করিয়া সাহেবের দয়ার বহরটা সে একবার যাচাই করিয়া লইতে চাহে।

আপিসের সকলে তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। বড়-বাবু বলিলেন, "কি হে, সিভিল সার্জ্জন Countersign করেনি বুঝি? শুধু শুধু সাহেবকে চটালে, কাজটা ভাল হ'ল না।

চন্দ্রকান্ত বলিল, "আমি একবার সাহেবের সঙ্গে দেখা করিতে চাই।"

"আপিস-ঘরে আছেন, চল। কিন্তু তোমার উপরে সাহেবের ভারী রাগ।"

অন্যান্য সহকর্ম্মী চন্দ্রকান্তের আগমনে ম্রিয়মাণ হইয়া গেল। তাহাদের আশা ছিল, যে অত্যাচারে তাহারা প্রপীড়িত হইতেছে, সাহেবের খেয়াল ও নির্য্যাতনে যে ক্ষতি তাহারা সহ্য করিতেছে, চন্দ্রকান্তের ছুটী হইলে তাহার কিছু হ্রাস ঘটিবে। আর যদি চন্দ্রকান্ত পুনর্মুষিকের ন্যায় ভয়ে ভয়ে আপিসের কার্য্যে যোগদান করে, তবে সাহেব বুঝিবে, বাঙ্গালী মিথ্যাবাদী। অতিরঞ্জন ও মিথ্যার সাহায্যে ছুটী লয়! একটু বেগ দিতে পারিলেই ঘানি কাঁধে তুলিয়া লইবে।

চন্দ্রকান্ত কেন আপিসে আসিয়াছে, তাহা কাহাকেও বলিল না। সে বড়বাবুর সঙ্গে সাহেবের আপিস-ঘরে প্রবেশ করিল।

বড়বাবু পরিচয় দিয়া বলিলেন যে, চন্দ্রকান্ত আপিসের কাজে যোগ দিতে আসিয়াছে। চন্দ্রকান্ত সে কথার কোন প্রতিবাদ না করিয়া সাহেবকে অভিবাদন করিল।

সাহেব গম্ভীরমুখে বলিলেন, "সিভিল সার্জ্জন সার্টিফিকেটে সহি দিলেন না? আপিসের কাজে এ ব্যক্তি যোগ দিতে পারে; কিন্তু প্রথম ছুটী ফুরাইবার পর আজিকার তারিখ পর্য্যন্ত কোন বেতন পাইবে না।"

চন্দ্রকান্ত ব্যগ্রভাবে বলিল, "সাহেব, আমি কাজ করিতে আসি নাই। সে সামর্থ্য আমার এখন নাই। আমার ছুটীটা আপনি মঞ্জুর করুন। তাই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি।"

সাহেব অসন্তোষভরে বলিলেন, "তোমার শরীরে কোন অসুখ আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। যদি তাহাই হইত, সিভিল সার্জ্জন সার্টিফিকেটে স্বাক্ষর দিতেন। কৈ, তোমার হাত দেখি?"

চন্দ্রকান্ত হাত বাড়াইয়া দিল। খপ করিয়া হাত ধরিয়া সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ সাহেব মাথা নাড়িলেন, বলিলেন, "তোমার সব মিথ্যা কথা। আমি তোমার নামে রিপোর্ট করিব। বাঙ্গালী জাতটাই মিথ্যাবাদী।"

চন্দ্রকান্তের সমস্ত দেহ অপমানে কাঁপিয়া উঠিল। শরীরের মধ্যে রক্তস্রোত চঞ্চল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে ধীর সংযত স্বরে বলিল, "সাহেব, আপনি চিকিৎসাশাস্ত্রেও যে পারদর্শী, তাহা জানিতাম না। একটা কথা বলি, অপরাধ লইবেন না। আমি হয় ত মিথ্যা কথা বলিতে পারি, কিন্তু সমস্ত জাতিটাকে আপনি এত বড় গালাগালি দিয়া ভাল করিলেন না। এটা গুরুতর অন্যায়।"

বড়বাবু চন্দ্রকান্তের দুঃসাহস দেখিয়া চমকিত হইলেন। সাহেবের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। কালা আদমী, কেরাণী, তাঁহারই অধীনস্থ কর্ম্মচারী তাঁহাকে নীতি শিক্ষা দিতে আসে। স্পর্দ্ধা ত কম নহে।

চন্দ্রকান্তের কথা অন্যান্য কেরাণীর কর্ণেও প্রবেশ করিয়াছিল। তাহারা উৎকণ্ঠিতভাবে এই ব্যাপারের পরিণতি জানিবার জন্য কাণ খাড়া করিয়া রহিল।

সাহেব সক্রোধে বলিলেন, "তুমি ত মিথ্যাবাদী, আনবৎ। আর তোমাদের বাঙ্গালী জাতিও অসৎ। তোমার নিজের ব্যবহারেই তার পরিচয়। আমি উপরে রিপোর্ট দিব, তুমি মিথ্যা কথা বলিয়া ছুটী লইবার চেষ্টা করিয়াছিলে। ইহাতে তোমার চাকরী যাইবে।"

পকেট হইতে সার্টিফিকেট-সম্বলিত দরখাস্তখানি বাহির

করিয়া ধীর বিনম্র কণ্ঠে চন্দ্রকান্ত বলিল, "সাহেব, আমার জাতি মিথ্যাবাদী নহে। আমিও মিথ্যা বলি নাই। তবে প্রেসিডেন্সি সার্জ্জন আমাকে দুই মাসের পরিবর্ত্তে ছয় মাসের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ দিয়াছেন। পরে আরও দিবেন বলিয়াছেন।"

সাহেব সার্টিফিকেট ও দরখাস্ত নিবিষ্ট-মনে পাঠ করিতে করিতে ওষ্ঠাধর দংশন করিতে লাগিলেন। বড়বাবুও পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার মুখে বিস্ময়-রেখা ফুটিয়া উঠিল।

সাহেব বলিলেন, "তুমি সাঁওতাল পরগণার সিভিল সার্জ্জনের সঙ্গে দেখা করিলে না কেন?"

"আজ্ঞে, দরখাস্তে সে কথার উল্লেখ আছে। অত কষ্ট করিয়া বহু দূরে যাওয়া ও সেই পরিমাণে অর্থব্যয় করা আমার সাধ্যাতীত! তাই কর্ম্ম ও বাসস্থান কলিকাতায় আসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ডাক্তারের সার্টিফিকেট দেওয়াই সঙ্গত মনে হইল।"

সাহেব বলিলেন, "তোমার বুঝি চাকরী করিবার ইচ্ছা নাই। তুমি কি গান্ধীর চেলা?"

চন্দ্রকান্ত পূর্ব্ববৎ নম্রকণ্ঠে বলিল, "দেখুন, সাহেব, চাকরী করিব না, এ অবস্থা যদি আমার হইত, অথবা তেমন মনের জোর থাকিত, তাহা হইলে সত্যই আমি গোলামী ছাড়িয়া দিতাম। উপস্থিত সে সৌভাগ্য আমার নাই। আর মহাত্মা গন্ধীর চেলা হইবার মত ভাগ্যবান্‌ও আমি নই।"

"তুমি গান্ধীকে ভক্তি কর?"

"আজ্ঞে, সহস্রবার করি। তাঁহার মত মহৎ হৃদয়বান্ মহাপুরুষ বর্ত্তমানে সমগ্র বিশ্বে কেহ নাই, তাঁহাকে পূজা করিব না?"

সাহেব আরক্ত-মুখে বলিলেন, "আমি উপরওয়ালার কাছে তোমার এ সম্বন্ধে রিপোর্ট করিব। তুমি অসহযোগের দলে।"

চন্দ্রকান্ত অপেক্ষাকৃত উত্তেজিতকণ্ঠে বলিল, "সাহেব, তা আপনি করিবেন। না হয় চাকরীতে ইস্তফা দিব। আমরা সরকার বাহাদুরের সহযোগিতার পক্ষপাতী, কিন্তু আপনাদের অসহযোগিতার ফলে ভক্তের দল ক্রমেই অসহযোগিতার পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছে। এ জন্য অপরাধী আপনারা। এখন বুঝিতেছেন না, পরে বুঝিতে পারিবেন। আজ তবে আসি সাহেব।"

চন্দ্রকান্ত ধীরপদে রাজপথে আসিয়া গাড়ীতে আরোহণ করিল। কয়েকটি সহকর্ম্মী তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "চন্দ্র বাবু, আপনার জন্য আজ আমরা গর্ব্ব অনুভব করছি, আমাদের হৃদয়ের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন। ভগবান্ আপনার মঙ্গল করবেন।"

সে আন্তরিকতাপূর্ণ সহানুভূতি-স্নিগ্ধ বাক্যে চন্দ্রকান্তের হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল। বিনয়নম্র-চিত্তে সে প্রত্যেককে অভিবাদন করিল। চন্দ্রকান্ত দেখিল, সহকর্ম্মীদিগের আনন আনন্দালোকে উদ্ভাসিত। তাহাদের বক্ষঃপঞ্জরমধ্যে যে জয়ধ্বনি গুমরিয়া উঠিতেছিল, ওষ্ঠপ্রান্তে আসিয়া তাহা আবার যেন ফিরিয়া যাইতেছিল। গোলামখানার গর্ব্বস্ফীত পাষাণ দেহের প্রভাব এমনই ইন্দ্রজাল-ভরা।

পল্লীবাণী—জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩২৮

মায়ের পূজা

"বাবা, চোখে দেখতে পাইনে—অন্ধ, একটা পয়সা দাও, বাবা!"

অশীতিপরা বৃদ্ধা পথের ধারে বসিয়া প্রত্যহ ভিক্ষা করে। কেহ দয়া করিয়া দুই একটা পয়সা দিয়া যায়—অধিকাংশই না দিয়া পথ চলে। করুণার একটা সুর আছে সত্য; কিন্তু যুগেরও ত একটা ধর্ম্ম আছে! সুতরাং ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে করিয়া যে দেশের লোক জীবনের পথে চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, এই বিংশ শতাব্দীতে তাহাদের হৃদয় করুণার আহ্বানে বড় একটা সাড়া দেয় না। সে অভ্যাস ক্রমেই মানুষ ভুলিয়া যাইতেছে! পশ্চিমের হাওয়ায় করুণরস কি শুকাইয়া যায়?

"একটা পয়সা দাও, বাবা—"

রৌদ্রের দীপ্ত কিরণ শীর্ণদেহা বৃদ্ধার চোখে-মুখে পড়িতেছিল। জজ-কাছারীর পথের ধারে বিরলপত্র গাছের নীচে বৃদ্ধা বসিয়া আছে ও এইখানে বসিয়া সে কিছু কিছু ভিক্ষা পাইয়া আসিতেছে। বেশী দূর চলিবার শক্তি নাই। বাঁশের লাঠীর উপর ভর দিয়া কোনমতে অদূরবর্ত্তী বস্তী হইতে সে এই পথটুকু অতিক্রম করিয়া এইখানে আসিয়া বসিয়া পড়ে। শ্রান্তদেহ জুড়াইবার অবকাশ হয় না। রৌদ্রের জ্বালা উদরের দহনজ্বালার সঙ্গে মিলিয়া দেহ ও মনকে অশান্ত করিয়া তুলে। কণ্ঠ হইতে ভিক্ষার বাণী বাতাসকে আর্ত্ত করিয়া পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইতে থাকে। বিশ্রাম কোথায়? এ পারে বৃদ্ধা এক দিনই বিশ্রামের অবসর পাইবে; কিন্তু সে দিন কত দূরে?

বৃদ্ধার নয়নে কি ব্যর্থ প্রয়াসের বেদনাজাত মুক্তাবিন্দু ঝরিয়া পড়িতেছে? দিনান্ত-তপন গড়াইয়া পড়িতেছে, কৈ, আজ ত কেহই তাহাকে দয়া করিতে আসিতেছে না? আজ কি পথে লোক চলিতেছে না? পদশব্দ আজ এমন ভাবে এই পথে বিরল হইয়া আসিল কেন? দুই দিন জ্বরের ঘোরে ছিন্নকন্থায় পড়িয়াছিল, সে তাহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিতে পারে নাই। আজ অতি কষ্টে সে কোনমতে আসিয়া বসিয়াছে—কয়টা পয়সা পাইলেই আজিকার রাত্রি ও আগামী কল্য দগ্ধ উদরে কিছু আহার্য্য সে দিতে পারিবে। সামান্য দুই এক পয়সার মুড়ি—বেশী ত তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই!

কিন্তু কেহ ত আজ দয়ার মূর্ত্তি ধরিয়া তাহাকে কৃপা করিতে আসিল না? বৃদ্ধার স্বর ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। থামিয়া থামিয়া আবার পথচারীর উদ্দেশ্যে অভ্যস্ত ভিক্ষার আবেদন তাহার কণ্ঠ হইতে উত্থিত হইতে লাগিল।

"দাও বাবা! একটা পয়সা! সারা দিন কিছু খাই নি, অন্ধকে দয়া কর।"

কোথায় দয়া? কে দয়া করিবে? মানুষ?

অভাব ও অভিযোগের তাড়নায় মানুষ বিভ্রান্ত, অধীর, উদ্ধত। নিজের সংসারের জ্বালায় এমন অশান্তির উপদ্রব ভোগ করে যে, অপরের দুঃখ-দুর্দ্দশার দিকে মন দিবার অবকাশ কোথায়? বিশ্ব-বিদ্যালয় দেশের পণ্ডিত সৃষ্টি করে, দয়া-মায়ার দুর্ব্বলতা হইতে তাহাদিগকে রক্ষাও করে। বিংশ শতাব্দীর সভ্য যুগে এই বাণীকে শিক্ষিত সম্প্রদায় কি স্বীকার করিতে পারেন?

নিরক্ষর মূর্খের অন্তরে হয় ত কিছু করুণার অবশেষ আছে। কিন্তু তাহারা ত মূর্খ—তত্ত্বজ্ঞান তাহাদের ত নাই। তাই বুঝি দুর্ব্বলতা তাহাদিগের মধ্যে এত অধিক।

* * * *

বৃদ্ধার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর সহসা স্তব্ধ হইল। শ্রবণপথে সমগ্র ইন্দ্রিয় কেন্দ্রীভূত করিয়া সে সাগ্রহে প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। কে আসিতেছে না! ভগবান্, দয়াল হরি! দয়া কর নাথ! আর যে সে পারে না। একটা পয়সা—শুধু একটা পয়সা হইলেই তাহার আজিকার অভাব মিটিয়া যাইবে।

কৈ কে আসিতেছ? দয়া কর! দয়া কর!

"একটা পয়সা; বাবা!"

সহসা পদশব্দ থামিয়া গেল। কে যেন বৃদ্ধার পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। বৃদ্ধার স্বর কাঁপিয়া উঠিল, শীর্ণ প্রসৃত দক্ষিণ হস্ত থর্ থর্ করিয়া স্পন্দিত হইতে লাগিল। আশার নিষ্ফলতা কি—

"এখানে ব'সে কি হচ্ছে, বুড়ী? আদালত যে বন্ধ!"

বন্ধ?—তবে!—এতক্ষণ সে বৃথাই আবেদনের অর্ঘ্যভার বাতাসে ঢালিয়া দিয়াছে!

"দু'দিন কিছু খাইনি, বাবা! একটা—"

আর্দ্র কণ্ঠস্বর মথিত করিয়া অতিকষ্টে যে কয়টি কথা বাহির হইল, তাহার সমাপ্তি আর ঘটিল না।

"তোমার কেউ নেই, বুড়ী?"

"না, বাবা। সব খেয়েছি, অন্ধের কেউ নেই, বাবা!"

"কোথায় থাক তুমি মা?"

অতিকষ্টে বুড়ী শূন্তে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া তাহার বর্ত্তমান আশ্রয়স্থানের উল্লেখ করিল। ভিক্ষার অর্থ হইতে এক টাকা মাসিক ঘর-ভাড়া দিয়া তাহাকেও মাথা গুঁজিয়া থাকিতে হয়! বিনা মূল্যে আশ্রয়স্থান কে তাহাকে দিবে? আহার? হাঁ, মাসিক চারি টাকা হিসাবে এক জনকে দিতে হয়! সে বিনিময়ে এক বেলা ডাল-ভাত তাহাকে সরবরাহ করে, আর এক বেলা? যদি জুটে ত এক পয়সার মুড়ি, নহিলে একাদশী। ভিক্ষালব্ধ অর্থ প্রত্যহ তাহাকে দিতে হয়। যে দিন কিছুই হয় না, তাহার পরদিবস নির্দ্দিষ্ট অন্ন হইতেও সে বঞ্চিত থাকে। নগদ কারবার। গরীব ভিক্ষুকের প্রতি বিশ্বাস করিয়া কে আগাম অন্ন দিতে পারে?

পথচারী কি চলিয়া গেল? কোন শব্দ ত পাওয়া যাইতেছে না? বৃদ্ধা কথা বন্ধ করিয়া কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিল। ও কিসের শব্দ?—

ভারী গলায় উচ্চারিত হইল, "তুমি আমার সঙ্গে যাবে, মা?"

কে গো তুমি! এই ভাগ্যহতা ব্রাহ্মণকন্তার প্রতি কেহ ত এতকাল এমন কথা বলে নাই। এ করুণার ধারা কি শূন্তপথে সেই অনন্ত-সুন্দরের হৃদয় হইতে নামিয়া আসিতেছে! এ কি সত্য? না তাহার উদ্‌ভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা?

বৃদ্ধার মুখে স্বর ফুটিল না।

"আমি ব্রাহ্মণসন্তান, তোমার কোন ভয় নেই মা।"

বলিষ্ঠ বাহুর স্পর্শে বৃদ্ধা উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার, দেহ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল।

* * * *

প্রভাতের সানাই আগমনীর সুরে বাতাসকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। কলকণ্ঠের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় পূজা-প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ।

"দাদা এসেছে। দাদা!—"

বালক-বালিকার দল হুড়াহুড়ি করিতে করিতে গরুর গাড়ীর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

প্রৌঢ়, বৃদ্ধ ও যুবার দল আগন্তুককে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। পঞ্চমীর অপরাহ্নে যাহার আসিবার কথা, তাহার অনুপস্থিতিতে বাড়ীর সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। পূজার সাজ, মায়ের বস্ত্র, পরিবারবর্গের বসন-ভূষণ লইয়া বাড়ীর জ্যেষ্ঠপুত্র যথাসময়ে না আসাতে একটা দুর্ভাবনা সকলের চিত্তকেই অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল।

বৃদ্ধ পিতা উৎকণ্ঠাভরে বলিল, "এত দেরী হ'ল কেন, বাবা?"

পুত্র তখন অন্ধ বৃদ্ধাকে সন্তর্পণে গাড়ীর মধ্য হইতে নামাইতে ব্যস্ত ছিল। সে সহাস্তমুখে বলিল, "বাবা, মা আমার পথের ধারে ব'সে ভিক্ষে কচ্ছিলেন। আপনার উপদেশ তখন আমার মনে প'ড়ে গেল।"

বৃদ্ধ চট্টোপাধ্যায় বিস্ফারিত-নেত্রে পুত্রের প্রতিভাদীপ্ত আননে দৃষ্টি রাখিয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিশ্ববিত্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী, বংশের গৌরব, রমাপতিকে কবে কি বলিয়াছিলেন, তাহা ত স্মরণ হয় না।

স্তম্ভিত আত্মীয়-স্বজন রমাপতির দিকে অর্থহীনভাবে চাহিতে লাগিল। বালক-বালিকারা নববস্ত্রপরিহিতা বৃদ্ধার দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিল, তাহা তাহারাই জানে।

"মায়ের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য কি বাবা?"

চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মুখ হর্ষোৎফুল্ল হইল। পুত্রের মস্তকে হস্ত রাখিয়া তিনি বলিলেন, "ঠিক হয়েছে, বাবা! এত দিন পরে মায়ের পূজার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তুই সত্যি এনেছিস্। চল্, ভেতরে নিয়ে চল্।"

বৃদ্ধার নয়ননিঃসৃত অশ্রুধারা পূজার প্রাঙ্গণ সিক্ত করিল। চণ্ডীমণ্ডপে মায়ের মুখে কি হাসি ফুটিয়া উঠিতেছিল? নয়নে কি মুক্তাবিন্দু ঝরে নাই?

বোধনের বাত্ত দ্বিগুণ উৎসাহে বাজিয়া উঠিল। মা ভক্তের পূজা গ্রহণের জন্ত কি অধীর হইয়া উঠেন নাই?

রমাপতি অন্দরের দিকে চলিতে চলিতে বলিতেছিল, "মা, বড় কষ্ট হচ্ছে, হাঁটতে?"

"না বাবা, এত সুখ জন্মে পাই নি।" রমাপতি কি তখন মনে মনে ভাবিতেছিল, এমনই ভাবে সারা বাঙ্গালায় ভক্ত বাঙ্গালীর হৃদয়ে মায়ের প্রকৃত রূপ আবার ফুটিয়া উঠিবে না? বাঙ্গালী কি তাহার সনাতন ভাবধারায় অবগাহন করিয়া আবার মায়ের পূজা করিবে না?

দৈনিক বসুমতী, ১৩৩৫

নভোরেণু

১

"বাবা, ও বাবা, ওঠ!—চা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।"

গুরুদাস বোধ হয় তখন স্বপ্নলোকে বিচিত্র মাধুর্য্য-রস উপভোগ করিয়া বিচরণ করিতেছিল। কন্যার কচি কণ্ঠের আহ্বানে তাহার সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। বিরক্তিভরে সে শয্যার উপর উঠিয়া বসিল।

খোলা জানালার মধ্য দিয়া সে বাহিরে চাহিয়া দেখিল; ফাল্গুনের প্রথম প্রভাত নভোরেণুজালে আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। পাঁচ বৎসরের কন্যা লীলা পিতার শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল। পিতা তাহাকে ধমক দিয়া বলিল, "অত জোরে চেঁচাচ্ছিলি কেন, বোকা মেয়ে?"

বালিকার সুন্দর কচি মুখখানা ভয়ে যেন পাংশুবর্ণ ধারণ করিল। মাতার আদেশে সে বাবার ঘুম ভাঙ্গাইতে আসিয়া অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, এ অনুভূতি তাহার প্রথম নহে। কিন্তু চা জুড়াইয়া গেলে পিতার নিকট হইতে তাহার জননীও যে তিরস্কারের দায় হইতে মুক্তি পাইবেন না, কচি শিশু তাহাও জানিত।

খেয়ালী গুরুদাস কন্যার বিষণ্ণ, ভীত মুখের দিকে চাহিয়া কি ভাবিল। তাহার পর তাহার কোমল গণ্ডে দুইটি আঙ্গুলের দ্বারা মৃদুভাবে স্পর্শ করিয়া বলিল, "যাও লক্ষ্মী মা, চা আন্‌তে বল; আমি মুখ ধুয়ে আস্‌ছি!"

বাড়ীর কর্ত্রী হইতে দাসী-চাকর পর্য্যন্ত কেহই এই বিচিত্র-চরিত্রের মানুষটিকে ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিত না। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে সদানন্দ, হাস্য-পরিহাস-রসিক, সরল, সহজ, গভীর-হৃদয় ছিল, পরমুহূর্ত্তে সেই ব্যক্তিই অতি নির্ম্মম, কঠোর এবং প্রতিশোধ-স্পৃহায় অধীর হইয়া উঠিত! অকস্মাৎ কেমন করিয়া এমন মানুষ এমন হইয়া যাইতে পারে, কেহ তাহা কল্পনাও করিতে পারিত না। এজন্য আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলেই তাহাকে যেমন ভালও বাসিত, তেমনই ভয়ও করিত—অনেক সময় তাহাকে এড়াইয়া চলিবারও চেষ্টা করিত। গত সাত বৎসর ধরিয়া তাহার খেয়াল যেন উদ্দাম নৃত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

পিতার আদরে লীলা কুঞ্চিত কালো চুলগুলি মাথার উপর নাচাইয়া মাতার কাছে ছুটিয়া গেল। কন্যার আননে হাস্যচ্ছটা দেখিয়া তরুণী মাতা হাসিয়া বলিল, "বড় খুশী যে, লীলা?"

"বাবা ডাকছে, চা নিয়ে যাও, মা।"

লীলার মাতা সুহাসিনী এক হস্তে চা এবং অপর হস্তে জলখাবারের রেকাবী লইয়া মৃদুগমনে স্বামীর কাছে চলিল, চাকর-চাকরাণীর অভাব না থাকিলেও এ কার্য্যটি তাহাকেই করিতে হইত। গুরুদাস অন্যের সেবা লইতে পছন্দ করিত না। সাধারণ লোক যাহা করে, গুরুদাসের ঠিক তাহার বিপরীত আচরণ না করিলে যেন চলিত না।

মাণিকগঞ্জের প্রসিদ্ধ জমীদার চৌধুরী-বংশের একমাত্র সন্তান সে। পিতামাতা অল্পবয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন। সে বংশের কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্রব রাখেন নাই। গুরুদাস এজন্য মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কয়টা পরীক্ষাই উচ্চ প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল। সে বংশের কাহারও চাকরী করিবার প্রয়োজন দূরে থাকুক, বিস্তৃত জমীদারীতে অসংখ্য বেতনভুক্‌ কর্ম্মচারী ছিল। এম-এ পাশের পর খেয়ালী গুরুদাস কলিকাতার কোন বে-সরকারী কলেজের দর্শনের অধ্যাপক-পদ গ্রহণ করিয়াছিল। দুই শত টাকা বেতনের জন্য নহে—সকলে তাহাকে চৌধুরীবংশের সেই অযোগ্য কার্য্য-গ্রহণে নিষেধ করার ফলেই সে চাকরীটিকে যেন আঁকড়াইয়া ধরিয়াছিল।

তাহার বিবাহের জন্য যখন নানা জমীদার অথবা বিশিষ্ট সম্ভ্রান্ত-বংশের কন্যার তালিকা লইয়া আত্মীয়-স্বজন আনাগোনা করিতে লাগিলেন, ঠিক সকলের ইচ্ছাকে ব্যর্থ করিবার জন্যই সে বাছিয়া বাছিয়া কোন দরিদ্র গৃহস্থের শ্যামবর্ণা কন্যাকে পছন্দ করিয়া বিবাহ করিয়া ফেলিল। সকলে আশা করিয়াছিল, সালিয়ানা পৌনে এক লক্ষ টাকা আয়ের জমীদারীর মালিকের বিবাহে বিবিধ উৎসব ও ভোজের আয়োজন হইবে—তাহারা সবিস্ময়ে দেখিল, অতি সাধারণভাবে গুরুদাস বিবাহ করিয়া সকলের আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছে। এমনই ভাবে জীবনযাত্রার প্রত্যেক ব্যাপারেই প্রকৃতির এই খেয়ালী সন্তানটি, জগতের প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থার প্রতি বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

পত্নী সুহাসিনীকে গুরুদাস ভালবাসিত কি না, এ বিষয়ে স্বজন ও বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে মতভেদ ছিল। গুরুদাসকে যাহারা আশৈশব দেখিয়া আসিতেছে, তাহারা জানিত, গুরুদাস সৌন্দর্য্যের পূজারী—রূপের সেবক, গুণেরও ভক্ত। সে প্রতীচ্য ও প্রাচ্য দর্শনশাস্ত্রে অভিজ্ঞ হইলেও কাব্য এবং ইতিহাসেরও পরম ভক্ত ছিল। সৌন্দর্য্যের গুণগানে তাহার কোনও সতীর্থ তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। রসশাস্ত্রের কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থই তাহার অনধীত ছিল না। তাহার কৈশোর ও যৌবনের ইতিহাস যাহারা জানিত, তাহারা বুঝিতে পারিত না, এই শ্যামাঙ্গী তরুণীর সাধারণ-স্তিমিত সৌন্দর্য্য-জ্যোৎস্নায় গুরুদাসের মত ব্যক্তি কি করিয়া মুগ্ধ থাকিতে পারে? কিন্তু যাহার খেয়ালের কোন অন্ত নাই, তাহাকে পূর্ণমাত্রায় বুঝিতে পারা অসম্ভব, এই ভাবিয়া বন্ধুজন সে সম্বন্ধে আলোচনাও পরে ত্যাগ করিয়াছিল।

সুহাসিনী অতি সন্তর্পণে, স্পন্দিত-হৃদয়ে টেবলের উপর স্বামীর চা ও খাবার রাখিল। স্বামীর কার্য্যে তাহার ত্রুটির অন্ত ছিল না। কাজেই সকল সময়ে তাহার মনে হইত, কখন্ তাহার ইহকালের সর্ব্বস্ব, তাহার কার্য্যে কোন্ ত্রুটি আবিষ্কার করিয়া বসিবেন।

গুরুদাস চায়ের পেয়ালা তুলিয়া মুখে দিয়া বলিল, "বাঃ! আজ চমৎকার চা তৈরী করেছ ত?"

এই অযাচিত এবং অকুণ্ঠিত প্রশংসার কলধ্বনি সুহাসিনীর হৃদয়ের তারগুলি স্পন্দিত করিলেও, সে সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়া তাহা উপভোগ করিতে পারিল না। অব্যবহিত পরেই তিরস্কারের জ্বালাপূর্ণ অশান্তি তাহার চিত্তকে ব্যথিত করিয়া তুলিবে না, কে বলিতে পারে?

সুহাসিনী শঙ্কিতনেত্রে স্বামীর জলযোগ লক্ষ্য করিতে লাগিল।

গুরুদাস পরিতৃপ্তি সহকারে প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া একটা সিগারেট ধরাইয়া লইল। তার পর প্রসন্ননেত্রে পত্নীর দিকে চাহিয়া বলিল,"আজ কুয়াশায় আকাশটা ঢেকে ফেলেছে; কিন্তু তোমার মুখে তার ছায়া থাকবে কেন, সুহাস?"

তরুণী বিস্ময়-চকিতভাবে স্বামীর দিকে চাহিল। এমন উচ্ছ্বাসভরা প্রীতি ও কবিতার ছাপ-মারা সম্বোধন—স্বামীর মুখে, তাহার কাছে প্রথম না হইলেও বিরল নহে কি?

"পাশে এখানে একটু ব'স না। এখন ত কাজ নেই।"

সাত বৎসরব্যাপী বিবাহিত জীবনে এমন ঘটনা অঙ্গুলি-গণনার মধ্যেই ধরিতে পারা যায়। সুহাসিনী ধীরে ধীরে স্বামীর পার্শ্বে আসিয়া বসিল। অকস্মাৎ পত্নীর কোমল, স্নিগ্ধ ও পুষ্ট বাম করতল দক্ষিণ করে গ্রহণ করিয়া গুরুদাস বলিল, "আমি তোমাকে সুখী করতে পারিনি, সেটা ঠিক। কিন্তু আমাকে ভুল বুঝো না, সুহাস। মদ খাই না, কিন্তু মাতালের মত আচরণ আমার কাছ থেকে পেয়েছ, হয় ত আরও পাবে, কিন্তু জেনে রেখ, সেটা আমার প্রকৃত মূর্ত্তি নয়, সকলে আমায় ভুল বোঝে বলেই আমি সেই ভুল-বোঝাটাকেই বড় ক'রে তুলি। এটা আমার পিতামহের অতিরিক্ত আদরের ফল কি না, জানি না।"

কুজ্ঝটিকা-সমাচ্ছন্ন বসন্ত প্রভাত মানুষের মনকে সাধারণতঃ বিরস করিয়া তুলে। প্রকৃতিতে যাহা কিছু সুন্দর, সবই আচ্ছন্ন, স্তিমিত; তাই কি গুরুদাস প্রকৃতির খেয়ালকে আপনার খেয়ালের দ্বারা জয় করিতে চাহিতেছিল?

"লীলা মাকে একবার এখানে ডেকে নিয়ে এস।"

সুহাসিনী তাড়াতাড়ি কন্যাকে স্বামীর কাছে লইয়া আসিল। পিতার দ্বারা আহূত হওয়ায় শিশু বিরসবদনে আসিয়া দাঁড়াইল। সে হয় ত কোন অন্যায় কার্য্য করিয়াছে, পিতা হয় ত তিরস্কার করিবেন।

কিন্তু গুরুদাস যখন বালিকাকে বুকের উপর তুলিয়া লইয়া অজস্র চুম্বনে কন্যার গোলাপী গণ্ড আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল, তখন তাহার ক্ষুদ্র হৃদয় আনন্দ ও উল্লাসে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিল।

২

প্রেসিডেন্সী কলেজ ভূতপূর্ব্ব ছাত্রগণের সম্মেলনে উৎসবমুখর হইয়াছিল। কলিকাতায় বিদ্যমান যাবতীয় ছাত্র ও ছাত্রী নির্ব্বিচারে সমবেত হইয়াছিলেন। গুরুদাসও উৎসবক্ষেত্রে যোগ দিয়াছিল। প্রবীণ ও নবীন সকলেরই মুখে পরিচয়ের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছিল ছাত্রজীবনের অবসানের পর বিস্তীর্ণ—সীমাহীন কর্ম্মক্ষেত্রে ইতস্ততঃ যাঁহারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, দীর্ঘকালের মধ্যে পরস্পরের মধ্যে মিশিবার শুভ সুযোগ ঘটে নাই, বিদ্যামন্দিরে আজ তাঁহাদের

মিলন যেন গঙ্গা-যমুনার সম্মিলনের ন্যায় তাঁহাদের কাছে পবিত্র—মহৎ বোধ হইতেছিল। পবিত্র বিদ্যাপীঠ যাহাদিগকে কাছাকাছি আনিয়া দেয়, হৃদয়ে হৃদয়ে মিলিবার সুযোগ প্রদান করে—মন্দিরের বাহির হইবার পর, কালের ব্যবধান তাহাদিগকে কোথায় টানিয়া লইয়া কতদূর চলিয়া যায়, কেমন অপরিচিত করিয়া রাখে; বিস্মৃতির যবনিকা মধুর সম্পর্কের মাঝখানে ধীরে ধীরে আবৃত হইয়া কেমন করিয়া আলোকের দীপ্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, গুরুদাসের দার্শনিক চিত্ত কি আজ তাহারই বিশ্লেষণ করিতেছিল?

কলেজের ছাত্রগণ তাহাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী সুধীগণের মনোরঞ্জনের জন্য অভিনয় প্রভৃতির আয়োজন করিয়াছিল। দর্শকের আসনে সকলে উপবিষ্ট হইলেন। ঐক্যতান-বাদন আরম্ভ হইল। সহসা দ্বিজেন্দ্রনাথ, গুরুদাসের দক্ষিণ হস্তে ঈষৎ চাপ দিয়া বলিল, "মিসেস্ রায়ের পাশে ব'সে—উনি অণিমা বসু না?

গুরুদাস সেই দিকে চাহিল। হাঁ, অণিমাই বটে; এখন ত তাহার পদবী বসু নহে—দত্ত। পাঁচ বৎসর হইল, ব্যারিষ্টার মিষ্টার দত্ত তাহাকে বিবাহ করিয়া রেঙ্গুনে লইয়া গিয়াছিলেন। তদবধি গুরুদাস তাহাদের আর কোন সংবাদই জানিত না।

বায়স্কোপের ছবির মত অতীত জীবনের সহস্র ঘটনার স্মৃতি তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে একে একে সমুদিত হইল। সে যখন এম-এ ক্লাসের ছাত্র, তখন সার আশুতোষের প্রতিষ্ঠিত পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসের ভিত্তি পর্য্যন্ত স্থাপিত হয় নাই—তখন অণিমা বসু প্রেসিডেন্সী কলেজের তৃতীয় শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিত। অধ্যাপক বসুর বাড়ীর পার্শ্বেই গুরুদাস বাড়ী ভাড়া লইয়া কলেজে পড়িতেছিল। গুরুদাসের আকৃতি, ব্যবহার ও চরিত্র-বৈশিষ্ট্যে বসু মহাশয় তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। দর্শনে প্রথম স্থান অধিকার করায় বিশ্ব-বিদ্যালয়ে গুরুদাসের সুনাম ছিল। বসু মহাশয়ও প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। গুরুদাস সেই সময়ে ভারত-বর্ষের ধর্ম্মজগতের ক্রম-বিবর্ত্তন সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছিল। এ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবন্ধ সে নানা স্থানে পাঠও করিয়াছিল। প্রবন্ধগুলিতে ধর্ম্মসম্বন্ধে অন্ধসংস্কারের অপ্রাচুর্য্য এবং স্বাধীন গবেষণাশক্তির পরিচয় পাইয়া বসু মহাশয় গুরুদাসের ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হইয়াছিলেন। রূপ, ঐশ্বর্য্য, বিদ্যা, যৌবন, আভিজাত্য প্রভৃতির সমবায়ে সে কলিকাতার তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে এক জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন বিশিষ্ট মত তখন তাহার ছিল কি না, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত বাহিরের কেহ তাহার বিশেষ আভাস পাইত না। সে যেমন বৈষ্ণবের কীর্ত্তন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিত, তেমনই একাগ্রভাবে শক্তিপূজার স্থানেও উপস্থিত থাকিত। বেলুড় মঠেও সে সর্ব্বদা যাতায়াত করিত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজেও শত শতবার গিয়াছে—অভিনিবেশ সহকারে আচার্য্যদিগের বক্তৃতাও শ্রবণ করিয়াছে। কয়েকবার উল্লিখিত সম্প্রদায়ের বিশেষ অধিবেশনে সে রাজা রামমোহন, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে নিপুণ সমালোচকের ন্যায় বিশ্লেষণ করিয়া প্রবন্ধ পাঠও করিয়াছে। সুতরাং সে যে কোন বিশিষ্ট ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠ উপাসক, এমন ধারণা প্রায় কাহারই ছিল না।

প্রথম হইতেই ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে বসু মহাশয় ও তাঁহার মাতৃহীনা শিক্ষিতা কন্যার সহিত গুরুদাসের হৃদ্যতা জন্মিয়াছিল। বসু মহাশয়ের অনুরোধ এবং অণিমার আগ্রহাতিশয়ে গুরুদাস অবসরসময়ে অণিমার পাঠেও সাহায্য করিত। কত দীর্ঘ দিবস এবং দীর্ঘ রজনী সাহিত্য, ইতিহাস ও দর্শনের আলোচনায় অতিবাহিত হইত। বসু মহাশয় সে সকল আলোচনায় সময়ে সময়ে যোগও দিতেন। এই দুই তরুণ-তরুণীর অবাধ সাহচর্য্য যে দূষণীয়, এমন দুর্ভাবনা বসু মহাশয়ের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ না করিলেও সমাজে একটা আলোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল। গুরুদাসের ধর্ম্মমত যাহাই হউক না কেন, সে বসু মহাশয়ের অবলম্বিত সমাজের কেহই নহে, এ সত্য সম্বন্ধে প্রতিবাদ করিবার কিছুই ছিল না। গুরুদাস বাঙ্গালার হিন্দু পরিবারেরই বংশধর, তাহার বাড়ীতে বারো মাসে তের পার্ব্বণ হয়। কোনও সমাজেই সে নাম লেখায় নাই। অতএব বসু মহাশয়ের এবং অণিমারও সতর্ক থাকা প্রয়োজন।

গুরুদাস এ সকল কথায় মনে মনে হাসিত কি না, তাহা প্রকাশ নাই; কিন্তু চিরদিনের খেয়ালের বশে—যেখানে বাধা, সেইখানেই সে বাধাকে চূর্ণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিত। সে পূর্ব্বাপেক্ষা যত্নসহকারে এবং বেশী সময় অণিমাকে পড়াইতে লাগিল। বন্ধু-বান্ধব কাহারও যুক্তি সে কাণে তুলিল না। শেষে এমন ধারণা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইল যে, হয় ত অবিলম্বেই

এই যুগল তরুণ-তরুণীর জীবন কোন এক বিধানের ছায়াতলে পরস্পর সংলগ্ন হইয়া যাইবে।

পূর্ব্বকথা স্মরণ করিয়া কি গুরুদাসের বক্ষঃপঞ্জরমধ্যে দীর্ঘশ্বাস সঞ্চিত হইতেছিল?

মনে পড়িল, সাঁওতাল পরগণার স্বাস্থ্য-নিবাসে—দীর্ঘদেহ বিশাল কুঞ্জতলে অপরাহ্নের সূর্য্যাস্ত-দীপ্তি। অদূরে বালুকাবিকীর্ণ নদীর মধ্যে ক্ষীণ স্রোতোধারা; বাধা-বন্ধ-বিহীন উদার বাতাসের শন্-শন্ শব্দ, মুক্ত নীলাকাশের অম্লান শোভা। উভয়ে পাশাপাশি পথ চলিয়াছে, কোন দর্শক নাই, বাধা নাই। কিন্তু তথাপি অণিমার শান্ত অচপল মধুর ব্যবহারে যেন একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর উভয়ের মাঝখানে খাড়া হইয়া রহিয়াছে। উচ্ছৃঙ্খলতার সাধ্য নাই যে, সে বাধাকে অতিক্রম করিতে পারে। অসংযম সে পাষাণ-প্রাচীরে আহত হইয়া চূর্ণ হইয়া যাইবে।

পুষ্পিত কাননমধ্যে, নিস্তব্ধ চন্দ্রালোকিত রজনীতে—অব্যক্ত, শুধু অনুভবনীয় সৌন্দর্য্য-বিকাশের মাঝখানে উভয়ে দাঁড়াইয়া। গন্ধ-ব্যাকুল বাতাস মাতালের মত বহিতেছে—দূরে প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের স্বাস্থ্যকুটীর হইতে দীপের উজ্জ্বল শিখা সুখী দাম্পত্য জীবনের বার্ত্তা ঘোষণা করিতেছে। মুক্ত সৌন্দর্য্যের পূজায় প্রকৃতি যখন ধ্যানমগ্ন, তখন ভাষাও বুঝি মূক হইয়া থাকে। প্রকাশের বেদনা অনুভব করিয়াও গুরুদাস—খেয়ালী যুবক—কৈ প্রাচীরের ব্যবধান উল্লঙ্ঘন করিয়া ভাববন্যার প্রবল আঘাতে ব্যবধানকে চূর্ণ করিয়া ফেলিতেও পারে নাই?

ত্রয়োবিংশ বর্ষ বয়সে—সুস্থ সবল দেহের অন্তরালে যৌবনের জ্বালাময় উত্তেজনার স্রোত অনুক্ষণ চপল নৃত্যে তরঙ্গায়িত, উচ্ছ্বসিত হইতে থাকে। তাহাকে সংযত করিয়া রাখা সম্ভবপর নহে, কিন্তু যখন কোন পক্ষ হইতে বাধার ক্ষীণ স্বর পর্য্যন্ত মাথা তুলিতে পারিতেছিল না, অনুকূল অবস্থা যখন সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত, তখন সকলকে বিস্মিত করিয়া—স্তব্ধ করিয়া সে একবার জীবনের গতিকে মোড় ফিরাইয়া দিল। বিবাহের পবিত্র বন্ধনে সে আবদ্ধ হইল বটে; কিন্তু কে সে তাহার জীবনসঙ্গিনী? অণিমা নহে—সুহাসিনী!

তার পর যাত্রা, ছন্দঃ, তালবিহীন জীবনযাত্রা? সে কোথায় চলিয়াছে?

অকস্মাৎ বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথের ঠেলা খাইয়া সে চমকিয়া উঠিল। দর্শকগণ আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। অভিনয় কখন্ আরম্ভ হইয়াছিল এবং কখন্ই বা যবনিকা পতন হইয়াছিল, সে কিছুই লক্ষ্য করে নাই।

বাহিরে আসিয়া সে স্বস্তির শ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইল।

"গুরুদাস বাবু, নমস্কার!"

দুইখানি শুভ্র, কোমল, সুগঠিত করপল্লব আরক্ত ললাট-তলে স্থাপন করিয়া অণিমা তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহার পার্শ্বে এক জন প্রিয়দর্শন যুবক। গুরুদাস তাঁহাকে চিনিতে পারিল। সে যখন তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িত, মিঃ দত্ত সেইবার বি-এ পাশ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন।

"অধ্যাপক গুরুদাস বাবু আমার গুরু, ইনি আমার স্বামী মিঃ দত্ত।"

গুরুদাস সহজভাবে মিষ্টার দত্তের সহিত সম্ভাষণ করিল।

উচ্ছ্বসিতভাবে হাসিয়া অণিমা বলিল, "আপনার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, গুরুদাস বাবু, ঠিক আগের মতই আছেন। কিন্তু চিরকাল কি খেয়াল নিয়েই থাক্‌বেন? আপনার অধ্যাপনার রোগ হ'ল কেন? বাড়ী ব'সে সাহিত্য-সেবা করবার আপনার মত সুযোগ অনেকের নেই।"

মৃদু হাসিয়া গুরুদাস বলিল, "ওটা আমার রোগ-বিশেষ।"

"তাই ত দেখছি। এখন কোথায় আছেন?"

"ভবানীপুরে।"

"বটে? তা হ'লে দেখা-শোনার সুবিধে হবে। আমরা বালিগঞ্জের বাড়ীতে আছি। এখনও দু'মাস থাকব। ভাল কথা, আপনি বিয়ে করেছেন, একবার সংবাদ দিতে পারেন নি? নেমন্তন্নটা বাদ গেছে। কিন্তু আমরা আপনাকে ভুলিনি। তবে আপনি নেমন্তন্ন রাখতে আসেন নি।"

সুন্দরীর নয়নে কি অভিমানের ছায়াপাত হইল? গুরুদাস একটু যেন অপ্রস্তুত হইল। সে বলিল, "আমার বিয়ে তাড়াতাড়ি হয়েছিল ব'লে খবর দিতে পারিনি। তার পর মাঝে দেশে গিয়ে এক বছর ছিলুম। আপনার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র বিবাহের পনের দিন পরে আমি পেয়েছিলুম, তখন আপনারা রেঙ্গুনে।"

"কিন্তু পুরাতন ছাত্রী হিসাবে একখানা পত্রও ত লিখতে পারতেন। আপনাকে ঠিকানা দিয়ে দু'খানা চিঠি লিখেছিলাম।"

সে কথা সত্য। অণিমা বিবাহের পর তাহাকে পত্র লিখিয়াছিল—উহাই তাহার প্রথম পত্র। কিন্তু তাহাতে উল্লেখযোগ্য কোন কিছুর সন্ধান না পাইয়া কি গুরুদাস তাহার উত্তর দেয় নাই? অথবা ইহাও তাহার অন্যতম খেয়াল?

"বৌদি, কোথায়? এখানেই আছেন? আচ্ছা, এক দিন আমরা আপনার ওখানে যাব। আপনিও আমাদের ওখানে আসবেন। দেখবেন, ভুলবেন না! এখন আসি।"

সুন্দরী পূর্ণ দৃষ্টিতে গুরুদাসের দিকে চাহিয়া হাসিল।

গুরুদাস কি অন্তরে অন্তরে শিহরিয়া উঠিয়াছিল? শান্ত নয়নযুগলে সে কি অরূপের দেখা পাইয়াছিল? অথবা তাহার অন্তরের রূপ ঐ নারীর নয়নে প্রতিফলিত করিয়া সে তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিল?

৩

"দেখ, তোমাকে দিয়ে আমার আর পোষাচ্ছে না!"

সুহাসিনী পলকহীননেত্রে স্বামীর ক্রুদ্ধ মুখমণ্ডল দেখিতে লাগিল, সে কি অপরাধ করিল যে, স্বামী এমন উগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন? কৈ, সে জ্ঞান-বিশ্বাসমতে আজ ত কোন ত্রুটিই করে নাই! তবে?

"দিদি তোমাকে অনেক দিন থেকে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন। তাই ভাল, দিনকতক তোমরা সেখানে গিয়ে থাক। বদ্ অভ্যাসটা শুধরে যাবে। আমিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি।"

বিবাহিত জীবনে লক্ষবার তিরস্কৃত হইলেও স্বামীর মুখে সুহাসিনী কখনও এই রকম প্রস্তাব শুনে নাই। তাই তাহার দুঃখদীর্ণ হৃদয় আজ অত্যন্ত বিচলিত হইল। দুই দিন পূর্ব্বে যিনি বড় আদর করিয়া কত কথা বলিয়াছিলেন, নিজের অব্যবস্থিত চিত্তের জন্য অনুশোচনা করিয়া তাহাকে স্বামীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইতে নিষেধ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার মুখে এ কি সাংঘাতিক বাণী!

নয়নপল্লবে অশ্রু আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল।

"আমি সুরেনকে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, সে আজই আসবে। কালকে তোমরা দিদির কাছে যাত্রা করবে। লীলাও যাবে। জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখ।"

একবারে সব বন্দোবস্ত ঠিক হইয়া গিয়াছে? কিন্তু কেন? সে রূপহীনা, দরিদ্রের কন্যা? স্বামীর অনুপযুক্তা? রূপ সকলের থাকে না, কিন্তু তাহার কি হৃদয় নাই, অনুভূতি নাই? স্বামীর তৃপ্তির জন্য, আনন্দের নিমিত্ত যাহা কিছু প্রয়োজন, অপর্য্যাপ্তভাবে, অকুণ্ঠিতচিত্তে সে কি তাহা উজাড় করিয়া স্বামীকে নিবেদন করে নাই?

স্বামী খেয়ালী বলিয়া সে গুরুদাসের কঠিন বাক্য, নির্ম্মম ব্যবহার সর্ব্বদা প্রশান্তচিত্তে পরিপাক করিয়াছে। তাহার ব্যবহারে এক দিনও এমন কিছু প্রকাশ পায় নাই, যাহাতে প্রকৃতই স্বামী অসুখী হইতে পারেন। মনগড়া অশান্তি সৃষ্টি করিয়া এতদিন তিনি নিজে হয় ত দুঃখ পাইয়াছেন, তাহাতে তাহার অপরাধ কতটুকু?

আজ সর্ব্বপ্রথম তাহার নারী-মর্য্যাদায় আঘাত লাগিল। না, নীরবে, বিনা প্রতিবাদে আর সে এ উপেক্ষা সহ্য করিবে না। সে শুধু গৃহের বধূ নহে—স্বামীর সুখদুঃখের অংশ-ভাগিনী, কন্যার জননী—গৃহিণী। আপনার অধিকারে অবিচলিত থাকাই তাহার ধর্ম্ম। পিতা দরিদ্র হইলেও, তাঁহার নিকট হইতে সে এই শিক্ষা লাভ করিয়াছে।

সুহাসিনী স্থির-দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিয়া, মৃদু অথচ দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমার সংসার ফেলে, যেখানে সেখানে আমি কখনই যাব না। তুমি সুরেনকে আসতে বারণ ক'রে দিও।"

পত্নীকে সে কোনও দিন এমনভাবে প্রতিবাদ করিতে দেখে নাই। সে মুহূর্ত্ত স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিল। তার পর কঠোর স্বরে বলিল, "তোমাকে যেতেই হবে। আমার হুকুম।"

ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া সুহাসিনী আপনাকে নিরুদ্ধ করিল। মুহূর্ত্ত পরে অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, "তোমার হুকুম—সঙ্গত আদেশ শুনতে আমি বাধ্য, কিন্তু যা অন্যায়, তা শুনব না—আমি যাব না।"

ক্রোধে গুরুদাসের মুখ লাল হইয়া গেল। দক্ষিণবাহু উদ্যত করিয়া সে পত্নীর নিশ্চল মূর্ত্তির দিকে ধাবিত হইল। কিন্তু সহসা আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "তুমি কুৎসিত। বিশ্রী! আমি তোমায় ঘৃণা করি।"

তরুণীর প্রশান্ত আননে মুহূর্ত্তের জন্য একটা ক্ষীণ কাল ছায়া ঘনাইয়া উঠিল। পরক্ষণেই মৃদুহাস্যের ক্ষীণতরঙ্গ ওষ্ঠ-প্রান্তে খেলা করিয়া গেল।

"আমি কুৎসিত, সে দোষ আমার নয়। যিনি আমায় সৃষ্টি করেছেন, হয় ত তাঁর। কিন্তু কুরূপাকে বিয়ে না করলেই পারতে। এমন ক'রে নিজেকে হত্যা করবার তোমার কোন প্রয়োজন ছিল না।"

অচপলা, সংযতভাষিণী, প্রিয়ম্বাদিনী এই নারী এত কথা শিখিল কোথা হইতে? দার্শনিক গুরুদাস, গুরু মানসিক চাঞ্চল্য সত্ত্বেও সহসা যেন নির্ব্বাক্ হইয়া গেল। পুরুষ কোনদিনই কি নারী-মনের প্রকৃত পরিচয় পায় নাই? শুধু কি একটা মনগড়া ধারণা লইয়া পুরুষ নারীর সম্বন্ধে বিচার করিয়া আসিয়াছে?

কিন্তু দ্বিতীয় রিপু গুরুদাসের মনকে এমনভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছিল যে, বেশীক্ষণ সে তত্ত্বালোচনায় অবহিত থাকিতে পারিল না। আরক্ত নয়নে সে বলিয়া উঠিল, "যা খুসী তোমার কর। আজ থেকে আমি উৎসন্ন যাবার পথ ধরলাম। আমি আর তোমাকে সহ্য করতে পারি না।"

স্বামীর প্রস্থানপথে নিবদ্ধদৃষ্টি সুহাসিনী নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

৪

বসন্তের শ্যামায়মান অপরাহ্নে, সুসজ্জিত 'ড্রয়িংরুমে' সুন্দরী একা বসিয়া একখানি বই পড়িতেছিল। গগনের প্রস্থান-পথে সিন্দুররাগ বিলাইয়া শ্রান্ত-তপন তখন অস্তমিত হইবার উপক্রম করিতেছিল।

বেহারা আসিয়া তাহার সম্মুখে একখানি কাগজ রাখিল। মুখ তুলিয়া, কাগজখানির প্রতি একবার চোখ বুলাইয়া তরুণী স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিল, "নিয়ে এস।"

আসন ছাড়িয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

"আসুন, গুরুদাস বাবু। সত্যি, আপনাকে দেখে আমি ভারী খুসী হয়েছি।"

তরুণীর আননে অকৃত্রিম আনন্দের তরঙ্গ-হিল্লোল বহিয়া গেল।

গুরুদাসের প্রসাধন ও বেশভূষার পারিপাট্য সাত বৎসর পূর্ব্বের সজ্জাকেও অতিক্রম করিয়াছিল। তাহার নয়নের উজ্জল দীপ্তি এবং আনন্দের আরক্ত চাঞ্চল্য অপরাহ্নের স্তিমিত আলোকেও অভিজ্ঞের দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারে না।

সুখসেব্য আসনে আপনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গুরুদাস একবার গৃহের চারি দিকে চাহিয়া দেখিল। গৃহস্বামীর সুরুচি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সম্যক্ পরিচয় প্রত্যেক পদার্থে পরিস্ফুট, সে কি তাহাই লক্ষ্য করিতেছিল?

অনিমা অদূরে আর একখানি আসনে উপবেশন করিল।

"এক পেয়ালা চায় আপত্তি নাই ত?"

"কিছুমাত্র নহে।" দীর্ঘকাল পরে ঈপ্সিত হস্তের চ পরিবেষণ তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্তকে শান্ত করিতে পারিবে না?

"উনি একটু পরেই আসবেন। সন্ধ্যাটা আজ উপভোগ করা যাবে। ওঃ! কতকাল পরে দেখা, বলুন ত?"

বীণাধ্বনি কি এই কণ্ঠস্বর অপেক্ষাও মধুর?

"পাখার বেগটা আর একটু বাড়িয়ে দিলে ভাল হয় না, মিসেস্ দত্ত?"

গুরুদাসের কণ্ঠে কথার শেষাংশটা যেন একটু বাধিয়া গেল।

বেহারা আসিয়া আলোর সুইচটা টানিয়া দিল—সঙ্গে সঙ্গে পাখার গতিবেগ বর্দ্ধিত হইল।

আলোকিত কক্ষমধ্যে, বর্ণ-বৈচিত্র্যবহুল মূক চিত্র-সৌন্দর্য্যপরিবেষ্টিত সজীব সুন্দরীর শোভন মূর্ত্তি পুলকিত-চিত্তে নিরীক্ষণ করিয়া গুরুদাস কি ভাবিতে লাগিল।

বেহারা চায়ের সরঞ্জাম টেবলের উপর রাখিয়া দিল।

রূপতরঙ্গে হিল্লোল তুলিয়া সুন্দরী পেয়ালায় চা ঢালিতে লাগিল। বাক্‌যন্ত্র নিরুদ্ধ করিলেও হৃদযন্ত্র কি নিষ্ক্রিয় থাকে? গুরুদাস দর্শন ও কাব্যশাস্ত্র লইয়া বোধ হয় বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তাহার নয়নযুগল পূর্ণ শক্তিতে কার্য্য করিতেছিল, এমন অনুমানের বিরুদ্ধে বলিবার বোধ হয় কিছুই ছিল না।

সুস্থ চিত্তে, অকম্পিত হস্তে নারী চায়ের পেয়ালা অতিথিকে আগাইয়া দিল।

বাসন্তী সন্ধ্যার সৌন্দর্য্য লইয়া বোধ হয় আলোচনার সূত্রপাত হইল। সাত বৎসরের ব্যবধান বিস্মৃত হইবার জন্য কি গুরুদাসের এই প্রচেষ্টা? অপর পক্ষ হইতে কুণ্ঠাহীন, জড়তাবিহীন মন্তব্যের সহিত বাক্‌পটু গুরুদাসের প্রসিদ্ধ, ওজস্বিনী বক্তৃতাশক্তি আজ যেন সমতা রক্ষা করিতে পারিতেছিল না। কথার সূত্র ধরিয়া বড় বড় তত্ত্বের মীমাংসায় যে এক দিন অপরাজেয় ছিল, আজ মাঝপথে সে থামিয়া পড়িতেছে কেন? তখন যাহা অনায়াসলভ্য ছিল, আজ দুর্লভ বলিয়াই কি উত্তেজনার শক্তি নিষ্প্রভ, ম্রিয়মাণ এবং স্খলিতগতি?

কূলপ্লাবিনী ভরা গঙ্গার দিকে চাহিলে দৃষ্টি নত হইয়া আসে কেন? রূপ-জ্যোৎস্নার প্লাবন [illegible]

সন্ধ্যার অন্ধকারের ছায়া বাহিরে গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। ঘরের আলোক পূর্ব্বাপেক্ষা সমুজ্জল। নিঃশেষপীত, শূন্য পেয়ালাটা টেবলের উপর রাখিয়া গুরুদাস রুমালে একবার মুখ মুছিয়া লইল। তাম্বুলভক্ত বলিয়া তাহার প্রসিদ্ধি ছিল। সাত বৎসর পূর্ব্বের মতই পাণের ডিবাটা অণিমা তাহার দিকে আগাইয়া দিল। সে পুরোবর্ত্তিনী নারীর আননে, নয়নে কি হারাণ অরূপের সন্ধান করিতেছিল? তাহার দৃষ্টি হতাশ হইয়া প্রাচীরগাত্রে নিক্ষিপ্ত হইল। সাত বৎসর পূর্ব্বেও কি তাহার নয়নে সে অমূল—অমূর্ত্ত দেবতার দেখা পাইয়াছিল? কাব্য যাহা মীমাংসিত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল, দর্শন তখনও তাহার দেখা পায় নাই। আজও কি সেই সমস্যা সমানভাবেই রহিয়া গিয়াছে? তাহার অতৃপ্ত আত্মা শুধু গোলকধাঁধাঁর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?

অণিমা তাহার প্রিয়-বয়স্য, সখা এবং পাঠগুরুর দিকে পূর্ণ-দৃষ্টিতে চাহিল। তাহার অন্তর ও বাহির মুহূর্ত্তের জন্যও সে প্রখর দৃষ্টির আঘাতে কাঁপিয়া উঠিল না। প্রসন্ন হাস্যের রেখা তাহার মধুর, মনোজ্ঞ অধরপ্রান্তে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। স্নিগ্ধ অথচ স্পষ্ট স্বরে সে বলিয়া উঠিল, "আপনার বাহিরটা আগের মত আছে দেখছি; কিন্তু ভিতরটাও কি তেম্‌নি আছে?"

গুরুদাস কি উত্তর দিতে যাইতেছিল। এমন সময় দ্রুত চঞ্চল চরণে তিন বৎসরের শিশু ধাত্রীর হাত ছাড়াইয়া মা'র কাছে ছুটিয়া আসিল। জননী সস্নেহে তাহাকে বুকে তুলিয়া লইল।

শিশু অপরিচিত গুরুদাসের দিকে বিস্মিত দৃষ্টি ফিরাইল। সুন্দরী জননী বলিল, "নম কর, খোকন!—তোমার মামা বাবু।"

অসহিষ্ণুভাবে গুরুদাস আসনের উপর নড়িয়া চড়িয়া বসিল।

"নারী আপনাকে সন্তানের মধ্যে বিসর্জ্জন করে, আপনি কবি ও দার্শনিক নিশ্চয় তা বোঝেন।"

অপলক দৃষ্টিতে গুরুদাস মাতৃমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার চটুল জিহ্বা কে যেন অবশ করিয়া দিয়াছে।

"আমার সর্ব্বস্ব এর মধ্যেই বিলিয়ে দিয়েছি। নিজের কিছুই নেই। আপনারা পুরুষমানুষ ঠিক হয় ত বুঝবেন না, বৌদিকে জিজ্ঞাসা করবেন। তিনি ও সন্তানের মা হয়েছেন।"

প্রসন্ন হাস্যের তরঙ্গ-হিল্লোল নারীর আননে-নয়নে উছলিয়া উঠিল।

নাই, নাই!—সত্য, শিব ও সুন্দর ব্যতীত অরূপের রূপ ধরা পড়ে না! কাব্য ও দর্শন এ বিষয়ে একমত।

"এই যে মিঃ চৌধুরী, আপনি কতক্ষণ?—থাক্, আপনি ভাল ক'রে বসুন।"

শিশু মায়ের কোল হইতে ঝাঁপাইয়া পিতার ক্রোড় গ্রহণ করিল।

মুগ্ধ গুরুদাস সত্য, শিব, সুন্দরের রূপ দেখিয়া পুলকিত হইয়া উঠিল।

* * * *

লঘুচিত্তে, লঘুপদে গুরুদাস বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সংস্কারের সঞ্চিত মোহ প্লাবন-প্রবাহে কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! অধীর আগ্রহে, কিন্তু চেষ্টাকৃত নিঃশব্দ-চরণে সে আপনার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। শয্যার উপর জমাট জ্যোৎস্নার মত লীলা ঘুমাইতেছিল; কিন্তু পার্শ্বদেশে ও কাহার দেহ ফুলিয়া ফুলিয়া ছুলিয়া ছুলিয়া উঠিতেছে? তাহারই সন্তানের জননী—অনাদৃতা, উপেক্ষিতা, অশেষ প্রেমময়ী সহধর্ম্মিণী শয্যার উপর উপুড় হইয়া অসহ দুঃখ ও শোকের তাড়নায় আত্মসংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে?

বলিষ্ঠ যুগল বাহুর সাহায্যে সে তাহাকে তুলিয়া ধরিল—পত্নীর অশ্রুপ্লাবিত নয়ন মুছাইয়া দিয়া গাঢ়স্বরে বলিল, "শতবার ক্ষমা করেছ, সহস্র অপরাধ মার্জ্জনা করেছ। আর একবার ক্ষমা কর।"

যে নয়ন হইতে এতদিন শুধু অগ্নিই বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা হইতে অশ্রু নির্ঝরের আকারে গলিয়া পড়িল।

প্রকৃতির অনবদ্য সুষমাকে এতদিন যে নভোরেণুজাল আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, দীপ্ত সূর্য্যের প্রখর আলোকে আজ কি তাহা চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়া গেল?

পুষ্পপাত্র, বৈশাখ ১৩৩৪।

প্রায়শ্চিত্ত

১

ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া বৃদ্ধা পরিচারিকা ক্ষেমীর মা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রাণী অপ্রসন্নভাবে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল। দাসী বলিল, "বাবুর দরোয়ান এই চিঠিখানা এনেছে।"

রাণী পত্র লইল। ক্ষেমীর মা বলিল, "জলখাবার এখানে আনবো?"

"না, তুই যা,—আমার মোটে ক্ষুধা নাই।"

দাসী চলিয়া গেল।

সুরঞ্জিত, সুরভি-চর্চ্চিত খামখানি খুলিয়া রাণী চিঠি পড়িল। তাহার বর্ত্তমান প্রতিপালক বিশ্বেশ্বর রায় বহু প্রিয় সম্ভাষণের পর লিখিয়াছেন যে, তাঁহার কোন বিশিষ্ট বন্ধুর প্রীত্যর্থে আগামী কল্য সন্ধ্যার সময় একটি ভোজের আয়োজন হইবে। বন্ধুবরকে তিনি সুগায়িকা, সুন্দরী রাণীর গান শুনাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে চাহেন। রাণী যে কখনও কোনও মজলিসে অথবা কাহারও বাগান-বাড়ীতে গিয়া গান গাহে না, তাহা তিনি বেশ জানেন; কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে উপায়ান্তর নাই। তাঁহার এ অনুরোধটি রক্ষিত না হইলে সত্যই তিনি আন্তরিক দুঃখিত এবং ক্ষুব্ধ হইবেন। তাঁহার বিলক্ষণ আশা আছে, রাণী তাঁহার এ প্রার্থনা মঞ্জুর করিবে।

সৌদামিনী দিগন্ত আলোকিত করিয়া হাসিয়া উঠিল। মেঘের গুরুগর্জ্জনে, মত্ত ঝটিকার আর্ত্ত চীৎকারে প্রকৃতি শিহরিয়া উঠিতেছিল। অবিশ্রান্ত বারিধারাপাতে আষাঢ়ের অপরাহ্ণ ম্লান হইয়া আসিল। দাসী গৃহে আলোক জ্বালিয়া দিয়া গিয়াছিল। রাণী সম্মুখস্থ বৃহৎ দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন করিল। তাহার নবনীত-কোমল বর-দেহে অলোকসামান্য রূপরাশি উছলিয়া উঠিতেছিল। নয়নে স্বপ্নালস দৃষ্টি, পরিপুষ্ট বিম্বাধরে বিজলিদীপ্তি।

রাণীর অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। না— শিকার পলাইতে পারিবে না। এ পর্য্যন্ত কোনও লুব্ধ, লালসা-মুগ্ধ মানব তাহার রূপের মোহ অতিক্রম করিতে পারে নাই। সে বিশ্বাস তাহার নিজের উপর আছে।

রাণী পুনরায় পত্রখানি পাঠ করিল।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত বিপথগামী যুবকদিগের এইরূপ অনুগত ক্রীতদাসের মত ব্যবহারে রাণী কত না তৃপ্তিই লাভ করিত! তাহার সৌন্দর্য্যের ইন্দ্রজাল এমনই বিচিত্র যে, মুগ্ধ যক্ষ-তনয়রা তাহার অলক্তকরাগলাঞ্ছিত চরণতলে লুটাইতে পারিলে ধন্য হয়! এইরূপ কত সম্ভ্রান্ত বংশধরের উচ্চশির তাহার চরণে লুণ্ঠিত হইয়াছে, পিতৃপুরুষের কষ্টার্জ্জিত সঞ্চিত অর্থরাশি তাহার লৌহ-সিন্দুকের রুদ্ধ অর্গল মুক্ত করিয়া অম্লানবদনে রাণীর সেবায় নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। রূপ ও যৌবনের বিনিময়-মূল্য সে-ও প্রসন্নহাস্যে গ্রহণ করিয়াছে।

না, করিবে না কেন? ব্যর্থ জীবনে উহাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য, সুখ ও তৃপ্তি। একটি অকলুষ চরিত্র, অথচ ধনমদ-গর্ব্বিত পুরুষকে রূপের নাগপাশে বাঁধিয়া জীর্ণ ও চূর্ণ করিতে পারিলে যে শান্তি ও তৃপ্তি পাওয়া যায়, তাহার বিনিময়ে রাণী যে তাহার অর্দ্ধেক জীবনও দান করিতে কুণ্ঠিত নহে!

আকাশে মেঘের উপর মেঘ ঘনাইয়া আসিল। ঝটিকার বেগ ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। সৌদামিনীর দীর্ঘ, দীপ্ত শিখা মেঘমেদুর আকাশের হৃদয় যেন ছিন্ন করিয়া বাহির হইতেছিল। দীপ্ত বিজলীর ন্যায় রাণীর হৃদয়ও বজ্রাগ্নিপূর্ণ। কিন্তু চিরদিন কি এমনই ছিল? শৈশবের স্নিগ্ধ, কোমল, সরল হাস্যদীপ্ত মুখ, কৈশোরের শান্ত-মধুর পবিত্রতাময় হৃদয়, তুষার-শুভ্র নির্ম্মল স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ চরিত্র কোথায় গেল? কেন গেল? কাহার অপরাধে আজ সে হীন ঘৃণ্য অপদার্থ জীব? নব বসন্তের প্রথম উষালোকে, মধুকরের অস্ফুট গুঞ্জন সবেমাত্র মুঞ্জরিত কুঞ্জপ্রান্তে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছিল, নবপল্লব-শ্যামল-মাধবীবিতানে সবে দুই একটি কলিকা বিকশিত হইতেছিল, সহসা মত্তঝটিকা বন্ধনমুক্ত দৈত্যের ন্যায় বিপুল বিক্রমে প্রবাহিত হইল; ছিন্নবৃন্ত অর্দ্ধমুকুলিত কুসুম সে প্রলয়-ঝটিকাবেগে কোথায় উড়িয়া গেল? কাহার অপরাধ?

সীমন্তের রক্তরাগ ফুটিয়া না উঠিতেই মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু মানব-প্রকৃতি বাধাবিঘ্ন বিচার করিয়া কাজ করে না। যে যাহার নির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়, আপনার কাজ আপনিই করিয়া যায়। নদীতে ধীরে ধীরে জোয়ার আসিয়া কূলে কূলে

পরিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। উহা প্রকৃতির ধর্ম্ম। বাঁধ না থাকিলে প্রবল বন্যায় নদীর কূল ছাপাইয়া উঠে—তখন পল্লী, নগর, কানন, প্রান্তর সমস্তই প্রবল স্রোতে ভাসিয়া যায়। ইহা বিধির বিধান! তাহারও জীবনে প্রবল বন্যা আসিয়াছিল। তখন তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র। পৃথিবীর কূটনীতি, মানবের সুন্দর দেহের অন্তরালে পশুবৃত্তি, স্বার্থপরতা যে ওত পাতিয়া বসিয়া আছে, সে সম্বন্ধে তাহার কতটুকু অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছিল? বৃদ্ধ বিপন্ন পিতা জীবন-সংগ্রামে ব্যস্ত। চির-রুগ্না পত্নী, বিধবা কন্যা এবং নাবালক পুত্রের উদরের অন্ন, লজ্জা নিবারণের পরিধেয় প্রভৃতি সংগ্রহে বিব্রত—অবসন্ন। সুতরাং বালবিধবা, উদ্ভিন্ন যৌবনা কন্যার সংযম-শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই করিতে পারেন নাই! জীবন লক্ষ্য-ভ্রষ্ট, সম্মুখে—কোন আদর্শ নাই; অথচ সংসারের যাবতীয় প্রবল প্রলোভন দমন করিতে হইবে! কর্ণধার কেহ নাই, তথাপি ঝটিকাবেগ প্রতিহত করিয়া তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ যোজনব্যাপী জলধি পার হইয়া সাবধানে নৌকাকে কূলে লইয়া যাইতে হইবে। কি ভীষণ কঠোর পরীক্ষা! কিশোরী শিহরিয়া উঠিল। তাহার শিরায় শিরায় উত্তপ্ত যৌবনের চঞ্চল রক্তস্রোত বহিতেছিল; বিবেকের দুর্ব্বল বাঁধ সে স্রোতে ভাঙ্গিয়া ভাসিয়া গেল। ঝঞ্ঝাবেগে তরণী ভাসিয়া চলিল। কুজ্ঝটিকায় দিগন্ত আচ্ছন্ন! কূল কোথায়?

যখন মোহ কাটিয়া গেল, কুহেলিকার মায়া-যবনিকা বিদীর্ণ করিয়া অকস্মাৎ সত্যের আলোক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, তখন হতভাগিনীর শুধু ক্রন্দনই অবলম্বন। তরী অকূলে ভাসিয়া চলিয়াছে! আশ্রয় নাই, উপায় নাই! কি তীব্র নৈরাশ্য, কি বুক-ভাঙা দুঃখ!

মাতাপিতার স্নেহশীতল বক্ষে আশ্রয় পাইবার আশায় পথিভ্রান্ত কিশোরী ব্যাকুল হইল। দুর্দ্দম প্রলোভনের প্রবল আকর্ষণে মুগ্ধ হইয়া সে বৃদ্ধ জনক-জননী এবং ছয় বৎসরের শিশু ভ্রাতার যে প্রগাঢ় স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছিল,—সেই চিরমধুর পবিত্র প্রেমপাশে পুনরায় ধরা দিবার বাসনায় সে ব্যগ্রভাবে প্রার্থনা জানাইল; কিন্তু শাসনদক্ষ সমাজ হিমালয়ের অভ্রভেদী চূড়ার মত সন্তান ও পিতামাতার মিলন-পথে বিরাট দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সৃষ্টি করিয়া দাঁড়াইল।

তার পর কি ঘোরতর জীবন-সংগ্রাম! জীবন ও মৃত্যুর প্রবল সংঘর্ষে সে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্ত্ত পিষ্ট হইতে লাগিল। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ নদীর প্রবল আবর্ত্তে ডুবিতে ডুবিতে, ভাসিতে ভাসিতে অবশেষে তাহার শ্রান্ত, অবসন্ন চরণযুগলে যখন মৃত্তিকাস্পর্শ অনুভূত হইল, তখন অভাগিনী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখিল, সে ডাঙ্গায় উঠিয়াছে বটে, কিন্তু সেটা যে কূল নহে, নদীর মধ্যবর্ত্তী একটা চড়া মাত্র, তাহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হইল না। কিন্তু স্বজন-পরিত্যক্তা, উৎপীড়িতা, আশ্রয়হীনার অন্যগতি কি? বেদনাবিদীর্ণ হৃদয়ে সে ভবি-তব্যতার কঠোর বিধান মস্তক পাতিয়া গ্রহণ করিল। কেহ ত তাহার উপদেষ্টা নাই!

কিন্তু সেই দিন হইতে সে শপথ করিল, যে পুরুষ-জাতির প্রলোভন, প্ররোচনা এবং নিষ্ঠুরতায় আজ তাহার নারীধর্ম্ম ব্যর্থ হইয়াছে, সে তাহাদিগকে কখনও ক্ষমা করিবে না। সে তাহার মোহিনী রূপের দীপ্তশিখায় পুরুষ-জাতিকে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ করিবে, তাহার নিটোল যৌবনের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে তাহাদিগের মনুষ্যত্ব ব্যর্থ করিবে। শিশু যেমন খেলার সখ মিটিলে মাটীর পুতুল দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেয়, সেও তেমনই তাহার খেলার সখ মিটাইয়া, মনুষ্যত্বহীন পুরুষগুলাকে একে একে অকর্ম্মণ্য ক্রীড়নকের মত দূরে নিক্ষেপ করিবে। এই তাহার ব্রত। সমাজ তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, ঘৃণ্য অস্পৃশ্য জীবের ন্যায় তাহাকে পাপের পঙ্কিল হ্রদে ডুবিয়া মরিতে আদেশ করিয়াছে; প্রাণের ব্যাকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও তাহাকে কেহ হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিবার চেষ্টা করিল না; তবে সে সমাজের কাহাকেও ক্ষমা করিবে কেন? যে সমাজ তাহাকে এতটুকু দয়া করে নাই, সে সমাজকে সে চূর্ণ না করিবে কেন?

যৌবনের প্রথম প্রভাতে সে যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছিল, পরিপুষ্ট যৌবনের উজ্জ্বল মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত এত দিন সে সেই ব্রত অক্ষুণ্ণভাবে পালন করিয়া আসিয়াছে।, ইহাতেই তাহার তাপদগ্ধ হৃদয়ে একমাত্র সান্ত্বনা, শান্তি ও তৃপ্তি। সপ্তদশবর্ষব্যাপী এই অভিযানে সে সাফল্যই লাভ করিয়া আসিয়াছে। নূতন শিকারটি কি হাত-ছাড়া হইবে? সাধ্য কি।

নবীন উৎসাহে রাণী কক্ষান্তরে গমন করিল।

২

সুচিত্রিত, সুসজ্জিত গৃহমধ্যে সৌদামিনী হাসিতেছিল; বৈদ্যুতিক পাখা দ্রুতবেগে চলিতেছিল। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা চারি জন মাত্র। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত সেই খাস

প্রীতিভোজে বিশ্বেশ্বর বাবু আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই। সাধারণ অথবা জনবহুল মজলিসে রাণী কখনও বাহির হইবে না, ইহা তিনি জানিতেন। এ বিষয়ে তাহার একটা দুর্নাম ছিল। অনেকে তাহাকে অত্যন্ত গর্ব্বিতা বলিয়া জানিত। ঐশ্বর্য্যশালী পুরুষ ব্যতীত রাণী কাহারও সহিত বড় একটা আলাপ রাখিত না। এ শ্রেণীর রমণী হইতে সে একটু ভিন্ন প্রকৃতিরই ছিল।

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই রাণীর গাড়ী উদ্যানভবনে প্রবেশ করিল। আজ সে অতি যত্নের সহিত বেশ-ভূষা এবং প্রসাধন করিয়াছিল। আলোকিত পুষ্পসৌরভসুবাসিত কক্ষমধ্যে রাজেন্দ্রাণীর ন্যায় মন্থরপদে রাণী যখন প্রবেশ করিল, তখন বিশ্বেশ্বর ও তাঁহার বন্ধুযুগল চমৎকৃত হইলেন। তাহার নয়নে কি অপূর্ব্ব, উজ্জ্বল, মোহমদির কটাক্ষ! লীলায়িত গমনভঙ্গিতে উচ্ছ্বসিত সৌন্দর্য্যের কি বিচিত্র বিলাস! বৃদ্ধ নকুড় দত্ত পর্য্যন্ত তাকিয়ার পার্শ্বে সোজা হইয়া বসিলেন। দত্ত মহাশয় নির্ব্বিচারে সকল দলেই মিশিতেন। পল্লীর বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেরই তিনি দাদামহাশয়। এই বৃদ্ধ দাদামহাশয়কে বাদ দিয়া রাজনীতি, সমাজনীতি কোন নীতিরই কোন বৈঠক বসিত না। অতি সামান্য হইতে বিরাট উৎসব—পল্লীতে যখনই যে কোন ব্যাপার ঘটিত, দাদামহাশয় সর্ব্বত্র বিরাজিত; "যেমন কানু ছাড়া গীত নাই", আমাদের দাদামহাশয়কে বাদ দিয়া তেমনই সে পল্লীর কোনও অনুষ্ঠান হইতে পারিত না। এমন পরিহাসরসিক সদানন্দ নির্ব্বিরোধ এবং স্পষ্টবক্তা 'মজলিসি' লোক সে পল্লীতে আর কেহ ছিল না।

যাহার উপলক্ষে প্রীতিভোজের আয়োজন, তিনি তখনও সেখানে আসেন নাই। সকলেই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু যতক্ষণ তিনি না আসেন, গীত-বাদ্য চলিতে থাকুক। সকলের এ প্রস্তাবে রাণী উপেক্ষা করিতে পারিল না।

বিশ্বেশ্বর বাবু স্বয়ং হারমোনিয়মে সুর দিলেন। নিস্তব্ধ কক্ষমধ্যে রাণীর অতুলনীয় সুমধুর কণ্ঠে গীতধ্বনি উঠিল। সঙ্গীতে তাহার অসাধারণ দক্ষতা ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু আজ সে কি গানই গাহিতেছিল! শ্রোতৃগণ মুগ্ধভাবে গান শুনিতে লাগিলেন। কক্ষস্থ বায়ুমণ্ডলের রেণু পরমাণু যেন সুরের [illegible]! [illegible] শরীরী হইয়া উঠিল!

এমন সময় মুক্তদ্বারপথে এক ব্যক্তি প্রবেশ করিলেন। বিশ্বেশ্বর বাবু স্বয়ং তাঁহাকে হাত ধরিয়া গৃহমধ্যে আনয়ন করিলেন। আগন্তুক মুহূর্ত্ত ইতস্ততঃ করিলেন, বন্ধুগৃহে প্রীতিভোজের আসরে বোধ হয় এরূপ কোন নারী-সমাগমের প্রত্যাশা করেন নাই। আগন্তুকের মুখমণ্ডল লজ্জায় আরক্ত হইয়া উঠিল। বিশ্বেশ্বর বাবু বন্ধুর কাণে কাণে বলিলেন, "কথাটা তোমায় তখন বলি নাই; দোষ লইও না। তুমি এ সকলের বিরোধী জানি, কিন্তু এমন গান তোমাকে না শুনাইয়া থাকিতে পারিলাম না। কোন ভয় নাই।"

আগন্তুক কুণ্ঠিতভাবে নতনেত্রে দাদামহাশয়ের পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। রাণী একবার অপাঙ্গে চাহিয়া দেখিল। শিকারের উপযুক্ত বটে! যুবকের বয়ঃক্রম ত্রয়োবিংশ কি চতুর্বিবংশ হইতে পারে। কিন্তু এত লজ্জা, এত সঙ্কোচ সে কোন পুরুষের ব্যবহারে দেখে নাই। রাণীর হৃদয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে সুর চড়াইয়া পূর্ণকণ্ঠে গাহিল—

"তোমারি রাগিণী জীবন-কুঞ্জে
বাজে যেন সদা বাজে গো!"

বিশ্বেশ্বর বাবু দাদামহাশয়কে বলিলেন, "ইনি আমার সতীর্থ, শ্রীযুক্ত রমানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। মেডিকাল কলেজে ইনি ডাক্তারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। সম্প্রতি হুগলীর হাঁসপাতালের চার্জ্জ লইয়া তথায় যাইতেছেন।"

রাণী পূর্ণদৃষ্টিতে একবার যুবকের পানে চাহিল। অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে গাহিল,—

"তোমার আসন হৃদয়-পদ্মে
রাজে যেন সদা রাজে গো!"

দাদামহাশয় গড়গড়ার নলটা ফিরাইয়া ধরিয়া বলিলেন, "তামাক ইচ্ছা করেন?"

রমানাথ বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আজ্ঞে, ওতে আমি নেই।"

গল্পপ্রিয় দাদামহাশয় বলিলেন, "মহাশয়ের নিবাস?"

"আমরা বাঙ্গাল। বরিশাল জেলার তাজনডাঙ্গায় আমার জন্মভূমি।"

বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "রাণী, হুঁসিয়ার, তাল কাটিল যে!"

রাণী লজ্জারক্ত আননে গানের কলিটা ফিরাইয়া ধরিল। কি লজ্জা! এমন ভুল ত তাহার কখনও হয় না!

দাদামহাশয় উচ্চহাস্তে কক্ষতল মুখরিত করিয়া বলিলেন, "আমরা সেকেলে লোক, বুঝেছেন, রমানাথ বাবু, পরিচয়টা আধা রকমের করিতে রাজি নই? হাল ফ্যাসান অথবা সভ্যতার খাতিরে এরূপ কৌতূহলটা অত্যন্ত দূষণীয় সন্দেহ নাই, কিন্তু জানেন তো চিরজন্মের অভ্যাস-দোষটা আর এ বয়সে সংশোধন করা অসম্ভব। মহাশয়ের ঠাকুরের নামটি কি? বুড়ার বেয়াদবি মাপ করিবেন, রমানাথ বাবু।"

অত্যন্ত বিনীতভাবে রমানাথ বলিলেন, "আমরা পল্লীবাসী; পিতৃ-পরিচয়দানে আমরা কখনই সঙ্কোচ বোধ করি না। আমার পিতার নাম ৺রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায।"

বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "গান থামাইলে যে, রাণী?"

দাদামহাশয় গায়িকার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন। রাণী অবনত-মস্তকে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আজ কি জানি কেন শরীরটা ভাল বোধ হইতেছে না। গান আজ আর জমিবে বলিয়া মনে হয় না, কেবলই ভুল হইতেছে।"

দাদামহাশয় বলিলেন, "রমানাথ বাবু, এমন গান আর কোথাও শুনেছ?"

লজ্জানম্র স্বরে নতনেত্রে যুবক বলিলেন, "ভাল গান শুনিবার সৌভাগ্য আমার বেশী হয় নাই; কিন্তু সত্যই এমন মধুর কণ্ঠস্বর জীবনে আমি আর শুনিব কি না জানি না।"

বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "নিধু বাবুর সেই গানখানা একবার শোনাও ত রাণী; 'ভাল বাসিবে বলে'—"

"মাপ করুন, আজ আর গায়িতে পারিব না। আমায় বিদায় দিন।"

রাণী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার আননে যন্ত্রণা, ক্লান্তি ও বেদনার ছায়া পরিস্ফুট। বিবর্ণ মুখে, কম্পিতচরণে রাণী দ্বার অভিমুখে অগ্রসর হইল।

গৃহকর্তা হতাশভাবে বলিলেন, "সে কি? আমাদের এত আয়োজন সব বৃথা হইবে যে!"

রাণীর দেহ টলিল; দরজার কপাট ধরিয়া সে অতি কষ্টে আত্মসংবরণ করিল;—বিশ্বেশ্বর তাহার সাহায্যার্থ উঠিতেছিলেন;—ইঙ্গিতে নিষেধ করিয়া রাণী কক্ষ ত্যাগ করিল।

বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বিশ্বেশ্বর বলিলেন, "আজ সব মাটী।"

দাদামহাশয় নল রাখিয়া বলিলেন, "নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কি বল? মাষ্টার, এইবার তোমার কীর্ত্তনটা ধর। আজ দুধের সাধ ঘোলেই মিটাইতে হইবে।"

৩

অপরাহ্নের ছায়া তখনও গাঢ় হয় নাই। রাণী সেই তরল অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া কি ভাবিতেছিল। কি গর্ব্ব, কি বিশ্বাস লইয়া সে প্রীতিভোজে গিয়াছিল; কিন্তু কি দৈন্য, কি নৈরাশ্য লইয়াই সে ফিরিয়া আসিয়াছে! নারীধর্ম্ম নাই বলিয়া কি শেষে এতও তাহার অদৃষ্টে ছিল? ধিক্কারে, গ্লানিতে, অনুশোচনায় তাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে চাহিতেছিল। নিষ্ঠুর ভবিতব্যতা এমন করিয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিবে, রাণী স্বপ্নেও কোন দিন সে আশঙ্কা করিয়াছিল কি? কিন্তু কি ঘৃণ্য! কি নিদারুণ কঠোর সত্য! রাণী আর ত সহ্য করিতে পারে না। এ স্মৃতি চিরজন্মের মত মুছিয়া দিতে পারে, এমন শক্তি পৃথিবীতে আছে কি? রাণী কি শেষে—না;—চিন্তা করিবার শক্তিও আজ তাহার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

বৃদ্ধা পরিচারিকা ঘরের মধ্যে নিঃশব্দ-চরণে প্রবেশ করিয়া কর্ত্রীর পানে চাহিল; তাহার মূর্ত্তি দেখিয়া বৃদ্ধার চরণ আর উঠিল না। কর্ত্রীর আজ এ কি ভাব? নয়নযুগল স্ফীত, রক্তবর্ণ; উন্নত হৃদয় আবেগে আন্দোলিত হইতেছে। আজ একাদিক্রমে আট বৎসর সে রাণীর পরিচর্য্যা করিতেছে, কিন্তু কখনও সে তাহার এমন ভাববৈলক্ষণ্য দেখে নাই। এই শ্রেণীর সাধারণ নারীর সহিত রাণীর ব্যবহার ও চরিত্রের যথেষ্ট পার্থক্য ছিল সত্য; কিন্তু আজিকার মত রাণীর এমন অবস্থা সে কখনও দেখে নাই।

রাণী শূন্যদৃষ্টিতে কক্ষের দ্বার দিকে চাহিল। সে দৃষ্টিতে শুধু যন্ত্রণা, বেদনা এবং আত্মগ্লানি যেন পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে! পরিচারিকা মৃদুস্বরে বলিল, "বাবু উপরে আসিতেছেন।"

রাণী চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। বিচলিত-কণ্ঠে সে বলিল, "তুই শীঘ্র বল্ গে যা, আমার শরীর বড় খারাপ, কাহারও সহিত আজ দেখা করিব না।"

বৃদ্ধার বিস্ময় চরম সীমায় উঠিল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, এমন সময় বাহিরে জুতার শব্দ শোনা গেল। বিশ্বেশ্বর রায় কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

"রাণী, প্রিয়তমে, কাল আমাদের সমস্ত আমোদটা একেবারে মাটী করিয়া দিয়াছ। রমানাথ বাবুকে তোমার

চারি জন মাত্র। নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত সেই ৭।০

তীব্রকণ্ঠে রমণী বলিল, "চুপ করুন, কে আপনাকে এখানে আসিতে বলিল ?"

বিশ্বেশ্বর তাহার এই অপ্রত্যাশিত কঠোর ব্যবহারে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন ; কিন্তু বিরক্তি প্রকাশ না করিয়া সোহাগভরে বলিলেন, "কাল তুমি অসুস্থ হইয়া আসিয়াছিলে, আজ সকালেই তোমার খবর লওয়া আমার উচিত ছিল ; কিন্তু বিকালের গাড়ীতে রমানাথবাবু হুগলী চলিয়া গেলেন বলিয়াই আমি—"

বাধা দিয়া অসহ্য যন্ত্রণাভরে রাণী বলিল, "আপনি দয়া ক'রে চ'লে যান। আমায় নির্জ্জনে থাক্‌তে দিন। দোহাই আপনার, আমায় বিরক্ত কর্‌বেন না।"

বিশ্বেশ্বর সে কথায় কাণ না দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন। রাণী পশ্চাতে সরিয়া গিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ় কণ্ঠে, কঠোর স্বরে বলিল,—"আমার নিজের বাড়ীতেও কি আমার স্বাধীনতা নাই ? এমন নির্লজ্জ অত্যাচার ত আমি কোথাও দেখি নাই।"

এবার যুবকের আত্মাভিমানে আঘাত লাগিল। তাঁহারই প্রতিপালিতা, তাঁহারই অনুগ্রহ-ভিখারিণী একটা পতিতা নারীর এত তেজ, এত দম্ভ ? বিদ্রূপভরে তিনি বলিলেন, "সুন্দরি ! এটা রঙ্গমঞ্চ নয় ! কাহার সহিত কথা বলিতেছ, সেটা স্মরণ রাখিও। আমার পরিণীতা স্ত্রী তুমি নও ; কিন্তু তোমার আবদার দেখিতেছি অনেকটা সেইরূপ।"

রমণীর নয়ন জ্বলিয়া উঠিল ; কিন্তু মুখমণ্ডল সহসা বিবর্ণ হইয়া গেল। ওষ্ঠে ওষ্ঠ চাপিয়া কম্পিতকণ্ঠে সে বলিল, "আমি যে কি, তা জানি। অবস্থার পাকে পড়েই এই নীচ ব্যবসা করিতেছি। কিন্তু তুমি নিজে কি, তা একবার ভেবে দেখেছ কি ? তোমার কিসের অভাব ছিল ? সাধ্বী স্ত্রী, বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ভগবান্ সবই ত তোমায় দিয়েছিলেন, তবু তোমার কেন পশুর মত আচরণ ? ছিঃ ছিঃ ! ধিক্ !"

"বাঃ রাণি ! বাঃ ! রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া এমন বক্তৃতা কাঁদিলে এতক্ষণ হাজার হাজার করতালি পাইতে !"

বাম হস্তে বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া রাণী দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী উদ্যত করিয়া বলিল, "যাও ! এখন আমার বাড়ী থেকে চ'লে যাও ! আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে তুমি আমাকেই এমনভাবে অপমান করিলে। যাও, তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নাই !"

"কেন, নূতন নাগর জুটিয়াছে নাকি ?"

"ঝি, দরোয়ানকে ব'লে দে, আমার বিনা হুকুমে কেউ যেন আমার বাড়ীতে না ঢোকে।"

ঝটিকার ন্যায় বেগে রাণী কক্ষান্তরে গিয়া দ্বার রুদ্ধ করিল।

৪

সমস্ত দিন রোগী দেখিয়া ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তার সন্ধ্যার সময় হাঁসপাতাল-সংলগ্ন আবাসে ফিরিয়া গেলেন। বাসায় পাচক ও ভৃত্য ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি আর কেহ ছিল না। ডাক্তার বাবু একাই বাস করিতেন।

বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের পর ডাক্তার বাহিরের ঘরের বারান্দায় আসিয়া একখানি আরাম-কেদারায় উপবেশন করিলেন। সমস্ত দিনের গুরু পরিশ্রমে আজ শরীর অত্যন্ত অবসন্ন। অন্য দিন সন্ধ্যার পর তিনি পুস্তকাদি পাঠ করিতেন ; আজ একান্ত পরিশ্রান্ত বলিয়া সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জ্জনে বসিয়া স্নিগ্ধ পবনে শ্রান্তি দূর করিতেছিলেন।

কিছুক্ষণ পরে হাঁসপাতালের উদ্যান-পথে গাড়ীর শব্দ হইল। বুঝি আবার কোন নূতন রোগী আসিয়া উপস্থিত। কর্ত্তব্যপরায়ণ ডাক্তার উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় ভৃত্য আসিয়া জানাইল, দুইটি রমণী তাঁহার সাক্ষাৎপ্রার্থী।

ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই ছিল না। স্ত্রী বা পুরুষ রোগী প্রত্যহই আসিতেছে। তবে সন্ধ্যার সময় স্ত্রী-রোগী বড় একটা আসে না। ডাক্তার বাবু নবাগতাদিগকে ভিতরের ঘরে লইয়া যাইবার জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন।

নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ডাক্তার বাবু প্রবেশ করিবার সময় দেখিলেন, দ্বারের পার্শ্বে একটি রমণী উপবিষ্ট। ভিতরে আর একটি নারী দ্বারের দিকে পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া। পরিচ্ছদ আড়ম্বরবিহীন হইলেও ডাক্তার বাবুর মনে হইল, নবাগতা কোন ভদ্রঘরণী হইতে পারেন। কুণ্ঠিতভাবে তিনি কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "আপনি কি চান ?"

রমণী সম্মুখে ফিরিয়া দাঁড়াইল। প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে ডাক্তার বাবু রমণীর সুন্দর কমনীয় মুখমণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তাঁহার বোধ হইল, এ মুখ যেন পরিচিত।

"আপনাকে কোথায় দেখিয়াছি। কিন্তু ঠিক মনে করিতে পারিতেছি না।"

নবাগতা নতনেত্রে, মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "কলিকাতায় বিশ্বেশ্বর বাবুর বাগানে—"

"মনে পড়িয়াছে। আর বলিতে হইবে না। কিন্তু আপনি এখানে কি মনে করিয়া?"

রমণী নতনেত্রে কুণ্ঠিতভাবে বলিল, "বিশেষ প্রয়োজন, তাই আপনার কাছে আসিয়াছি।"

রাণীর সদাচঞ্চল নয়নযুগলে বিষাদের রেখা পড়িয়াছিল। সে কমনীয় আননে সৌন্দর্য্যের বিদ্যুদ্দীপ্তি আর স্ফুরিত হইতেছিল না। সমগ্র আননে একটা পাণ্ডুর ছায়া বিরাজিত। কণ্ঠস্বরে যেন ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিতেছিল।

ঈষৎ অপ্রসন্নভাবে রমানাথ বাবু বলিলেন, "আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?"

রাণী অবনত মস্তকে কথা বলিতেছিল। উদাসভাবে সে মুক্ত বাতায়ন-পথে বাহিরে চাহিয়া দেখিল, তার পর মৃদুস্বরে বলিল, "আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবেন?"

ডাক্তার বাবু অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। এই সুন্দরী বারনারীর এমন কি প্রয়োজন আছে যে, কলিকাতা হইতে অনুসন্ধান করিয়া তাঁহার এখানে আসিয়াছে? এক দিন এক ঘণ্টার অধিক সে তাহাকে দেখে নাই। অথচ তাঁহারই কাছে তাহার প্রয়োজন! ডাক্তার বাবু প্রশান্তভাবে বলিলেন, "আপনার অভিপ্রায় কি, জানিতে না পারিলে আমি কেমন করিয়া বলিব?"

রাণীর মুখমণ্ডল স্বেদার্দ্র হইল। অঞ্চলে মুখ মুছিয়া লইয়া ব্যথিত হৃদয় দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "আমি কোনও অসঙ্গত অনুরোধ করিব না।"—বলিতে বলিতে তাহার স্বরভঙ্গ হইল। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া সে বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি রেশমের পুঁটুলি বাহির করিল। ধীরে ধীরে ডাক্তারের সম্মুখস্থ টেবলের উপর উহা রক্ষা করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "এগুলি আপনার কাছে রাখিলাম। ইহাতে দুই লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ আছে; দয়া করিয়া ইহার সদ্ব্যয় করিবেন কি?"

ডাক্তার চমকিতভাবে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "মাপ করিবেন, আপনার অর্থ আমি লইতে পারিব না। না, না, ও কথা আমায় বলিবেন না। আমি সেরূপ নহি—আমাকে তেমন ভাবিবেন না।"

অঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া হতভাগিনী মনোজ্বালা [illegible] সংবরণ করিবার চেষ্টা করিল। কি ভীষণ অগ্নিপরীক্ষা! কি নিদারুণ আঘাত! যন্ত্রণায় অধীর হইয়া সে অনুচ্চকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "দুলাল!"

ডাক্তার অন্যমনে কি ভাবিতেছিলেন। সেই আহ্বানে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। বিস্মিতভাবে আনমিতদেহা রমণীর পানে তিনি চাহিলেন। শৈশবের আদরের নামে বহুকাল পরে তাঁহাকে কে ডাকিল? পিতামাতা ব্যতীত এ নামে আর কেহ কখনও ত তাঁহাকে ডাকে নাই। এই অপরিচিতা রমণী কোথা হইতে এ নাম জানিল?

কম্পিত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ নাম আপনি কি করিয়া জানিলেন?"

রমণী ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। উচ্ছ্বসিত-কণ্ঠে সে বলিল, "আমি মহামায়া!"

যদি সেই মুহূর্ত্তে হিমালয়ের বিরাট শৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইত, ডাক্তার তথাপি এত বিস্মিত হইতেন না।

"দিদি!"

বেদনাবিদীর্ণ স্বরে অভাগিনী বলিল, "দিদি বলিয়া আর আমায় যন্ত্রণা দিও না। আমি সে মুখ রাখি নাই। কালা-মুখীর জন্য পবিত্র বংশ কলঙ্কিত। তোমাদের উচ্চ-মাথা আমার জন্য হেঁট হইয়াছে। মহামায়া বহুদিন মরিয়াছে।"

নতমস্তকে রমানাথ কি ভাবিতে লাগিলেন।

মহামায়া বলিল, "আমার জন্যে ভাবিও না। সে জন্য তোমায় বিব্রত করিতে আমি আসি নাই। যে পথে চলিতে-ছিলাম, তাহাও জন্মের মত ত্যাগ করিয়াছি। পাপের অর্থ কোন পুণ্য কাজে ব্যয় করিও। তাহাতে আমার হৃদয়ের নরক-জ্বালা যদি কিছু কমে। আমি চলিলাম, যত দিন বাঁচিব, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। আমাকে পাপী বলিয়া ঘৃণা করিও।"

রমানাথ দৃঢ়স্বরে বলিলেন, "তুমি কোথায় যাইবে? পাপকে ঘৃণা করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু মানুষকে ঘৃণা করিবার কাহারও অধিকার নাই। তুমি আমারই কাছে থাক. এক দিনের ভ্রমে যে বিষম অনিষ্ট ঘটিয়াছিল, সামান্য উদারতায় তাহার অনেক প্রতীকার হইতে পা[illegible]। পিতামাতা এবং সমাজের অবিবেচনায় সে [illegible]যোগ ঘটে নাই; কিন্তু সকলের পক্ষ হইতে আজ [illegible]ার প্রায়শ্চিত্ত করিবার দিন আসিয়াছে। আমি [illegible]াকে কোথাও যাইতে দিব না।"

মহামায়া মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। এতটা সে প্রত্যাশা করে নাই। সে ধীরে ধীরে বলিল, "না দুলাল, তা হইবার নয়। তোমার গৃহে আমি সমাজের অভিশাপ বহন করিয়া আনিব না। তোমার গৃহেই ত আমি স্বর্গের দেবীর ন্যায় থাকিতে পাইতাম; কিন্তু স্বেচ্ছায় সে অধিকার আমি বহুদিন হারাইয়াছি। তোমার আত্মত্যাগ অতুলনীয়। কিন্তু আমারও ত কর্ত্তব্য আছে। নারী বলিয়া গর্ব্ব করিবার কিছু আমার নাই, কিন্তু হৃদয়ও কি একেবারে হারাইয়াছি?"

মহামায়া দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইল।—পরিচারিকা ক্ষেমীর মাও উঠিয়া দাঁড়াইল।

রমানাথ বাধা দিয়া বলিলেন, "দিদি, তুমি যেও না। আমার কাছে না থাকিতে চাও, তোমার অর্থে যে মহদনুষ্ঠান আরম্ভ হইবে, তাহার সেবা হইতে তুমি আপনাকে বঞ্চিত করিও না। আমার বিশ্বাস, তাহাতেই যথেষ্ট প্রায়শ্চিত্ত হইবে। ভগবানের করুণা সর্ব্বত্র অবারিত। তুমিও তাঁহার দয়া লাভ করিবে।"

সে করুণা কি এত দিন মহামায়া চাহিয়াছিল? দীর্ঘ সপ্তদশ বর্ষের মধ্যে এক দিন এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি সে অনন্ত করুণাময়ের চরণে আত্মনিবেদন করিয়াছিল?

মহামায়ার হৃদয় আজ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অকস্মাৎ একটা আশার আলোক তাহার নৈরাশ্য-তমসাবৃত হৃদয়ে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। রমণী নতজানু হইয়া কাহার উদ্দেশে ভক্তিভরে প্রণাম করিল। সুদূর-ভবিষ্যতে কোনও দিন মুহূর্ত্তের জন্যও কি তাহার সহস্র পাপানুষ্ঠানজনিত যন্ত্রণা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হইবে না? কঠোর প্রায়শ্চিত্তে কি পাপের ক্ষয় নাই?

উপাসনা, ১৩১৯।

সম্পূর্ণ